

১

রচনা বালী

সৈয়দ মুজতবা আলী



ହିନ୍ଦୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଚଳଣି ବିଚାରବଳୀ

ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ



ସିନ୍ଧୁ ଓ ଘୋଷ ପବ୍ଲିଶାନ୍ସ
ପ୍ରା ଇ ଡେ ଟି ଲି ମି ଟେ ଡ

୧୦ ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଦେ ସ୍ଟ୍ରୀଟ, କଲିକାତା ୧୨

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সদৃশনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
সিস্ক স্ক্রীন ও
চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও বোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন.
রায় কতৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলীর সহিত তাহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের অনেক আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। আমাদের পরম দুঃখের বিষয়, সে আলাপ-আলোচনার বাস্তব পরিণতি তাহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিলাম না। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ‘দেশে-বিদেশে’, কিন্তু তাহার অনেক রম্যরচনা ‘দেশে-বিদেশে’ গ্রন্থেরও পূর্বে লিখিত—সে কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তাহার সম্পূর্ণ রচনাসৃষ্টির বিষয়বৈচিত্র্য এমনই বিপুল ও বিভিন্নধর্মী যে চাপ-উপন্যাস রচয়িতা কথাসাহিত্যিকদের রচনার মত তাহার শ্রেণীবিভাগ করা দুঃসাধ্য। যেহেতু রম্যরচনাই তাহার লেখনীর প্রথম সৃষ্টি, এই কারণে রচনাবলীর প্রথম দিকের খণ্ডগুলিতে প্রধানত রম্যরচনার গ্রন্থগুলিই অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এই রচনাবলী প্রকাশের কাজে ডক্টর আলীর আত্মীয়-স্বজন অগণিত বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে যে উপদেশ-পরামর্শাদি পাইয়াছি, তাহার জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ডক্টর আলীর মধ্যম-অগ্রজ সুপণ্ডিত সৈয়দ মর্তাজা আলী তাহার লিখিত ডক্টর আলীর জীবনীটি এই রচনাবলীতে সংযোজিত করিবার অনুরোধ দিয়া আমাদের ঋণবদ্ধ করিয়াছেন।

সূচীপত্র

সৈয়দ মজতবা আলী (জীবনী)	/০
কথারসিক সৈয়দ মজতবা আলী	১৮০
ভূমিকা	১১
পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব	
বই কেনা	৩
কাইরো	৭
পদলিনবিহারী	১১
আহারাদি—	১৩
নেতাজী	১৬
রোগক্ষয়—শিক্ষালাভ	১৯
ইস্কিলাস—শেলি—স্পিটলার	২৪
মোপাসাঁ - চেমফ—রবীন্দ্রনাথ	২৭
অনুবাদ সাহিত্য	২৯
‘কলচর’	৩২
ঋণ	৩৪
প্যারিস	৩৬
আজব শহর কলকাতা	৩৮
কিসের সম্বন্ধে ?	৪০
ভক্তি	৪৬
‘আমার ভাণ্ডার আছে ভরে—’	৪৯
মার্জারানিধন কাব্য	৫৪
বেদে	৫৮
ভাষাতত্ত্ব	৬১
সিনিয়র এপ্রেন্টিস্	৬৩
দাম্পত্য জীবন	৬৫
পঁচিশে বৈশাখ	৬৮
তোতা-কাহিনী	৭০
ব্রাহ্ম বিশ্বকর্মা	৭২
রেড্‌ক্‌ব্‌সিয়ারে আড্‌ আবস্‌ড্‌ম !	৭৪
ইরোরোপে ভারতীয় শাস্ত্র-চর্চা	৭৭
চরিত্র পরিচয়	৭৯
আস্তা	৮১
ধূপ-ছায়া	৯০
মেষোদিনী	৯২
কোন্-ডিনারের মা	৯৭

কোদাড মুখহানা	...	১০৩
মাদ্রাজ উপকণ্ঠের বেলাভূমি	...	১২৫
আনিকি পার্সিকিভি	...	১২৭
বিদেশে	...	১২৯

ময়ূরকণ্ঠী

গুরুদেব	...	১৫১
নন্দলালের দেয়াল ছবি	...	১৫৪
বড় দিন	...	১৫৫
পাণ্ডা	...	১৫৭
গীতা-রহস্য	...	১৬০
বন	...	১৬২
‘নেভা’র রাধা	...	১৬৪
বব’র জার্মান	...	১৬৭
ফরাসী—জার্মান	...	১৭২
‘এ তো মেয়ে মেয়ে নয়...’	...	১৭৩
স্বয়ংবরচক্র	...	১৭৫
ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন	...	১৭৮
শিক্ষা-সংস্কার	...	১৮১
কোন গুণ নাই তার—	...	১৮৩
কালো মেয়ে	...	১৮৮
ঋতালী	...	১৯০
রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ইয়োরোপীয় সুরধারা	...	১৯৩
শ্রমণ রিয়োকোলান	...	১৯৬
প্ররজ্যা	...	২০৪
কিংবদন্তীচয়ন	...	২১১
মহাপরিনির্বাণ	...	২১৬
ফুটবল	...	২১৮
বেমলা	...	২২১
আমরা হাসি কেন ?	...	২২৩
গাইড	...	২২৫
আচার্য তুচ্ছ	...	২২৬
নিশীথদা	...	২২৯
পরিমল রায়	...	২৩১
মপাসী	...	২৩৩
রামমোহন রায়	...	২৩৫

বিশ্বভারতী	...	২৩৭
নাগা	...	২৪০
হিন্দু-মুসলমান কোড বিল	...	২৪১
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৪৬
'জিদ-ওয়াইল্ড'	...	২৪৮
এষাস্য পরমার্গতি	...	২৫০
দিস্ ইল্লোরোপ	...	২৫২
শমীম	...	২৫৪
দীনেন্দ্রনাথ	...	২৫৬
ভারতীয় নৃত্য	...	২৫৮
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — নির্বাসিতের আত্মকথা	...	২৬০
জয়হে ভারতভাগ্যবিধাতা	...	২৭০
ইন্দ্রলুপ্ত	...	২৭৪
নল্লরাট	...	২৭৫
আজাদ হিন্দ ফৌজের সমরসংগীত	...	৩০৬

স্বদেশমধুর

নোনাজল	...	৩০৯
নোনামিঠা	...	৩১৭
মণি	...	৩৩১
চাচা-কাহিনী	...	৩৪১
বাশী	...	৩৫২
গ্রন্থ-পরিচয়	...	৩৫৭

সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম হয় ১৯০৪ সালের শেষের দিকে করিমগঞ্জ শহরে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের আগে করিমগঞ্জ শহর সিলেট জেলার ভিতরে ছিল। বর্তমানে করিমগঞ্জ আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের পিতা সৈয়দ সিকান্দার আলী (পরে খানবাহাদুর) তখন সেখানে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে চাকরি করতেন। আমাদের আত্মার নাম আমতুন মম্মান খাতুন।

মুজতবা আলীর বাল্যজীবনের একটি ঘটনা থেকে তার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তার বয়স যখন পাঁচ তখন মিঃ জে. হেজলেট আই. সি. এস. (ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন) আসেন চাড়াভাঙ্গায় বাবার অফিস পরিদর্শন করতে। সেই নিভৃত পল্লীঅঞ্চলে ইংরেজ সাহেবের আগমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। অফিসের বারান্দা লোকে লোকারণ্য। সাহেব নিবিষ্ট মনে অফিসের কাজ পরিদর্শন করছেন। তাঁর বাম হাতে বাঁধা মূল্যবান হাতঘড়ি। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মুজতবা আলী সাহেবের কবজিতে বাঁধা রিস্টওগ্লাসে হাত রাখল। হেজলেট সাহেব ছিলেন অমায়িক ব্যক্তি। তিনি হেসে জানতে চাইলেন ছেলটি কে? বাবা কাছেই ছিলেন। পুত্রের আচরণে লজ্জিত হলেন। সাহেব হেসে বললেন, 'নেভার মাইন্ড, হি উইল বি এ জিনিয়াস!' এই ঘটনাটি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সৈয়দ মুস্তাফা আলীর আত্মস্মৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ছাত্রজীবনেই তার সাহিত্যপ্রীতির উন্মেষ ঘটে। তখনই সে ছিল ওয়ার খৈয়ামের রুবাইয়াতের উৎসাহী পাঠক। তখন সবোন্নত কাস্তিচন্দ্র ঘোষের রুবাইয়াতের অনুবাদ প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়ে সঙ্গো সঙ্গো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মুজতবা আলীর বৌক চাপল রুবাইয়াতের বিভিন্ন বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদ সংগ্রহ করার দিকে। সে ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণ উইন্ডফিল্ডের অনুবাদ সত্যেন দত্ত ও কাস্তি ঘোষের অনুবাদ সংগ্রহ করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ত। পরবর্তী জীবনে নজরুল ইসলামের রুবাইয়াতের অনুবাদে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সরস ভূমিকা লেখে। ১৯২১ সালে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা আসে। সৈয়দ মুজতবা আলী তখন সিলেটে সরকারী হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। সে তখন ক্লাসের ফাস্ট বয়। সরস্বতী পূজার সময়ে কয়েকটি হিন্দু ছাত্র ডেপুটি কমিশনারের বাংলা থেকে ফুল চুরি করে। পরের দিন ডেপুটি কমিশনার ডসন সাহেব (I. A. Dawson) চুরির খবর পেয়ে দোষী ছেলেদের ডেকে পাঠান। ছেলেরা উপস্থিত হলে ডেপুটি কমিশনারের হুকুমে চাপরাসীরা ছেলেদের দৃ-এক ঘা বেত মারে। তখন দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত। ছেলেরা আরম্ভ করল ধর্মঘট। কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুনলেন।

তখন যেসব সরকারী কর্মচারীর পুত্রেরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন তাদের অভিভাবকদের উপর কর্তৃপক্ষ চাপ দিলেন। আমার বাবা তখন ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রার। (আসামে তখন এ চাকুরির নাম ছিল—স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার।) ডেপুটি কমিশনার বাবাকে ডেকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বাবা মৃদুভাবে শুলে ফিরে যেতে বলেন। মৃদুতবা আলী কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার মনোভাব অনমনীয়। সে কিছুতেই শুলে ফিরে যেতে রাজী হ'ল না। আমার বাবার মনে হ'ল তাকে সিলেটের রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দূরে সরাতে পারলে বোধ হয় সব দিক দিয়ে সুবিধা হবে।

ইতিপূর্বে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সিলেটে আসেন তখন তিনি ছাত্রদের কাছে আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। মৃদুতবা আলীর বয়স তখন চৌদ্দ বছর। বক্তৃতা শুনে কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে সে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি লেখে। চিঠিতে জিজ্ঞাসা ছিল, ‘আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হ'লে কি করা প্রয়োজন?’ রবীন্দ্রনাথ সিলেট থেকে আগরতলা গিয়েছিলেন। কবির সিলেট ত্যাগের সপ্তাহখানের পরে আশমানী রঙের খামে ও আশমানী রঙের চিঠির কাগজে মৃদুতবা আলীর নামে আগরতলা থেকে কবির নিজের হাতের লেখা জবাব এল। ১০।১২ লাইনের এই চিঠির মর্ম ছিল, ‘আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করিতে হইবে—এই কথাটার মোটামুটি অর্থ এই—স্বার্থই যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কাম্যনাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার পক্ষে কি করা উচিত তা এতদূর থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমার অন্তরের শূভেচ্ছাই তোমাকেই কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।’ অপ্রত্যাশিত এই চিঠি আমাদের পরিবারে চাম্পল্যের সৃষ্টি করে। তখন থেকেই বিশ্বকবির সান্নিধ্যলাভের আগ্রহ মৃদুতবা আলীর হৃদয়ে জাগ্রত হয়। বাবা তাকে সরকারী শুলে ফিরে যেতে বললে সে শান্তিনিকেতন যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন সবমোট বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়েছে। মৃদুতবা আলী বোধ হয় বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে প্রথম বাইরের ছাত্র। তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্বভারতীতে পড়াতেন। মৃদুতবা আলী তাঁর কাছে বলাকা, শেলি ও কীটসের কাব্য অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করে। একাদিক্রমে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে সে বিশ্বভারতীর স্নাতক হয়। মৃদুতবা আলী ও গুজরাটের বাচ্চুভাই শূক্লাই বোধ হয় বিশ্বভারতীর প্রথম বছরের গ্রাজুয়েট।

বাল্যকালে মৃদুতবা আলীর চেহারা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তার বর্ণ গৌর ছিল। মুখের রেখা ছিল ধারালো। শেষ জীবনের মাথাজোড়া টাক থেকে তার যৌবনকালের চেহারার হৃদিস পাওয়া কঠিন ছিল। বাস্তবিকই সে যৌবনে ছিল কাম্পনকান্তি সুপুরুষ। তার ডাকনাম ছিল সিতারা বা নক্ষত্র। সিতারা শব্দ পরে সিতু রূপে সংক্ষিপ্ত হয়। তাই মৃদুতবা আলী মার্জার-নিধন কাব্যে লিখেছে—

“বাণীয়ে বন্দিয়া কেছা খতম বয়ান
দীন সিতু মিয়া ভণে শুন পুণ্যবান।”



শাস্তিনিকেতনের পড়া শেষ করে মৃজতবা আলী কিছুকাল আলিগড়ে পড়াশুনা করে। সেখানকার পরিবেশ তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। যদিও সে সেখানে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।

এই সময়ে তার কাবুল যাওয়ার সুযোগ হয়। আমানুল্লাহ খান তখন আফগানিস্থানে, ব্যাপক শিক্ষা সংস্কারে মনোযোগী হয়েছেন। শাস্তিনিকেতন থেকে ফরাসী অধ্যাপক বেনোয়া ও রাশিয়ান অধ্যাপক বগদানভ্ তখন কাবুলের শিক্ষাবিভাগে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সাহায্যে সে কাবুল শিক্ষা-বিভাগে চাকরি পায়। তার দায়িত্ব ছিল কৃষিবিজ্ঞান কলেজে সাধারণ বিষয়ে অধ্যাপনা। কাবুলে প্রায় দুই বছর থেকে সে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি দেশে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে বাচ্চাই সাকো কাবুলের বাদশাহ হয়েছেন। পড়াশুনোর কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আফগানিস্থান থেকে ফিরতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়। আমার আব্বা তৎকালীন ভারতীয় লোকসভার সহ-সভাপতি। সিলেটের সুসন্তান আবদুল মতীন চৌধুরীর সাহায্যে মৃজতবা আলী দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে। মৃজতবা আলীর কাবুল-প্রবাসজীবনের সরস বর্ণনা আছে ‘দেশে-বিদেশে’ বইতে। কাবুল থেকে ফিরে এলে মৃজতবা আলী বিদেশে যেতে আগ্রহী হয়। এই সময় বিশ্বভারতীর ডিগ্রী বিদেশে স্বীকৃতিলাভ করে নি। শূদ্ধ ঐটিশের হাতে পরাজিত জার্মান সরকার বিশ্বভারতী ও জার্মানামিলিয়া ইত্যাদি স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিত। মৃজতবা আলী Wilhelm Humboldt নামক জার্মান প্রতিষ্ঠান থেকে একশত পঞ্চাশ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করে। এই বৃত্তি জার্মানীতে পড়াশুনা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আমি তাকে মাসে একশ টাকা করে পাঠাতাম। মৃজতবা আলী প্রথমে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু বার্লিনের মত বড় শহরের হটগোল তার সহ্য হয় নি। কয়েক মাস পরে সে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়। এখানে দুই বছর পড়াশুনা করে সে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী অর্জন করে। তার গবেষণার বিষয় ছিল ‘The origin of the khozhas and their religious life to-day’। জার্মানী থেকে শিক্ষা সমাপন করে সে ১৯৩২ সালে দেশে ফিরে আসে।

এর পর সে পুনরায় ইউরোপ যায় ও ইউরোপ থেকে কায়রো গিয়ে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। সে যখন কায়রোতে তখন বরোদার মহারাজা সন্নাজীরাও গাইকোয়াড় আল-আজহার পরিদর্শনে যান।

এখানে মহারাজাকে মৃজতবা আলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। মহারাজা তার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন এবং দেশে ফিরলে তাকে মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। ১৯৪৩ সালে দেশে ফিরে মৃজতবা আলী বরোদায় যায়। মহারাজা তাকে বরোদা কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। মৃজতবা আলী প্রায় আট বৎসর বরোদায় অধ্যাপনা করে। এই সময়ে সে গুজরাটের একখানি আরবী ইতিহাস সম্পাদনা করতে শুরু করে। এই কাজ সে শেষ করতে পারে নি। সন্নাজীরাও মৃজতবা আলীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও বিদেশী পাণ্ডিত্যের কাছে পরিচিত করিয়ে দিতেন। মহারাজার মৃত্যুর

পর বরোদার পরিবেশ মুজতবা আলীর কাছে প্রীতিকর মনে হয় নি। তখন সে বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলিকাতায় চলে আসে। এই সময় থেকে সে দীর্ঘকাল ও পল্লী রোডে তার বন্ধু আব্দু সৈয়দ আইয়ুবের সহচাৰ্য্যে বাস করে। আইয়ুব যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ ভারতের মদনাপল্লী যান। মুজতবা আলী তাঁর অনুগমন করেন। এই সময়ে সে কিছুকাল বাঙ্গালোরে বাস করে। বাঙ্গালোরে অবস্থানকালেই সে দেশে-বিদেশে লেখার কাজে হাত দেয়।

মুজতবা আলী পরিণত বয়সে সাহিত্যকর্মে রতী হয়। ১৩৪২ সালের মোহম্মদী পত্রিকায় তার মিশরের শিক্ষায়তন শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে মে মাসে সে সিলেট শহরে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে। তার ভাষণ মাসিক মোহম্মদী ও সিলেটের আল-ইসলাহ পত্রিকায় ছাপা হয়।

এর পর সে আনন্দবাজারে সত্যপীর ও টেকচাঁদ নামে একটি 'কলম' লিখতে আরম্ভ করে। মুজতবা 'রায়পিত্তোরা' এই ছদ্মনামে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড কাগজেও লিখেছেন।

১৯৪৮ সালে সে দেশ পত্রিকায় 'দেশে-বিদেশে' লিখতে আরম্ভ করে। এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। প্রকাশক ছিলেন নিউ এজ পাবলিশার্স। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই বই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

রম্যরচনার ক্ষেত্রে নতুন প্রকাশভঙ্গিতে যে লেখক প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি যাযাবর। তাঁর অনবদ্য সুন্দর প্রথম গ্রন্থ 'দৃষ্টিপাত' বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এর পরেই মুজতবা আলী এই ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে। তার রচনাশৈলীর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সে তার মনের ভাব বাচনভঙ্গীর ওপর এঁকে দিতে সমর্থ হয়েছিল। সে অনেক আরবী ফরাসী শব্দ ও পূর্ববঙ্গেয় আঞ্চলিক শব্দকে বাংলাভাষায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। তার কলমের গুণে তার ব্যবহৃত নতুন শব্দ আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তার ভাষায় ফরাসী গদ্যসাহিত্যের প্রাজ্ঞতা স্বচ্ছতা ও বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতা দেখতে পাওয়া যায়। লঘুচালের ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত রচনাশৈলীতে চমক ও শৈল্যের ব্যবহারে সে এক অভিনব রম্যসাহিত্য সৃষ্টি করেছে। অতি সাধারণ ঘটনাকে তীক্ষ্ণ-পর্যবেক্ষণ-শক্তি আত্মস কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকে তীব্রতর স্বচ্ছ রূপপ্রদানের ক্ষমতা তার অসাধারণ।

মুজতবা আলী বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগদান করে। তার প্রগতিশীল মতবাদ কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন নি। তার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল, কলেজ ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধে একজন মন্ত্রী বিরুদ্ধে অশোভন মন্তব্য করা হয়েছিল। তার লেখা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পদ্ধতিকা কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন নি। এই সকল কারণে সে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয় ও ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে।

পরে সে প্রায় সাত বৎসর অল ইন্ডিয়া রেডিওর কটক স্টেশনের ডিরেক্টর ছিল। এই সময়টা তার সুখে কাটে। এসময় বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র

নবকুম্ভ চৌধুরী উড়িষ্যার মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এর পরে সে পাটনা ও দিল্লীতে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে যুক্ত ছিল। অল ইন্ডিয়া রেডিওর চাকুরি করার আগে সে ভারত গবর্ণমেন্টের Cultural Relation সংস্থার সেক্রেটারী ছিল। অল ইন্ডিয়া রেডিওর চাকুরি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে সে জার্মান ভাষা অধ্যাপনা করতো। পরে সে বিশ্বভারতীর ইসলামিক কালচার বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়।

মুজ্তবা আলী ছিল বহুভাষাবিদ। ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষা ও আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি প্রাচ্য ও ভারতীয় ভাষার তার দখল ছিল। সে পনেরোটি ভাষা জানতো।

তার প্রকাশিত গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া গেল—দেশে-বিদেশে, চাচা-কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র (১ম ও ২য় পর্ব), ময়ূরকণ্ঠী, অবিশ্বাস্য, ধূপছায়া, চতুরঙ্গ, শব্দধর্মধর, ভবঘুরে, টুনিমেম, দু'হারা, হাস্যমধুর, প্রেম, জলে-ডাঙায়, শবনম, শহর ইয়ার, বড়বাবু, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, কত না অশ্রুজল, হিটলার ইত্যাদি। শব্দধর্মধর মুজ্তবা আলী ও রঞ্জনের উভয়ের রচনার সংকলন। এ সকল বই ছাড়া তার শ্রেষ্ঠ গল্প, শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা, পছন্দসই, বহুবিচিত্র ইত্যাদি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তার আর একখানা বই 'তুলনা-হীনা' তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে সে পূর্বদেশ পরিচয় 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' নামে একটি ধারাবাহিক রচনা লেখে।

পূর্বে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডি. পি. আই. পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। মুজ্তবা আলীর দুই পুত্র সৈয়দ মশররফ আলী ও সৈয়দ জগলুল আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজে পড়ছে।

মুজ্তবা আলী ছিল আমার আশ্বার কনিষ্ঠ পুত্র। তার জন্মের পরেই আমার আশ্বার চাকুরিতে উন্নতি হয়েছিল। এই কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি আশ্বা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। মুজ্তবা আলী বন থেকে ডক্টরেট নিয়ে এলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি মুজ্তবাবার থিসিস সর্বদা তাঁর সঙ্গে রাখতেন। তাঁর ওফাত হয় ১৯৩৯ সালে ৭৪ বয়সে। ১৯৪৮ সালে মুজ্তবা আলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। পরম পরিতাপের বিষয় আমাদের আশ্বা মুজ্তবা আলীর সাহিত্যখ্যাতি চোখে দেখে যেতে পারেন নি।

সৈয়দ মৃত্যুজা আলী

কথারসিক সৈয়দ মুজতবা আলী

দেশে-বিদেশে বইখানা প্রথম প্রকাশিত হওয়া মাত্র পাঠকসমাজ চমকে উঠল, আর তারপরে বইয়ের পরে বই প্রকাশিত হয়ে সেই প্রথম চমককে অব্যাহত রাখলো, শেষ পর্যন্ত সেই চমকের ভাব অব্যাহত ছিল—যদিচ পাঠকের চোখ তখন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। লেখকের এই ক্ষমতা বিস্ময়কর ও বিরল।

সৈয়দ মুজতবা আলীর নাম আজ দুই বঙ্গে সুপরিচিত, শ্রেষ্ঠ লেখক-গণের তিনি অন্যতম। আমার সৌভাগ্য এই যে পাঠক সমাজের কাছে লেখক রূপে পরিচিত হওয়ার অনেক আগেই আমার সঙ্গে তাঁর দেখা ও পরিচয় হয়েছিল। আমার হাতের কাছে কয়েক খণ্ড শান্তিনিকেতন পত্রের পুরাতন ফাইল আছে, তার মধ্যে চোখে পড়লো ১৯২৬ সালে যে সব ছাত্র-ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সেই তালিকায় সৈয়দ মুজতবা আলী নামটি। ঠিক কোন সালে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন মনে নেই, ১৯২১ বা ১৯২২ হওয়া সম্ভব। তাঁকে প্রথম দেখে Curram অঙ্কিত শেলীর ছবির মুখ মনে এসেছিল, সেই উজ্জ্বল উদাস চোখ, সেই এলোমেলো চুলের অজস্রতা, সেই মৃদুখন্ডলের ছাঁদ। অপরে এই মিল লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানি না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে কলেজে গেলেন না, শান্তিনিকেতনেই কিছ্‌ কিছু বিদেশী ভাষা শিখতে শুরু করলেন। কবে তিনি সে-স্থান পরিত্যাগ করলেন এখন আর মনে নেই, আমি ১৯২৭ সালে পরিত্যাগ করেছিলাম, হয়তো তার কিছ্‌ পরেই। এবার তাঁর আরম্ভ হল বিদেশ ভ্রমণের পালা—জার্মানীর প্রতি বিশেষ টান ছিল তাঁর। তখন এবং তারপরে একাধিকবার জার্মানীতে গিয়েছেন, ইউরোপের অন্য দেশেও। জার্মান ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে গিয়েছিলেন। ভাষা শিক্ষাতেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। ফরাসী ভাষা বেশ ভালো জানতেন।

এই সময়টার তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল হয়ে গিয়েছিল, বন্ধুদের মুখে শুনতে পেতাম তিনি কখনো কাবুলে, কাবুল কলেজের আহবানে কলেজের অধ্যাপক, কখনো শুনতে পেতাম বরোদা কলেজের অধ্যাপক। তারপরে একদিন শুনলাম দেশে ফিরেছেন, আপাতত বিদেশের পালা শেষ। দেখাও হ'ল। এবারে এসে অল্‌ ইন্ডিয়া রোডের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন, কখনো পাটনায়, কখনো দিল্লীতে। কিন্তু কোথাও স্থায়ীভাবে বসতে পারলেন না, তাঁর মধ্যে যে ভবধ্বরেটা ছিল ঘুরিয়ে মারতো সে। তা ছাড়া চাকুরির ছক-কাটা জীবন তাঁর পছন্দ নয়। অবশেষে সমস্ত চাকুরি পরিত্যাগ করে মস্ত-পুরুষ হয়ে ফিরে এলেন বাংলাদেশে। তখন তাঁর আয়ের একমাত্র পথ কলম। কলম তাঁকে জীবনের শেষ পর্যন্ত খোরাক যুগিয়েছে।

আগে বলেছি তাঁর বিদেশ ভ্রমণের পালা শেষ হল। তবে শেষ হয়েও শেষ হল না, রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিল দেশে-বিদেশে গ্রন্থরূপে। এখানাই তাঁর

গ্রেস্ট বই, সেই সঙ্গে পণ্ডিতকে ধরা যেতে পারে। তাঁর বহিমুখী মনের পরিচয় দেশে-বিদেশে, আর বহুমুখী মনের পরিচয় পণ্ডিতশ্রেণী। সমস্তর মূলে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর সেই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল। তাঁর রচনার স্টাইলকে অনায়াসে বৈঠকী চাল বলা যেতে পারে, এ যেন আসর জমিয়ে কথা বলছেন আর সে-সব কথা অনায়াসে কলমের মুখে ঝরছে, কলম তাঁকে এতটুকু বিকৃত করতে পারেনি। এ বড় শক্ত কাজ। অবনীন্দ্রনাথের পথে বিপথে এই চালে রচিত, সে যেন লেখকের হয়ে কলম কথা বলে চলেছে। তবে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে মজতবা আলীর রচনার পার্থক্য এই যে তাঁর ভাষায় দেশী-বিদেশী, বিশেষ উর্দু-ফারসির অনায়াস ও অগাঙ্গী মিশ্রণ, কোথাও এতটুকু ফাটল নেই। কাজী নজরুল ইসলাম যা করেছেন পদ্যে, সৈয়দ মজতবা আলী তাই করেছেন গদ্যে। এ আলালের ঘরের দুলালের ফারসি-বহুল বাংলা নয়—বাংলার সঙ্গে ফারসি মিশিয়ে এক নূতন খাঁচ—অথচ কখনো অবাংলা বলে মনে হয় না। বৈঠকী রীতির এই বিশেষ স্টাইল বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রধান দান। দ্বিতীয় দান দেশ-বিদেশের আবহাওয়াকে বাঙালীর মনের আবহাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। তৃতীয় দানের কথা বলতে হলে প্রথম দানের উল্লেখ করতে হয়, মনীষাকে বৈঠকী রীতিতে প্রকাশ। বিদ্যা আছে অথচ বিদ্যার ভার নেই—এ যেন চন্দ্রলোকের আবহাওয়ান্ন ভারের লঘুভবন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু কোথাও পণ্ডিতী করেন নি—সেই জন্যে সাধারণ পাঠকেরও আকর্ষণ তাঁর রচনার প্রতি। তাঁর অকাল মৃত্যু একটি সম্ভাবনাকে হঠাৎ ছিন্ন করে দিল, কেবলই মনে হতে থাকে না-জানি আরও কী ছিল তাঁর রহস্যময় ঝুলিটার মধ্যে !

প্রীতমথনাথ বিশী

ভূমিকা

সৈয়দ মুজতবা আলী বা আমাদের সৈয়দদার রচনাবলীর ভূমিকা আমি লিখতে বসেছি, এ সংবাদটি তিনি জীবিতকালে পেলে তখনই কাগজ কলম নিয়ে বসে যেতেন এবং সেই মজার ঘটনাটা নিয়েই পণ্ডতন্ত্রের একটা অধ্যায় লিখে ফেলতেন, আর রচনাটি যে খাসা হ'ত—সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ।

ঘটনাটা হাস্যকর বটে, হয়ত সৈয়দদার পক্ষে শোচনীয়ও। কিন্তু কি করব বলুন, যদি আর কেউই লিখতে সাহস না করেন, একজনকে তো অগ্রজকৃত্য, বন্ধুকৃত্য করতেই হয়। আমার দিক থেকে একটা প্রশংসার দাবী এই করতে পারি যে, তাঁর মন্থ চেয়ে হাস্যাস্পদ হবারও ভয় করি নি। দেবদূতরা যেখানে পা ফেলতেও ভয় পান, সেখানে আহাম্মুদুরা অনায়াসে ছুটে আসে—এই অবশ্যাবর্ণণীয় বিদ্রূপবাক্য ভাগ্যে আছে জেনেও, অশ্রী জেনেই, এ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি।

তবে সাফাই একটা আছে। সেটা সৈয়দদাই দিয়ে গেছেন। তিনি নেতাজীকে উপলক্ষ ক'রে যা বলেছেন, তা আমরা তাঁর বেলায়ও কাজে লাগাতে পারি।

“আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের মতো মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা অশ্বের হস্তী দর্শনের ন্যায়। তৎসঙ্গেও যে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছি তার প্রধান কারণ, আমাদের মতো অর্বাচীন লেখকেরা যখন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধাজলি দেবার জন্য ঐ একমাত্র পন্থাই খোলা পায়, তখন তার শ্রদ্ধাবেগ তাকে অশ্বের চরমে পৌঁছিয়ে দেয়—শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য তখন আমাদের চেয়ে সহস্রগুণে উত্তম লেখককেও বাচাল করে তোলে।

“ঐশ্বর্যীয় কারণ, এক চীনা গুণী জনৈক ইংরেজকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজীতে বদ্বিগ্নে বলেছিলেন, ‘সরোবরে জল বিস্তর কিন্তু আমার কাপ ক্ষুদ্র। জল তাতে ওঠে অতি সামান্য। কিন্তু আমার শোক নেই—মাই কাপ ইজ স্মল, বাৎ আই দ্রিস্ক অফভেনার...।’

“আমাদের পাঠ ছোট, কিন্তু যদি সুভাষ-সরোবর থেকে আমরা সে পাঠ ঘন ঘন ভরে নিই তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোবর নিঃশেষ হোক আর না-ই হোক, আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হবে। আমার পায়ে উঠছে দুই গড্ডি জল, অথবা বলব, আমি অশ্ব, হাত দিয়ে ফেলেছি সৌভাগ্যক্রমে দুটি দাঁতেরই উপর। অবশ্য সব অশ্বই ভাবে সে-ই সবচেয়ে মহামূল্যবান স্থলে হাত দিয়ে ফেলেছে।”
[পণ্ডতন্ত্র, ১ম পর্ব, ষোড়শ মন্ত্রণ, পৃঃ ১৭]

সৈয়দ মুজতবা আলী নেতাজী নন—তেমনি আমিও মুজতবা আলী নই। সুতরাং অশ্বের হস্তীদর্শনের উপমাটা এখানে বোমালুম খাটে। আর ঐ

কথাটাও—‘মাই কাপ ইজ স্মল—বাং আই দ্রিস্ক অফ তেনার ।’ অনেকবার অনেক রকম ভাবে সৈয়দদার রচনা দেখতে বৃদ্ধত, তা নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করোঁছি ; তাতে আমার সামর্থ্যের বাটি যতই ক্ষুদ্র হোক—সে রসের কিছুমাত্র স্বাদ পাই নি, এমন হ’তে পারে না । সুতরাং সৈয়দসাহিত্যচর্চা আমার পক্ষে একেবারে অমার্জনীয় খৃষ্টতা না-ও হতে পারে ।

তবে, নির্বোধ হলেও, গোছা বোকা হয়ত নই (কে জানে, এই পংক্তিটি পড়ে পাঠক খুব একচোট হেসে নিচ্ছেন কিনা) । ঠিক ভূমিকা যাকে বলে তা আমি লিখতে বসি নি । মূল্যবান কোন গ্রন্থের যে সব ভূমিকা লেখা হয়, অস্তত যা রীতি—তাতে কিছুটা সমালোচনা থাকে, কিছুটা থাকে ‘উজ্জ্বল অঙ্গুলি করে’ গুণগুণো দেখিয়ে দেওয়া, ‘অজ্ঞান তিমিরাম্বাসা স্ত্রীনাগ্ন-শলাকয়া’ চক্ষু উন্মীলিত ক’রে দেওয়ার প্রচেষ্টা । এক কথায় কিছু ব্যাখ্যার কাজ করা ।

সৈয়দ সাহিত্যে এটা নিঃপ্রয়োজন । তাঁর রচনা দিবালোকের মতো পরিষ্কার, ঝরঝর জলের মতো স্বচ্ছ—সেই রকমই সুস্বাদু, সুপেয়, স্বাস্থ্যকর । তাঁর রচনায় আবিলতা নেই, তা সোজাসুজি পাঠকদের হৃদয়ে পৌঁছয় এবং কিছুটা রসায়নের কাজ করে বলেই তিনি এত জনপ্রিয় । নইলে, তাঁর মতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার পূর্ণ মূল্য দেওয়া, তার সমস্ত বক্তব্য বুঝে তার রসগ্রহণ করা অধিকাংশ সাধারণ পাঠকদের পক্ষে দুঃসাধ্য । তুলনাটা আর একটু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে আনতে গেলে বলতে হয়—তাঁর রচনা অনেকটা পায়ের মতো । খাঁটি দুধ, কামিনী বা গোলাপ-সরু চাল, নলেন-গুড় সহযোগে প্রস্তুত পরমান্ন, সুস্বাদু ও লোভনীয় সন্দেহ নেই কিন্তু কিঞ্চিৎ গুরুপাক, সম্পূর্ণ জীর্ণ করা কঠিন । তবু, জীর্ণ না হ’লেও যেমন রসনামন অনির্বচনীয় ভাবে তৃপ্ত হয়—মুজতবা আলীর রচনা তেমনিই একটা তৃপ্তি দেয়, সবটা না বুঝে, রেফারেন্সগুলো না জেনেও অনেকটা আনন্দলাভে বাধা থাকে না । জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের কথা বাদ দিয়েও অনেক কিছু আছে তাঁর লেখাতে, আর তার আশ্বাদে কোন বাধা নেই—কাঁটা-খোঁচা যাকে বলে—সেই জন্যেই আমাদের মতো গোলা লোকও পড়ে প্রচুর আনন্দ পান । ইলিশমাছ সৈয়দদার খুব প্রিয় ছিল—কিন্তু ভাগ্যে তাঁর রচনা অত কটকাকর্ণ নয়, হিন্দুবিধবার নিরামিষ ব্যঞ্জনের মতো (এও সৈয়দদার প্রিয় অবশ্য) সুস্বাদু ও কিছু হয়ত গুরুপাক—তবু অনায়াসে অশ্বকারেও খেয়ে যাওয়া যায় । এ একটা মস্ত সুবিধে । সবটা, কি দিয়ে কি তৈরী, না বুঝলেও মোটামুটি রসাস্বাদনে বাধা থাকে না ।

না, ব্যাখ্যা করারও যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি সমালোচনা করারও না । আমি ও’র সঙ্গে একমত, “সমালোচনা লেখার মতো শক্তি—দৃষ্ট লোকে বলে শক্তির অভাব—আমার এবং আমার মতো অধিকাংশ লোকের নেই ।……আর কী বা হবে সমালোচনা লিখে ? কটা সুস্থ লোক সমালোচনা পড়ে ?…আলগোছে তফাৎ থেকে সমালোচনা-প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোকর দেয়

অনেকেই—অর্থাৎ রোজা পরসা ঢেলে মাসিকটা যখন নিতান্তই কিনেছে তখন পরসার দাম তোলবার জন্যে একটু-আখটু খোঁচাখুঁচি করে। ফলে চারের রস যত না পেল বঁড়িশির খোঁচাতে তার চেয়ে বেশী জখম হয়ে দুত্তোরছাই বলে তাসপাশাতে ফিরে যায়।”

ব্যাখ্যাও করব না সমালোচনাও করব না—তবে ভূমিকা নাম দিয়ে এ কী আবোলতাবোল লিখতে বসেছি?—স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। হক কথাও। আমি বলব—ঐ অশ্বের হস্তীদর্শনের মতো, আমি যেটুকু তাঁকে দেখেছি বড়োছি—সেইটুকুই এখানে বলব। সহস্রদয় পাঠকদের পছন্দ না হয় পড়বেন না। দয়া ক’রে এই পাতা কটা উল্টে যাবেন।

সৈয়দসাহিত্য পড়তে গিয়ে প্রথমেই আমার যা মনে হয়েছে, আমার বিশ্বাস আরও অনেক সুধী পাঠকের হবে—মুজতবা আলী মূলত কবি ছিলেন। চিরজীবন বেশির ভাগ গদ্য রচনা করে গেলেও তাঁর মন ছিল কবির মন, দৃষ্টি ছিল কবির দৃষ্টি। তাই যেখানেই দেখেছেন কোন অবিচার অত্যাচার, দুঃখ ও শোক, সুঃ নিরপরাধ লোকের শাস্তিভোগ, সেখানেই তিনি অতি সোঁটমেটাল কোমলহৃদয় ব্যক্তির মতো হাহাকার ক’রে উঠেছেন। সে হাহাকারে কখনও ভাগ্যের প্রতি, বিধাতার সম্বন্ধে নিরুপায় ক্লোভ প্রকাশ পেয়েছে—কখনও মানুষের সম্বন্ধে প্রকট উষ্মা। তাঁর ‘শমীম’, ‘ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার সমুদ্রে ঘন আঁধার’ রচনা দুইটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হয়ত ‘মৃত্যু’কেও এর মধ্যে ফেলা যায়। এমন কি যে আঘাত প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ওপর আসে নি, যা তিনি নিজেকে দেখেন নি—তাও তাঁকে এক এক সময় কত বিচলিত করত তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ‘মৃত্যু’ রচনাটি। মৃত্যুর এই অকরণ ও অকারণ আঘাতগুলো যদিচ প্রধানত তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ওপরই—লেখাটা পড়লে মনে হয় তাঁকেও কম বাজে নি।

তা ছাড়াও—তাঁর আপাতচট্‌ল মজলিসী লেখার মধ্যে যেখানে যেখানেই তিনি প্রসংগত কোন কাহিনী বলতে বসেছেন—সেখানেই দেখবেন করুণ কোন ঘটনা—করুণ বললেও ঠিক বলা হয় না—প্যাথোটিক* অভিজ্ঞতা। যেমন কোদুড মৃৎহানার, শামসাদবানুললার ইতিহাস। এই ধরনের ব্যথাতুর, ভাগ্যের-হাতে-মার খাওয়ার কাহিনী তাঁর অজস্র রচনায় মণিমুক্তোর মতো ছড়ানো রয়েছে। ‘পছন্দসই’ বইয়ের লেখাগুলো তিনিই সাজিয়েছিলেন—তাঁর নিজের প্রিয় লেখার সংকলন হিসাবে—তাতে দেখুন, প্রায় সব রচনাই আসলে এই ধরনের করুণ বা প্যাথোটিক কাহিনী। এগুলি সবই তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বিবৃত করা—হয়ত সামান্য একটু হেরফের অদলবদল আছে, কিন্তু সত্য ঘটনার এক সের দৃষ্টে পাঁচপো জল পড়ে নি। ‘ক্লন্দসী’ গল্পই ধরুন না কেন—বলে-কয়েই শূন্য নামটা পাল্টেছেন নায়িকার। বাকী সবই সত্য। তাঁর গুরুদেবের ভাষাতেই বলতে হয়—“শান্তি কোথায় মোর তরে হয় বিশ্বভুবন মাঝে অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বাঁগা বাজে।”

* অভিধানে অর্থ লেখা আছে ‘হৃদয়স্পর্ক’।

অশান্তি শূন্য নয়,—“অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ/কুটিল কুৎসিত ক্রুর, এর পরে তব অভিশাপ/বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্ৰবেগে অজ্ঞানের অগ্নিবাণ সম/তুমি সত্য-বীর, তুমি স্নেহের নির্মল নির্মম/করুণ কোমল।” রবীন্দ্রনাথ, সৈয়দদারই গুরুদেব তাঁর আর এক প্রিয় কবি সত্যেন দত্তর সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, তাঁর নিজের বেলাতেও হুবহু তাই খাটে। সত্যবীর না হোক, লেখার সময় কিছুকাল সত্যপীর নামও নিয়েছিলেন সৈয়দদা। ‘এর পরে তব অভিশাপ/বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্ৰবেগে অজ্ঞানের অগ্নিবাণ সম’—এ দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায় ভূরি ভূরি। অথবা বলা যায়, এ ছাড়া কিছু নেই।

মুজতবা আলীর রচনা পড়তে শূন্য করলে প্রথম একটা আলতো ধারণা হ’ত—তিনি হাসাতে বসেছেন। কারও কারও এমনও ধারণা হ’ত—সাহিত্যের রাজদরবারে তিনি শূন্য ভাড়ামি করতে চান। এমন কি—হায় হতভাগ্য দেশবাসী—অনেক পড়ার পরও এই ধারণা অনেকের যায় নি। তিনি মজলিসী গল্প বলতেন, আড্ডাবাজী ধরনে—সে কথা বলেও গেছেন বার বার—বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের তিনিই প্রচেষ্টা (সে কথায় পরে আসছি) কিন্তু সেটা আর যাই হোক, ভাড়ামি নয়। এ বিষয়ে তাঁর এক প্রিয়—অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, পৃথিবীর বোধ করি সর্বশ্রেষ্ঠ ভাড়ি, একদা বিশ্ববাসীর ভোটে স্বীকৃত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঁচ ব্যক্তির অন্যতম চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় বা নির্মিত ছায়াচিত্রের সঙ্গে (এসব ছবির গল্প হয় উনি নিজে লিখতেন, নয়ত বেছে বেছে নিজের মতো কাহিনীগুলিই নির্বাচন করতেন, নয়ত কাঠামোটা বলে দিয়ে অন্যকে দিয়ে লেখাতেন) তাঁর রচনাধারার অনেক মিল আছে। চার্লিরও হাসিটা যেমন ঠিক হাসি নয়—কান্নারই ছদ্মবেশ, মূখোশ, অথবা কান্নাকে ব্যঙ্গ করা—সৈয়দদার রচনাও তাই, হাসিতে অশ্রুতে মেশানো, অশ্রুর মাঠাই বেশী; কোথাও কোথাও তা এসেছে সোজাসুজি, কোথাও বা এসেছে হাসির আড়ালে, তামাশার মূখোশ পরে। ব্যঙ্গবিদ্‌গু যা করেছেন, তার মধ্যেও ভাল করে (পড়লে) চেয়ে দেখলে দেখা যাবে—দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি বেদনায় ছলছল করছে।

যথার্থ কবিপ্রকৃতি ছাড়া এ সম্ভব নয়। তিনি কবিতাও লিখেছেন—কিন্তু সে নগণ্য; তাঁর অনেক রচনার ফার্সী গজল বা রুবাইয়ের অনুবাদ করেছেন (সত্যেন দত্তর অনুবাদ পেলে সে চেষ্টা আর করেন নি) কিন্তু সেও কাব্যরচনা হিসেবে এমন কিছু উৎকৃষ্ট মানের নয়। আসলে তাঁর সমস্ত রচনাই মূলতঃ কাব্য, কাব্যধর্মী গদ্য—কবিতার মতো করে সাজালে গদ্যকবিতা হ’তে পারত। যেখানে যেখানে তিনি নিসর্গ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সেখানে তাঁর লেখনী ছদ্মবেশও রাখতে পারে নি। যেমন, দু-একটি উদাহরণই দিই—

“বসেছিলুম জলের আর জেলেপাড়ার মাঝখানে। পিছনে নারকেল বন— তাতে আগুন লাগিয়ে সূর্য প্রচণ্ড মহিমায় অস্ত গেলেন—গরবিনীর সতীদাহ। সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ে-ভেসে-আসা-পোনা-মাছ-লব্ধ কাকের ককশ চিৎকার, নারকেল গাছের উসকোখুসকো মাথার অবিস্রান্ত আছাড়

খাওয়া—অশান্তির চরম আয়োজন ।...

“অন্ধকার নামল অতি ধীরে ধীরে। পাটরাণী তো চিত্তের উঠলেন লাল টকটকে হয়ে। আকাশ সিঁদুর মুছলেন অতি অনিচ্ছায়—এমেঘে ওমেঘে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। সন্ধ্যার শেষ পাল্লা জল লালে-নীলে মেঘা বেগুনি ঝিলিক-টুকু মুছে ফেলে আশ্বে আশ্বে শ্যামলা সবুজ হলেন।

“কোনদিন আবার রঙের রাজা মায় তিনটি রঙ নিয়ে খেলায় বসেন। সমুদ্র আর পূর্বের আকাশকে দেন কালো-নীল, পশ্চিম আকাশকে একটুখানি গোলাপী আর মাথার উপর বাকী সমস্ত আকাশ পায় ফিকে ফিরোজা। যতক্ষণ না কালো পরদায় সব কিছুর ঢাকা পড়ে যায়, ততক্ষণ শুধু এই তিন রঙের ‘ফিকে ঘন’র খেলা। তাতে কতই না কারুচুপি। এদিকে কালো-নীল যত ঘনিষে ঘনিষে নীলের রেশ কমাতে লাগল, ওদিকে তেমনি গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরীষ রঙের আমেজ নিতে আরম্ভ করল। মাঝখানের আকাশ ফিরোজাতে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিন স্বর নিয়ে খেলা। আর তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ যদি দ্রুত লয়ে রঙ বদলান তবে পূর্বও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জন যেন তানপূরোর আমেজ।

“সন্ধ্যা এসে যখন পূর্ব-পশ্চিম মিলে গেল অন্ধকারে, তখন তানপূরোর রেশটুকু মায় রইল সাগরপারে। মশালিচ এসে আসমানের ফরাশে এখানে-ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গেল। এবার রাত্রির মশায়েরা (কবিসঙ্গম) বসবে। নারকেল মাথা দোলাবে, ঝাঁঝ নুপূর বাজিয়ে নাচবে, পূর্বের বাতাস সভার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে। তার পর দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে মাতাল চাঁদ উঠবেন ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে, একটুখানি কাৎ হয়ে। মোসাহেবদের মুখে হাসি ফুটেবে—অন্ধকারে যারা গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল তাদের সবাইকে তখন চেনা যাবে।

*

*

*

“দূর থেকে রোষে ক্রোধে তর্জনে-গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিঁদুপারে লুটুটিয়ে পড়ে অবশেষে এ কী বিগলিত আত্মনিবেদন।

“তাড়বের ডমরু বাজিয়ে, ছিন্নমস্তার আত্মঘাতে নিজেকে বারে বারে শ্বিখাশিত করে, পাড়ে এসে অবশেষে লক্ষ কিলিকদীর এ কী মৃদু শান্ত নুপূর-গুঞ্জরণ!

“সূর্যোদয়ের লোহিতোজ্জ্বল রক্ত-টিপ, শ্বিপ্রহরের অতি ঘন নীলাম্বরী, সন্ধ্যার গৈরিক পট্টবাস, সর্বশেষে অন্ধকারে সর্বস্ব ত্যাগ করে কার অভিসারে সিঁদুপারে মৃদুপদসঞ্চার!!” [পঞ্চতন্ত্র, ১ম পর্ব, ১৬শ মৃদুগ, পৃঃ ১১-১৩]

“পশ্চিম বাঙলা যেখানে সতাই সুন্দর সেখানেই দেখি তার উঁচু-নিচু খোয়াইডাঙা আর দূরদুরান্তের নীলাভ পাহাড়। উঁচু-নিচুর ডেউখেলানো মাঠের এখানে ওখানে কখনো বা দীর্ঘ তালগাছের সারি, আর কখনো বা একা

দাঁড়িয়ে একটিমাত্র তালগাছ। এই তালগাছগুলো মানুষের মনে যে অন্তহীন দূরত্বের মায়ী রচে দিতে পারে তা সমুদ্রও দিতে পারে না। সমুদ্রপাড়ে বসে মনে হয়, এই আধ মাইল দূরেই বৃষ্টি সমুদ্র খেমে গিয়েছে—আকাশে নেমে গিয়ে নিরেট দেয়ালের মত হয়ে সমুদ্রের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে।

“পশ্চিম বাঙলার খেয়াইডাঙা তাই তার শালতাল দিয়ে, দূর না হলেও যে দূরত্বের মরীচিকা সৃষ্টি করে, সে মায়াদিগন্ত মানুষের মনকে এক গভীর মৃগতির আনন্দে ভরে দেয়। জানি, মন স্বাধীন; সে কল্পনার পক্ষিরাজ চড়ে এক মূহুর্তেই চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে সৃষ্টির ওপার পানে ধাওয়া দিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্নপ্রয়াণে তো আমার রক্তমাংসের শরীরকে বাদ দিয়ে চলতে হয়—আমাকে দেখতে হয় সব-কিছু চোখ বন্ধ করে। আর এখানে আমার দুটি মাত্র চোখই আমাকে এক নিমেষে নিয়ে যায় দূর হতে দূরে, যেখানকার শেষ নীল পাহাড় বলে, ‘আরো আছে, আরো দূরের দূর আছে’; সে যেন ডাক দিয়ে বলে, ‘তুমি মনুষ্য মানুষ, তুমি ওখানে বসে আছ কী করতে—চলে এসো আমার দিকে।’...

“পূর্ব-বাঙলার সৌন্দর্য দূরত্ব নয়, পূর্ব-বাঙলার ‘মাঠের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে/সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে’ নয়, সেখানে মাঠের শেষেই ঘন-সবুজ গ্রাম আর গ্রামখানির উপর পাহারা দিচ্ছে সবুজের উপর সাদা ডোরা কেটে কেটে সুদীর্ঘ সুপারি গাছ। আর সে সবুজ কত না আভা, কত না আভাস ধরতে জানে। কচি ধানের কাঁচা-সবুজ হলদে-সবুজ থেকে আরম্ভ করে আম, জাম, কাঁঠালের ঘন সবুজ, কৃষ্ণচূড়া-রাখাচূড়ায় কালো সবুজ; পানার সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, কচি বাঁশের সবুজ, ঘন বেতের সবুজ—আর ঝরে-পড়া সবুজ পাতার রস খেয়ে খেয়ে পূর্ব-বাঙলার মাটি হয়ে গেছেন গাঢ় সবুজ...কৃষ্ণশ্যাম। তাই তাঁর মেয়ের গায়ের রঙে কেমন যেন সবুজের আমেজ লেগে আছে। সে শ্যামশ্রী দেশ-বিদেশে আর কে পেয়েছে, আর কে দেখেছে?” [অবিবাস্য, ২য় মূদ্রণ, পৃঃ ১০-১১]

কে জানে প্রথম যৌবনে বা কৈশোর বয়সে অতি ভীর্ণ ভদ্র কোমল মন তাঁর—কোন প্রবল আঘাত পেয়েছিল কিনা, যার ক্ষত সারা জীবনেও শুকোয় নি—তা সামান্য দুঃখের কাঁটা লাগলেও তা থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছে।

আমাদের এ অনুমানের কিছু সমর্থনও তারা রচনাতেই মেলে :—

“আজ না হয় ঠাট্টা-মসকরা রঙ্গ-রসিকতা ক’রে মনের গভীর আবেগ, তার গোপন ক্ষুধা, তার অসম্ভব অসম্ভব স্বপ্ন-চয়ন, তার বন্ধ পাগলামি যতখানি পারি ঢেকে চেপে বলাছি কিন্তু তখন, হয়, এ হালকামি ছিল কোথায়?” [শবনম্, ২য় বিশ্ববাণী সং, পৃঃ ২৮]

উপন্যাসের নায়কের মতোই বসেছে কথাগুলো—কিন্তু এ নায়ককে জেথকই নিজের সঙ্গে প্রায় একাধ্ব করেনি কি ?

সম্ভবত তাঁর এই কবিপ্রকৃতি, বৈদ্য এবং সত্যকার আভিজাত্যের জন্যেই তিনি পুরাতন ‘সেন্স অফ ড্যান্স’ বা মূল্যবোধের সমর্থক ছিলেন।

ভদ্রতা, শিষ্টাচার, মিথ্যা সম্বন্ধে ঘৃণা—সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা—আজ যে গুণ-গুলোর গুণপনা হারিয়ে যেতে বসেছে, যাকে পৌরাণিক যুগের ‘নন্থসেন্স’ বলে মনে করা হয়—সেগুলো সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। তাঁর রচনাতে—যার অধিকাংশ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রূপে তাঁর আত্মজীবনেরই অংশ—এই পুরাতন জগতের মূল্যবোধের, বিশেষত কৃতজ্ঞতাবোধের নিদর্শন অসংখ্য। সামান্যতম স্বর্ণও, যা সে পক্ষ স্বর্ণের কোন কারণ বা উপকার বলে মনেই করেন না—তাও প্রথম সন্ধ্যোগেই উল্লেখ করেছেন।

আমরাও এসব বিষয়ে—বিশেষ জীবনের মূল্যায়নে—প্রাচীনপন্থী। (আমাদের বিশ্বাস অধিকাংশ পাঠকই তাই—নইলে সৈয়দদার বই এত বিক্রী হবে কেন?), সেইজন্যই এই গুণগুলি ভদ্রলোক মাত্রেরই থাকা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। আর, কে না জানে সৈয়দদা সময়ে সময়ে যত বোহেমিয়ান জীবনই যাপন করুন না কেন—মনেপ্রাণে যথার্থ ভদ্রলোক ছিলেন। He was a gentleman first, other things afterwards. অন্য গুণ বা দোষ তাঁর জীবনে পরে - অনেক পরে।

তাঁর এই কৃতজ্ঞতাবোধেরই বড় নিদর্শন তাঁর প্রগাঢ় গুরুভক্তি। গুরুদেব বলতে তিনি রবীন্দ্রনাথকেই বুঝতেন, রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষ রবীন্দ্রসঙ্গীত (রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর অসীম অনুরাগ তাঁর প্রতি রচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে—একথা যদি বলি, বোধ হয় অতুষ্টি করা হয় না) তার সঙ্গে যেন ওতপ্রোত ভাবে মিশে ছিল। হয়ত এমন ভাবে দেহের অস্থিতে মজাতে, প্রতি রক্ত-কণিকায় পর্যন্ত না মিশে গেলেই ভাল হ’ত। যখনই গুরুদেবের প্রসঙ্গ এসেছে তখনই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভক্তি—বোধ হয় তার চেয়েও বেশী—ভালবাসা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভালই বাসতেন, বৈষ্ণবরা যেমন ভাবে তাদের ভগবানকে ভালবাসে—হয়ত সেই রকমই : সথারূপে, নাথরূপে।

রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে তাঁর সত্তায় মিশে না গেলেই হয়ত ভাল হ’ত—কথাটা বোলোঁছ ভেবেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে তিনি সুদৃষ্টি সাধকের, পীরের বাণী শুনতে পেরেছিলেন, তার মধ্যে পেরেছিলেন সেই সাধনার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। তাঁর শহরইয়ার উপন্যাসে শহরইয়ারকে তিনি বার বার এই কথাই বলেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন। শহরইয়ার যখন স্বামী ছেড়ে সংসার ছেড়ে এক সুদৃষ্টি পীরের কাছে গিয়ে পড়ে থাকছে—তখন উনি (এ উপন্যাসের ‘আমি’ বা বক্তা লেখকের ব্যক্তিগত সত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম, একরূপ) রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করছেন, বার বার কতকগুলি বিশেষ রেকর্ড বাজাতে বলছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিভূত করছেন, প্রভাবিতও করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসের মধ্যে যেটি প্রথম ও বোধ করি সর্বাধিক জনপ্রিয়—সেই ‘শবনম’এ তাঁর অজ্ঞাতসারেই ‘শেখের কবিতা’র প্রভাব এসে পড়েছে। সুভাষিত কথার মালা গাঁথে গেছেন, সেটা ক্রমশ যেন নেশার মতো পেয়ে বসেছে তাঁকে। তাতে উপন্যাসের ক্ষতি হয়েছে। কাহিনী দানা বাঁধতে পারে নি তেমন।

বোধ হয় লেখকও সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন, শেষের ষ্ট্যান্ডার্ড ঘটনাটি দিয়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করেছেন—তবু, উপন্যাস হিসেবে যতটা সার্থক হওয়া উচিত ছিল তাঁর মতো বহু-সাহিত্যদর্শী রসবোধী লেখকের পক্ষে, তা হতে পারে নি।

তাঁর উপন্যাস ‘শবনম’ ও ‘শহরইয়ার’ দুয়ের নায়ক তিনি স্বয়ং। শহর-ইয়ারে তো একেবারে সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এটা যেমন একটা প্রচণ্ড বিস্ময়—এমন কি ‘স্টাট’ বললেও বিশেষ অপরাধ ঘটে না—তেমনি বিপুল অসুবিধারও কারণ হয়েছে।

তাঁর উপন্যাস সুলিখিত ও সুললিত তাতে সন্দেহ নেই। বহু করুণ মধুর শাখা কাহিনীতে ভরা—কিন্তু মন্থকিল হয়েছে এই—পাণ্ডিত মনুজতবা আলী বার বারই এসে উপন্যাসিকের কলম কেড়ে নিয়েছেন। তাঁর বলবার কথা অনেক, বলবার অধিকারও যথেষ্ট—প্রবৃত্তিও, তাঁদের পাণ্ডিত্যের বংশ, বহু পুরুষের ঐতিহ্য রক্তে তার কাজ করে যায়—তাঁর মধ্যে একটি সত্যকারের শিক্ষক ছিল—তিনি যা জানতেন তা, পাঠকদের গ্রহণ-ক্ষমতা কত, আধারের পরিধির মাপ বিচার না করেই জানাবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, বস্তুত না জানিয়ে থাকতে পারতেন না। তার ফলে কাহিনী বারে বারে হোঁচট খেত, কোথাও দানা বেঁধে ওঠার অবসর পেত না। তা সত্ত্বেও যে—শবনম ও শহর-ইয়ার—দুটি চরিত্র পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে, সেইটেই ওঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য, ধার ; ওঁর অসমানা শক্তির পরিচায়ক।

এই দুটি উপন্যাসে লেখক স্বয়ং নায়ক বলে তত্ত্বালোচনার মাত্রা একটু বেশী হয়ে পড়েছে। অবিশ্বাস্য ও তুলনাহীনায় এই অসুবিধা নেই। বস্তুত উপন্যাস হিসেবে অবিশ্বাস্য অনেকটা পূর্ণাঙ্গ এবং সার্থক। এর নায়কের জীবনের সুগভীর ষ্ট্রাজেডি, তাঁর বেদনাময় অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাগ্যের হাতে মার খাওয়ার অসহায়তা—একটা পরিপূর্ণ রূপ নিতে পেরেছে। শেষের চিঠিটি একটু বক্তৃতা ও তত্ত্ববহুল, তৎসত্ত্বেও উপন্যাসের প্রকৃত গুণ বইটিতে বর্তমান।

বোধ হয় অবিশ্বাস্য উপন্যাসের নায়ক ঐ সাহেব চরিত্রের মূল মানদণ্ডটিকে—অন্তত অনেকটা ঐ রকম—লেখক কোথাও দেখে থাকবেন। এর ষ্ট্রাজেডি, এর স করুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব—হয়ত কাল্পনিক, কোন তথ্যে নির্ভর করে সে অনুমান গড়ে উঠেছিল—তাকে নাড়া দিয়েছিল, এ কাহিনী বহুদিন ধরেই মাথায় ছিল তাঁর, ভাবনার মধ্যে বহন করেছেন। টুনিমেম গল্‌পের ওঁহায়াই যে অবিশ্বাস্য উপন্যাসের ওরেলি তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এ কাজ তারাত্মক চিরদিন করে গেছেন, তাঁর বহু বিখ্যাত উপন্যাসই আগে বাঁজগল্পাকারে বেরিয়েছে।

মনুজতবা আলী ঈশ্বরবিশ্বাসী খাটি মুসলমান ছিলেন। কিন্তু বহু শাস্ত্র—পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে অনায়াসে সংকীর্ণতা বা গোড়ামির উদ্ভেদ উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস ও

অসম্প্রদায়িকতা—অথবা বলা উচিত উদার দৃষ্টি ও সম্প্রদায়নিরপেক্ষতা—
তাঁর রচনার মধ্যে পাশাপাশি চলেছে বরাবর। এতটা কেউ ভেবেচিন্তে হিসেব
ক’রে লিখতে পারে না, অন্তরের কথা, সহজ সত্য বলেই তা এমন ভাবে
ফুটেছে।

তিনি সংস্কৃত ভাল জানতেন (যদিও বার বার আমাদের বলেছেন যে এ
বিষয়ে তাঁর দাদারা ‘জাল্লা’ট—তিনি কিছুই নন, ‘পিগমী’), মূল রামায়ণ
মহাভারত পড়েছেন, আমাকে একবার কথায় কথায় স্মৃতি থেকে শান্তি পর্বে
ভীষ্মের উক্তি এবং দ্রুতসভায় বিদুরের উক্তির মূল শ্লোক কয়েকটি উদ্ধার
ক’রে শোনান। তাঁর রচনাতেও সে প্রমাণ আছে। গীতা বেদ ভাল ক’রেই
পড়া ছিল। খাঁটি মুসলমান হিসাবে ইসলামকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিশ্বাস
করতেন কিন্তু তার পরই যে ধর্মের শিক্ষার ওপর তাঁর অধিক আস্থা ছিল—
তা হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। এটা কথার কথা নয়, মনোযোগও নয়। সে পরিচয় বলতে
গেলে ওঁর রচনার ছেঁদে ছেঁদে আছে। পদাবলী কীর্তনের ওপর যার এত
প্রগাঢ় অনুরাগ, রাধাকৃষ্ণের বিরহ-কাহিনী তাকে স্পর্শ করে নি—তা হ’তে
পারে না।

তাঁর স্বভাবেই কোন কাপটা বা হীনতা ছিল না। উত্তরকালে যারা
শুধু তাঁর লেখাই পড়বে তারাও বুঝবে যে তিনি মনেপ্রাণে অসম্প্রদায়িক
ছিলেন—এবং কোন সংকীর্ণতা তাঁর থাকা সম্ভব নয়। আগেও বলেছি
এখনও বলছি—তিনি সর্বপ্রথম ও সর্বদা—ভদ্রলোক ছিলেন, ভদ্রতার সব
রকম নিরিখে বিচার করলেও। যথার্থ ভদ্রলোক ও যথার্থ অভিজ্ঞাত। এ
বিষয়ে বংশপরম্পরা ঐতিহ্য তো ছিলই—তার ওপর পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের
আলোকসামান্য প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ—অন্য রকম হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব
ছিল না।

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, ‘বড়বাবু’ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ
ঠাকুরের ওপর তাঁর যে অসীম অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল—যার পরিচয় আমরা বহু-
বার পেয়েছি তাঁর সঙ্গে আলাপে আড্ডায়—যার পরিচয় তাঁর বহু রচনায়—
অপরিমাণ ভক্তি—হয়ত বা, যাকে ইংরেজীতে বলে awe তাও—তাতেই বোঝা
যায় তাঁর মনের গঠন ও গতি কোন দিক ঘেঁষা ছিল। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন
শুদ্ধস্ব মানুষ, কোন মালিন্য তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারত না, সম্পূর্ণ
অহিংস—যে কারণে মহাত্মা গান্ধীও তাঁকে অন্তরঙ্গ-আত্মীয়তা-সূচক বড়দা
বলে সম্বোধন উল্লেখ করতেন—আর ঠিক সেই কারণেই তিনি অবৈষয়িক
অসংসারী ছিলেন, ফলে সাধারণ লোকে তাঁকে বশ্ব পাগল ভাবত। এই লোককে
যিনি ভক্তি করতে পারেন ভালবাসতে পারেন—(সে প্রমাণ তাঁর প্রখ্যাত রচনা
‘বড়বাবু’তেই পাবেন পাঠকরা)—ওঁর রচনা যিনি শ্রদ্ধাসহকারে পড়েন ও মতের
মূল্য দেন—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথের ‘গীতাপাঠ’ বইখানি তাঁর বিছানায় বালিশের পাশে
রাখা থাকত দেখেছি—যিনি ওঁর মতকে সূক্ষ্ম-সাধকদের সঙ্গে তুলনীয় মনে
করতেন—তিনি নিজেও কিছুটা অগ্রসর বৌক।

তাঁর অন্তরে শুদ্ধসং চিন্তার, ঈশ্বরবিশ্বাসের একটা পাবক বাঁহি ছিল

—তার জন্যই যেন কোন আবজ্ঞানা মনে জন্মতে পারত না, কোন অভ্যাসের দোষ তাঁর মনকে আবিল ক'রে তুলতে পারে নি। Self-purifying স্বতঃশোধনশীল উচ্চাচিন্তাই তাঁকে চিরদিন পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে এসেছে। এই নিম্নল মনের জন্যই তাঁর উপন্যাসগুলিতে কোন জখন্য চিন্তা কি যৌন-মিলন-চিহ্ন স্থান পায় নি, গল্প বলতে বসে অমল পবিত্র প্রেমের কথা ছাড়া ভাবতে পারেন নি। 'অবিশ্বাস্য'তে ব্যাভিচারের কথা আছে—বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলন বা তার অভাব, অভাবের ফলে ব্যাভিচার—সমস্ত কাহিনীটার মূলে এ কথাই—তবু বই পড়ে শেষ করলে কোথাও আধুনিক মার্কিন (আমাদের দেশেও সে প্রবল বাতাস এসে পৌঁছেছে) উপন্যাসের মতো আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায় না। দুটি নিরপরাধ জীবন কী ভাবে ভাগ্যের হাতে অকারণ অকরণ মার খেল—সেই বেদনাতেই পাঠকের মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, যৌন জীবনের প্রশ্ন প্রধান হয়ে ওঠে না। এ-ই তাঁর জীবনদর্শন। অস্তত অনেকখানি।

সৈয়দদার আগে বাংলাসাহিত্যে রম্যরচনার একেবারে অভাব ছিল না। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় কৈদার বন্দ্যোপাধ্যায়-দের রচনা হাস্যরসমধুর হ'লেও এগুলি আসলে রম্যরচনাই। যাযাবরের তো কথাই নেই। তাঁর 'দৃষ্টিপাত' রম্যরচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দিলীপকুমার রায়—যিনি belles Lettres 'বেলে লেত্রস্'কে মঞ্জুভাষা নামকরণ করেছিলেন—তিনিও অনেক রম্যরচনা লিখেছেন। এঁদের কাছে বাংলাসাহিত্যের ঋণ অনেক। রাজশেখর বসু ও তাঁর পূর্বাচার্য অসামান্য শক্তিদ্বারা শ্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়—যিনি সে আমলেই একটি গল্পের জন্য পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা আদায় করতেন বলে শুনিয়েছি—এঁদের আবির্ভাব অপ্রত্যক্ষভাবে সৈয়দ সাহিত্য-রচনার মূলে অনেক রসদ যুগিয়েছে। তবে মজতবা আলীর লেখাগুলিতে রম্যরচনা ও রসসাহিত্য ছাড়াও কিছু আছে। একে কী নাম দেবেন - 'আন্ডাসাহিত্য' বললেই ঠিক বলা হয়, 'মজলিসী সাহিত্য' বললে অভিধানটার ওপর একটু পালিশ পড়ে। এই মজলিসী ঢং—অপর কেউ কেউ চেষ্টা করলেও—পরিপূর্ণ মজলিসী রচনার—মজতবা আলী বাংলাসাহিত্যে একক ও অনন্য।

'গালগল্পের' মেজাজে, কর্মহীন অবসরের অলস উদ্দেশ্যহীন আড্ডার ঢঙে বলে গেলেও কথাগুলি অনেক কাজের কথায় ভর্তি; জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, শাস্ত্রচর্চা ও সার্থক বিচার-সমালোচনায় ঠাসা। আগেই বলেছি তাঁর মধ্যে একটি শিক্ষক ছিলেন, আলীদার স্বভাবে সেটাই প্রধান—তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে সেই শিক্ষকতা নাই—যাকে সহজ বাংলায় মাস্টারী বলে—প্রবল ও অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে। রসগোষ্ঠী দিয়ে শটকে শেখানোর মতোই আন্ডাবাজী হালকা 'গল্পের' সুগার-কোটিং বা মধুপ্রলেপ দিয়ে আমাদের অনেক মূল্যবান শিক্ষণীয় তথ্য ও সত্য শেখাতে জানাতে চেয়েছেন। বহু দেশ ঘুরেছেন তিনি, বহু লোক দেখেছেন—পাণ্ডিত, গুণী, রাজনৈতিক থেকে শূন্য করে একেবারে সাধারণ মানুষ—এই সাধারণের সম্বন্ধেই প্রীতি-ভালবাসা বেশী ছিল তাঁর—

সে অভিজ্ঞতাও কম নয়, গল্পের মধ্যে দিয়ে নানাপ্রকার শাখাপ্রসঙ্গে সেই বিশাল, আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত জগৎকে জানতে বোঝাতে চেয়েছেন। আমাদের অজ্ঞতার ওদাসীন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কিন্তু হতাশ হন নি, হাল ছাড়েন নি।

[এই জানবার চেষ্টা এত বেশী ছিল যে আমার মতো সামান্য লেখকের কোন কোন রচনা সাময়িক পড়ে প্রকাশের সময় কোন শব্দার্থে বা শব্দপ্রয়োগে ভুল থাকলে গরজ ক'রে চিঠি লিখে তা জানিয়ে দিতেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অনুরাগ দেখে—বিশেষ মৃদল আমলের ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে—তিনি আমাকে Wollaston-এর মহামূল্যবান গ্যাংলো-পারিসিয়ান অভিধানটি কিনতে পরামর্শ দেন। এবং আমি পেয়ে গেলে কৃত্রিম পরিতাপ প্রকাশ ক'রে একটি সরস চিঠি দেন, কারণ বইটি তিনিও খুঁজছিলেন, পান নি !]

তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে কিছু নেন নি, পরোক্ষ ভাবে অনেক নিয়েছেন। তাদের মূল্য বুঝেছেন বলেই সেই চলা-পথ ত্যাগ ক'রে নিজের পৃথক রাস্তা ক'রে নিতে পেরেছেন।

কিন্তু তাঁর দ্বারা খুব বেশী লেখক প্রভাবিত হ'তে পারেন নি। তা বোধ হয় হওয়া সম্ভবও নয়। তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তর সাধক বলতে গেলে একটিই—রূপদর্শী বা গৌরকিশোর ঘোষ। তবে শংকরের অপ্রত্যক্ষ ঋণ কিছু আছে। অন্তত মৃদুতবা আলীর আবির্ভাবের আলোয় তিনি নিজের পথ, নিজের শক্তির বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন।

সৈয়দদা একটা কথা বার বার বলেছেন যে, রোজগারের দৃষ্টিশক্তি না থাকলে তিনি কলম ধরেন না। তাই যদি হবে, এতই যদি অর্থ সম্বন্ধে সচেতন তবে রোজগারের সিধা সহজ রাস্তাগুলো—ভাল ভাল চাকরিগুলো ছাড়লেন কেন? এই প্রশ্নটাই মাঝে মাঝে মনে জাগে। এত বড় লেখক—এত শক্তিমান, যিনি রচনাবৈশিষ্ট্যে আজও অনন্য, তিনি কি সাহিত্যসৃষ্টির জন্যই সাহিত্য রচনার প্রেরণা কোন দিন অনুভব করেন নি—সৃষ্টিবৃত্তি যাকে বলে? লেখবার, নিজের বক্তব্য বলবার তাগিদ? বিশ্বাস হয় না, কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

বার বার সেই কথাটাই মনে হয়—জীবন প্রভাতে কোথায় একটা কঠিন আঘাত পেয়েছিলেন, অনুভব করেছিলেন সীমাহীন আশাভঙ্গের বেদনা—তাই আশা বলতে উদ্যম বলতে সার্থকতার স্বপ্ন বলতে আর কিছু তাঁর ছিল না। জীবন, প্রতিভা, যশ, সমস্তগুলো সম্বন্ধেই একটা সীমাহীন ওদাসীন্য, apathy এসে গিয়েছিল। স্থায়ী যশলাভ বা অমর সাহিত্য রচনা করার কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করতেন না। তৎসঙ্গে যেটুকু আমরা পেয়েছি সে নিতান্তই আমাদের, সাহিত্য-পাঠকদের ভাগ্য, সাহিত্য-সরস্বতীর করুণা।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পঞ্চতন্ত্র
(প্রথম পর্ব)

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সরলাবালা সরকার

মহাশয়্যার কব্ৰকমলে—

লেখকের নিবেদন

এই পুস্তিকার অধিকাংশ লেখা রবিবারের ‘বসুদমতী’ ও সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় বেরোয়। অননুজপ্রতিম শ্রীমান কানাই সরকার ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ বসু কেন যে এগুলো পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার জন্য আমাকে বাধ্য করলেন সে কথা সহৃদয় পাঠকেরা বিবেচনা করে দেখবেন।

মুদ্রিতবা আলী

বই কেনা

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিগণই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দ্দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবার্ণাবস্কৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বন্ধে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক-একটা করে আমার মনের চোখ ফুটে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুলেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমতঃ—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভূবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশী ভূবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভূবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত গমর খেয়াম বলেছিলেন,—

Here with a loaf of bread
beneath the bough
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়র কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশতের সরঞ্জামের ফিরাঞ্চি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে ‘আল্লামা বিল কলমি’ অর্থাৎ আল্লা মানুশকে জ্ঞান দান করেছেন ‘কলমের মাধ্যমে’। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—The Book.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুদ্বার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি ‘গণ’ অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবদ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মূখে ঐ এক কথা ‘অত কাঁচা পয়সা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?’

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেইটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—বাস্। এর বেশী আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশী বই বিক্রী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, ‘বইয়ের দাম কমাও’, তবে সে বলে ‘বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে?’

‘কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?’

‘আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ষট্‌কায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিম্বাস ওঠে দু’হাজার ছাপাতে গেলেই বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?’

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সম্ভা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সম্ভা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের

পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিল্লি পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝড়কটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয় নি। বই কেনার ব্যাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্ল্যাসের মাছির মত অনেকগুলি চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একাধারে producer এবং consumer—তামাকের মিকশচার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer : আরও বন্ধিয়ে বলতে হবে? আমি একথানা বই produce করেছি—কেউ কেনে না বলে আমিই consumer; অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

*

*

*

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা ন্যাক দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, ‘বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?’

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, ‘ভাই, বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।’

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছুর বই কিনে; আর কিছুর বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, ‘ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সম্মানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করাতে চাই। ধনীর মেহমতের ফল হ’ল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়,

জ্ঞানীরা পরস্পর পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদেব চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদেব হাতে গারে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—বই পড়তে পারে না।’

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ. ই. ডি দিয়ে ‘অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।’

তাই প্রকৃত মানব জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সৈয়দ তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ভ্রূইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরিবনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভান্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরশা হয়ে বললে, ‘তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?’ গরিবনী নাসিকা কুণ্ঠিত করে বললেন, ‘সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।’

যেমন স্ত্রী তেমন স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাहा বেইজিং করতে চায়; তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পগাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদের মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোর্ভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্টালিনীস্টরা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুকাটবা করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ করে সব কিছু শূন্যে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগারে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনলে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মৃত্যুকঙ্ক হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চাড়িয়েছেন। জিদ শত্রু জগতাই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের

মাধ্যখানে জাহাজে বসে শুনতে পেরেছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছাড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা-কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টীক বিক্রি হয়েছিল!)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেন নি।

*

*

*

আর কত বলবো? বাঙালীর কি চেতনা হবে?

তাও বুদ্ধত্ব, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে! বাঙালী যদি হট্টেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অশ্রুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, ‘বাঙালীর পরসার অভাব।’ বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা একথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টীকট কাটার ‘কিউ’ থেকে।

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গুঢ়ার্থ মাত্র কাল বুদ্ধিতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেঁকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে খুঁখু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেঁকিম জ্ঞান মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন ব’লে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেঁকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

কাইরো

কাইরো যাওয়ার জন্য আলাদা করে কাঠখড় পোড়াবার প্রয়োজন হয় না। ইয়োরোপ যাবার সময় জাহাজ সুয়েজ বন্দরে থামে। সেখানে নেবে সোজা কাইরো চলে যাবেন। এদিকে আপনার জাহাজ অতি ধীরে মন্ডরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে পোর্ট সাইদের দিকে রওয়ানা হবে। খালের দু’দিকে বালুর পাড়

যাতে ভেঙে গিয়ে খালটাকে বন্ধ না করে দেয়, তার জন্য কড়া আইন, জাহাজ যেন গরুর গাড়ির গতিতে এগোয়। কাজেই জাহাজ সইদ বন্দর পৌঁছতে না পৌঁছতে আপনি কাইরোতে ঢুঁ মেরে স্ট্রেন করে, সেই সইদ বন্দরেই পৌঁছে যাবেন। সেই জাহাজেই চেপে, সেই কেবিনেই শুয়ে ইয়োরোপ চলে যাবেন—ফালতো কোনো খরচা লাগবে না।

অবশ্য তাতে করে কাইরোর মত শহরের কিছুই দেখা হয় না—আর কাইরোতে দেখবার মত জিনিস আছে বিস্তর। পিরামিড দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, এইটুকু যা সাক্ষ্যনা। জাহাজের অনেকেই আপনাকে বললেন, ঘণ্টা দশকের জন্য কাইরোতে ওরকমধারা ঢুঁ মেরে বিশেষ কোন লভ্য নেই। আমারও সেই মত; কিন্তু তবু যে যেতে বলছি তার কারণ যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, তবে হয়ত বিলেত থেকে ফেরার মুখে ফের কাইরোতে নেবে দু'চার সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে পারেন। ইয়োরোপে তো দেখবেন কুল্লো এক ইয়োরোপীয় সভ্যতা (ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ যত তফাৎই থাক না কেন, তবু তো তারা আপোসে একটা সভ্যতাই গড়ে তুলেছে), আর দেখেছেন ভারতীয় সভ্যতা—তার উপর যদি আরেক তৃতীয় সভ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা হয়ে যায়, তবে তাতে নিশ্চয়ই বিস্তর লভ্য।

আমার লেগেছিল কাইরো দেখতে পাক্সা একটি বছর! অতদিন আপনি থাকবেন না সে আমি জানি। আপনার অতটা সময় লাগবে না—সে কথাও জানি। কারণ আমি কাটিয়েছিলাম প্রথম ছ'টি মাস শুধু আড্ডা মেরে মেরে—বাড়ির ছাতের উপর থেকে পিরামিড স্পষ্ট দেখা যায়, ট্রামে করে হুশ করে সেখানে যেতে কোনোই বাধা নেই, পূর্ণিমায় আবার ইম্পিশল সার্ভিস, তৎসঙ্গে ছ'টি মাস কেটে গেল এ-কাফে ও-কাফে করে করে, পিরামিড দেখার ফুরসৎ আর হয়ে ওঠে না। বন্ধুরা কেউ জিজ্ঞেস করলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতুম, 'সবই ললাটক লিখন। কলকাতায় দশ বছর কাটিয়ে “গঙ্গাস্তান” যখন হয়ে উঠেনি, তখন বাবা-পিরামিড দর্শন কি আমার কপালে আছে?' (আসল কারণটা চুপে চুপে বলি;—এক গাদা পাথর দেখায় যে কি তত্ত্ব তা আমি পিরামিড দেখার আগে এবং পরে কোনো অবস্থাতেই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি নি)।

সে কথা থাক; সভ্যতা, পিরামিড এ-সব জিনিস নিয়ে অন্য জায়গায় পার্শ্বে ফলাব। 'বসুমতী'র পাঠকরা এতদিনে আমাকে বিলক্ষণ চিনে গিয়েছেন, আমার মুখে পার্শ্বেত্তার কথা শুনলে ঠা-ঠা করে হেসে উঠবেন। তাই সেই আড্ডাতেই ফিরে যাই।

আমি ভালোবাসি হেদো, হাতিবাগান, শ্যামবাজার। ও-সব জায়গায় তাজমহল নেই, পিরামিড নেই। তাতে আমার বিন্দুমাত্র খেদও নেই। আমি ভালোবাসি আমার পাড়ার চায়ের দোকানটি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিই, পাড়ার পটলা, হাবুল আসে, সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে গুস্তীসুখ অনুভব করি আর উজির-নাজির মারি। আমার যা কিছু জ্ঞান-গম্মি তা ঐ আড্ডারই ঝড়তি-পড়তি মাল ফুড়িয়ে নিয়ে।

তাই যখন কপালের গাঁদশে কাইরোতে বাসা বাঁধতে হল, তখন আড্ডাভাবে

তিনদিনেই আমার নাভিস্বাস উপস্থিত হল। ছন্দের মত শহরময় ঘুরে বেড়াই আর পটলা-হাবলুর বসন্ত রেস্টুরেণ্টের জন্য সাহারার উষ্ণ নিশ্বাসের সঙ্গে আপন দীর্ঘ নিশ্বাস মেশাই। এমন সময় সদগুরুর কৃপায় একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম—পাড়ার কফিখানাতে রোজই দেখতে পাই গোটা পাঁচেক লোক বসন্ত রেস্টুরেণ্টেরই মত চেঁচামেচি কাজিয়া-খগড়া করে আর এন্টার কফি খায়, বিস্তর সিগারেট পোড়ায়।

দিন তিনেক জিনিসটা লক্ষ্য করলুম, কখনো কফিখানায় বসে, কখনো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। নতুন শহরের সব কিছই গোড়ার দিকে সুদূর-রিয়ালিস্টিক ছবির মতো এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়? অর্থ খাড়া হতে হতে কয়েকদিন কেটে যায়। যখন ব্যাপারটা বৃদ্ধিতে পারলুম তখন আমেজ করলুম, আমাদের বসন্ত রেস্টুরেণ্টের আড্ডা যখন গুরুচাঁদাল সন্ধ্যার জন্যই অব্যাহত, তখন এরাই বা আমাকে রাত্তি করে রাখবে কেন? হিম্মৎ করে তাদের টেবিলের পাশে গিয়ে বসলুম আর করুণ নয়নে তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকালুম। শকুন্তলার হরিণও বৃদ্ধি ওরকমধারা তাকাতে পারত না।

দাওয়াই ধরলো। এক ছোকরা এসে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নিল এবং জানালো তাদের আড্ডায় বিস্তর সীট ভেকেষ্ট, আমি যদি ইত্যাদি। আমাকে তখন আর পায় কে? ভাঙা ফরাসী, টুটাফুটা আরবী, পিজ্জু ইংরিজী সবকিছই জড়িয়ে-মড়িয়ে দু'মিনিটের ভিতরেই তাঁদের সবাইকে বসন্ত রেস্টুরেণ্টে নেমন্ত্রণ করলুম পটলা-হাবলুর ঠিকানা দিলুম, বসন্ত যে ভেজাল তেল আর পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায় তার বর্ণনা দিতেও ভুললুম না।

কিন্তু কোথায় লাগে আমাদের আড্ডা কাইরোর আড্ডার কাছে? বাঙালী-আড্ডার সব কটা সুখ কাইরোর আড্ডাতে তো আছেই; তার উপর আরেকটা মস্ত সুবিধার কথা এই বেলা বলি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে ভূমিকা দিলুম।

দুনিয়ার যত ফোরিওলা কাইরোর কাফেতে চক্কর মেরে যায়। টুথব্রাশ, সাবান, মোজা, আরশি, চিরদুনি, নোটবক, পেন্সিল, তালাচারি, ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি—হেন বস্তু নেই যা ফোরিওলা নিজে আসে না! আমি জানি, আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ধর্মসাক্ষী, দাঁজ পর্যন্ত বস্তু বস্তু কাপড় মূর্টের ঘাড়ে চাপিয়ে কাফের ভিতর চক্কর মেরে যায়। কাইরোর লোক দোকানে যেতে ভালোবাসে না। তাতে নাকি সময় নষ্ট হয়, আর দোকানী একা পেয়ে আপনাকে ঠকাবেও নিশ্চয়। আড্ডাতে বস্তু-বাস্তু বসেছেন। পাঁচজনে মিলে বরং ফোরিওলাকে ঘায়েল করার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

একপ্রস্ত সূট বানাবার বাসনা ছিল। আড্ডাতে সেটা সর্বিনয় নিবেদন করলুম। পাশ দিয়ে দাঁজ যাচ্ছিল—ডাক দিতে সবাই 'হাঁ হাঁ, করো কি করো কি!' বলে বাধা দিলেন! 'ও ব্যাটা সূট বানাবার কি জানে? প্লাস্টিয়াস আসুক। গ্রীক বটে, ঠকাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরাও তো পাঁচজন আছি। ও কাপড় আনে ঠকিয়ে, কাস্টম না দিয়ে। আমরাও ওকে ঠকাতে পারলে টাকায় আট আনা লাভ। ঠকলে দু' আনা লাভ। অথবা কুইটস।' তারপর আড্ডা

আমায় বন্ধিয়ে বলল, যে সূট বানাতে চায় সে যেন বর। তার কথা কওয়া ভালো দেখায় না। সে কনৈপক্ষের প্যাঁচে পাড় বানচাল হয়ে যাবে, গয়নাগুলো যাচাই না করে নিয়ে ফেলে আথেরে পজাবে।

প্লাস্তিরাস এল। তারপর বাপরে বাপ। সে কী অসম্ভব দরদস্তুর, বকাবকি, —শেষটায় হাতাহাতির উপক্রম। আড্ডা বলে, ‘বাটা তুমি দুনিয়া ঠিকিয়ে খাও, তোমাকে পুর্লিসে দেব।’ প্লাস্তিরাস বলে, ‘ও দামে সূট বানাতে আমাকে আপন পাতলুন বশ্বক দিয়ে কাচা-বাচ্চার জন্য আ’ডারুটি কিনতে হবে।’

পাক্সা তিনঘণ্টা লড়াই চলছিল। এর ভিতর প্লাস্তিরাস তিনবার রাগ করে কাপড়ের বস্তা নিয়ে চলে গেল, তিনবার ফিরে এল। আড্ডাও দল বাড়াবার জন্য কাফের ছোকরাকে পাঠিয়ে আমাদের গ্রীক সভা পাউলুসকে ডেকে আনিয়োছ। তখন লাগল গ্রীকে গ্রীকে লড়াই। সুড-এটেন্ নিয়ে হিটলার চেম্বারলেনে এর চেয়ে বেশী দর-কষাকষি নিশ্চয়ই হয় নি। যখন রফারফি হল তখন রাত এগারোটা। আমি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিলুম—আড্ডা তাতে আপত্তি জানান নি, বরের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কাফের ছোকরা আমাকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে গেল। মাপ দেওয়া হল। তিন দিন বাদে পয়লা ট্রায়েল—অবশ্য কাফেতেই।

তিন দিন বাদে আড্ডা ফুল স্ট্রেন্থে হাজির। আমি কাফের পিছনের কামরায় গিয়ে নতুন সূট পরে বোরিয়ে এলুম। সর্বত্র চকের দাগ আর তাঁতী-বাড়ির মত আমার সর্বাঙ্গ থেকে সূতো ঝুলছে। সূটের চেহারা দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘মার লাগাও ব্যাটা প্লাস্তিরাসকে; এ কি সূট বানিয়েছে না মোলবী সাহেবের জোন্ডা কেটেছে?’ ও কি পাতলুম না চিমনির চোঙা? প্লাস্তিরাস দাঁজ না হাজাম? ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কটুকাটব্য। প্লাস্তিরাসও হেঁকে বলল, সে স্বয়ং বাদশার সূট বানায়। সবাই বললে, ‘কোন বাদশা? সাহারার?’

তারপর এ বলে আস্তিন কাটো, ও বলে কলার ছাঁটো। কেউ বলে পাতলুন নামাও, কেউ বলে কোট তোলা। প্লাস্তিরাসও পয়লা নম্বরের ঘড়েল—সকলের কথায় কান দেয় আবার কারো কথায় কান দেয়ও না, অর্থাৎ যা ভালো বোঝে তাই করে।

এই করে করে কাফেতে আড্ডা জমানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ট্রায়েল পেরলুম। সূট তৈরী হল। আমি সেইটে পরে বরের মত লাজুক হাসি হেসে সবাইকে সেলাম করলুম। সূট দীর্ঘজীবী হোক বলে সবাই আশীর্বাদ করলেন। কাফের মালিক পর্যন্ত আমাদের পরবে शामिल হল। আমি সবাইকে একপ্রস্থ কফি খাওয়ালুম। সে-সূট পরে আজও যখন ফার্পোতে ষাই গুণীরা তারিফ করেন।

পুলিনবিহারী

ছেলেবেলায় যে-রকম গলাজল ঠেলে ঠেলে খাল পেরতুম, ঠিক সেইরকম পূর্বের হাওয়া ঠেলে ঠেলে সমুদ্রপারে পৌঁছতে হল।

অন্য দিন সমুদ্র থেকে থেকে এক-একখানা করে ঢেউ পাঠায়। সে অনেক দূর থেকে পায়তারা কষে কষে দাঁড় পাকিয়ে পাকিয়ে কোমর বেঁধে শেষটায় পাড়ে এসে আছাড় খায়। আজ বিশাল আয়োজন। একসঙ্গে অনেকগুলো পালোয়ান; একজনের পিছনে আরেকজন পায়তারা কষে কষে আসছে। তারপর পাড়ে এসে হুটোপুটি—দোস্ত-দুশমনের সনাক্ত হওয়ার গোলমালে আপসে হানাহানি। শেষটায় কোলাকুলিতে মিলে গিয়ে ছোট ছোট দ'য়ে জমে যাওয়া।

সমস্ত আকাশ জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া রঙিন মেঘ—এলোমেলো, যেন আর্টিস্টের পেলেটে, এলোপাতাড়ি হেথা হেথায় এবড়ো-থেবড়ো রঙ। কিন্তু তবু সব-সুন্দর মিলে গিয়ে যেন কেমন একটা সামঞ্জস্য রয়েছে—মনে হয় না অদলবদল করলে কিছুর ফেরফার হবে।

বসেছিলাম জলের আর জেলেপাড়ার মাঝখানে। পিছনে নারকেল বন—তাতে আগুন লাগিয়ে সূর্য প্রচণ্ড মহিমায় অস্ত গেলেন—গরবিনীর সতীদাহ। সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ে-ভেসে-আসা-পোনা-মাছ-লুপ্ত কাকের ককঁশ চিংকার, নারকেল গাছের উস্কাখুস্কা মাথার অবিশ্রান্ত আছাড় খাওয়া—অশান্তির চরম আয়োজন।

তাই বোধ করি একটি জেলে-ডিঙিও জলে নামে নি। লম্বা সারি বেঁধে কাৎ হয়ে পড়ে আছে ডাক্তার, যেন, ডিসেকশান টেবিলের সারি সারি মড়া। সমস্ত তীরে মাত্র দু'টি জেলে সুতো ফেলে গভীর ধৈর্যে মাছ ধরার চেষ্টাতে আছে। জোয়ারের জোর টোপ ধুয়ে নিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে, নতুন টোপ সাজতে হয়—তবু তাদের ধৈর্য অসীম। বাদবাকি ছেলেবুড়ো বালুপাড়ে বসে আছে—এত মেহমত করে লাভ নগণ্য।

অন্ধকার নামল অতি ধীরে ধীরে। পাটরাণী তো চিত্তে উঠলেন লাল টকটকে হয়ে। আকাশ সিঁদুর মুছলেন অতি অনিচ্ছায়—এমেঘে ওমেঘে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। সন্ধ্যার শেষ পাল্লা জল লালেনীলে মেশা বেগুনি ঝিলিকটুকু মুছে ফেলে আন্তে আন্তে শ্যামলা সবুজ হলেন।

কোনদিন আবার রঙের রাজা মাত্র তিনটি রঙ নিয়ে খেলায় বসেন। সমুদ্র আর পূর্বের আকাশকে দেন কালো-নীল, পশ্চিম আকাশকে একটুখানি গোলাপী আর মাথার উপর বাকী সমস্ত আকাশ পায় ফিকে ফিরোজা। যতক্ষণ না কালো পরদায় সব কিছুর ঢাকা পড়ে যায়, ততক্ষণ শুধু এই তিন রঙের ফিকে ঘন'র খেলা। তাতে কতই না কারুচুপি। এদিকে কালো-নীল যত ঘনিয়ে ঘনিয়ে নীলের রেশ কমাতে লাগল, ওদিকে তেমনি গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরিষ রঙের আমেজ নিতে আরম্ভ করল। মাঝখানের আকাশ ফিরোজাতে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিন স্বর নিয়ে খেলা। আর

তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ যদি দ্রুত লয়ে রঙ বদলান তবে পূর্বও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জনে যেন তানপুরার আমেজ।

সন্মে এসে যখন পূর্ব-পশ্চিম মিলে গেল অন্ধকারে, তখন তানপুরার রেশটুকুমাত্র রইল সাগরপারে। মশালটি এসে আসমানের ফরাসে এখানে-ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গেল। এবার রাত্রির মদুশায়েরা (কবিসঙ্গম) বসবে। নারকেল গাছ মাথা দোলাবে, ঝিঁঝিঁ নদপুর বাজিয়ে নাচবে, পূর্বের বাতাস সভার সর্বাস্থে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে। তারপর দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে মাতাল চাঁদ উঠবেন ধীরে ধীরে গা টেনে টেনে, একটুখানি কাণ্ড হয়ে। মোসাহেবদের মুখে হাসি ফুটবে—অন্ধকারে যারা গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল, তাদের সবাইকে তখন চেনা যাবে।

*

*

*

সমুদ্রপারে, নীল গম্বুজের তলে, বিশ্ব-সংসারের ঠিক মাঝখানে যখন বসি তখন মনে হয়, যেন সার্কাসের গোল তাঁবুর মাঝখানে আমাকে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে আর চতুর্দিকে গ্যালারিতে লাল হলদে সোনারলি মেঘের পাল অপেক্ষা করছে আমি কখন বাঁদর-নাচ আরম্ভ করব।

ভারি অস্বস্তি বোধ হয়।

এই সব রঙচঙা মেঘের দল অত্যন্ত অভদ্র চার-আনী দর্শক।

ইহাৎ একজন যেন হেসে হেসে লাল হয়ে ফেটে পড়ার যোগাড় করে পাশের আরেক চার-আনীকে কি বলে। সেও তখন লাল হয়ে উঠে তার পাশের জনকে সে কথা বলে—দেখলে দেখতে সমস্ত তাঁবুর সবাই লাল হয়ে ওঠে। যদিও তাকাই সেদিকেই হাসির লুটোপুটি।

লুকোবার জায়গা নেই।

বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলুম বিরক্ত হয়ে।

কিন্তু তবু সেই মাঝখানেই। তবু যেন তার চার-আনীর দলকে সঙ্গে নিয়ে আমারই চতুর্দিকে ঠিক তেমনি ঘিরে দাঁড়াতে চায়।

বিশ্বসংসার আমাকে বাঁদর-নাচ নাচিয়ে ছাড়বে না!

*

*

*

দু'জোড়া কপোত-কপোতী নিত্য নিত্য দেখতে পাই। একে অন্যকে পেয়েই তারা খুশী। সে খুশী তাদের বসাতে, চলাতে, তাদের হাত-পা নাড়া-চাড়াতে যেন উপচে পড়ে। এক জোড়া সমুদ্রের পারে পারে পা-চারী করে—ছেলেটা যেমন ছ'ফুট ঢ্যাঙা, মেয়েটিও তেমনি পাঁচ ফুটের কর্মতি। ছেলেটার কর্ম, মেয়েটার দুই জুতো এক ফিতেতে বেঁধে কড়ে আঙ্গুলে ঝুলিয়ে দোলাতে দোলাতে লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলা; মেয়েটা-শুধু পায়ে ভিজে বাজির উপর দিয়ে চড়ুই পাখীর মত লাফ দিয়ে দিয়ে নেচে যায়—কেউ তাড়া করে এলে লাফ দিয়ে এক পাশে সরে যায়, চলে গেলে বেঁকে গিয়ে জলের দিকে এগোয়। খাটো করে পরা ফ্রক, পা দু'টি সুড়ৌল ঘন শ্যামবর্ণ। কথাবার্তা

কখনো কইতে শুন নি—একে অন্যের দিকে তাকায় পর্যন্ত না। এগুতে এগুতে তারা আডায়ার পর্যন্ত চলে যায়, তবু দূর থেকেও তাদের চেনা যায়—ঢাঙা আর বেঁটে। ঢাঙা নাক-বরাবর সোজা চলেছে, মেয়েটি একে-বেঁকে।

আরেক জোড়া সমস্তক্ষণ বসে থাকে ডাঙার-তোলা একটা নৌকোর আড়ালে কুন্ডলী-পাকানো জালের বস্তায় হেলান দিয়ে। সমুদ্রের দিকে তাকায় না, পিছনের সুযান্ত্রিক জালের বস্তায় ঢাকা পড়ে। সমস্তক্ষণ গুজুর গুজুর। কখনো খুব পাশাপাশি ঘেঁষে বসে, ছেলেটা মেয়েটির কোলে হাত রেখে, কখনো দোঁখ মেয়েটির হাত ছেলেটির কোমর জড়িয়ে। বেড়ায় না, ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় না। রাত ঘনিয়ে এলে একই সাইকেলে চড়ে উত্তর দিকে চলে যায়।

*

*

*

দূর থেকে রোষে-ক্রোধে তর্জন-গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিঙ্খুপারে লুটিয়ে পড়ে অবশেষে এ কী বিগলিত আত্মনিবেদন।

তা'ড়বের ডমরু বাজিয়ে, ছিন্নমস্তার আত্মঘাতে নিজেকে বারে বারে শ্বিখাশ্চিত করে, পাড়ে এসে অবশেষে লক্ষ কিশকণীর এ কী মৃদু শান্ত নৃপদ-গুঞ্জরণ!

সূর্যোদয়ের লোহিতোজ্জ্বল রক্ত-টিপ, শ্বিপ্রহরের অতি ঘন নীলাম্বরী, সম্ভার গৈরিক পটুবাস, সর্বশেষে অন্ধকারে সর্বস্ব তাগ করে কার অভিসারে সিঙ্খুপারে মৃদুপদসংগরণ!!

আহারাদি—

যে লোক উশ্ভিদতত্ত্ব জানে না, সে দেশী-বিদেশী যে-কোন গাছ দেখলেই মনে করে, এও বুদ্ধি এক সম্পূর্ণ নতুন গাছ। তখন নতুন গাছের সঙ্গে তার চেনা কোনো গাছের কিছুটা মিল সে যদি দেখতে পায় তবে অবাক হয়ে ভাবে, এই চেনা-অচেনায় মেশানো গাছের কি অন্ত নেই। কিন্তু শুনোছি, উশ্ভিদবিদ্যা নাকি পৃথিবীর বেবাক গাছকে এমন কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলেছে যে, নতুন কোনো গাছ দেখলে তাকে নাকি কোনো একটা শ্রেণীতে ফেলে নামকরণ পর্যন্ত করা যায়। আশ্চর্য নয়, কারণ ধর্মির বেলা তো তাই দেখতে পাচ্ছি। ইংরিজী শূনে মনে হয় যে, এই বিকট ভাষার স্বর-ব্যঞ্জনের বুদ্ধি অন্ত নেই। কিন্তু ডেনিয়েল জোন্স এবং পূর্বাচার্যগণ এমনি উত্তম শ্রেণীবিন্যাস করে ফেলেছেন যে, আজ আমরা বাপঠাকুরদার চেয়ে বহু কম মেহমতে ইংরিজী উচ্চারণ শিখতে পারি।

আহারাদির বেলাও তাই। আপনার হয়ত কোনো কাবুলীওয়ালার সঙ্গে মিতালি হল। সে আপনাকে দাওয়াত করে খাওয়াল। প্রথমটায় আপনি হয়ত ভেবেছিলেন যে, হাতুড়ি বাটালি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। গিয়ে দেখেন, খেতে দিল তোফা পোলাও আর থাসা মুরগীর ঝোল। তবে ঠিক জাকারিলা স্ট্রীটের মত রান্না নয়, কলকাতাবাসী পশ্চিমা মুসলমানরা যে রকম রান্না করে ঠিক

সে-রকম নয়। কেমন যেন একটুখানি আলাদা, কিন্তু খেতে উদ্দা।

অথবা মনে করুন আপনাকে প্যারিসের কোনো রেস্টোরাঁর আপনার ভারতীয় বন্ধু 'হার্জেরিয়ান গুলাশ' খেতে দিলেন। হয়ত আপনি ইয়োরোপে এসেছেন মাত্র কয়েকমাস হল—নানা প্রকার যাবনিক খাদ্য খেয়ে খেয়ে আপনার পিণ্ড (উভয়ার্থে) চটে আছে। তখন সেই 'গুলাশ' দেখে আপনি উম্বাহু হয়ে নত্ব করবেন। সেই রাগেই আপনি গিল্পীকে চিঠি লিখলেন, 'বহুকাল পরে মাংসের ঝোল খেয়ে বিমলানন্দ উপভোগ করলুম।' কারণ 'হার্জেরিয়ান গুলাশ' আর সাদা-মাটা মাংসের ঝোলে কোনো তফাৎ নেই।

আর আপনার বন্ধু যদি ন'সিকে গুপী হন এবং সেই গুলাশের সঙ্গে খেতে দেন 'ইতালিয়ান রিসোত্তো', তাহলে আপনাকে হাতী দিয়ে বেঁধেও সেই রেস্টোরাঁ থেকে বের করা যাবে না। ইয়োরোপের বাকী ক'টা দিন আপনি সেই রেস্টোরাঁর টেবিল বেড়ালছানার মত আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চাইবেন। কারণ বহুকাল যাবনিক আহাারাদির পর মাংসের ঝোল আর রুটি মূখরোচক বটে, কি তার সঙ্গে কি পোলাও আর মাংসের ঝোলের তুলনা হয়? ঘড়েল পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন যে, 'ইতালিয়ান রিসোত্তো' মানে পোলাও, তবে ঠিক, ভারতীয় পোলাও নয়। কোস্তা-পোলাওয়ের কোস্তাগুলোকে যদি ছোট্ট ছোট্ট টুকরো করে পোলাওয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাই হবে রিসোত্তো।

অথবা মনে করুন, দেশে ফেরার সময় আপনি একদিনের তরে কাইরোতে ঢুক্ মেরে এলেন। কিছু কঠিন কর্ম নয়। পোর্ট সইদে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে কাইরো, সেখানে ঘণ্টা বারো কাটিয়ে মোটরে করে সুয়েজ বন্দরে পৌঁছে ফের সেই জাহাজই ধরা যায়—কারণ জাহাজ সুয়েজ খাল পেরায় অতি ধীরে ধীরে।

কাইরোতে খেলেন মিশরী রান্না। চাক্তি চাক্তি মাংস খেতে দিল, মাধ্যাহ্নে ছাদা। দাঁতের তলায় কাঁচ কাঁচ করে বটে, কিন্তু সোওয়াদ খাসা। খাচ্ছেন আর ভাবছেন বস্তুটা কি, কিন্তু কোন হৃদিস পাচ্ছেন না। হঠাৎ মনে পড়ে যাবে, খেয়েছি বটে আমজাদিয়ায় এইরকম ধারা জিনিস—শিকাবাব তার নাম। তবে মশলা দেবার বেলা কঞ্জুসী করেছে বলে ঠিক শিকাবাবের সুখটা পেলেন না।

এতক্ষণে আপনার শাস্ত্রাধিকার হল। এই যে মশলার তত্ত্বটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, এরই খেই ধরে আপনি রান্নার শ্রেণী বিভাগ নিজেই করে ফেলতে পারবেন।

পৃথিবীতে কুলে দুই রকমে রান্না হয়। মশলাযুক্ত এবং মশলাবির্জিত। মশলা জন্মে প্রধানতঃ ভারতবর্ষে, জাভায়, মালয়ে। ইউরোপে মশলা হয় না। তাই ইউরোপীয় রান্না সাধারণতঃ মশলাবির্জিত।

এবার ঈষৎ ইতিহাসের প্রয়োজন। তুর্ক পাঠানরা যখন এদেশে আসে তখন পশ্চিম এবং উত্তর ভারত নিরাসিম খেত। তুর্ক পাঠানরা মাংস খেত বটে, কিন্তু সে রান্নায় মশলা থাকত না। তুর্ক-পাঠান—মোগলরা যে রকম ভারতবর্ষের অলংকার কারুকার্যের সঙ্গে ভূকস্থানী ইরানী স্থাপত্য মিলিয়ে তাজমহল

বানালো, ঠিক সেইরকম ভারতীয় মশলার সঙ্গে তাদের মাংস রান্নার কায়দা মিলিয়ে এক অপূর্ব রান্নার সৃষ্টি করল। আপনারা তাজমহল দেখে ‘আহা’ ‘আহা’ করেন, আমি করি না। কারণ তাজমহল চিবিয়ে খাওয়া যায় না। আর খাস মোগলাই রান্না পেলেই আমি খাই এবং খেয়ে ‘জিন্দাবাদ বাবুদর আকবর’ বলি—যদিও তাঁরা বহুকাল হল এ-জিন্দেগীর খাওয়াদাওয়া শেষ করে চলে গিয়েছেন।

এই ‘মোগলাই’ রান্না ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের তাবৎ মাংস-খেকোদের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। (বাঙালী আর দ্রাবিড়ের কথা আলাদা; এরা মাংস খায় কম, আর খাস মোগল-পাঠানের সংস্পর্শে এসেছে তারও কম। পিরালী ঠাকুরবাড়ি ব্যত্যয়, তাঁরা মোগলের সঙ্গে খানিকটা মিশেছিলেন বলে তাঁদের রান্নায় বেশ মোগলাই খুশবাই পাওয়া যায়)। এমন কি মোগলের দুশমন রাজপুত মারাঠারা পর্যন্ত মোগলাই খেতে আরম্ভ করল। এখনো রাজপুতানা, বরোদা, কোল্‌হাপুর রাজ্যের সরকারী অতিথিশালায় উঠলে বাবুর্চি প্রথম দিনই শুধায় ‘মোগলাই’ না নিরামিষ খাবেন। আমার উপদেশ—মোগলাইটাই খাবেন—তাতে করে পরজন্মে অজ-শিশু হয়ে জন্মালেও আপত্তি নেই।

মোগল-পাঠানরা এই রান্না আফগানিস্থান-তুর্কীস্থানে প্রচলিত করল। আশ্চে আশ্চে সেই রান্নাই তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য ছেয়ে ফেলল। তবে যত পশ্চিম পানে যাবেন, ততই মশলার মেকদার কমে আসবে। অর্থনীতিতে নিশ্চয়ই পড়েছেন, উৎপাদিত্বল থেকে কোন বস্তু যত দূরে যাবে ততই তার দাম বেড়ে যায়। আফগানিস্থানের রান্নায় যে হলুদ (কাবুলীরা বলে ‘জরদ্ চোপ’ অর্থাৎ হলদে কাঠ) পাবেন, ইস্তাম্বুল পর্যন্ত সে হলুদ পৌঁছয় নি।

তুর্কীরা বস্কান জয় করে, হাঙ্গেরি পেরিয়ে ভিয়েনার দরজায় হানা দেয়। হাঙ্গেরিতে মোগলাই মাংসের ঝোল ‘হাঙ্গেরিয়ান গুলাশে’ পরিবর্তিত হল এবং মিশরী এবং তুর্কদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভেনিসের কারবারীরা ‘মিন্‌সট-মীটে’র পোলাও বা রিসোস্তো বানাতে শিখল। গ্রীস সেদিন পর্যন্ত তুর্কীর তাঁবেতে ছিল, তাই গ্রীসের পোশাকী রান্না আজও চোগা-চাপকান পরে থাকে।

পৃথিবীতে শ্বিতীয় উচ্চাঙ্গের রান্না হয় প্যারিসে কিন্তু মশলা অতি কম, যদিও ইংরাজী রান্নার চেয়ে ঢের ঢের বেশী। এককালে তামাম ইয়োরোপ ফ্রান্সের নকল করত, তাই বস্কান গ্রীসেও প্যারিসী রান্না পাবেন। গ্রীস উভয় রান্নার সঙ্গমস্থল। বাকি জীবনটা যদি উত্তম আহারাদি করে কাটাতে চান, তবে আশ্তানা গাড়ুন গ্রীসে (দেশটা বেজায় সম্ভা)। লণ্ড, ডিনার, সাপার খাবেন ফরাসী মোগলাই এবং ঘরোয়া গ্রীক কায়দায়। ভূঁড়ি কমাবার কোমরবন্দ সঙ্গে নিয়ে যাবেন—গ্রীসে এ জিনিসের বস্তু বেশী চাহিদা বলে বস্তুটো বেজায় আক্সা।

সুশীল পাঠক, স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারছি, আপনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। আপনার মনে আঁকুবাকু প্রশ্ন, রান্না-জগতে বাঙালীর অবদান কি?

শুধু আছে। মাছ, হানা এবং বাঙালী বিধবার নিরামিষ রান্না।

কিন্তু তার আগে তো চীনা রান্নার বয়ান দিতে হয়। মোগলাই, ফরাসী এবং চীনা এই ত্রিমূর্তির বর্ণনা না করে আমি 'প্রাদেশিক সংকীর্ণতা'র প্রশংসা দিতে চাইনে।

আরেকদিন হবে। বৈদ্যরাজ বলেছেন, দীর্ঘজীবী হয়ে যদি বহুকাল ধরে উদরমার্গের সাধনা করতে চাও, তবে বীজমণ্ড হাচ্ছে 'জীর্ণো ভোজনং'। অর্থাৎ হজম না করা পর্যন্ত পুনরায় আহারে বসবে না। তাও যদি না মানেন, তবে চটে গিয়ে সুকুমার রানের ভাষায় বলব (দোষটা তাঁর, কটু বাক্যটা তিনিই করেছেন)—

এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা

খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘটা ॥

নেতাজী

আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের মত মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা অশেষ হস্তী-দর্শনের ন্যায়। তৎসত্ত্বেও যে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছি তার প্রধান কারণ, আমাদের মত অর্বাচীন লেখকেরা যখন মহাপুরুষকে প্রশংসাজলি দেবার জন্য ঐ একমাত্র পন্থাই খোলা পায়, তখন তার প্রশংসাবেগ তাকে অশ্বত্থের চরমে পৌঁছিয়ে দেয়—প্রশংসা ও ভক্তির আতিশয্য তখন আমাদের চেয়ে সহস্রগুণে উত্তম লেখককেও বাচাল করে তোলে।

দ্বিতীয় কারণ, এক চীনা গদ্যী জনৈক ইংরেজকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বুদ্ধিগ্নে বলছিলেন, 'সরোবরে জল বিস্তার কিন্তু আমার পাত্র ক্ষুদ্র। জল তাতে ওঠে অতি সামান্য। কিন্তু আমার শোক নেই—মাই কাপ্ ইজ্ স্মল—বাট আই দ্রিঙ্ক অফতেনার (My cup is small but I drink oftener)।'

আমাদের পাত্র ছোট, কিন্তু যদি সুভাষ-সরোবর থেকে আমরা সে পাত্র ঘন ঘন ভরে নিই তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোবর নিঃশেষ হোক আর নাই হোক, আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হবে। আমার পাত্রে উঠেছে দুই গন্ডুষ জল, অথবা বলব, আমি অশ্ব, হাত দিয়ে ফেলেছি সৌভাগ্যক্রমে দুটি দাঁতেরই উপর। অবশ্য সব অশ্বই ভাবে, সেই সবচেয়ে মহামূল্যবান স্থলে হাত দিয়ে ফেলেছে, কাজেই এ-অশ্বের অভিমত আশ্চর্যরিতাপ্রসূতও হতে পারে।

প্রথম, বর্মান্নে সুভাষচন্দ্র কি কৌশলে হিন্দু-মুসলমান-শিখকে এক করতে পেরেছিলেন? এবং শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে ফেরার পরও এঁদের অধিকাংশ অখণ্ডবাহিনীরূপে আত্মপরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। আমরা জানি, সুভাষচন্দ্রের সাইগন আসার বহুপূর্বে রাসবিহারী বসু অনেক চেষ্টা করেও কোনো আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে পারেন নি। অথচ রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের তুলনায় জাপানীদের কাছে অনেক বেশী পরিচিত ছিলেন—জাপান-ফোর্ট ভারতীয়দের মধ্যে শুনেনি রাসবিহারী বসুকে জিজ্ঞাসা না করে জাপান সরকার কখনো কোনো ভারতীয়কে জাপানে থাকবার ছাড়পত্র মঞ্জুর করত না।

একদিকে যেমন দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র ‘আজাদ হিন্দ’ নামটি অনায়াসে সর্বজনপ্রিয় করে তুললেন, অন্যদিকে দেখি, কৃতজ্ঞ মুসলমানেরা তাঁকে ‘নেতাজী’ নাম দিয়ে হৃদয়ে তুলে নিয়েছে—‘কাইদ-ই-আকবর’ বা ঐ জাতীয় কোনো দুরূহ আরবী খেতাব তাঁকে দেবার প্রয়োজন তারা বোধ করে নি। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, তখন এ-দেশে হিন্দী-উর্দু সমস্যা কংগ্রেসকে প্রায়ই বিচলিত করত, অথচ দেখি সুভাষচন্দ্রকে এ সমস্যা একবারের তরেও কাতর করতে পারে নি। বেতारे আমি সুভাষচন্দ্রের প্রায় সব বক্তৃতাই শুনছি এবং প্রতিবারই বিস্ময় মেনেছি হিন্দী-উর্দু অতীত এ ভাষা নেতাজী শিখলেন কি করে? নেতাজী তো শব্দতাত্ত্বিক ছিলেন না, ভাষার কলাকৌশল আরম্ভ করবার মত অজস্র সময়ও তো তাঁর ছিল না। এ-রহস্যের একমাত্র সমাধান এই যে, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যে মহাত্মার থাকে, দেশকে সত্যি যিনি প্রাণ মন সবচেঁতন্য সবানুভূতি দিয়ে ভালো-বাসেন, সাম্প্রদায়িক কলহের বহু উর্ধ্ব নিম্বন্দ পুণ্যলোকে যিনি অহরহ বিরাজ করেন, যে মহাপুরুষ দেশের অখণ্ড সত্যরূপ ঋষির মত দর্শন করেছেন, বাক্যরত্ন তাঁর ওষ্ঠাগ্রে বিরাজ করেন। তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন, সে-ভাষা সত্যের ভাষা, ন্যায়ের ভাষা, প্রেমের ভাষা। সে-ভাষা শুদ্ধ হিন্দী অপেক্ষাও বিশুদ্ধ হিন্দী, শুদ্ধ উর্দু অপেক্ষাও বিশুদ্ধ উর্দু। সে-ভাষা তাঁর নিজস্ব ভাষা। এই ভাষাই মহাত্মাজীর আদর্শ ভাষা ছিল।

নিজের মনকে বহুবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, সুভাষচন্দ্র না হয় সর্বস্বদেবর উর্ধ্ব উজ্জীয়মান ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৈন্যকে তিনি কি করে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করলেন? যে উত্তর শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছি, সেটা ঠিক কি না জানি না; আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র শুদ্ধ মাত্র সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্য কখনো কোমর বেঁধে আসরে নামেন নি। আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র এমন এক বৃহত্তর জাজ্বল্যমান আদর্শ জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন, এবং তার চেয়েও বড় কথা, এমন এক সর্বজনগ্রহণীয় বীরজনকাম্য পন্থা দেখাতে পেরেছিলেন যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ সকলেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র বলছেন, ‘আগুন লেগেছে, চল আগুন নেভাই, এই আমার হাতে জল। তোমরাও জল নিয়ে এসো।’ সুভাষচন্দ্র কিন্তু এ কথা বলছেন না, ‘আগুন নেভাতে হলে হিন্দু-মুসলমানকে প্রথম এক হতে হবে, তারপর আগুন নেভাতে হবে। এস প্রথমে মিটিং করি, প্যাঙ্ক বানাই, শিলমোহর লাগাই, তারপর স্বরাজ।’

বৃহত্তর আদর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেছে,—তা সে ব্যক্তিগত স্বার্থই হোক আর সাম্প্রদায়িক স্বার্থই হোক—এ তো কিছু অভূতপূর্ব জিনিস নয়। স্বীকার করি এ জিনিস বিরল। তাই এ রকম আদর্শ দেদীপ্যমান করতে পারেন অতি অল্প লোকই, তাই সুভাষচন্দ্রের মত নেতা বিরল।

দ্বিতীয় যে গজদন্ত আমি অনুভব করতে পেরেছি, সেটি এই :—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি তিনজন নেতা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে সৈয়দ মুজতবা আলী রচাবলী (১ম)—২

দেশোদ্ধারের জন্য মার্কিন-ইংরেজের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম জেরুজালেমের গ্র্যান্ডমুফতী এবং শ্বিতীয় ইরাকের আবদুর রশীদ। এঁদের দুজনই আপন আপন দেশের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের নেতাজী। তিনি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন না।

তিনজনই কপর্দকহীন, তিনজনই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আপন আপন যশ এবং চরিত্রবল। প্রথম দুজনের স্বজাতি ছিল উত্তর আফ্রিকায়, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এঁদের কেউই কোনো সৈন্যবাহিনী গঠন করে তুর্নিসিয়া আলজেরিয়ায় ইংরেজের সঙ্গে লড়ায়ে পারলেন না; শুধু তাই নয়, জার্মান রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযানে বেরলেন, তখন এঁদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন না। এঁদের কেউই জার্মান সরকারকে আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে অভিভূত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের গতি হল আর পাঁচজনের মত ইতালী থেকে বেতারযোগে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে ‘প্রোপাগান্ডা’ করার।

অথচ, পশ্য, পশ্য সুভাষচন্দ্র কি অলৌকিক কর্ম সমাধান করলেন। স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে, ইংরেজের ‘গর্ব ভারতীয় সৈন্যদের’ এক করে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। বর্ম্ম-মালয়ের হাজার হাজার ভারতবাসী সর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

আমরা জানি, জাপান চেয়েছিল সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যগণ যেন জাপানী ঝান্ডার নীচে দাঁড়িয়ে লড়েন (মুফতী এবং আবদুর রশীদ জার্মানীকে সে সুযোগ দিতেও বাধ্য করাতে পারেন নি)। সুভাষচন্দ্র কবুল জবাব দিয়ে বলেছিলেন, “আমি আজাদ হিন্দ ও তার ফৌজের নেতা। আমার রাষ্ট্র নির্বাসনে বটে, কিন্তু সে-রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম! যদি চাও, তবে সে রাষ্ট্রকে স্বীকার করার গৌরব তোমরা অর্জন করতে পারো। যদি ইচ্ছা হয়, তবে অস্পৃশ্য এবং অর্থ দিতে পারো—এক স্বাধীন রাষ্ট্র যে রকম অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে মিত্রভাবে ধার দেয়, কিন্তু আমি কোনো ভিক্ষা চাই না এবং আমার সৈন্যগণ ‘আজাদ হিন্দ’ ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ করবে না।”

এই ইশ্রুজাল কি করে সম্ভব হল? সুভাষচন্দ্রের আত্মাভিমান যেমন তাঁকে বাঁচিয়েছিল জাপানের বশ্যতা না করা থেকে, তেমনি তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, জাপান তাঁর কথামত চলতে বাধ্য হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কত গুণ, কত কটুবুদ্ধি, কত দূঃসাহস, কত নির্বিকার ধৈর্য, কত চরিত্রবলের প্রয়োজন হয়েছিল, আমাদের মত সাধারণ লোক কি তার কল্পনাও করতে পারে।

কপর্দকহীন, সামর্থ্যসম্বলহীন সুভাষচন্দ্র টোকিয়োতে একা দাঁড়িয়ে—প্রথম দেখি এই ছবি। তারপর দেখি, সেই সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে, ভারতেরই এক কোণে।

যতই বিশ্লেষণ করি না কেন, এই দুই ছবির মাঝখানের পর্যায়গুণে ইশ্রুজাল

—ভানুমতীই থেকে যায়। এ যুগে না জন্মে এ কাহিনী ইতিহাসে পড়লে কখনই বিশ্বাস করতুম না।

“জিন্দাবাদ নেতাজী”।

রোগক্ষয়—শিক্ষালাভ

মানুষ যেমন বিষের খঁয়সো এটম বম বানিয়ে তার আপন ভাইকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে মারতে শিখেছে—ঠিক তেমনি এমন মানুষেরও অভাব নেই যারা মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য সমস্ত কল্পনামাশ্রিত, সর্বশেষ রক্তবিন্দু ক্ষয় করতে প্রস্তুত আছেন। কেন জানিনে, আজ ২৮তম, ২৯তম, ৩০তমের একজনের কথা মনে পড়লো। এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের নাম মিসরো লুই ভোতিয়ে।

আমি তখন জিনীভায়। এক অচেনা ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করলেন, লেজাঁর তাঁর যক্ষ্মারোগীর সানার্টারিয়ামটি আমি যদি দেখতে যাই তবে তিনি অত্যন্ত খুশী হবেন। ফ্রান্স, জার্মানি, সুইটজারল্যান্ডে বিস্তারিত সানার্টারিয়া দেখেছি, সর্বত্রই সব গুণীর মধ্যে একই কথা, ‘যক্ষ্মার’ বিশেষ কোনো চিকিৎসা নেই, তবে রোগী যদি মনস্ত্বির করে ফেলে যে, যমকে চোখের জলে নাকের জলে না করা পর্যন্ত সে মরবে না, অর্থাৎ বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে হিম্মৎ নামক অস্ত্রখানি দিয়ে তার সঙ্গে লড়াই দেবেই দেবে, তবে হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই সে বীরকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা করতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।’

আমি ডক্টর ভোতিয়েকে একথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভারী খুশী হলেন। বললেন, ‘আপনি যখন এ তথ্যটা জানেন তখন আপনারই বিশেষ করে লেজাঁতে আসা উচিত।’ তবে আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না; কারণ যক্ষ্মার হাসপাতাল দেখা কিছুমাত্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু ভোতিয়ে সেই শ্রেণীর লোক যারা খানিকটে হেসে, খানিকটে যুক্তিতর্ক দিয়ে, খানিকটে অনুন্নয়-বিনয় করে গররাজি লোককে নিমরাজি নিজের পায়ে পটিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। আমি খানিকটে ধমকাধমক করেছিলাম, কিন্তু তখন যদি জানতাম যে ভোতিয়ে মনঃসোলালী এবং লয়েড জর্জের কাছ থেকে আপন হাসপাতালের জন্য টাকা বাগাতে সমর্থ হয়েছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপত্তি না করে সুবোধ ছেলোটর মত সুড়সুড় করে লেজাঁ চলে যেতাম।

লেজাঁ যেতে হয় চেন-রেলওয়ে ধরে। এমনই ভয়ঙ্কর খাড়া পাহাড়ের উপর যক্ষ্মা সানার্টারিয়ামগুলো বানানো হয়েছে যে সাধারণ ট্রেন, এমন কি মোটরও সেখানে পৌঁছতে পারে না।

হোটেল আছে; কিন্তু যখন নিতান্ত এসেই গিয়েছি তখন সানার্টারিয়ামের ভিতর থাকলেই তো দেখতে পাবো বেশী।

মিসরো ভোতিয়ে, মাদাম, এমন কি বাচ্চা দুটো পর্যন্ত আমাকে দিল-খোলা অভ্যর্থনা জানালেন। বাচ্চা দুটোর বয়স ছয় আর আট। এদের জন্ম হয়েছে

এই সানার্টারিয়ামেই ! তারা সুস্থ ! শ'খানেক যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে তারা খায়-দায়-খেলাধুলা গল্পগুজব করে—বাপ-মা'র তাতে কোনো ভয় নেই। আমিই তাহলে ডরাব কেন ?

মিসসো ভোতিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, যক্ষ্মা রোগটা ছেলেছোকরাদেরই হয় বেশি। বরং এ রোগটার সবচেয়ে বড় ডেরা খাটানো রয়েছে কলেজে কলেজে। কলেজের ছোকরারা এ রোগে মরেও সবচেয়ে বেশী। আপক্ষাকৃত বয়স্ক রোগী কিংবা নিতান্ত বাচ্চাকে বাঁচানো অনেক সহজ।

'তার প্রধান,—প্রধান কেন, একমাত্র কারণ, যক্ষ্মা হলেই তাদের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। তারা তখন ভবিষ্যৎ অশ্বকার দেখে। ভাবে, পড়াশোনা যদি নাই করতে পারলুম তবে দু'পাঁচ বৎসর পরে সেরে গিয়েই বা করব কি ? খাবো কি ? সংসারই বা পাতবো কি দিয়ে ?

'তাই তারা রোগের সঙ্গে লড়বার আর কোনো প্রয়োজন দেখতে পায় না, সব হিম্মৎ হারিয়ে ফেলে, এগিয়ে মৃত্যুর হাতে আপন জানটি ভেট দেয়।'

মিসসো ভোতিয়ে বললেন, 'যবে থেকে আমি যক্ষ্মা রোগ নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছি তখন থেকেই আমি কাজে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, অবসর সময়ে অহরহ ভেবেছি এর কোনো প্রতিকার করা যায় কিনা ? শেষ পর্যন্ত আমি যে প্রতিকার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি তারই ভিতরে আজ আপনি আমি বসে কথা বলছি—তার নাম 'সানার্টারি়া ইউনিভার্সিটির', অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় আরোগ্যায়তন'।

'এখানে শুধুমাত্র কলেজের ছেলেমেয়েদের নেওয়া হয়। এবং জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের বন্দোবস্ত যেন আমাদের রোগীদের টার্ম হিসেবে নেওয়া হয় অর্থাৎ এরা জিনীভায় ক্লাস না করে ক্লাস করছে এই সানার্টারিয়ামে। এরা এখানেই পড়াশোনা করে, সুইট্জারল্যান্ডের সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপকরা এখানে এসে মাঝে মাঝে লেকচার দিয়ে যান, তাছাড়া যক্ষ্মাবৈরী বহু নির্মিত রবাহূত গুণী এখানে এসে দু'দশ দিন থেকে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় নানাপ্রকারে সাহায্য করে যান।

'বুঝতেই পারছেন, যে-সব বিষয় নিলে ভয়ঙ্কর বেশী খাটতে হয়, সেগুলোর ব্যবস্থা এখানে নেই। তাই নিয়ে ছেলেমেয়েরাও বেশী কান্নাকাটি করে না, তারা জানে, সে ধরনের পড়াশোনা করলে তাদের শরীর কখনো সারবে না। তারা খুশি, কোনো কিছু একটা নিয়ে পাশ দিতে পারলেই ; কাজেই বিজ্ঞানের ছেলে দর্শন নিতে আপত্তি করে না, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছেলে ইতিহাস উৎসাহের সঙ্গেই পড়ে।

'অবশ্য স্বাথোর অবস্থার উপর পড়াশোনার মেকদার নির্ভর করে। আমাদের সব সময় কড়া নজর, কেউ যেন বস্তু বেশী না খাটে। কিছুদিন থাকার পর রোগীরাও ততটা বুদ্ধি ফেলে, আর নতুন রোগীদের ধমক দিয়ে ব্যাপারটা তাদের কাছে জলের মত তরল করে দেয়। আমাদের তো আজকাল

এ-নিম্নে বিলকুল মাথা ঘামাতে হয় না। ওদের চিকিৎসার দিকে এখন আমি আরো বেশী সময় দিতে পারি।’

একটুখানি চোখ টিপে মূর্চকি হেসে বললেন, ‘পড়াশোনা বিশেষ হয় না, সে তো বুঝতেই পারছেন। তা নাই বা হল। ছেলেমেয়েরা সাহস তো পায় বেঁচে থাকবার, সেইটেই হল আসল কথা। জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ও আমার কলটা বেশ বুঝতে পেরেছেন, আমিই তাদের খোলাখুলি বলে রেখেছি। এখানে মধ্যমামিনীর তৈল ক্ষয় নিষিদ্ধ, বেশী পড়াশোনা এখানে হতেই পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষেরা তো আর হৃদয়হীন পাষণ নন; এখান থেকে যারা পরীক্ষা দেয়, তাদের প্রতি তাঁরা সদয়, আর যারা সেরে উঠে বাকী টার্মগুলো জিনীভায় কাটায় তাদের প্রতিও মোলায়েম ব্যবহার করেন।’

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘কিন্তু টাকা পাই কোথায়? অটেল টাকার দরকার। আমি পনেরো বছর ধরে তামাম ইয়োরোপ চষে বেড়াচ্ছি টাকার জন্য। মুন্সোলীনি, লয়েড জর্জ থেকে আরম্ভ করে যেখানে যে আমাকে সামান্যতম সাহায্য করতে পারে তারই দরজায় হ্যাট পেতে ভিক্ষা মেডেছি।

‘এখন আমার ইচ্ছা এ-প্রতিষ্ঠানটিকে ইণ্টারনেশনাল—সার্বজনীন সার্বভৌমিক করার। ভারতবর্ষ থেকে যদি রোগী ছাত্র আসে তবে তার জন্য যেন এখানে আমি ব্যবস্থা করতে পারি, সেও যেন নিরাময় হয়, সঙ্গে সঙ্গে জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে ফিরতে পারে। আপনাদের দেশে তো রাজা মহারাজদের অনেক টাকা—দানখয়রাতও তাঁরা করেন শুনছি।’

আমি মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, ‘এককালে রাজ-রাজড়ার বিস্তর দান-ধ্যান করতেন এ-কথা সত্যি, আজকালও যে একেবারেই নেই সে-কথা আমি বলব না। আপনি যদি স্বয়ং ভারতবর্ষে আসেন তবে একটা চেষ্টা দিয়ে দেখতে পারি। আমার দ্বারা যোগসূত্র স্থাপনের ষেটুকু সামান্য সাহায্য সম্ভবপর—’

ডক্তার ভোতিয়ে আমার দু’খানা হাত চেপে ধরে নীরবে আমার চোখের দিকে সক্রতজ্ঞ নয়নে তাকিয়ে রইলেন।

আমি দেশে ফিরে এলাম! তারপর লেগে গেল ১৯৩৯-এর লড়াই। সুইটজারল্যান্ড ছোট দেশ। সীমান্ত রক্ষার জন্য ভোতিয়ের মত ডাক্তারকে উর্দি পরে ব্যারাকে ঢুকতে হল—অবশ্য ডাক্তারের উর্দি। দিস্তু তাঁর এ-দেশে আসাটা আর হয়ে উঠল না।

*

*

*

মসিয়ো লুই ভোতিয়ে সুইটজারল্যান্ডের লেজাঁ নামক স্থানে যে ‘আরোগ্যায়তন বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেখানে যক্ষ্মা সারানোর সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শেখানোর অভিনব সমন্বয় বহু সুইটজারল্যান্ডবাসীর হৃদয়মন আকৃষ্ট করেছে। তাঁরা অকৃপণ হস্তে এ-প্রতিষ্ঠানে অর্থদান করেছেন এবং তাঁদেরও ইচ্ছা এ-প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে ক্রমে বিশ্বজনের সম্পদ হয়ে উঠুক। কিন্তু উপস্থিত জাতীয়তাবাদ নামে যে বর্বরতা পৃথিবীকে শতধা বিভক্ত করে

দিচ্ছে, তার সামনে মসিয়ো ভোতিয়ে নিরুপায়। তাই আমার বিশ্বাস, যতদিন সুইটজারল্যান্ডে বিশ্বকল্যাণের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা না হয়, ততদিন এ-দেশে আমাদেরও চূপ করে বসে থাকা অনুচিত হবে। লেজাঁতে যে প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর হয়েছে, এদেশেই বা তা হবে না কেন? বরঞ্চ এদেশে তার প্রয়োজন অনেক বেশী; কারণ এদেশের ছাত্র-সমাজে যক্ষ্মারোগের যে প্রসার তার সঙ্গে অন্য কোন দেশেরই তুলনা হয় না। অসম্মদেশীয় যক্ষ্মাবৈরী সম্মজন সম্প্রদায় আশা করি কথটা ভেবে দেখবেন।

কিন্তু এ-হেন গুরুতর বিষয় নিয়ে মাদৃশ অব্যবহিক জনের অত্যধিক বাগাড়ম্বর অশোভনীয়। আমার উচিত, যোগাযোগের ফলে আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছে সেইটে পাঁচজনকে শুনিয়ে দেওয়া। তারপর কে কি করল না করল তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

লেজাঁয় যক্ষ্মারোগের জন্য কি চিকিৎসা করা হয়, সে সম্বন্ধে সালৎকার বিবৃতি দেবার প্রয়োজন নেই। দক্ষিণ ভারতের মদনপল্লীর ‘আরোগ্য-বরমে’ যে-সব ব্যবস্থা আছে, সেগুলো তো আছেই তার উপর লেজাঁ এবং ডাভোসের অন্যান্য মাদুলী সানার্টরিয়াতে যক্ষ্মারোগ বাবদে যে-সব গবেষণা অষ্টপ্রহর করা হচ্ছে, তার ফলও মসিয়ো ভোতিয়ে অহরহ পাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান। এবং তার এক প্রধান অঙ্গ নানা দেশের নানা গুণীকে লেজাঁতে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করা। তার জন্য ভোতিয়ের প্রতিষ্ঠানে একটি চমৎকার লেকচার থিয়েটার আছে। অন্যান্য সানার্টরিয়াতে এ রকম হলের প্রয়োজন হয় না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি লেজাঁ পৌঁছবার ঠিক কয়েকদিন আগে দু-তিনজন বড় বড় পণ্ডিতের গুরু গুরু ভাষণের গুরুভোজনের ফলে ছেলেমেয়েরা ঈশ্বর কাতর হয়ে পড়েছিল! তাই বোধ করি, মসিয়ো ভোতিয়ে একটা জব্বর রকমের জোলাপের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মসিয়ো ভোতিয়ে আমাকে সোজাসুঁজি বললেন, ‘আপনি একটা লেকচার দিন। জার্মান কিংবা ফ্রেঞ্চ, যে-কোনো ভাষায়!’

আমি বললুম, ‘আপনি যদিও জাতে সুইস, আপনার মাতৃভাষা ফরাসী এবং আপনি ফরাসী ঐতিহ্যে গড়ে-ওঠা বিদগ্ধজন। কাজেই আপনিও নেপোলিয়নের মত ‘অসম্ভব’ কথাতায় বিশ্বাস করেন না এবং তাই আপনার পক্ষে এ অনুরোধ করাটা ‘অসম্ভব’ নয়; আমি কিন্তু ফরাসী নয়, আমি ‘অসম্ভব’ কথটা জানি এবং মানি। আমার পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব।’

এগারো বৎসর হয়ে গিয়েছে, সম্পূর্ণ কথোপকথনটা আমার আজ আর মনে নেই। তবে চোখ বন্ধ করলে যে ছবিটি এখনো মনের ভিতর দেখতে পাই, তাতে আছে—এক বিরাট ফ্লাস্কেনস্টাইন যেন আমার দিকে দৃবাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে আর আমি ক্রমেই পিছু হটে হটে শেষটায় দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আর পিছু হটবার জায়গা নেই। ফ্লাস্কেনস্টাইনের দৃহাত আমার গলা টিপে ধরেছে। হাত দুখানি বলছে,

‘এতগুলো রোগীকে আপনি নিরাশ করবেন?’

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলাম,

‘পড়েছি যবনের হাতে

খানা খেতে হবে সাথে।’

* * *

ঝটপট ইশ্টিহার বোরিয়ে গেল ‘ভারতীয় অমুক কাল সম্মুখ লেজার ‘সানতারিয়া ইউনিভার্সিটির সুইসে’ একখানা ভাষণ দেবেন। বিষয়……। লেজার তাবৎ সানতারিয়ার অধিবাসিবৃন্দকে সাদর নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে।’ অর্থাৎ ভোতিয়ে সাহেবের প্রতিষ্ঠানের পাঁচজন তো আসবেনই, অন্যান্য সানতারিয়ার আরো বহু দূশ্মনকে ডাকা হয়েছে আমার মুখোশ খসাবার জন্য—কিন্তু ধর্ম সাক্ষী, আমি অনেক মুখোশ পরেছি বটে, পাণ্ডিত্যের মুখোশ কখনো পরি নি।

ভোতিয়ে বললেন, ‘চলুন, হলটার ব্যবস্থা কি রকম হল দেখবেন।’

লোকটা নিশ্চয়ই স্যাডিস্ট। এই যে সামনে পূজো আসছে, আমরা তো কখনো বলির মোষটাকে হাড়িকাঠ দেখিয়ে চ্যাটাস্ চ্যাটাস্ করে ঠোট চাটিনে।

গিয়ে দেখি মধ্যখানে বেশ স্থানিকটে জায়গা ফাঁকা রেখে চতুর্দিকে চেয়ার বোঁধ পাতা হয়েছে। তবে কি আমাকে ওখানে ফেলে জবাই করা হবে—আমার ছটফটানির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে? কি হবে বৃথা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে? গর্দীশ, গর্দীশ, সবই কপালের গর্দীশ।

ভোতিরে ব্যবস্থাটা দেখে চ্যাটাস্ চ্যাটাস্ করলেন, অদৃশ্য সাবানে হাত দুটো কচলালেন। বদ্বলম, আমার অনুমান ভুল নয়। জবাইটা জব্বর ধরনেরই হবে।

ক্ষম থন’ টু থন’ অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় ভোতিয়ে আমাকে সেই হলে নিয়ে ঢোকালেন।

দেখি ফাঁকা জায়গাটা ভরে গিয়েছে বিস্তর হুইল চেয়ারে। যে-সব রোগীর পায়ের হাড়ে যক্ষ্মা অথবা যাদের নড়াচড়া করা বারণ, তাদের আনা হয়েছে হুইল চেয়ারে করে। জন দুই শৃঙ্গে আছে লম্বা লম্বা কোঁচ সোফায়। পরে জানলাম, যারা নিতান্তই খাট ছাড়তে পারে না তাদের জন্য ঘরে ঘরে ‘ইয়ার ফোনে’র ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একজন দেখি হুইল চেয়ারে বসে পাইপ টানছে। তখন আমার গর্দানে ঘি মালিস করা হচ্ছে—অর্থাৎ কে যেন যা-তা আবোল-তাবোল বকে আমার পরিচয় দিচ্ছে। ভোতিয়ে আমার পাশে বসে—পাছে আমি শেষ মুহূর্তে পালাবার চেষ্টা করি। কানে কানে জিজ্ঞেস করলাম, ‘পাইপ সিগারেট খাওয়া যক্ষ্মারোগীদের বারণ নয়?’ ভোতিয়ে বললেন, ‘ভিতরে তামাক না থাকলে নিশ্চয়ই বারণ নয়’। আমি বললাম, ‘অর্থাৎ?’ অর্থাৎ বেচারীর যক্ষ্মা হওয়ার পূর্বে সে দিনরাত পাইপ টানত! অভ্যাসটা সম্পূর্ণ ছাড়তে পারে নি বলে এখন খালি-পাইপ কামড়ায়। ধর্মো বেরচ্ছে না বলে দাঁত কিড়িমিড়ি খায়, আর হরদরে প্রতি মাসে গোটা সাতেক ভাঙে। কিন্তু ছেলেটা পাইপ বাবদে জুড়ির। “ব্রায়ার” ছাড়া

অন্য কোনো পাইপ চিবোতে রাজী হয় না ।’

আপনি ভাবছেন, শ্রোতারা যক্ষ্মারোগী, তাই তাদের বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখচোখ । আদপেই না । আপেলের মত লাল গাল প্রায় সম্বায়ের, চোখে মুখে উৎসাহ আর উত্তেজনা । যার দিকে তাকাই সেই যেন আমার হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছে, সবাই যেন বলছে, ‘কি ভয় তোমার ; এত দূর দেশ থেকে এসেছো, যা-ই বলো না কেন আমরা কান পেতে শুনবো ।’

তবু আমি মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করলুম আমাকে ঠাণ করার জন্য ।

তারপর কি হল ?

তারপর কি হল ? ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভিতর সঁঁধিয়ে গিয়েছে ; আর আজ যদি আপনাদেব কাছে স্বীকারও করি যে তারা বস্তুত-শেষে আমার দিকে পচা ডিম আর পচা টমাটো ছুঁড়েছিল, তাহলেও আপনাদের চারখানা হাত গজাবে না ।

আমি কি বলেছিলুম ?

সে বকবকানি আপনারা তো প্রতি হস্তায় শোনে। নূতন করে বলে আর কি লাভ ?

ইস্কিলাস—শেলি—স্পিটলার

বিদ্রোহী মানুষকে সমাজের কড়া বাঁধন মেনে নেবার জন্য গ্রীক নাট্যকার ইস্কিলাস যে নাটকখানি লেখেন তার নাম প্রমিথিয়ুস বাউন্ড—শৃঙ্খলবদ্ধ প্রমিথিয়ুস । ইস্কিলাস ইচ্ছে করেই নাটকের পাত্র-পাত্রী দেবসমাজ থেকে বেছে নিয়েছিলেন । ভাবখানা অনেকটা এই :—খুদে দেবতারাই যখন নিয়ম কানুন না মেনে চলতে পারেন না তখন তুমি আমি কোন্ হার । নাটকের মূল গল্প হচ্ছে : প্রমিথিয়ুস দেবতাদের পরম যত্নে লুকিয়ে-রাখা সাত-রাজার-ধন-মাণিক অগ্নি জিনিসটি চুরি করে মানুষের হাতে তুলে ধরেন, তাই দিয়ে মানব-সভ্যতা গড়ে ওঠে । দেবরাজ জুপিটার ভয়ংকর চটে গিয়ে প্রমিথিয়ুসকে পাহাড়ের গায়ে পেরেক পর্দে বেঁধে রাখলেন, শকুনি দিয়ে বৃকের কলিজা, চোখের পাতা খাওয়ালেন, যাতে করে প্রমিথিয়ুস আপন পাপ স্বীকার করে সোজা রাজ্য চলেন । প্রমিথিয়ুস সে নিপীড়ন সহ্য না করতে পেরে শেষটায় হার মানলেন । জুপিটার খুশি, ইস্কিলাস আরো বেশী খুশী—স্বর্গ-রাজ্যে ধর্ম-রাজ্যে পরিণত হল ।

আমাদের কবিগুরু রামায়ণে এরকম কোনো ধর্ম-নীতি প্রচার করতে চেয়েছিলেন কি না জানিনে কিন্তু সেখানেও রাবণকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছিল ।

তারপর প্রায় দু’হাজার বছর কেটে গেল । দেবতাদের হুমকির ভয়ে কি গ্রীস, কি ভারতবর্ষ কেউই প্রমিথিয়ুসের মত তাঁদের সামনে মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে সাহস পেল না । কিন্তু তবু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, এই দু’হাজার বৎসর ধরে যাদের বৃকের কলিজা, চোখের পাতা খাওয়ানো হল,

তারা কি সব সময়ই ভিতরে বাইরে দু'দিকেই আপন 'পাপ' স্বীকার করে নিয়েছিল? তাদের ভিতর কি এমন কেউ ছিল না যে বাইরে ক্ষমা চেয়েছে হয়ত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মরেছে যে দেবতার অনুশাসনই চিরন্তন ধর্ম নয় : যেখানে নিপীড়ন দিয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা বের করতে হয় সেখানে নিশ্চয়ই কোনো দুর্বলতা, কোনো গুটি লুকানো রয়েছে।

এই কথাটি জোর গলায় বলবার মত সাহস প্রথম দেখালেন ইংরেজ কার্ভ শেলি। তখনকার দিনে রুচার্থে ভগবান বলতে যা বোঝাত শেলি সে পুরুষকে অস্বীকার করলেন, আর সেই ভগবানের নামে গড়া তখনকার দিনের সমাজের আইন-কানুন ভাঙতে কসুর করলেন না। ভগবানের পুঁলিসমেন অর্থাৎ পাদ্রী পুরুষতা তখন শেলির পিছনে জুঁপিটারের মতনই শকুনি লাগিয়ে দিলে : শেলির অনেকখানি কলিজা খাওয়ানো হয়, শেলি অসহ্য যন্ত্রণায় বহু বিনীত রজনী যাপন করলেন, শেলিরও চোখের পাতার অনেকখানি শকুনির পেটে গিয়েছিল। কিন্তু তবু শেলি হার মানেন নি।

এবং সেই না-মানা অজরামর রূপ নিয়ে বেরল তাঁর নাট্যকাব্য 'প্রমিথিয়ুস আনবায়উণ্ড'—মুক্ত প্রমিথিয়ুস। শুনোছি, এক জাপানী চিত্রকর নাকি তাঁর বৃকের জখমের রক্ত দিয়ে তুলি ভিজিয়ে ভিজিয়ে ছবি আঁকতেন বলে তাঁর ছবি সমস্ত জাপানের চিত্র জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। হয়ত রূপক, হয়ত সত্য; কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, শেলির প্রমিথিয়ুস নাট্য বৃকের রক্ত দিয়ে আঁকা। অত্যাচার-জর্জরিত মানবাত্মার তীক্ষ্ণতম চিৎকার, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান সমাজবিধির বিরুদ্ধে মানবের গভীরতম হৃৎকার এ কাব্যে যে রূপ, যে রস পেয়েছে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত শ্বিতীয় কাব্য তো সহজে খুঁজে পাইনে।

(আর পাঁচজন হয়ত স্বীকার করবেন না, কিন্তু আমার মনে হয় মধুসূদনের রাবণ চরিত্রে যেন আমি খানিকটা সেই সূর শুনতে পাই। কিন্তু হিন্দু সমাজ তো মধুসূদনের উপর কোনো অত্যাচার করে নি—তাঁর তুলনায় হিন্দু ঈশ্বর-চন্দ্রকে তো অনেক বেশী কটুবাকা শুনতে হয়েছে। তখনকার দিনের কলকাতার বিদগ্ধ ইতর কোনো সমাজই তো মধুসূদনের পিছনে শকুনির পাল চালিয়ে দেয় নি। তবু হয়তো হৃদযাত্রার অভাব দেখতে পেরেছিলেন এবং হয়তো মনে মনে আপন সনাতন ধর্ম বর্জন সম্বন্ধে ঈষৎ বিবেকদংশনে কাতর হয়েছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি অন্য চরিত্র না নিয়ে রাবণকে বেছে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ রাবণের যে গোড়ার দিকে খানিকটা দোষ আছে একথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই হয়ত প্রমিথিয়ুস ও রাবণ এক পাত্র নয়। শেলির প্রমিথিয়ুস বলে, আমি কোন দোষ করিনি। মধুসূদনের রাবণ বলে, 'একবার দোষ করেছিলুম বলেই কি আমাকে বিনষ্ট করার জন্য দেবনরবানর সবাই একজোট হয়ে সর্ব ধর্ম সর্ব ক্ষাত্রনীতি বিসর্জন দেবে?')

তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মের বাঁধন টিলে হয়ে গেল, এমন কি বড় বড় শহরে সমাজের তিরস্কারও গাড়িঘোড়ার শব্দের নীচে চাপা পড়ে গেল। প্যারিস তো এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছল যে, সেখানে যে শব্দ সমস্ত পৃথিবীর

মুক্তিকামী নর-নারী সম্মিলিত হল তাই নয়, আধা-পাগল বঞ্চপাগল এমন সব চিংকার কলাবৎকে প্যারিস সন্নে নিল যারা আপন দেশে থাকলে আর কিছ্‌ না হোক অন্ততঃ পাগলা গারদের ভিতরে জীবনের বেশীর ভাগ কাটাতেন।

কিন্তু এ সব মুক্তির বদলে মানুষ তখন আরেক দেবতার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। অর্থের এবং সম্বের অত্যাচার।

না খেয়ে মানুষ যে পূর্বে কখনো মরে নি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এবারে কলকারখানার জোরে, মানুষের পয়সা কামাবার হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে 'যে প্রতিষ্ঠান যে সম্ব গড়ে উঠল তার অত্যাচার দেশ-বিদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লুণ্ঠন যে আগে ছিল না তা নয়, কিন্তু এখন সাম্রাজ্যবাদের নামে যে শোষণ আরম্ভ হল তার শেষ নেই। চেন্সিস নাদির আটুলা আসত দু'দিনের তরে; কিন্তু এখন যে পাদ্রী কামান রাজপুরুষ বণিক পুলিশ আসতে লাগল তার আর অন্ত নেই। তাদের শোষণ দিনযামিনী, সায়াং প্রাতঃ, শিশির বসন্ত, যুগ যুগ ধরে। জমিদার ব্যারন যে সুন্দরী ধরে নিয়ে যেত সে তো অজানা নয়। কিন্তু এখন বড় বড় দোকানের চাকরিতে তরুণীদের আর নিষ্ঠার নেই। বড় সায়েবদের বিলাস লালসায় যে নারীমেধ যজ্ঞ জ্বলে তার ইন্ধন অর্ন্তপ্রহর দেদীপ্যমান রাখবার জন্য আর কোনো তরুণীর বসনভূষণ বাঁচিয়ে রাখবার উপায় নেই।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাকাব্য রচনা করলেন সুইট্‌জারল্যান্ডের মহাপুরুষ কার্ল স্পিটলার। সে কাব্যের নাম প্রমেটয়েস উট এপিমেটয়েস (Prometheus und Epimetheus)। এ কাব্যের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন আর কোনো কাব্য আমার জানা নেই। গুরুগম্ভীর গদ্যচ্ছন্দে লেখা সে কাব্য, পদ্যের সর্বোচ্চ শিখরে জ্যোতিষ্মান ভাস্করের ন্যায় সে গদ্য। এ গদ্য ছন্দ পাই উপনিষদ, বাইবেল এবং কুরানে। এবং উপনিষদ, বাইবেল, কুরানের অনুবাদ যে-রকম অসম্ভব, এ কাব্যের অনুবাদও মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ-কাব্য রচনা করে স্পিটলার নোবেল প্রাইজ পান, তৎসঙ্গেও এখন পর্যন্ত এ-কাব্যের অনুবাদ হয় নি।

স্পিটলার যে অত্যাচার অবিচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রমিথিয়ুসের কণ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, সে অত্যাচার ইতিমধ্যে আরও রূপধারণ করেছে। কলকাতা বৃকের উপরই তার নব নব তাণ্ডব আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানুষের গড় দুর্ভিক্ষ, দৈনন্দিন অনশন, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দৈন্যের দায়ে দেহ বিক্রয়, নিরপরাধের উপর গুলিবর্ষণ, সাম্প্রদায়িক বর্বরতা, মানুষের প্রাণ নিয়ে বিবেকহীন রাজ-নৈতিকদের ছিনিমিনি খেলা, অরক্ষণীয় অন্ধকার ভবিষ্যৎ, অর্থের জোরে সমাজের বৃকের উপরে বসে অম্মাভাবে মৃত্যুভয়েকাতর পিতামাতার সম্মুখে তাদের কুল-কামিনীর সর্বনাশ, শূণ্যহত্যা—সবই তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু কই সে বাঙালী স্পিটলার ??

মোপাসাঁ—চেখফ্—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অশুভ যোগাযোগের ফলে অনেক তথ্য ও অনেক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শূন্যে রয়ান্টগেনের রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার, ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার এ রকম যোগাযোগের ফল। সাহিত্যে এ রকম ধারা বড় একটা হয় না। শূন্য ছোট গল্পের বেলা তাই হয়েছে। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, রয়ান্টগেন ও ফ্যারাডে যদি বহু বৎসর ধরে আপন আপন জ্ঞানচর্চায় নিবিষ্ট না থাকতেন, তাহলে যে-সব যোগাযোগের ফলে রঞ্জনরশ্মি ও বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কার হল সে সব যোগাযোগ বশ্যই থেকে যেত। ছোট গল্পের বেলাও তাই—মোপাসাঁ যদি সাহিত্য সাধনায় পূর্বের থেকেই নিযুক্ত না থাকতেন, তবে ফ্রবেরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পূর্ণ নিঃফল হত।

ফ্রবের যে কি অশুভ সুন্দর ফরাসী লিখে গিয়েছেন, তার বর্ণনা দিতে পারেন শূন্য ফ্রবেরই। ভলতেরের পরেই ফ্রবেরের নাম করতে হয় এবং এঁদের মাঝখানের যে-কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক পেলোও বাংলা ভাষা বর্তে যাবে। আর ফ্রবেরের আশা শিকেন্স তুলে রাখাই ভালো, তাঁর মত লেখক জন্মাবার পূর্বে এদেশের গঙ্গায় বিস্তর চড়া পড়ে যাবে। তার কারণ এ নয় যে আমাদের দেশে শক্তিমান লেখকের অভাব, বেদনাটা সেখানে নয়, আসল বেদনা হচ্ছে আমাদের লেখকেরা খাটতে রাজী নন। ফ্রবেরের লেখা পড়ার সময় বোঝাই যায় না তার পিছনে কি অসম্ভব পরিশ্রম রয়েছে, কারণ সে পরিশ্রমের উপরে ফ্রবেরকে আরো পরিশ্রম করতে হয়েছে গোড়ার পরিশ্রমটা ঢাকবার জন্য। ভলতেরের সরল স্বচ্ছ শৈলীর প্রশংসা করলে তিনি নাকি করুণ হাসি হেসে বলতেন, ‘ফরাসী জাতটা কি আর জানে তাদের কষ্ট বাঁচাবার জন্য আমি নিজেকে কতটা কষ্ট স্বীকার করি?’ ফ্রবের এ কথাটা বললে মানাতো আরো বেশী—তিনি তো শেষটায় সে পরিশ্রম সইতে না পেরে লেখাই ছেড়ে দিলেন।

ধূস্রে মূছে কেচে ইন্সট করে পাট না করা পর্যন্ত ফ্রবের ভাষাকে রেহাই দিতেন না। তাই যখন শাগরেদ মোপাসাঁর ভিতর ফ্রবের গুণের সন্ধান পেলেন তখন মোপাসাঁর লেখার উপর নির্মম রূঢ়া চালাতে আরম্ভ করলেন। আর কী সব অশুভ ফরমায়েশ—দশ লাইনে করুণ বর্ণনা লেখো, পনেরো লাইনে বীররস বাংলাও, এটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, ওটা ছাপিয়ে না—অর্থাৎ ফ্রবের শাগরেদ মোপাসাঁকে ধূস্রে মূছে কেচে তৈরি করে প্রায় পকেটস্থ করে ফেলেছেন, এমন সময় তাঁর ডাক পড়লো সেই লোক থেকে যেখানে রসসৃষ্টি করা যায় বিনা পরিশ্রমে—স্বর্গলোকে পরিশ্রম নেই বলেই মর্ত্যলোকের সৃষ্টি হয়েছিল এ-কথা বাইবেলে লেখা আছে।

এই তালিমের ফলেই ছোট গল্পের সৃষ্টি? মোপাসাঁর পূর্বের লেখকরা কি বর্ণনা, কি চরিত্রবিশ্লেষণ, কি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সব কিছই লিখতেন ছিড়িলে-ছিটিয়ে। ছোট গল্প লিখতে হলে যে বাকসংঘম দরকার, বিজ্ঞর কথা

অল্প কথায় প্রকাশ করবার যে কেরামতির প্রয়োজন, প্রকাণ্ড আলোটার চতুর্দিক কালো কাপড়ে ঢেকে তার সামনের দিকে পুরু কাঁচ লাগালে যে রশ্মির তীব্রতা বাড়ে সেই জ্ঞান মোপাসাঁর পূর্বে কারো ছিল না, অথবা তাই নিজে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেন নি। সর্বত্র বেনারসীতে ঢেকে মুখ থেকে শুধু ঘোমটা সরিয়ে ফিক করে এক ঝলক হেসে সুন্দরী চলে গেল—মোপাসাঁর পূর্বে ফরাসীরা যেন এ-অভিজ্ঞতার কম্পনাই করতে পারেন নি। তাঁদের কায়দা কি ছিল সে কথা ফেনিয়ে বলার সাহস আমার নেই—কলকাতা এ সব বাবদে প্যারিসের মত ‘উদার’ নয়।

এ সব নিছক যোগাযোগের কথা। মোপাসাঁর আপন কৃতিত্ব তবে কোন্-খানে? গল্পটাকে বিশেষ এক জালগায় এনে অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়া, এবং সেই অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়াটাই গল্পের সম্পূর্ণতাকে প্রকাশ করল—ইংরিজিতে যাকে বলে ‘ক্রাইমেক্স’—এইখানে মোপাসাঁর বিশেষত্ব। মোপাসাঁর পূর্বের ঔপন্যাসিকেরা তাবৎ নায়ক নায়িকাদের জন্য এতটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত না করে উপন্যাস বন্ধ করতেন না। নটে গাছটি তাঁরা এমনি কায়দায় মুড়তেন যে, পাঠকের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকত না যে এদের জীবনে আর কিছু ঘটতে পারে না, এরা এখন থেকে ‘পুত্র কন্যা লাভ করতঃ পরমানন্দে জীবন যাপন করিল’ অথবা ‘অনুতাপের তৃষনালে তিলে তিলে দম্প হইতে লাগিল’।

ক্রাইমেক্স আবিষ্কার মোপাসাঁর একান্ত নিজস্ব।

মোপাসাঁর পর বিস্তর লেখক এন্টার ছোট গল্প লিখেছেন, কেউ কেউ মোপাসাঁর চেয়েও ভালো লিখেছেন; কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সব গল্পই মোপাসাঁর ছাঁচে ঢেলে গড়া। মোপাসাঁ যে কাঠামোটি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাঠামোটিতে কোন ফেরফার করার সাহস কারোরই হল না।

চেখফ্‌ই (Chekhov, Tschehoff ইত্যাদি নানা বানানে নামটি লেখা হয়, কিন্তু উচ্চারণ ‘চেখফ্‌’) প্রথম এই কাঠামোতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে ক্রাইমেক্স বাদ দিয়েও সরেস ছোট গল্প লেখা যায়। শুধু তাই নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুব কম ঘটনাই এ রকম ধারা ‘বৃম্‌স্-প্যাণ্ড’ করে সশব্দে ক্রাইমেক্সে এসে অরকেষ্ট্রা শেষ করে। চেখফের অনেক গল্প ক্রাইমেক্সে শেষ হয় সত্য; কিন্তু সেটা গল্পের নিজস্ব প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সব গল্পই যদি পাঠক ক্রাইমেক্সের প্রত্যাশা করে করে পড়ে, তবে সেগুলো একঘেয়ে হয়ে যেতে বাধ্য সব কবিতাই তো আর সনেট নয় যে শেষের দৃষ্ট ছন্দে কবিতার সারাংশ জোর গলায় বলে দেওয়া হবে। তাই চেখফের বহু ক্রাইমেক্স-বর্জিত গল্পের ভারকেন্দ্র এমন ভাবে সমস্ত গল্পে ভাগ করে করে দেওয়া হয়েছে যে, পাঠক রসিয়ে রসিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গল্পগুলো পড়তে পারে—ক্রাইমেক্সের আচমকা ইলেকট্রিক শকের জন্য নাক কান খাড়া করে থাকতে হয় না।

আর ভাবার দিক দিয়ে চেখফ্‌ মোপাসাঁকেও ছাড়িয়ে যান। যান। টলস্টয়ের ফ্যাবেরের চেয়ে অনেক বড় স্রষ্টা এবং চেখফ্‌ যদিও টলস্টয়ের শিষ্য নন তবু তিনি বহু বৎসর ধরে টলস্টয়ের সাহচর্য ও উপদেশ পেয়েছিলেন। টলস্টয় স্বয়ং

গাঁকির চেয়ে চেখফ্কে পছন্দ করতেন বেশী—তিনি নাকি একবার গাঁকিকে বলেছিলেন, চেখফ্ মেয়ে হলে তিনি তাঁর কাছে নিশ্চয়ই বিয়ের প্রস্তাব পাড়তেন।

রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের গল্পগদ্যলি বড় ঢিলে। প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু আমার মনে হয়, এই ঢিলে ভাব তাঁর প্রথম কাটাল মোপাসাঁর গল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্প মোপাসাঁরই মত ঠাস বন্দুনি দেখতে পাওয়া যায়, আর কাঠামোটাও হরদরে মোপাসাঁর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত লেখক আপন বৈশিষ্ট্য বজ্রন করে লিখবেন—তা সে কাঁচা লেখাই হোক আর পাকা লেখাই হোক—সে কথা অনায়াসে অস্বীকার করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প মোপাসাঁ চেখফ্ দুজনের গল্পকেই হার মানায় তার গীতিরস দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পটি কেমন যেন সঙ্গীতের কোনো এক রাগে বাঁধা। এখানে সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল রয়েছে। মৃৎশকটিকা, শকুন্তলা, রত্নাবলী নাটক গ্রীক কাঠামাতে ফেলা যায় সত্য; কিন্তু এগুলিতে যে গীতিরস রয়েছে, গ্রীক নাটকে তো নেই—তাই আমরা সংস্কৃত নাটকে যে আনন্দ পাই, গ্রীক নাটকে সেটি পাই নে।

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বয়সে শোলি, কীটসের প্রভাবে পড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য, রবীন্দ্রনাথ সে প্রভাব একদিন সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। গল্পের বেলাতেও রবীন্দ্রনাথ একদিন মোপাসাঁর প্রভাব ঝেড়ে ফেলে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকের গল্পগুলিতে কি যেন এক অনিবচনীয়ের প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। ‘মিস্টিক’ কথাটাকে সব কিছুই ঢাকা পড়ে যায় বলে শব্দটা ব্যবহার করতে বাধা বাধা ঠেকে; কিন্তু মানব-চরিত্রের আলো-অন্ধকারের আবছায়া আঁকুবাঁকু, মানব-চরিত্রের যে দিক দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চোখে পড়ে না, মানুষকে যে সব সময় তার বাক্য আর আচরণ দিয়েই চেনা যায় না মানুষের সেই দুঃখের অন্তঃস্থল রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন আধা-আলোরই ভাষা এবং ভঙ্গী দিয়ে প্রকাশ করতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ একা, মোপাসাঁ চেখফের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র সেখানে সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যের মত অন্ভুত এবং বেতলা সাহিত্য পৃথিবীতে কমই আছে। রবীন্দ্রনাথ গান আর কবিতা দিয়ে যে বাঙলা গীতিসাহিত্য রচনা করে গেছেন তার কাছে এসে দাঁড়াতে পারে, এমন গীতিসাহিত্য পৃথিবীতে আর নেই বললেও চলে। মেঘদূতের মত গীতিকাব্য পৃথিবীতে নেই—রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান অনেক স্থলে কালিদাসের মেঘদূতকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকাব্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যকে যেন একসঙ্গে তেইশটা ডবল প্রমোশন পাইয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পও বিশ্বসাহিত্যের যে-কোন কথাসাহিত্যের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে। আরো বিশ্বার অতুলনীয় সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কলম দিয়ে বেরিয়েছে, তার উল্লেখ এখানে অবান্তর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টিকার। তাঁর পক্ষে অন্য লেখকের রচনা অনুবাদ করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এমন কি এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না, যেটুকু অনুবাদ তিনি করেছেন তাতে সময় নষ্ট হয়েছে মাত্র। কদম-ফুলের কেশর ছাড়িয়ে লাটু বানিয়ে ছেলেরা জিনিসটাকে কাজে লাগায় বটে, তবু নিষ্কর্মা কদম-ফুলেরই দাম বেশী।

অনুবাদ-চর্চা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশী সময় নষ্ট করেন নি বলেই বোধ করি বাঙলা সাহিত্য অনুবাদের দিক দিয়ে এত হীন। তাই বলছিলাম বাঙলা সাহিত্য বেতাল সাহিত্য; গীতিকাযে যেন যে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় উড়ে বেড়ায় আর অনুবাদ সাহিত্যের বেলা সে যেন এদৌ কুয়ের ভেতরে খাবি খায়।

অথচ ঊনবিংশ শতকে শেষের দিকে বাঙলা ভাষায় যে অনুবাদ সাহিত্যের রচনা দানা বাঁধতে আরম্ভ করে, তার তুলনায় আজকের দিনে তাকিয়ে দেখি সে দানা দিয়ে মিঠাই মণ্ডা তো হ'লই না, তলানির চিনিটুকু দিয়ে আজ যেন সাহিত্য-সভায় পানসে শরবৎ বিলানো হচ্ছে। গীতিকাযে যে সাহিত্য তেইশটে ডবল প্রমোশন পেয়েছিল, অনুবাদে সেই সাহিত্যকেই বাহানটা ডিগ্রেডেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ করতে হলে বিদেশী ভাষা জানার প্রয়োজন। আজকের দিনে কলকাতা শহরে শূদ্ধ ফরাসী বই বিক্রয়ের জন্য দোকান হয়েছে—সত্তর বৎসর আগে ছিল না।—তবু আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যে যেটুকু শরবৎ আজ বিলানো হচ্ছে তার আগাগোড়া ইংরিজী থেকে।

অথচ ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকেই জ্যোতির্বিদ্রনাথ ঠাকুর ফরাসী সাহিত্যের উত্তম রস-সৃষ্টি বাঙলায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। বিংশ শতকেও তিনি এই কর্মে লিপ্ত এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি একাজে ক্ষান্ত দেন নি। ঠিক স্মরণ নেই, তবে খুব সম্ভব লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের বিরাট মারাঠী গীতার অনুবাদই তাঁর শেষ দান।

আশ্চর্য বোধ হয় যে, বাঙালী জ্যোতির্বিদ্রনাথ ঠাকুরকে ভুলে গিয়েছে। সংস্কৃত থেকে তিনি যে সব নাটক অনুবাদ করেছিলেন সেগুলোর কথা আজ থাক। উপস্থিত পিয়ের লোতির একখানা বইয়ের কথা স্মরণ করছি।

পিয়ের লোতির মত লেখক পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন। শূদ্ধমাত্র শব্দের জোরে, সম্পূর্ণ অজানা, অদেখা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা গড়ে তোলা যে কি কঠিন কর্ম, তা শূদ্ধ তাঁরই বুদ্ধিতে পারবেন, যারা কখনো এ-চেষ্টায় দণ্ডমাত্র কালক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার মত দুর্মতি কোনো বাঙালীর হওয়ার কথা নয়, তাই বলতে আপত্তি নেই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অদেখা বা অগপ দেখা জিনিস নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করাটা পছন্দ করতেন

না। সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে পাহাড় এবং সমুদ্রের পরিচয় অতি কম—তাই বোধ করি রবীন্দ্রনাথ এ দুটো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন যতদূর সম্ভব কম। শীতপ্রধান দেশের পাতা-ঝরা হেমন্ত ঋতু, শুল্ল মল্লিকা বর্ষণের মত বরফ-পাত যে কি দর্শনীয় বস্তু, সিনেমা থেকেও তার খানিকটে আন্দাজ করা যায়, - রবীন্দ্রনাথ এসব দেখেছেন, উপভোগ করেছেন বহুবার; কিন্তু কোথাও তার বর্ণনা করেছেন বলে তো মনে পড়ে না।

পিয়ের লোতির বৈশিষ্ট্য এইখানেই। তিনি জাপান, তুর্কী, আইসল্যান্ড এবং আরও নানাদেশের যে সব ছবি ফরাসী ভাষায় একে দিয়ে গিয়েছেন, সে-সব পড়ে মনে হয় ভাষার সঙ্গীত, বর্ণ, গন্ধ একসঙ্গে মিলে গিয়ে কি করে এই-রূপ রসবস্তু নির্মাণ হতে পারে! মনে হয়, একসঙ্গে যেন পণ্ডিতের রস গ্রহণ করছে, মনে হয় কারো কলম যদি নিতান্ত অরসিক জনকে দেশ-কাল-পাত্র ভোলাতে সক্ষম হয়, তবে সে কলম পিয়ের লোতির।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লোতি যে বইখানা লিখেছেন তার নাম 'ল্যাঁদ, সাঁজাংলে'। অর্থাৎ 'ভারতবর্ষ, কিন্তু ইংরেজকে বাদ দিয়ে।' অর্থাৎ তিনি ভারতবর্ষের ছবি আঁকতে বসেছেন কিন্তু মনস্ত্রির করে ফেলেছেন যে, এ-দেশের ইংরেজদের সম্বন্ধে তিনি কিছ্ বলবেন না।

স্বীকার করি, ইংরেজ-বর্জিত-ভারত ('বসুমতী' কর্তৃক প্রকাশিত জ্যোতির্বিদ্য গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য)। 'ল্যাঁদ, সাঁজাংলে'র ঠিক অনুবাদ নয়, কিন্তু জ্যোতির্বিদ্য-নাথের অনুবাদশাশ্বত একটা মাত্র কলঙ্ক। বাদবাকী পুস্তকখানা অনুবাদ-সাহিত্যে যে কি আশ্চর্য কুতুব-মিনার, তার বর্ণনা দিতে হলে লোতির কলমের প্রয়োজন।

প্রিবাঙ্কুরে লোতি ভারতীয় সঙ্গীত শুনে বিস্ময়ের উচ্ছ্বাসে সে-সঙ্গীতের বর্ণনাতে কত না স্বর কত না ধ্বনি মিশিয়ে দিয়েছেন; জ্যোতির্বিদ্যনাথের বাংলা সে-স্বর সে ধ্বনি অবিকল বাজিয়ে চলেছে। মাদ্রাজে লোতি ভরত-নাট্যম দেখে ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে মানবহৃদয়ের যত প্রকারের আশা-নৈরাশ্য, ঘৃণা-ক্লোষ, আকুলি-বিকুলি সম্ভব হতে পারে, সব ক'টি প্রকাশ করেছেন কখনো গম্ভীর মেঘমন্ড্রে, কখনো মধুর বীণাঝংকারে, কখনো শব্দ সমন্বয়ের চটুল নৃত্যে—জ্যোতির্বিদ্যনাথের বাংলা-বীণা যেন প্রতি মন্দ্র, প্রতি ঝংকার, প্রতি ব্যঞ্জনা ঠিক সেই সুরে রসসৃষ্টি করেছে। ইলোরার স্থাপত্য-ভাস্কর্য লোতিকে বিহবল ভয়াতুর করে ফেলেছে, অনির্বচনীয় চিরন্তন সন্তার রসস্বরূপে স্বপ্রকাশ দেখিয়ে—জ্যোতির্বিদ্যনাথের লেখনী লোতির বিহবল ভয়াত হৃদয়ের প্রতি কম্পন প্রতি স্পন্দন ধরে নিয়ে যেন বীণাযন্ত্রের চিকণ কাজের সঙ্গে মৃদঙ্গের নিপুণ বোল মিশিয়ে দিয়েছে।

এরূপ অশ্রুত সঙ্গত দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের মজলিসে যে অনুবাদ-সাহিত্য আরম্ভ হয়েছিল, আজ তার সমাপ্তি দেখতে পাচ্ছি সস্তা, রগরগে ইংরিজী উপন্যাসের অনুবাদে। থেমটা আর 'ফিল্মি গামের' সঙ্গে তার মিতালি ॥

‘কলচর’

‘পরশুরামে’র কেদার চাটুজ্যেকে বাঘা তাড়া করেছে, ভূত ভয় দেখিয়েছে, হুমুমান দাঁত খিচিয়েছে, পদূলিস কোর্টের উকীল জেরা করেছে, তবু তিনি ভয় পান নি কিন্তু শেষটায় এক আমেরিকান মেমসায়েরের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান। কেদার চাটুজ্যের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি কিন্তু তৎসঙ্গেও আমাকে সবিনয় বলতে হবে তাঁর তুলনায় আমি দেশভ্রমণ করেছি অনেক বেশী, কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়েছে আরো অনেক বেশী ভূত, অশুভূত, নাৎসী, কম্যুনিষ্ট, মিশনারী, কলাবৎ, সম্পাদক, দারোগান ইত্যাদি কিন্তু তবু যদি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে শপথ কাটতে হয়, তবে বলব আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছি ‘কলচর’ের সামনে।

বাঙলা দেশে ‘কলচর’ আছে কিনা জানিনে ; যদি বা থাকে তবে আমি নিজে বাঙালী বলে সে জিনিস এড়িয়ে যাবার অন্ধিসন্ধি জানি। কিন্তু বিদেশ-বিভূইয়ে হঠাৎ বেমক্লা এ জিনিসের মুখোমুখি হয়ে পড়লে যে কী দারুণ নাভিস্বাস ওঠে তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা এবং শৈলী আমার পেটে নেই।

পশ্চিম ভারতে একবার এই ‘কলচর’ অথবা ‘কলচরড্’ সমাজের পাল্লায় পড়েছিলুম। তার মর্মশ্রুত কাহিনী নিবেদন করছি।

এক যুবতীর সঙ্গে কোনো এক চায়ের মজলিসে আলাপ হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। সুন্দরী রমণী। প্রত্যাখ্যান করি কি প্রকারে? তখন যদি জানতুম তিনি আমাকে বাঙালী অতএব ‘কলচরড্’ ঠাউরে নিমন্ত্রণ করেছেন তাহলে ধর্ম সাক্ষী আমি কেটে পড়তুম। কারণ, আমি ‘কলচরড্’ নই এবং পূর্বেই বলেছি ও-জিনিসটাকে আমি বস্তু ডরাই।

সুন্দরী মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই বাড়ি খুঁজে বের করার মেহনত থেকে রেহাই পেলুম। গাড়ি এসে এক বিপুলায়তন বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়ি বলা হয়ত ভুল হল। সংস্কৃতে খুব সম্ভব এই বস্তুকেই ‘প্রাসাদ’ বলে।

কিন্তু সে কী অশুভ বিভীষিকা। সাঁচীর স্তূপ, অজন্তার প্রবেশদ্বার, অশোকের স্তম্ভ, মাদুরার মণ্ডপ, তাজের জালির কাজ, জামি মসজিদের আরাবেস্ক ভারতবর্ষের তাবৎ সৌন্দর্য সেখানে যেন এক বিরাট তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়েছে। যে ফিরিস্তিটা দিলুম সেটা পূর্ণাবয়ব কি না জানি নে এবং এসব স্থাপত্য কলার মর্ম এ অধম জানে না সেটাও সে সবিনয় স্বীকার করে নিচ্ছে। আমি সাহিত্য নিয়ে ঈষৎ নাড়াচাড়া করি, কারণ এ একমাত্র জিনিসই মাস্টার অধ্যাপকেরা আমাকে স্কুল-কলেজে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে কিছুটা শিখিয়েছেন। সাহিত্যের দৃষ্টিবিন্দু দিয়ে তাই যদি সে-প্রাসাদের বর্ণনা দিই তবে বলতে হবে, আমি যেন এক কবিতার সামনে দাঁড়ালুম যার প্রথম লাইন চর্চাপদী, দ্বিতীয় লাইন চণ্ডীদাসী, তৃতীয় লাইন মাইকেলী, চতুর্থ লাইন রংগলালী, পঞ্চম লাইন ঠাকুরী এবং শেষ লাইন নজরুলী। জানি, আজ যদি কেউ এই সব ক’জন মহাজনের শৈলী এবং ভাষা আয়ত্ত করে কাব্য সৃষ্টি করতে

পারেন তবে তিনি কি কালিদাস, কি সেক্সপীয়র, কি গ্যোটে সর্ব যুগের সর্ব কবিরাজকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু আমি যে বিভীষিকার সামনে দাঁড়ালুম সে তো তা নয়। এ যেন কেউ কাঁচ দিয়ে নানান কবির লেখা নিয়ে হেথা থেকে দূ'ছর হোথা থেকে তিন পংক্তি কেটে গ'দ দিয়ে জুড়ে দিয়ে বলছে, 'পশ্য, পশ্য, কী অপূর্ব কবিতা ; এ-কবিতা মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো কবির লেখাকে হার মানায় কারণ এ-কবিতা দু'নিয়ার তাবৎ কবির বারোয়ারী চাঁদা দিয়ে গড়া। বাদর হারালেও এখানে খুঁজে পাবে।'।

তখনও পালাবার পথ ছিল, কিন্তু সুন্দরীর—যাক্গে। না পালাবার অন্য আরেকটা কারণও মজুদ ছিল। এ বিভীষিকা দেখে গাঙ্গুলী মশাই অথবা ক্রামরিণ বীণী পালাবেন, কিন্তু আমি তো 'কলচরড্' নই আমি পালাব কেন ?

ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি লিফ্টের সামনে। অপূর্ব সে খাঁচা। এতদিন বাদে আজ আর মনে নেই কোন্ কোন্ শৈলীর ঘুমোঘুমিতে (কোলাকুলিতে নয়) সে লিফ্টের চারখানা কাঠের পাট নির্মিত ছিল। প্রত্যেক পাটে অতি সুক্ষ্ম নাজুক, মোলায়েম দারুশিল্প। জয়পুরের মিনা যেন সুক্ষ্মতায় তার কাছে হার মানেন।

ভিতরে ঢুকলুম। তখন লক্ষ্য করলুম লিফ্টবয় দরজাখানা বন্ধ করল অতিশয় সন্তর্পণে—পাছে কাঠের চিকন কাজে কোনো জখম হয়। কিন্তু ফল হল এই যে লিফ্ট আর উড়ীয়মান হতে চায় না। বয় ধীরে ধীরে চাপ বাড়ায় কিন্তু লিফ্ট নড়তে চায় না। তারপর হুস করে বলা নেই কপ্পা নেই, লিফ্ট উপরের দিক চলল, পক্ষীরাজের বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে হঠাৎ জিন লাগালে সে যে-রকম ধারা আচমকা লম্ফ দিয়ে ওঠে।

তারপর দোতলায় নামবার কথা—লিফ্ট সেখানে থামে না। থামলো গিরে আর্চাম্বিতে দোতলা আর তেতলার মাধ্যখানে।

একে ত গাঁয়ের ছেলে, বয়স হওয়ার পর শহরে এসে প্রথম লিফ্ট দেখেছি এবং তখনকার দিনে খুঁতকুঁত পরা থাকলে লিফ্ট চড়তে দিত না বলে এ ফাঁড়া থেকে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি, তার উপর জানি দড়াম করে দরজা বন্ধ না করলে ভালো লিফ্টও নড়তে চায় না এবং তার উপর দেখি এই ছোকরা চাকরি যাবার ভয়ে দরজার উপর জোর লাগাতেও রাজী হয় না। এই 'কলচরড্' লিফ্টটাকে জখম চোটের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমার প্রাণটা বলি দিতে হবে নাকি ?

আমি তখন হন্যে হয়ে উঠেছি। ধমক দিয়ে বললুম, 'দরজা জোরে বন্ধ করো।'।

সে করে না। এই মাগ্গীর বাজারে প্রাণের চেয়ে চাকরি বড়। প্রাণ জিনিসটা জন্মে জন্মে বিনা খরচে, বিনা মেহমতে পাওয়া যায় ; কিন্তু চাকরির জন্য বিস্তার বেদদর বেইজ্জতী সহ্যে হয়।

আমি আর কী করি ? থান্ডা দিয়ে ছোঁড়াটাকে পথ থেকে সরিয়ে দরজায় দিলুম বিপুল এক থান্ডা। হুস করে লিফ্ট উঠে গেল তেতলায়। আমি দরজা

খুলে নাবতে যাচ্ছি, বস চোঁচিয়ে বললো, ‘আপনি যাবেন দোতলায়, তেতলায় নয়।’ আমি বললাম, ‘তুমি যাও চুলোয়।’ ছোকরা বাঙলা বোঝে না।

তেতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামলাম দোতলায়।

ততক্ষণে লিফটের ধড়ধড় শব্দ শুনে সুন্দরীর ভাই-বোরা দূর একজন সিঁড়ির কাছে জমায়েত হয়ে গিয়েছেন। আমি ছোকরার চাকরি বাঁচাবার জন্য নিজের অপরাধ স্বীকার করলাম। ওঁরা ষে-রকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে মনে হল আমি যেন তাজমহলের উপর এটম বম মেরেছি অথবা ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের গলা কেটে ফেলেছি।

‘কলচরড’ নই, তাই বলতে পারব না, ‘কলচর’ দেশ-কাল-পাত্র মেনে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয় কি না। কিন্তু লিফটের ভিতরকার ‘কলচর’কে সম্মান দেখাতে গিয়ে আমি প্রাণটা দিতে রাজী নই। তাই বলছিলাম, আমি ‘কলচর’ জিনিসটাকে ডরাই।

বর্ষা

কাইরোতে বছরে ক’ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে এতদিন বাদে সে কথা আমার আর স্মরণ নেই। আধা হতে পারে সিকিও হতে পারে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মেঘমুক্ত নীল আকাশ দেখে দেখে আমার তো প্রথমটায় মনে হতোছিল, এদেশে বৃষ্টি আদাপেই বৃষ্টিপাত হয় না। আর গাছপালার কী দুরবস্থা, পাতাগুলোর কী অশুভ চেহারা! সাহারার ধূলো উড়ে এসে চেপে বসেছে পাতাগুলোর গায়ে—সিন্দবাদের কাঁধে যে রকম পাগলা বড়ো চেপে বসেছিল—সে ধূলা সরানো দশদশটা হোঁজের কর্ম নয়। কাফেতে বসে বলভারের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রায়ই ভাবতাম, এদের কপালে কি কোন প্রকারের মনস্তিস্তান নেই?

সুদানের একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হ’ল। সে বললে, তার দেশে নাকি ষাট বছরের পর একদিন হঠাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি নেবেছিল। মেয়েরা, কাচাবাচারারা, এমন কি গোটা কয়েক জোয়ান মশদরা পর্যন্ত হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়েছিল, ‘আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে আমাদের ঘাড়ে ভেঙে পড়লো গো। আমরা যাব কোথায়? কিস্যামতের (মহাপ্রলয়ের) দিন এসে গেছে। সব পাপের তওবা (ক্ষমা-ভিক্ষা) মাঙবার সময় পেলুম না, সবাইকে যেতে হবে নরকে।’ গাও-বড়োরা নাকি তখন সাস্থনা দিয়ে বেরিয়েছিলেন, ‘এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে না। এ যা নাবছে সে জিনিস জল। এর নাম মৎর্ (অর্থাৎ বৃষ্টি)।’ সুদানী ছেলোটি আমায় বৃষ্টিয়ে বললে, ‘আরবী ভাষায় মৎর্ (বৃষ্টি) শব্দ আছে; কারণ আরব দেশে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, কিন্তু সুদানে যে-আরবী ভাষা প্রচলিত সে-ভাষায় মৎর্ শব্দ কখনো ব্যবহৃত হয় নি বলে সে শব্দটি সুদানী মেয়েছেলেদের সম্পূর্ণ

অজানা।

সুদানে যাই হোক। কিন্তু একদিন যখন হঠাৎ কাইরোতে বৃষ্টি নাবল আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাফে ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। বিরহী যক্ষ যেরকম দুই বাহু প্রসারিত করে উত্তরের বাতাস আলিঙ্গন করছিল; আমি ঠিক সেইরকম ‘ঝড় নেমে আস’ বেসুদা বেতলা করে গাইলাম আর আমার জোম্বাজোম্বা যে ভিজে কাঁই হল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বৃষ্টি না থামার পূর্বেই ফিরে এলাম পাড়ার কাফেতে। সবাইকে বোঝাবো, বাঙলা দেশে কি রকম অদ্ভুত বর্ষা নামে, তার কি অপূর্ব জৌলুস। দেখি, আন্ডার সদস্যরা কেউ আধভেজা, কেউ ছ’আনা, কেউ দু’ আনা। আমাকে দেখা মাত্র সবাই তো মারমার করে তেড়ে এল। আরে, বুঝিয়েই বলো না, কি ব্যাপার, চটছো কেন?

সবাই এক সঙ্গে কথা কয়। কি মূর্খকিল! ভাবখানা অনেকটা;—এই ড্যাম নুইসেস বৃষ্টির প্রশংসা আমি বাস্কেল ইন্ডিয়ান কেন এতদিন ধরে করে আসছি? আর দ্যাট পোয়েট টেগোর, যার নামে আমি অজ্ঞান, সেই বা এই বৃষ্টির নামে এত কবিতা লিখল কেন? সুট বরবাদ হয়ে গিয়েছে, হিম লেগে কেউ হাঁচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বা পিছলে-পড়ে হাত ভেঙে ফেলেছে। আর সব চেয়ে মারাত্মক খবর, পাউলসেব বান্ধবী বৃষ্টির জন্য আসতে পারে নি বলে পাউলস মমহিত হয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইডের সম্মানে বেরিয়ে গিয়েছে।

মহা মূর্খকিলে পড়লাম। জুৎসই কি উত্তর দিই। মৃৎশকটিকায় বসন্তসেনা বৃষ্টিতে ভিজে যখন চাবুদত্তের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন যে কাবা সৃষ্টি হয়েছিল, তাব বর্ণনা এদের সামনে এই বেমক্সায় পেশ করলে এরা আমাকে খুন কববে; মেঘদূতের বয়ান, জয়দেবের ‘মেঘমেদুরম্ববং’ এদেব সামনে গাইতে গেলে এরা আমাকে জ্বাস্ত পুঁতে ফেলবে। তাই ভাবলাম, কার্ল মার্কসের স্মরণ নেওয়াই প্রশস্ত। অর্থনৈতিক কারণ দেখালে এরা হয়ত মোলায়েম হবে। বললাম, ‘বৃষ্টি না হলে গাছপালা, গম-ধান গজাবে কি প্রকারে?’

সবাই আমার দিকে এমন ভাবে তাকালে যেন আমি বেহেড মাতাল অথবা বন্ধ উন্মাদ। মিশরে পাগলা উটের কামড় খেয়ে বহু লোক মতিচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে এরা পাগলকে কি ভাবে শাস্তা করতে হয় সে কথা বিলক্ষণ জানে। রমজান বললো, ‘কাইরো শহরের ভিতর কি যবগম ফলে যে এখানে বৃষ্টির প্রয়োজন? যবগম ফলে গ্রামাঞ্চলে। সেখানে বৃষ্টি হোক না, কে বারণ করছে। কিন্তু শহরের ভিতরে কেন?’

শরিফ মুহম্মদ বললো, ‘সেখানেই বা বৃষ্টি হবে কেন? আমাদের গম-ধান ফলে নাইলের জলে। এই যে বৃষ্টি কখন আসে কখন আসে না তার তো কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। এর উপর নির্ভর করলে মিশরীদের আর বাঁচতে হত না। আমি কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় গ্রীক সদস্য পাউলস ফিরে এসে ঝুপ করে একটা চেয়ারে বসে টোবিলে মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করল। আমার সঙ্গে তর্কাতর্কির কথা সবাই ভুলে গিয়ে পাউলসের চতুর্দিকে

ঘিরে দাঁড়ালো ।

কি হয়েছে, কি ব্যাপার ?

অনেক ঝুলোঝুলির পর পাউলুস মাথা না তুলেই ফুঁপিয়ে যা বললো তার অর্থ, মেঘ আর বৃষ্টিতে তার বাম্ববীর বিরহবেদনা তাকে কাবু করে ফেলেছে । এ যন্ত্রণা সে সহিতে পারবে না । পটাসিয়াম সায়ানাইড রেশন্ড হয়ে গিয়েছে । মৃত্যুর অন্য কোনো প্রশস্ত পস্থা আছা যদি তাকে না বাৎসায় তবে—ইত্যাদি ।

আমাকে তখন আর পায় কে ? হৃৎকার দিয়ে বললুম, ‘ওরে মূর্খের দল, জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য বিরহ । আর বিরহ করে কম, সে-কথা কি করে জানাবি মেঘ না জমলে, বৃষ্টি না ঝরলে ? আর শেষ তত্ত্বকথা কবিতা কি করে ওংরাবে বিরহবেদনা যদি মানদ্বকে পাগল করে না তোলে ?

* * *

আজও ভাবি, আমাদের পদাবলী, জয়দেব, কালিদাস শূদ্রক যে বিরহ-বর্ণনা রেখে গিয়েছেন তার সঙ্গে তো অন্য কোন সাহিত্যের বিরহবর্ণনার তুলনা হয় না । তার একমাত্র কারণ আমাদের বর্ষা ।

জিন্দাবাদ হিন্দুস্থানী বর্ষা ! !

প্যারিস

জার্মান ভাষায় একটি গান আছে :

“In Paris, in Paris, sind die
Maedels so suess
Wenn sie fiuestern “Monsieur,
ich bin Dein,—”

অর্থাৎ :

প্যারিসের মেয়েগুলো কি মিষ্টি !
যখন তারা কানের কাছে গুনগুনিয়ে বলে,
‘মিসিয়ে আমি তোমারি ।’
সবাই হেসে হেসে তাকায়, সবাই কথা বলবার
সময় ‘তুমি’ বলে ডাকে
আর কানে কানে বলে, ‘তোমায় ছেড়ে
আর কারো কাছে যাব না ।’
কিন্তু হায়, শূদ্র তোমাকেই না, আরো
পাঁচজনকে তারা ঐ রকমধারাই বলে !

ইংরেজীতে বলে, ‘ফেরীং কোল টু নিউ কাসল’, হিন্দীতে বলে ‘বরেলীমে

বাস লে জানা' (বেরলীতে নাকি প্রচুর বাঁশ জন্মে), রাশানে বলে, 'ভুলা শহরে সামোভার নিয়ে যাওয়া' (সেখানে নাকি পৃথিবীর বেশীর ভাগ সামোভার তৈরী হয়), গুজরাতে বলে, 'ভরা কলসী নিয়ে নদীতে যাওয়া' এবং ফরাসীতে বলে, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া'।

ফরাসী প্রবাদটিই মৃৎরোচক। কিন্তু প্রশ্ন, সত্যি কি প্যারিস-সুন্দরীরা বড়ই দিলদরিয়া? উপরের গানটাতে তো খানিকটে হাদিস পাওয়া গেল। তবু কেন তামাম ইয়োরোপবাসীর সুখস্বপ্ন অস্তিত্ব একবারের মত প্যারিসে যাওয়া? এমন কি যে জার্মান ফরাসী জাতটাকে দু'চোখের দৃশ্যমন বলে জানে, সেও ফরাসীনার নাম শুনলে বে-এক্জেরার হয়ে পড়ে। হিন্দুর কাশী দর্শনাভিলাষ হুঁসলমানের মক্কা গমন তার কাছে নসি।

এ অখম ছেলেবেলায় এক ভ্রমচাষি বামুনের খপ্পরে পড়েছিল। তিনি তার মাথায় তখনই গবেষণার পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্যারিসে নেবেই ভাবলুম, 'সত্যি কোন্ হিরণ্যর পাতে লুক্কায়িত আছেন, তার গবেষণা করতে হবে' এবং তার নির্যাস আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব। এ-নির্যাস বানাতে আমাকে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে।

প্রথমতঃ, প্যারিসের মেয়েরা সুন্দরী বটে। ইংরেজ মেয়ে বড় ব্যাটামুখে, জার্মান মেয়েরা ভোঁতা, ইতালিয়ান মেয়েরা অনেকটা ভারতবাসীর মত (তাদের জন্য ইয়োরোপে আসার কি প্রয়োজন?) আর বলকান মেয়েদের প্রেমিকরা হরবকতই মারমুখে হয়ে আছে (প্রাণটা তো বাঁচিয়ে চলতে হবে)। তার উপর আরো একটা কারণ রয়েছে—ফরাসী মেয়ে সত্যি জামা-কাপড় পরার কায়দা জানে—অল্প পয়সায়—অর্থাৎ তাদের রুচি উত্তম।

তা না হয় হল। কিন্তু সুন্দরীরাই যে সব সময় চিত্তাকর্ষণ করেন তা তো নয়। যে-সব দেশে কোর্টিশপ করে বিয়ে হয়, সে-সব দেশে দেখেছি, মেলা সুন্দরীর বর জোটে নি আর এস্তার সাদামাটা মেয়ে খাপসুদর বর নিয়ে শহরময় দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

তবে কি মানুষ প্রেমে পড়ার বেলা সুন্দরী খোঁজে, বিয়ে করার সময় অন্য বস্তু? তবে কি প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপাড়া? হবেও বা।

তবে একথা অস্বীকার করার যো নেই, ফরাসী মেয়েরা আর পাঁচটা দেশের মেয়েদের তুলনায় ঢের বেশী বিদগ্ধা। গান বোঝে, সাহিত্য নিয়ে নাড়াচড়া করে, নাচতে জানে, ওয়াইনে বানচাল হয় না, অপ্রিয় সত্য এড়িয়ে চলে, পলিটিকস্ নিয়ে মাথা ঘামায় কম এবং জাভ-ফাত, সাদা কালো, দেশী-বিদেশী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংস্কার বিবর্জিত। ভালো লেগেছে তাই, হামেশাই দেখতে পাবেন, দেবকন্যার মত সুন্দরী ফরাসীনারী যমদুত্তের মত বিকট হাবশীর সঙ্গে সগর্বে সদম্ভে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন, নাচে খাসা, গান গায় তোফা, ছবি দেখলেই বলতে পারে কোন্ নম্বরী, আর ডাক্তারি পড়ে বলে এর ব্যাণ্ডেজ ওর ইন্জেকশন হামেশাই বিন্য়মিতে করে দেয়।

জার্মান মেয়ে বিদেশীকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, প্রেমে পড়ে ফরাসীনার

চেয়েও বেশী, কিন্তু তৎসঙ্গেও আপনি চিরদিনই তার কাছে ‘আউসল্যাণ্ডার’ (আউটল্যাণ্ডার) বা ‘বিদেশী’ থেকে যাবেন—কিন্তু ফরাসীরা মনে অন্য ভাগাভাগি। তার কাছে পৃথিবীতে দুই রকম লোক আছে—কলচরড্ আর অনকলচরড্। ফরাসী, বিদেশী এই দুই স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বাদ-বিচার তার মনে কখনো ঢোকে না।

আপনি দিবা ফরাসী বলছেন, ফ্রাঁস আপনি পড়েন, রোদাঁকে ভক্তি করেন, শোপার রস চাখতে জানেন, বর্দো বর্গেণ্ড সম্বন্ধে ওকীবহাল, বাস, তবেই হল। কোনো ইংরেজ বন্ধুকে যদি আপনি ফরাসীরা সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় সমস্ময়ে ভারতীয় কায়দায় বলেন, ‘ইনি অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট,’ তবে ফরাসীরা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শুধাবে, ‘কোন সর্ভজ্ঞেই মহাশয়? টেনিস না ক্রিকেট?’ ফরাসীরা বিশ্বাস, অক্সফোর্ডে মাত্র ঐ দুই কর্মই হয়। ভাগ্যিস প্যারিসীরা জানে না, ভারতবর্ষে কিছুই হয় না—কাজেই আপনাকে এ রকম ধারা প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করবে না।

কিন্তু ফরাসীরা সব চেয়ে বড় গুণ—সে ভণ্ডামি করতে জানে না। আর সব শহরে যা হয়, প্যারিসেও তাই হয়, কিন্তু ফ্রান্সের লোক ঢেকে চেপে রাখবার চেষ্টা করে না। যদি কোনো জিনিস চেপে যায়, তবে সেটা দৃষ্টিকটু রুচিবিরুদ্ধ বলে—নিজেকে ধর্মপ্রাণ, নীতিবাগীশ বলে প্রচার করার জন্য নয়।

অর্থাৎ ফরাসীরা কাছে টেস্ট্ বা রসবোধ মরাল্ বা নীতিবোধের চেয়ে বহুৎ বেশী বরণীয়।

আজব শহর কলকেতা

আজব শহর কলকেতা ছেলেবেলা থেকে শুন্যে আসছি। বড়ো হতে চললুম তবু তার প্রমাণ পেলেম কমই। তাই নিম্নে একখানা প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখব ভাবছি এমন সময় নামল জোর বৃষ্টি। সমীরণে পথ হারানোর বেদনা বেজে উঠল কারণ যদিও পথ হারাই নি তবু সময়টা একই! ছাতা নেই, বর্ষাতি নেই, ট্রামে চড়বার মত তাগদও আর নেই—বাস মাথায় থাকুক,—ট্যাঙ্কি চড়তে বুক কচ কচ করে; কাজেই বার্ডি ফেরার চিন্তার বেদনাটা ‘পথহারানো’র মতই হল। এমন সময় সপ্রমাণ হয়ে গেল ‘কলকেতা আজব শহর’—সামনে দেখি বড় বড় হরফে লেখা ‘ফ্লেশ বুক শপ’!

থেমেছে! নিশ্চয়ই কোনো ফরাসী পথ হারিয়ে কলকাতায় এসে পড়েছে আর যে দুটি পয়সা ট্যাঁকে আছে তাই খোঁসাবার জন্য ফরাসী বইয়ের দোকান খুলেছে। বাঙালী প্রকাশকরা বলেন, ‘শুধু ভালো বই ছাপিয়ে পয়সা কামানো যায় না, রসিক উপন্যাসও গাদা গাদা ছাড়তে হয়।’ কথাটা যদি সত্যি হয় তবে শুধু ফরাসী বই বেচে এ দোকানে মুনামা করবে কি প্রকারে? তাই আন্দাজ করলুম, এই ‘ফ্লেশ বুক শপ’ বোধ হয় হাতীর দাঁতের মত—শুধু দেখবার জন্য,

চিবোবার জন্য দাঁত রয়েছে লুকোনো অর্থাৎ দোকানের নাম বাইরে যদিও 'ফ্রেণ্ড বুক শপ,' ভিতরে গিয়ে পাবো অন্য মাল—'খুশবাই', 'সাঁঝের পীর,' 'লোধরেন্দু', 'ওষ্ঠ-রাগ'।

সেই ভরসায় ঢুকলুম। বৃষ্টিটাও জোরে নেমেছে। নাঃ। আজব শহর কলকেতাই বটে। শূধু ফরাসী বই বেচেই লোকটা পয়সা কামাতে চায়। গাদা গাদা হলদে আর সাদা মলাটগুলা এস্তার ফরাসী বই, কিছু সাজানো-গোছানো, কিছু যত্নতর ছড়ানো। ফরাসী দোকানদার কলকাতায় এসে বাঙালী হয়ে গিয়েছে। বাঙালী দোকানদারেরই মত বইগুলো সাজিয়েছে টাইপ রাইটারের হরফ সাজানোর মত করে। অর্থাৎ সিজিলটা যার জানা আছে সে চোখ বন্ধ করেই ইচ্ছেমত বই বের করে নিতে পারবে, যে জানে না তার কোমর ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যাবে।

ফুটফুটে এক মেমসাহেব এসে ইতিমধ্যে ফরাসী হাসি হেসে দাঁড়িয়েছেন। পরশুরামের কেদার চাটুজ্যেকে আমি মূর্খনিষ মানি। তারই ভাষায় বললুম, সেলাম মেমসাহেব।' মেমসাহেব ফরাসীতে বললেন, 'আপনার আনন্দ কিসে?'—অর্থাৎ 'কি চাই?' মেরেছে। ফরাসী ভাষা কবে সেই প্রথম যৌবনে বলছি সে কথাই স্মরণ নেই—গোটা ভাষাটার কথা বাদ দিন।

জার্মান ভাষায় একটি প্রেমের গান আছে Dein Mund sagt "Nein" Aber Deine Augen sagen "Ja". অর্থাৎ, তোমার মুখ বলছে 'না, নো', কিন্তু তোমার চোখ দৃষ্টি বলছে 'হাঁ হাঁ'।

কিন্তু ফরাসী জার্মানির দৃশমন। জার্মান যা করে ফরাসী তার ঠিক উল্টো করাটাই জাত্যাভিমানের কৈবল্যানন্দ বলে ধরে নিয়েছে। তাই মেমসাহেব যতই মুখে 'ইয়েস ইয়েস' বলেন ততই দেখি তাঁর চোখে স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'না' 'নো'—অর্থাৎ মেমসাহেব আমার ইংরেজী বুঝতে পারছেন না। মহা মূর্খকিল।

হঠাৎ কখন ফরাসী রাজদূত মসিয়ো ফ্রাঁসোয়া পঁসেঁর নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে বোধ হয় কিছুটা ফরাসী বেরিয়ে পড়েছিল, আর যাবে কোথা, মেমসাহেব আদেশ দিলেন, 'মসিয়ো, ফরাসীতে কথা বললেই পারেন।'

বাঙালীর জাত্যাভিमानে বড়ই আঘাত লাগলো স্বীকার করতে যে যদিও ফরাসী ভাষাটা কেঁদেঁকুকিয়ে পড়ে নিতে পারি, বলতে গেলে আমার অবস্থা ডডনং হয়ে দাঁড়ায়। ভাবলুম, দু'গুণা বলে ঝুলে পড়ি। এ মেমসাহেব যদি কলকাতার বৃকের উপর বসে বাঙলা (এমন কি ইংরেজীও) না বলতে পারে তবে আমি ফ্রান্স থেকে হাজারো মাইল দূরে দাঁড়িয়ে টুটিফুটি ফরাসী বললে এমন কোন্ বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

দশ বছরের পুরোনো মর্চে ধরা, জাম-পড়া, ছাতি-মাথা ফরাসী তানপুরোটোর তার বেঁধে বরজলালের মত ইমনকল্যাণ সুর ধরলুম। এবং কী আনন্দ, কী আনন্দ, মেমসাহেবও বড়ো রাজা প্রতাপ রায়ের মত। আমার ফরাসী শুনেনে কখনো 'আহা বাহা বাহা বাহা' বলেন, কখনো, 'গলা ছাড়িরা গান গাহো' বলেন। এই হল ফরাসী জাতটার গুণ। হাজারো দোষের মধ্যে একটা কিছু

ভালো দেখতে পেলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

আমাকে আর পাল্ল কে ?

আপনাদের আশীর্বাদে তার শ্রীগুরুর কৃপায় তখন ব্যাকরণকে গঙ্গাধারা
বসিয়ে উচ্চারণের মাধ্যম ঘোল ঢেলে চালানুম আমার খেনো মার্কা ফরাসী
শ্যাম্পেন। মেমসাহেব খুশ। আম্মো তর।

অতি সযত্নে তিনি আমার বইয়ের ফর্দ টুকে নিলেন, বই আসা মাত্র আমার
খবর দেবেন সে ভরসাও দিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে সাত সমুদ্র ভেরো নদীর এপারে
বিদেশীর সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা কইতে পাওয়ার আনন্দে সুখ-দুঃখের দু'চারটা
কথাও বলে ফেললেন। মাত্র তিন মাস হল এদেশে এসেছেন, তাই ইংরাজী
যথেষ্ট জানেন না, তবে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন, বইয়ের দোকান তাঁর নয়,
এক বাম্ববীর, তার অনুপস্থিতিতে শৃঙ্খমাত্র ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার
কামনায় দোকানে বসেছেন।

তুলসীদাস বলেছেন—‘পৃথিবীর কি অশুভ রীতি। শৃংড়ি দোকানে জেঁকে
বসে থাকে আর দুর্নিয়ার লোক তার দোকানে গিয়ে মদ কেনে। ওদিকে দেখ,
দুঃখওয়ালাকে ঘরে ঘরে ধন্য দিয়ে দুখ বেচতে হয়।’

বুঝলুম কথা সত্য। এতদিন পৃথিবীর লোক প্যারিসে জড়ো হত ফরাসী
বেচবার জন্য।

সে কথা থাক। ইতিমধ্যে একটি বাঙ্গাল ছোকরা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস
করলো, ‘কনার্শিয়াল আর্ট সম্বন্ধে কোন বই আছে কিনা?’ আমার মনে বড়
আনন্দ হল। বাঙালী তাহলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। ফরাসী ভাষায়
কনার্শিয়াল আর্টের বই খুঁজছে।

ততক্ষণে আমি একটা খাসা বই পেয়ে গিয়েছি। ন্যূরনবগের মোকদ্দমায়
যেসব দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গিয়েছিল, তাই দিয়ে গড়া হিটলার চরিত্রবর্ণন।
হিটলার সম্বন্ধে তাঁর দুঃশমন ফরাসীরা কি ভাবে তার পরিচয় বইখানাতে আছে।
এ বইখানার পরিচয় আপনাদের দেব বলে লেখাটা শুরুর করেছিলুম, কিন্তু
গৌরচন্দ্রিকা শেষ হতে না হতেই ভোরের কাক কা-কা করে আমার স্মরণ করিয়ে
‘দিলে, কলম ফুরিয়ে গিয়েছে’। আরেক দিন হবে।

কিসের সাক্ষনে

হটেনটটদের কথা আলাদা। শিক্ষালাভের জন্য তারা যেখানে খুশি যেতে
পারে। একথা তাদের ভাবতে হয় না, ‘যে-শিক্ষা লাভ করতে যাচ্ছি সেটা আবার
দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাবে তো?’ কারণ কোনো প্রকারের ঐতিহ্যের
কণামাত্র বালাই তাদের নেই।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমরা প্রায় হটেনটটের পৰ্যায়ভূত হয়ে পড়েছিলুম।

আর করেকটি বৎসর মাত্র ইংরেজ এদেশে থাকলে আমরা একে অন্যকে কাঁচা খেয়ে ফেলতে আরম্ভ করতুম।

ইংরেজ গিয়েছে। তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে আমরা বিদ্যাল্যাভ করতে যাব কোন দেশে? এতদিন এ প্রশ্ন কেউ শূন্যতো না। টাকা থাকলেই ছোকরারা ছুটতো হয় অক্সফোর্ডের দিকে নয় কেমব্রিজের পানে। সেখানে সীট না পেলে লন্ডন কিংবা এডিনবরা।

কিমার্শ্চর্যমতঃপরম্। এই ভারতবর্ষে একদিন বিদ্যাশিক্ষার এমনি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল যে, গান্ধার, কশ্মির, বল্হীক, তীশ্বত, শ্যাম, চীন থেকে বিদ্যার্থী শ্রমণ এদেশে আসত সত্যজ্ঞান লাভ করার জন্য। এবং বিংশ শতকে দেখলুম, এই এই ভারতবর্ষের লোকেই ধৈর্যে চলেছে ইংলেণ্ডের দিকে 'বিদ্যাল্যাভ'ের জন্য। ভারতীয় ঐতিহ্য তখন তার দূরবস্থার চরমে পৌঁছেছে।

রাধার দূরবস্থা যখন চরমে পৌঁছেছিল, তখন যমুনার জল উজান বয়েছিল, একথা তাহলে মিথ্যা নয়।

কিন্তু আমাদের ছেলেরা যে ইংলেণ্ডের পানে উজান স্রোতের মতো বয়ে চলেছিল, সেটা তো আর রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া যায় না—পরাদীনতা-মুগীটার গলা কাটা যাওয়ার পরও সে খানিকদূর পৰ্যন্ত ছুটে যায় তারপর ধপ করে মাটিতে পড়ে। তাই এই বেলা জমাখরচ নিয়ে নেওয়া ভালো, ভারতীয় ছেলে ইয়োরোপে পেরে কি, যেত কিসের আশায়?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করার সময় বলিছিলেন, ইয়োরোপকে আমরা চিনলুম ইংলেণ্ডের ভিতর দিয়ে—তাই আমাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ইংলেণ্ড আর ইয়োরোপ একই জিনিস। ইংলেণ্ডের অনেক গুণ আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈদেশ্যভাষাভারে যে ইংলেণ্ড তেমন কিছু হীরে-মানিক জমা দিতে পারে নি, সে কথাও সত্য। ইয়োরোপীয় বৈদেশ্যের অপ্রতিশব্দনী কুতূবমিনার বলতে যাঁদের নাম মনে আসে—মাইকেল এঞ্জেলো, রদা, রায়ফেল, সেজান, বেটোফেন, ভাগনার, গ্যোটে, টলস্টয়, দেকার্ত, কান্ট, পাস্তোর, আইনস্টাইন ইংলেণ্ডে জন্মায় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে যেন ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালী, রুশ থেকে গুণীজ্ঞানীরা এসে এদেশে ছেলেমেয়েদের সামনে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন বহু গুণী শান্তিনিকেতনে এসেছেন, বহু ছাত্র তাঁদের কাছ থেকে নানা প্রকারের বিদ্যা আহরণ করেছে, কিন্তু আজ শান্তিনিকেতনে সে-মেলা আর বসে না। তবু আমার বিশ্বাস, বাঙালী যদি আত্মবিশ্বাস না হারায় তবে এই শান্তিনিকেতনেই—দিল্লী, এলাহাবাদ, আমেদাবাদে নয়—এই শান্তিনিকেতনের পঞ্চবটীর তলায়ই একদিন পঞ্চমহাদেশ সম্মিলিত হবে। আমাদের দেখতে হবে, এই পঞ্চবটী যেন ততদিন শূন্যকরে না যায়।

ভারতীয় ছেলে যে ইংলেণ্ডে পড়াশোনা করতে যেত তার কারণ এই নয় যে, তাদের সবাই ধরে নির্যেছিল ইংলেণ্ডই ইয়োরোপের প্রতীক—তারা ধরে নেয় নি

যে, ইয়োরোপ থেকে যা কিছু শেখবার মত আছে তার তাবৎ সম্পদ অক্সফোর্ড কেমব্রিজেই পাওয়া যায়। এদের ভিতর অনেক ছেলেই জানতো, শিল্পকলার জন্য ফ্রান্স, এবং বিজ্ঞানদর্শনের জন্য জার্মানিতেই গঙ্গোদক পাওয়া যায়—অভাব-বশতঃ তারা যে তখন কপোদকের সম্মানে যেতো তাও নয়। তার একমাত্র কারণ চাকরি দেবার বেলা ইংরেজ এ জলেরই কদর দেখাতো বেশী। (এতে আশ্চর্য হবার মত কিছু নেই; আয়ানও চাইতেন না যে রাধা যমুনার জল আনতে যান, পাছে কৃষ্ণের সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়ে যায়—ইংরেজও চাইত না যে, ফ্রান্স জার্মানি গিয়ে আমরা সভ্য ইয়োরোপকে চিনে ফেলি। আয়ান ইংরেজ দূর-জনেই তাই কপোদক-সম্প্রদায়ের মূখপাত্র)।

জানি, আমার পাঠক মাহই টিম্পনি কাটবেন আমি বস্তু বেশী প্রাদেশিক কিন্তু তাই বলে তো আর ডাছা মিথ্যা কথা বলতে পারি নে। নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইংলেন্ড বর্জন করে তবু যে কলটি ছেলে প্যারিস, বার্লিন, মুনিক, ভিয়েনায় জ্ঞানের সম্মানে যেত তাদের অধিকাংশই বাঙালী।

আশা করি একথা কেউ বলবেন না যে বাঙালীর টাঁকে এত বেশী কড়ি জমে গিয়েছিল যে, সেগুলো ওড়াবার তালে সে প্যারিস যেত, জার্মান ঘুরত। বরং বাঙালীর বদনাম সে চাকরির সম্মানে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। এক অখ্যাতনামা বাঙালী কবি চাকরির বাঁচানো সম্পর্কে আপিস ধাবমান বাঙালী কেরানীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

ভরা পেটে ছুটতে মানা? চিবিয়ে খাওয়া

স্বাস্থ্যকর?

চাকরি আগে বাঁচাই দাদা, প্রাণ বাঁচানো

সে তারপর।

যে অম্মের জন্য বাঙালী কেরানীগির করে সেই অম্ম পর্যন্ত বাঙালী কেরানী ধীরে-সুস্থে খেয়ে আপিস যেতে পারে না। এত বড় প্যারাডক্স, এত বড় স্বার্থত্যাগ বাঙ্গালা দেশের বাইরে আপনি পাবেন না।

আমি বলি—আর আপনার কথায় কান দেব না—বাঙালীরই দৃষ্টি রসবোধ ছিল, তাই সে প্যারিস যেত।

প্যারিসে একপ্রকারের হতভাগা চিত্রকরের দল আছে—এদের নাম পেভেমেন্ট আর্টিস্ট। এরা আবার দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এদের ভিতর যারা কিঞ্চিৎ খানদানি তারা আপন ছবি ফুটপাথের রেলিঙের উপর ঝুলিয়ে রেখে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি যদি কোনো ছবি সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তবে সে পরম উৎসাহে আপনাকে বাংলা দেবে ছবিটার তাৎপর্য কি! আপনি যদি সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেখান তবে সে তার তাবৎ ছবির ঠিকুজি-কুলজি, নাড়ী-নক্ষত্র সব কিছু গড় গড় করে বলে যাবে, আর যদি সত্যি আপনি একথানা ছবি কিনে ফেলেন—এ জাতীয় অলৌকিক ঘটনা অতিশয় রাঙা শুক্লরবার ছাড়া কখনো দুর্ভাগ্যগোচর হয় না—তবে সে আপনাকে ‘ও রিভোয়া’ জানাবার সময় কানে কানে বলে দেবে, ‘এ ছবি কিনে আপনি ভুল করেন নি,

মসিয়ো—এ ছবি দেখিবার জন্য তামাম পৃথিবী একদিন আপনার দোরের গোড়ার ধরা দেবে।’

অবশ্য ততদিন সে উপোস করে। শেষটায় সে-দিন না দেখেই সে মরে—শীতে এবং ক্ষুধায়।

এদের চেয়েও হতভাগ্য চিত্রকর আছে। তাদের রঙ আর ক্যানভাস কেনবার পয়সা পর্যন্ত নেই। তাই তারা রঙিন খড়ি দিয়ে ফুটপাথের একপাশে ছবি এঁকে রাখে। প্যারিসের ফুটপাথে বারোমাস পূজোর ভিড়—তাই এদের ছবি আঁকতে হয় অপেক্ষাকৃত নির্জন ফুটপাথে। সেখানে পয়সা পাবার আশাও তাই কম।

এসব ছবি তো আর কেউ বাড়ি নিয়ে যেতে পারে না, তাই ছবি দেখে খুশী হয়ে কেউ যদি চিত্রকরের হ্যাটের ভিতর—বলতে ভুলে গিয়েছিলুম হ্যাটটা ছবির একপাশে চিৎ করে পাতা থাকে—দু’টি পয়সা ফেলে দেয় তবে সেটা ভিক্ষে দেওয়ার মতই হ’ল। এ শ্রেণীর চিত্রকররা অবিশ্যি বলে, ‘পয়সাটা ভিক্ষে নয়, পিকচার গ্যালারির দর্শনী। দর্শনী দিয়েছে বলে কি তোমাকে গ্যালারির ছবি বাড়ি নিয়ে যেতে দেয়?’ হক্ কথা।

এদের যদি বেশী পয়সা দিয়ে বলেন, ‘ঐ ছবিটা তুমি আমাকে ক্যানভাস আর রঙ কিনে ভালো করে এঁকে দাও’, তবে সে পয়সাটা সীনের জলে ফেলারই সমান। এ শ্রেণীর চিত্রকরের সঙ্গে বোতলবাসিনীর বন্ড বেশী দহরম-মহরম।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে মন উদাস হয়ে গিয়েছিল। তাই বেড়াতে বেরিয়েছি আর দেশের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি ফুটপাথের উপর অলৌকিক দৃশ্য। পশ্চানদীর গোটা কয়েক ছবি রঙিন খড়ি দিয়ে আঁকা। ছবিগুলো ভালো না মন্দ সেকথা আমি এক লহমার তরেও ভাবলুম না। বিদেশ-বিভূঁইয়ে দেশের লোক পেল সে পকেটমার না শঙ্করাচার্য, সেকথা কেউ শুধায় না।

বৃষ্টি নামলেই ছবিগুলো ধুয়ে মুছে যাবে। আর্টিস্টের দিকে তাকালুম। শর্তাচ্ছন্ন কোট পাতলুন। হাতে বেগলা। বাঙালী।

আমাকে দেখে তার মুখের ভাব কণামাত্র বদলালো না। বেগলাখানা কানের কাছে তুলে ধরে ভাটিয়ালি বাজাতে আরম্ভ করল।

হাস্তিসার মূখ, ঠোঁট দুটো অনবরত কাঁপছে, চোখ দুটিতে কোনো প্রকারের জ্যোতির বিন্দুমাত্র আভাস নেই, একমাথা উন্স্কাখুন্স্কা চুল, কিন্তু সব ছাড়িয়ে চোখে পড়ে তার কপালখানা। এবং সে কপাল দেখে স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, এরকম ‘কপালী’ মানুষ বিদেশ-বিভূঁইয়ে ভিক্ষে মাগছে কেন?

তাকে পাশের কাফেতে টেনে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে বিজ্ঞর বেগ পেতে হয়েছিল। আমার কোনো কথার উত্তর দেয় না, আমার চেয়ে দেড় মাথা উঁচু বলে তার দৃষ্টি আমার মাথার উপর দিয়ে কোথায় কোন দ্রান্তে গিয়ে ঠেকেছে তার সম্বন্ধ নেই। একবার হাত ধরে বললুম, ‘চলুন, এক কাপ কফি খাবেন’;

ঝটকা মেয়ে হাত সরিয়ে ফেলল।

আমি নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছি দেখে হঠাৎ হ্যাটটা তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। পাশের কাফেতে বসে আমি শূধালুম, ‘কিফ? চা?’ মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। আমি মনে মনে বদ্বাতে পেরেছিলাম সে কি চায়; কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্য চা কিফর প্রস্তাব পেড়েছিলাম। শেষটায় শূধালুম, ‘তবে কি থাকেন?’

একটি কথা বললো ‘আবসাঁৎ।’

দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক মাদক দ্রব্য! শতকরা আশীভাগ তাতে এলকহল। এ মদ মানুষ তিন চার বৎসরের বেশী খেতে পারে না। তারই ভিতরে হয় আত্ম-হত্যা করে, নয় পাগল হয়ে যায়, না হয় এলকহলিক বিভীষণতা দেখে দেখে এক মারাত্মক রোগে চাঁৎকার করে করে শেষটায় ভিন্নি গিয়ে মারা যায়। ইঁদুরছানার নাকের ডগা এ মদে একবার চুবিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে মিনিট তিনেকের ভিতর ছফ্-ফট্ করে মারা যায়।

কী বিকৃত মুখ করে যে আর্টিস্ট আবসাঁৎটা খেল, তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। মনে হল, পানীর যেন আগুন হয়ে পেটে ঢুকতে চায় বলে নাড়ীভূঁড়ি উল্টে গিয়ে বমি হয়ে বেরতে চায়, আর সমস্ত মুখে তখন ফুটে ওঠে অসহ্য যন্ত্রণার বিকৃততম বিভীষিকা। চোখ দুটো ফুলে উঠে যেন বাইরের দিকে ছিটকে পড়ে যেতে চায়, আর দরদর করে দু’চোখ দিয়ে জল নেমে আসে।

আমি মাত্র একটা আবসাঁতের অভ্যাস দিয়েছিলাম। সেটা শেষ হতেই আমার দিকে না তাকিয়ে নিজেই গোটা তিনেক অভ্যাস দিয়ে ঝপাঝপ গিললো।

আমি চুপ করে আপন কিফ খেয়ে যাচ্ছিলাম।

গোটা চারেক আবসাঁৎ সে ততক্ষণে গিলেছে। তখন দেখি সে আমার দিকে তাকান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এর চোখে এল কোথেকে?

হঠাৎ বললো, ‘আর কেন ছোকরা, এইবার কেটে পড়ো, বীট ইট্, গে ভেক্, ভিৎ ভিৎ।’ ক’টা ভাষার যে সে আমার পালাতে বললো তার হিসেবই আমি রাখতে পারলাম না।

আমি চুপ করে বসে রইলাম—নট নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু।

একগাল হেসে বলল, ‘দেখালি? আমি ভিখিরি নই। এই ভাষা ক’টি ভাঙিয়েই আমি তোমার চেয়ে দামী সুট পরতে পারবো, বদ্বালি? আবসাঁৎ দিয়ে প্যারিস শহর ভাসিয়ে দিতে পারবো, বদ্বালি, কমপ্রাঁ, ফের্শট্-হেস্ট ডু, পলিময়েশ?’ আবার চলল ভাষার ভুবড়ি।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে খানিকক্ষণ হাসলো। শূধালো, ‘ছবি আঁকতে এসেছিস এ দেশে?—না হলে আর্টিস্টের উপর এ দরদ কেন, বাপদ্? তা তোমার অজ্ঞতার কি হল? না বাগ-গদ্বাহা? কিংবা মোগল? অথবা রাজপুত?’

তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে কুটি কুটি। ‘অবনবাবদ্? নন্দলাল?

যামিনী রায় ? এনারা সব আর্টিস্ট ! কহু !'

আমি তবু চুপ ।

বললে, 'অ-অ-অ-। সেজান্ রেনোয়া গোগাঁ, আঁরি-মার্তিস ? বল্ না রে ছোকরা ।'

আমি পূর্ববৎ ।

'তবে শোন্ ছোকরা । এদের কাছ থেকে কিচ্ছুটি শেখবার নেই, তোকে সাফ সাফ বলে দিচ্ছি । আমার কথা শোন্ । আর্ট জিনিসটা কি ? আর্ট হচ্ছে—'

বলে সে আমার প্রথম আর্ট সম্বন্ধে একখানা লেকচর শোনালে । সেই গ্রীকদের আমল থেকে নন্দনশাস্ত্রের ইতিহাস শব্দ ক'রে হঠাৎ চলে গেল ভরত দর্শিন মন্মট ভট্টে । সেখান থেকে গোস্তা খেয়ে নাবলো টলস্টয়ে—মধ্যাথানে গোয়টেকে খুব একহাত নিল । তারপর বদলের, মালামে' । শেষ করল জেমস জয়েসকে দিয়ে ।

আরো বিস্তর কাব্য, নাট্য, চিত্রের সে উল্লেখ ক'রে গেল, যার নাম আমি বাপের জন্মে শুনিনি ।

তারপর ঝপ ক'রে আরেকটা আবসাঁৎ গিলে বললো, 'উহু ! তোর চোখ থেকে বদ্বতে পারছি ছবির তুই বদ্বিস কচুপোড়া । একবার একটা সাড়া পর্যন্ত দিলি নে । তবে কি তোর শখ মূর্তি গড়াতে ? অশোকমন্ডলের সিংগি, গান্ধারের বদ্বশ, মথুরার অমিতাভ, এলিফেণ্টার হিমমূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলোর মোজেস, নটরাজ ? বল্ না ?

তারপর ছাড়লে আরেকখানা লেকচর । দুর্নিয়ার কোন যাদুঘরের কোন কোণে কোন মূর্তি লুকনো আছে, সব খবর নথ্যগ্রন্থপণে ।

এই রকম ক'রে লোকটা আর্টের যত শাখা-প্রশাখা আছে তার সম্বন্ধে আপন মনে কখনো মাথা নেড়ে, কখনো শব্দ ওজন ক'রে ক'রে, কখনো গড়গড়িয়ে মেল গাড়ির তেজে, কখনো বক্রোক্তি ক'রে সন্দেহের দোদুল-দোলায় দুলে ব্যাখ্যান দিল । এদেশ ওদেশ সেদেশ সব দেশ-মহাদেশের সর্বপ্রকারের আর্ট বস্তুর পাঁচমেশালি বানিয়ে ।

এরকম পণ্ডিত আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে সে চুপ করে আর থাকতে দিল না ।

বোধ হয় নেশা একটু কমে গিয়েছিল ; তাই চাপ দিয়ে শুধালো, 'বল্, তুই এদেশে এসেছিস কি করতে ?'

আমি না পেরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'লেখাপড়া শিখতে ।'

খুব লম্বা একখানা 'অ-অ-অ' টেনে বললো ।

'তা তো শিখবি । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইন, শ্যাম্পেন, আবসাঁৎ ? তার কি হবে ? নানা প্রকারের ব্যামো ? তার কি হবে ? অশুভ অশুভ নয় নয়া নয়া ইনকিলাবী মতবাদ ? তার কি হবে ?

*

*

*

এই হল মূর্খকল । অরসাঁৎ ব্যামোর চেয়েও ভয়ঙ্কর অর্ধসিদ্ধ অর্ধপঙ্ক

মতবাদ। শুধু ইনকিলাবী নয়, অন্য পাঁচরকমেরও।

আজ পর্যন্ত যেটুকু এদেশে এসেছে তাকেই আমরা সামলে উঠতে পারছি নে। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের শিক্ষার সঙ্গে তাকে কি করে মিল খাওয়াবো, বুঝে উঠতে পারিনে। অথচ পশ্চিমের সঙ্গে লেন-দেনও তো বন্ধ ক'রে দেওয়া যায় না। উপায় কি??

ভক্তি

ভক্তি ও ভালবাসার ভিতর দিয়ে অনিবর্তনীয় সত্তাকে পাবার চেষ্টা মানুষ সব যুগে আর সব দেশেই করেছে। এ-প্রচেষ্টার তুলনামূলক ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। কারণ শেষ পর্যন্ত এই ইতিহাস লেখা হবে সর্বধর্মের উৎপত্তিস্থল প্রাচ্যেই এবং প্রাচ্য এখনো আপন ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইশ্বন নিয়ে এতই উন্মাদ যে তিন দেশের শাস্ত্রগ্রন্থ একত্র করে সেদিকে আপন শক্তি নিয়োজিত করবার অবসর পাচ্ছে না।

ভক্তিমার্গের প্রসার ও বিস্তার হয় প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলিম এবং খৃস্টান ধর্মে। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্ররাশি এতই বিশাল এবং বিক্ষিপ্ত যে, তার ভিতর দিয়ে ভক্তির অভ্যুদয় পদে পদে অনুসরণ করা সহজ কর্ম নয়। তার তুলনায় খৃস্টধর্মে ভক্তির অনুসন্ধান অনেক সহজ। একমাত্র বাইবেলখানা মন নিয়ে পড়লেই ভক্তির সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

বাইবেলের প্রথম খণ্ডে (অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্ট) ঈশ্বরের যে রূপ পাওয়া যায় সেটি প্রধানতঃ একচ্ছত্রাধিপতি দুর্ধর্ষ, অকরণ্য এমন কি বদরাগী এবং খাম-খেয়ালী রাজার রূপ? তাঁর সামনে পশুপক্ষী দাহ না করলে তিনি তুষ্ট হন না, তাঁর পদপ্রান্তে কুমারী কন্যাকে বিসর্জন না দিলে তিনি বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দিয়ে দেশ লণ্ডভণ্ড করে দেন। তাই ওল্ড টেস্টামেন্টের দেবতাকে পূজারী আপন অর্ঘ্য দিচ্ছে অতি ভয়ে, সশঙ্ক চিত্তে।

খৃস্ট এসে এই ভাবধারা সম্পূর্ণ বদলে দিলেন। তিনি বললেন, সৃষ্টিকর্তা রাজাধিরাজ, তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি আমাদের পিতা। ‘আওয়ার ফাদার উইচ আর্ট ইন হেভন্।’ এইখানেই ভক্তির সূত্রপাত। ভগবানকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর করুণা, তাঁর স্নেহ পেতে হলে তাঁকে ভালবাসতে হবে পিতার মত।

কিন্তু মানুষ একবার ভালবাসার মন্ত্র পেলে সে আর মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চায় না। মন্তপক্ষ বিস্তার করে সে আকাশের সর্বোচ্চ স্তরে উড়য়মান হতে চায়। পিতার প্রতি ভালবাসা মঙ্গলময় জিনিস কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে অনেক মধুর, বহু নিবিড় মাতার প্রতি পুত্রের ভালবাসা, পুত্রের প্রতি মাতার মমতা। তাই ক্যাথলিক জগৎ গেয়ে উঠলো, “খ্যা হে জননী মেরি,

তুমি মা করুণাময়ী ।”

ক্যাথলিক জগতে তাই ভগবানের পূজা প্রধানতঃ মা-মেরিরূপে । এ পূজা ‘আভেমারিয়া’ মন্ত্র দিয়ে সমাধান হয় এবং সে মন্ত্র যে কত সঙ্গীত-ম্রুটাকে অনুপ্রাণিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই । খৃস্টবৈরী ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রধান সঙ্গীতকার মেণ্ডেলজোন এই আভেমারিয়া মন্ত্রে সুর দিয়ে লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিক নরনারীর ধর্মপিপাসা সঙ্গীতসুধা দিয়ে তৃপ্ত করেছেন—সঙ্গীতজগতে আপন অক্ষয় আসন রেখে গিয়েছেন ।

‘উর্ধ্বদিকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত এই আভেমারিয়া সঙ্গীতের প্রতীক উর্ধ্বাশির ক্যাথলিক গির্জা । আতুর মানুষের যে প্রার্থনা, যে বন্দনা অহরহ মা-মেরির শূন্য কোলের সম্মানে উর্ধ্বপানে ধায় তারই প্রতীক হয়ে গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে উর্ধ্বদিকে । লক্ষ লক্ষ গির্জার লক্ষ লক্ষ শিখর মা-মেরির দিবা সিংহাসনের পার্শ্বব স্তম্ভ ।’

কিন্তু মানুষ এখানে এসেও থামল না । সত্য হোক, মিথ্যা হোক, মানুষের বিশ্বাস মাতার প্রেম, পুত্রের ভালবাসার চেয়েও শক্তিশালী যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণীর মধ্যে যে প্রেম উদ্ভাসিত হয় । বাইবেলে যখন বলা হয়েছে “For, love is stronger than death” তখন মহাপুরুষ এই প্রেমের কথা ভেবেছিলেন । তাই মানুষ বিচার করল, ‘ভগবানকে যদি ভালবাসা দিয়েই পেতে হয়, তবে সে ভালবাসা তার নিবিড়তম রূপ নেবে না কেন ? ভগবানকে তবে পিতা অথবা মাতারূপে কল্পনা না করে তাঁকে হৃদয়ে বসাব বল্লভরূপে, প্রেমিকরূপে ।’

সমস্ত বৈষ্ণব রসসাধনা এই তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত—সে কথা পরে হবে । কিন্তু ক্যাথলিক রহস্যবাদী ভক্তেরা (Mystic saints)-ও যে এরকম রসস্বরূপে আরাধনা করছেন তার সম্মান আমরা কমই রাখি,—কারণ আমাদের পরিচয় প্রধানতঃ প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্মের সঙ্গে । ঈশ্বর দীর্ঘ হলেও নিচের কবিতাটি উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না :—

O Night, that dids't lead us thus,

O Night, more lovely than dawn
of light,

O Night that broughtest us

Lover to lover's sight

Lover with loved in marriage
of delight !

Upon my flow'ry breast,

Wholly for him, and save himself
for none,

There did I give sweet rest

To my beloved one ;

The fanning of the cedars
 breathed thereon
 When the first morning air
 Blew from the bower, and waived
 his locks aside,
 His hand with gentle care,
 Did wound me in the side,
 And in my body all my senses
 died.
 All things I then forgot,
 My cheek on him who for my
 coming came ;
 All ceased and I was not,
 Leaving my cares and shame
 Among the lilies and forgetting
 them.

ক্যাথলিক জগতের বিখ্যাত সাধু সান জোয়ান্দে লা ক্রুসের (San Juan de la Cruz) কবিতা পড়ে কে বলবে—এ কবিতা অধ্যাত্ম জগতের ধর্মরস সৃষ্টি করবার জন্য রচিত হয়েছিল? এ কবিতা তো বৈষ্ণব পদাবলীর সুরে বাঁধা।

কিন্তু ভগবানকে রসস্বরূপে আরাধনা করার প্রচেষ্টাতে ক্যাথলিক জগতের এই চূড়ান্ত।

বৈষ্ণব ভক্ত সেই চূড়ান্ত ত্যাগ করে তারপর আকাশে উড়ীরমান হন। বৈষ্ণব প্রেমিক বলেন, বৈধ প্রণয়ের নিবিড়তা বার বার হার মেনেছে অবৈধ প্রেমের সম্মুখে। আত্মীয়স্বজন, প্রচলিত ধর্মরীতি যেখানে এসে প্রেমের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, দুর্বীর প্রেম এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেইখানেই। তাই আমাদের কদম্ববনবিহারিণী বিরহিণী রজসুন্দরী শ্রীরাধা যে প্রেম পাগলিনী, সে প্রেমের সঙ্গে অন্য কোন প্রেমের তুলনা হয় না। বাঙালীর রাধা বিবাহিতা, —সমাজ তাঁর প্রেমের পথে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছে। শাশুড়ী-ননদী শঙ্খ-করাভের মত তাঁকে আসতে যেতে যেন খ'ড খ'ড করে কেটে ফেলেছেন।

বহু যুগ পূর্বে উচ্চারিত মন্ত্র তাই তার সম্পূর্ণ অর্থ পেল কৃষ্ণাধার মিলনে—

যদেৎ হৃদয়ং মম তদন্তু হৃদয়ং তব।

যদেৎ হৃদয়ং তব তদন্তু হৃদয়ং মম।

ভারতের বাইরে একমাত্র ইরানে মাঝে মাঝে এই সর্বোচ্চ রসসাধনার সম্মান মেলে। কারণ ভারত ও ইরানের আধ্যাত্মিক যোগাযোগ বহু শত শতাব্দীর।

তাই ইরানী কবি সূর মিলিয়ে গেয়েছেন :—

‘মন্ তু শূদম্ তু মন্ শূদী, মন্ তন্ শূদম্
তু জী শূদী
তা কসী ন গোয়েদ্ বাদ্ আজ্ ঈ মন্ দিগরম্
তু দিগরী ।’
আমি তুমি হন, তুমি আমি হলে, আমি দেহ
তুমি প্রাণ,
এর পরে যেন কেহ নাহি বলে তুমি আন
আমি আন ।

*

*

*

এই বিশাল রসধারার কত স্রোত, কত শাখা-প্রশাখা । কত ধ্বনি, কত সঙ্গীত উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছে সান গোয়ান, শ্রীরাধা, রুমীর বিরহকাতর বক্ষ থেকে । কিন্তু হায়, এ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতি মানুষকে কাছে এনেও কাছে আনতে পারল না । অর্থের সম্বন্ধে, স্বার্থের অবশেষে আজ পৃথিবীর এক কোণের মানুষ অপর কোণে গিয়ে মাথা কোটে, কিন্তু এ সব সাধক প্রেমিকদের বাণী এক করে দেখবার চেষ্টা কেউ যে করে না ! !

‘আমার ভাণ্ডার আছে ভরে—’

শব্দপ্রাচুর্যের উপর ভাষার শক্তি নির্ভর করে । ইংরেজি এবং বাংলা এই উভয় ভাষা নিয়ে যাদের একটুখানি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়, তাঁরাই জানেন বাঙলার শব্দ-সম্পদ কত সমীচিবদ্ধ । ডাক্তারী কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং টেকনিকেল শব্দের কথা তুলছি নে—সে সব শব্দ তৈরী হতে দেরি—উপস্থিত সে শব্দের কথাই তুলছি যোগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রেই সর্বদা দরকার হয় ।

ইংরেজির উদাহরণই নিন্ । ইংরেজি যে নানা দিক দিয়ে ইয়োরোপীয় সর্ব-ভাষার অগ্রগণ্য তার অন্যতম প্রধান কারণ ইংরেজির শব্দ-সম্পদ । এবং ইংরেজি সে সম্পদ আহরণ করেছে অত্যন্ত ‘নির্লঙ্ঘ্য’র মত পূর্ব-পশ্চিম সর্ব দেশ মহাদেশ থেকে । গ্রীক, লাতিনের মত দুটো জোরালো ভাষা থেকে তার শব্দ নেবার হক তো সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েইছে, তার উপর ফরাসীর উপরও ওয়ারিশান বলে তার ষোল আনা অধিকার । তৎসঙ্গে—সুকুমার রায়ের ভাষায় বলি—

এতো খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা

খাও তবে কচু-পোড়া খাও তবে ঘণ্টা !!

ইংরেজি উত্তরে বেশরমের মত বলে, “ঠিক বলেছে, আমার মনে ওঠে নি, আমি কচু-পোড়া এবং ঘণ্টা খেতেও রাজী !”

তাই দেখুন ইংরেজ, আরবী, ফার্সী, তামিল, হিন্দী, মালয়—কত বলবো ?—দুনিয়ায় তাবৎ ভাষা থেকে কচু-পোড়া ঘণ্টা সব কিছু নিয়েছে, এবং হজমও করে ফেলেছে । ‘এডমিরাল’ নিয়েছে আরবী ‘আমীর-উল-বহর’ থেকে, ‘চেক’

সৈয়দ মুক্ততাবা আলী রচনাবলী (১)—৪

(কিস্তিমাত্রে) নিয়েছে ফার্সী ‘শাহ’ থেকে, ‘চুরট’ নিয়েছে তামিল ‘শদুরট্ট’ থেকে, ‘চৌকি’ নিয়েছে হিন্দী থেকে, ‘এমাক’ নিয়েছে মালয় থেকে।

(কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজের এই বিদঘুটে গরুড়ের ক্ষুধা শব্দ ব্যবহার; আহা!দির ব্যাপারে ইংরেজ নাকিয়া কুলীনের মত উন্মাদিক, কটর স্বপাকে খায়, এদেশে এত কাল কাটানোর পরও ইংরেজ মাস্টার্ড (অর্থাৎ সর্ব্ববাটা বা কাসুন্দি) এবং মাছে মিলিয়ে খেতে শেখে নি, অথচ কে না জানে সর্ব্ববাটার ইলিশ মাছ খাদ্য-জগতে অন্যতম কুতুব-মিনার? ইংরেজ এখনো বিস্বাদ ফ্রাইড ফিশ খায়, মাছ ভাজতে শিখলো না; আমরা তাকে খুশী করার জন্য পান্তুয়ার নাম দিলুম লোর্ডির্কানি (লোডি ক্যানিং) তবু সে তাকে জাতে তুললো না, ছানার কদর বুঝলো না। তাই ইংরেজের রান্না এতই রসকম-বর্জিত, বিস্বাদ এবং একঘেয়ে যে তারই ভয়ে কণ্টিনেন্টাল মাদ্রাই বিলেত যাবার নামে আঁৎকে ওঠে—যদি নিতান্তই লন্ডন যায় তবে খুঁজে খুঁজে সোহো মহল্লায় গিয়ে ফার্সী রেস্টোরাঁয় ঢুকে আপন প্রাণ বাঁচায়। আমার কথা বাদ দিন, আমার পেটে এটম বোম মারলেও আমি ইংরিজি খানা দিয়ে আমার পেট ভরতে রাজী হবো না।)

শব্দের জন্য ইংরেজ দুনিয়ার সর্বত্র ছৌকি ছৌকি করে বেড়ায় সে না হয় বুঝলুম; কিন্তু ইংরেজের মত দম্ভী জাত যে দশমনের কাছ থেকেও শব্দ ধার নেয় সেইটেই বড় তাম্জবকী বাৎ। এই লড়াইয়ের ডামাডোলে সবাই যখন আপন আপন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত তখনো ইংরেজ গোটা কয়েক শব্দ দশমনের কাছ থেকে ধার নিয়ে দাঁত দেখিয়ে হেসেছে। লুফ্ট-ভাফ্ফের মার খেয়ে খেয়ে ইংরেজ যখন মর-মর তখনো সে মনে মনে জপছে, ‘লুফ্ট-ভাফ্ফে, লুফ্ট-ভাফ্ফে, শব্দটা ভুললে চলবে না’, ব্রিৎস-ক্ৰীগের ঠেলায় ইংরেজ যখন ডানকাকের ডুবু-ডুবু তখনো ইণ্টনাম না জপে সে জপেছে, ব্রিৎস-ক্ৰীগ, ব্রিৎস-ক্ৰীগ।’

আর বেতামিজীটা দেখুন। গালাগাল দেবার বেলা যখন আপন শব্দে কুলোয় না—মা লক্ষ্মী জানেন সে ভাণ্ডারেও ইংরেজের ছয়লাব—তখনো সে চক্ষু-লজ্জার ধার ধারে না। এই তো সেদিন শুনলুম কাকে যেন “স্বাধিকার-প্রমত্ত” বলতে গিয়ে কোনো এক ইংরেজ বড় কর্তা শত্রুপক্ষকে শাসিয়েছেন, “আমাদের উপর ফুরার-গিরার ফপরদালালি করো না।”

পাছে এত সব শব্দের গম্ভীরাদন ইংরেজকে জগন্নাথের জগদল পাথরে চেপে মারে তাই তার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছে। ‘জগন্নাথ’ কথাটা ব্যবহার করেই সে বলেছে, “ভেবে চিন্তে শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করবে—পাগলের মত ডোন্ট প্লো ইয়োরসেলভস আণ্ডার দি হুইল অব Juggernaut (জগন্নাথ)।”

ব্যাটারা আমাদের জগন্নাথকে পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা করিয়ে দেশে নিয়ে ছেড়েছে। পারলে তাজমহল আর হিমালয়ও আগেভাগেই নিয়ে বসে থাকত—কেন পারে নি তার কারণ বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

ফরাসী জাতটা ঠিক তার উল্টো। শব্দ গ্রহণ বাবদে সে যে কত মারাত্মক ছদ্মবাইগ্রস্ত তা বোঝা যায় তার অভিধান থেকে। পাতার পর পাতা পড়়ে যান, বিদেশী শব্দের সম্বন্ধ পাবেন না। মনে পড়়ছে, আমার তরুণ বয়সে শান্তিনিকেতনের ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। রোমা রলার পঞ্চাশ না ষাট বছর পূর্ণ হওয়াতে পৃথিবীর বড় বড় রলা-ভক্তেরা তখন তাঁকে একথানা রলা-প্রশান্তি উপহার দেন। এদেশ থেকে গাধী, জগদীশ বসু এঁরা সব লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কি না ঠিক মনে পড়়ছে না। বেনওয়া সায়েবও সে-কেতাবে একথানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—বিষয়বস্তু ‘শান্তিনিকেতনের আশ্রম’। ‘আশ্রম’ শব্দ এসে বেনওয়া সায়েবের ফরাসী নৌকা বানচাল হয়ে গেল। ‘আশ্রম’ শব্দটা ফরাসীতে লিখবেন কি প্রকারে, অথচ ফরাসী ভাষায় ‘আশ্রম’ জাতীর কোনো শব্দ নেই। আমি বললাম, ‘প্যারিস শহর আর ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তে অবস্থিত—অন্ততঃ ভাললোকে—সে কথা সবাই জানে, তবু—ইত্যাদি।’ বেনওয়া সায়েব ফরাসী কায়দায় শোলডার শ্রাণ করে বললেন, ‘উঁহু বদহজম হবে।’ সায়েব শেষটায় কি করে জাতরক্ষা আর পেট ভরানোর শব্দ সমাধান করেছিলেন সে-কথাটা এতদিন বাদে আজ আমার আর মনে নেই।

অর্থাভাববশতঃ একদা আমাকে কিছুদিনের জন্য এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর ফ্রান্সগত ফরাসী চিঠি-পত্রের অনুবাদ করে দিতে হয়েছিল। মনে পড়়ছে, কারবারে ফরাসী পক্ষ হামেশাই ইংরেজ পক্ষকে দোষারোপ করতো যে ইংরেজ অনেক সময় আপন অভিপ্সি সাফ সাফ বলে না। ইংরেজি ভাষায় শব্দসম্পদ প্রচুর বলে ইচ্ছে করলেই আপন বস্তুবা ঘোলাটে, আবছা আবছা করে লেখা যায়। ফরাসীতে সেটি হবার জো নেই। যা বলার সেটা পরিষ্কার হয়ে বেরবেই বেরবে (লক্ষ্য করে থাকবেন কাচ্চা-বাচ্চার শব্দ-সম্পদ সমীক্ষা বলে তাদের কথায় সব জিনিসই হয় কালো নয় ধলা, সব কিছুই পরিষ্কার, কোনো প্রকারের হাফটোন নেই)। তাই ফরাসী এই চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারে পড়়লো বিপদে।

কিন্তু ফরাসীরাও গম যব দিয়ে লেখাপড়া শেখে না। তাই শেষটায় ফরাসী কারবারি হুমকি দিল, সে ইংরেজ রেখে চিঠি-পত্র ইংরিজিতে লেখাবে। ইংরেজ হস্তদন্ত হয়ে চিঠি লিখল, ‘সে কি কথা, আপনাদের বহুং তর্কালফ হবে, বস্তু বেশী বাজে খরচা হবে, এমন কস্ম করতে নেই।’

তখন একটা সমঝাওতা হল।

*

*

*

Gepaeckaufbewahrungstelle !

শব্দটা শুনে মুছঁ যাই আর কি !

প্রথমবার বার্লিন যাচ্ছি, জার্মান ভাষার জানি শূন্য ব্যাকরণ, আর ক’তস্থ আছে হাইনারিশ হাইনের গদ্যটিকয়েক মোলায়েম প্রেমের কবিতা। সে-রেক্ষ দিয়ে তো বার্লিন শহরে বেসাতি করা যায় না। তাই একজন ফরাসী সহযাত্রীকে টেনে

বার্লিন পৌঁছবার কিছু আগে জিন্তেস করলুম, 'ক্লোক-রুম' বা 'লেফট-লাগেজ-অফিসের' জার্মান প্রতিশব্দ কি? বললেন—

Gepaeckaufbewahrungsstelle !

প্রথম থাকারই এরকম আড়াইগজী শব্দ মুখস্থ করতে পারবো, সে দুরাশা আমি করি নি। মসিয়োও আঁচতে পারলেন বেদনাটা—একখানা কাগজে টুকে দিলেন শব্দটা। তাই দেখালুম বার্লিন স্টেশনের এক পোর্টারকে। মাল সেখানে রেখে একটা হোটেল খুঁজে নিলুম। ভাগ্যিস 'হোটেল' কথাটা আন্তর্জাতিক—না হলে ক্লোক-রুমের তুলনায় হোটেলের সাইজ যখন পঞ্চাশগুণ বড় তখন শব্দটা পঞ্চাশগুণ লম্বা হত বই কি।

জার্মান ভাষার এই হল বৈশিষ্ট্য। জার্মান ইংরিজির মত দিল-দারিয়া হয়ে যত্নর শব্দ কুড়োতে পারে না, আবার ফরাসীর মত শব্দতাত্ত্বিক বাত-ব্যামোও তার এমন ভয়ংকর মারাত্মক নয় যে উবু হয়ে দু'একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় শব্দ কুড়োতে না পারে। শব্দ সম্পন্ন বাবদে জার্মান ইংরেজী ও ফরাসীর মাঝখানে। তার সম্প্রসারণক্ষমতা বেশ খানিকটা আছে; কিন্তু ইংরিজী রবরের মত তাকে যত খুশী টেনে লম্বা করা যায় না।

জার্মান ভাষার আসল জোর তার সমাস বানাবার কৌশলে আর সেখানে জার্মানের মত উদার ভাষা উপস্থিত পৃথিবীতে কমই আছে।

এই যে উপরের শব্দটা শুনে বিদগ্ধ পাঠক পর্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন সেইটেই নিন। Gepaeck অর্থ যা প্যাক করা যায়, অর্থাৎ লাগেজ, aufbewahrung অর্থ তদারকি করা (ইংরিজী beware কথা থেকে bewahrung); আর stelle কথার অর্থ জায়গা। একুনে হল 'লাগেজ তদারকির জায়গা'। জার্মান সবকটা শব্দকে আলাদা আলাদা রূপে বিলক্ষণ চেনে বলেই সমাসটার দৈর্ঘ্য তাকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করে না।

তুলনা দিয়ে বক্তব্যটা খোলসা করি।

“কিংকর্তব্যবিমূঢ়” কথাটার সামনে আমরা মোটেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই নে। তার কারণ, কর্তব্য আর বিমূঢ় আমরাই হামেশাই ব্যবহার করি আর কিং কথাটার সঙ্গে আমাদের ঈষৎ মুখ চেনাচেনি আছে। কাজেই সমাসটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের বড় বেশী 'প্রত্যাপন্নমতিত্বের' প্রয়োজন হয় না। যারা সামান্যতম বাঙলা জানে না তাদের কথা হচ্ছে না, তারা 'নিত্যসা ফতেনা দিয়ামা' করে এবং ঘৃত-তৈল-লবণ-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইশ্বনের সামনে ঘরপোড়া গোরুর মত সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়।

বড় বেশী লম্বা সমাস অবিশ্যি কাজের সুবিধে করে দেয় না। তাই যারা সমাস বানাবার জন্যই সমাস বানায় তাদের কচকচানি নিয়ে আমরা ঠাট্টা-মস্কারা করি। জার্মানরাও করে। রাজনৈতিক বিসমার্ক পর্যন্ত সমাস বানাবার বাই নিয়ে ঠাট্টা করতে কসদুর করেন নি। 'ড্রিগিস্ট' শব্দটা জার্মানে চলে, কিন্তু তার একটা উৎকট জার্মান সমাস স্বয়ং বিসমার্ক বানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

Gesundheitswiederherstellungsmittelzusammen' mischun-

gverhaeltnisskundiger.

টুকরো টুকরো করলে অর্থ হয় ; ‘স্বাস্থ্য,’ ‘পুনরায় দান,’ ‘সর্বভৈষজ্য’, ‘এক-সঙ্গে মেশানোর তত্ত্বজ্ঞান’। একুনে হবে ‘স্বাস্থ্যপুনরায়দানসর্বভৈষজ্যসংমিশ্রণ-শাস্ত্রজ্ঞ’।

(সমাসটায় কোনো ভুল থেকে গেলে বিদগ্ধ পাঠক বিরক্ত হবেন না—আমার সংস্কৃতজ্ঞান ‘নিত্যসা ফতেনা’ জাতীয়)।

সংস্কৃত ভাষা সমাস বানানাতে সুপটু, সে-কথা আমরা সবাই জানি এবং প্রয়োজনমত আমরা সংস্কৃত থেকে সমাস নিই, কিন্তু নতুন সমাস যদি বা আমরা বানাই তবু কেমন যেন আধুনিক বাংলায় চালু হতে চায় না। ‘আলোকচিত্র’, ‘যাদুঘর’, ‘হাওয়া-গাড়ি’ কিছুতেই চললো না।—ইংরিজি কথাগুলোই শেষ পর্যন্ত ঠেলে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসন জাঁকিয়ে বসলো। স্মিভেস্ট্রনাথ নির্মিত automobile কথার ‘স্বতঃচলকট’ সমাসটা চালানোর ভরসা আমরা অবশ্য কোনো কালেই করি নি।

বিশেষ করে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এ প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করছি—এবং এতক্ষণ ধরে তারই পটভূমিকা নির্মাণ করলুম।

ভাষাকে জোরালো করার জন্য যে অকাতরে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করতে হয়, সেকথা অনেকেই মনে নেন, কিন্তু আপন ভাষারই দুটো কিংবা তারও বেশী শব্দ একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে তৃতীয় শব্দ নির্মাণ করে ভাষার শব্দভান্ডার বাড়ানো যায় সে দিকে সচরাচর কারো খেয়াল যায় না।

এই সমাস বাড়ানোর প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা কোনো কোনো ভাষার নেই। ইংরিজী ফরাসী কেঁদে-কুকিয়ে দৈবাৎ দু’একটা সমাস বানাতে পারে—যথা ‘হাই-ব্রাও’ ‘রাঁদেভু’। এ প্রবৃত্তি যে ভাষার নেই, তার ঘাড়ে এটা জোর করে চাপানো যায় না।

বাংলার আছে, কিন্তু মরমর। এখানে শুদ্ধ সংস্কৃত সমাসের কথা হচ্ছে না—সে তো আমরা নিই—আমি খাঁটি বাংলা সমাসের কথা ভাবছি। হুতোমের আমলেও অশিক্ষিত বাঙালী খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ দিয়ে খাস সমাস বানাতে। মেছুর্নি ডাকছে, “ও-‘গামছা-কাঁধে,’ দাঁড়া, এঁ হোথায় ‘খ্যাংরা-গৌপো’ তোর সঙ্গে কথা কইতে চায়।”

একেই বলে সমাস ! চট করে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু আজকালকার লেখকেরা এরকম সমাসের দিকে নজর দেন না, নতুন সমাস গড়বার তকলিফ বরদাষ্ট করতে তো তাঁরা বিলকুল নারাজ বটেনই। সমাস বানাবার প্রবৃত্তিটা অনাদরে ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কারণ লক্ষ-প্রতিষ্ঠ লেখকেরা যদি দিশী সমাসকে আপন লেখনে স্থান না দেন, তবে ক্রমে ক্রমে গোটা প্রবৃত্তিটা বেমালাম লোপ পায়—যে-রকম বাউল-ভাটিয়ালাই সাহিত্যিকদের কাছে সম্মান পাচ্ছে না বলে ক্রমেই উপে যাচ্ছে—পরে যখন হুঁশ হয় ততদিনে ভাষায় লড়াইয়ের একখানা উমদা-সে উমদা হাতিয়ার অবহেলায় মর্চে ধরে শেষ হয়ে গেছে। তখন শুদ্ধ মাথা-চাপড়ানো আর কান্নাকাটি।

রবীন্দ্রনাথ এ তম্বটা শেষ বয়সে বিলক্ষণ বদ্বতে পেরেছিলেন এবং সেই শেষ
রাতেই ওজাদের মার দেখিয়ে গিয়েছেন :—

‘ডাকছে থাকি থাকি
ঘুমহারা কোন্ ‘নাম-না-জানা’ পাখী,
দক্ষিণের ‘দোলা-লাগা’, ‘পাখী-জাগা’
বসন্ত প্রভাতে’

তাই বলি বাঙ্গলা ভাষা ‘লক্ষ্মীছাড়া,’ ‘হতভাগা’ নয় ! শুধু হাতীর মত
আমরা নিজেদের তাগদ জানি নে

মার্জারনিধন কাব্য

বা

গুরবে কুশ, তন শব-ই আওওয়ল

কোন্ দেবে পূজা করি কোন্ শীর্ষ ধরি ?
গগপতি, মৌলা-আলী, খুজ্জিট, শ্রীহরি ?
মুশকিল-আসান্ আর মুশির্দ মস্তান্
কোম্পানী কি মহারানী, ইংরেজ, শয়তান ?
হিন্দুস্থান, পার্শ্বজান, য়েবা আছ যথা
ইম্পাহানী, ডালমিঞা—কলির দেবতা ।
সবারে স্মরণ করি সিতুমিঞা ভনে
বেদরদ বেধড়ক ভন্ন নাহি মনে ॥

ইরান দেশের কেছা শোন সাধুজন
বেহদ্ রঙীন কেছা, বহুৎ বরণ ।
এস্তার তালিম পাবে করিলে খেন্নাল
রোশনী আসিবে দিলে ভাঙিয়া দেয়াল ।
পুরানা যদিও কেছা ভব্ হব্ কৎ
সমঝাইয়া দিবে নয়া হাল হকীকৎ ॥

ইরান দেশেতে ছিল যমজ তরুণী ।
ইয়া রঙ, ইয়া ঢঙ, নানা গুণে গুণী ।
কোথায় লায়লী লাগে কোথায় শিরীন
চোখেতে বিজলী খেলে ঠোটে বাজে বীণ ।
ওড়না দুলানে যবে দুই বোন যায়
কলিজা আছাড় খায় জোরা রাঙা পায় ।
এয়াসা পীরিতি তোলে ফকিরেরও জানে
বেহুশ হইয়া লোক তারীফ বাখানে ।

দৌলতও আছিল বটে বিস্তরে বিস্তর
 বাপ দাদা রাখি গেলা চাকর-নফর ।
 ধন জন ঘর বাড়ী তালাব খামার
 টাকা কাড়ি জওয়াহর এস্তারে এস্তার ।
 তাই দুই নারী চান থাকিতে আজাদ
 কলঙ্কের ভয়ে শূদ্ধ বিয়ে হৈল সাধ ।
 তখন সে করিল শর্ত সে বড় অশুভ
 সে শর্ত শূন্যে ডর পায় যমদূত ।
 বলে কিনা প্রতি ভোরে মিঞার গর্দনে
 পণ্ডাশ পয়জার মারি রাখিবে শাসনে ।
 এ বড় তাজ্জব বাৎ বেতালা বদখদ্
 এ শর্ত মানিবে নেবা হয় যদি মর্দ্ ?
 দুল্হা বরেতে ছিল পাড়া ছয়লাপ
 শর্ত শূনে পটপাঠ হয়ে গেল সাফ ।
 সিতু মিঞা বলে সাধু এ বড় কৌতুক
 মন দিয়া কেছা শোনো পাবে দিলে সুখ ॥

শীত গেল বর্ষা গেল আমিল বাহার
 ফুলে গুলে ইস্ফাহান হৈল গুলজার ।
 শীরাজ তব্রীজ আর আজর বৈজান
 খুশীতে ভরপূর ভেল জমিন আসমান ।
 শূদ্ধ দুই ভাই নাম ফিরোজ মতীন
 পেটের খান্দায় মরে দুঃখে কাটে দিন ।
 অবশেষে ছোট ভাই বলে ফিরোজেরে
 “কি করে বাঁচিবে বলো, কি হবে আখেরে ।
 তার চেয়ে জুতা ভালো চলো দুই জনে
 শাদী করি পেট ভরি দু মেয়ের সনে ।”
 দুআভুআ ফিরোজের মন মাঝে হয়
 শাদীতে আয়েশ বটে জুতারও ভো ভয় ।
 হদীসের লাগি ঘাটে কুরান পুরান
 দীন সিতু মিঞা ভগে শূনে পুণ্যবান ॥

মজলিস জৌলুস করি দুনিয়া রঞ্জন
 জোড়া শাদী হয়ে গেল খুশ তিভুবন ।
 চলি গেলা দুই ভাই ভিন্ন হাবেলিতে
 মশন হইলা মস্ত হইলা রসের কোলিতে ।

তার পর কার ঘাড়ে দুইডা মাথা
করিবে যে তেড়িমেড়ি ?”
সিতু মিঞা কয় নিশ্চয় নিশ্চয়
বাঘিনী পরিল বোড়ি ।

“ক্যাবাৎ”, “ক্যাবাৎ” বলি হাওয়া করি ভর
চলিলা ফিরোজ মিঞা পেঁচি গেলা ঘর ।
মিলেছে দাওয়াই আর আদেশা তো নাই
খুদার কুদ্রতে ছিল তালেবর ভাই ।
তার পর শোনো কেছা শোনো সাধুজন
ঠাস্যা দিল সেই দাওয়া পুলাকিত মন ।
সে রাতে খানার ওস্তে খুলা তলোয়ার
কাট্যা না ফালাইল মিঞা কল্লা বিল্লিডার ।
চক্ষু দুইডা রাঙ্গা কর্যা হুঙ্কারিয়া কয়
“তবিয়ে আমার বুরা গবড় না সয় ।
হুশিয়ার হয়ে থেকো নয় সর্বনাশ ।”
সিতু মিঞা শুনে কয়, শাবাশ শাবাশ ॥
হায়রে বিধির লেখা, হায়রে কিস্মৎ
জহর হইয়া গেল যা ছিল শর্বৎ ।
ভোর না হইতে বীবী লয়ে পয়জার
মিঞার বুকতে চাঁড়ি কানে ধরি তার ।
দমাদম মারে জুতো দাড়ি ছিঁড়ে কয়
“তবিয়ে তোমার বুরা, বরদাশ না হয় ?
মেজাজ চড়েছে তব হয়েছ বজাজ ?
শাবুদ করিব তোমা শুনে লও বাৎ
আজ হৈতে বেড়ে গেল রেশন তোমার
পঞ্চাশ হৈতে হৈল একশ’ পয়জার ।”
এত বলি মারে কিল মারে কানে টান
ইয়াল্লা ফুকারে সিঁতু, ভাগ্যে পুণ্যবান ॥
কোথায় পাগড়ী গেল কোথায় পাজামা
হোচট খাইয়া পড়ে কভু দেয় হামা ।
খুন ঝরে সর্ব অঙ্গে ছিঁড়ে গেছে দাড়ি
ফিরোজ পেঁচিছিল শেষে মতীনের বাড়ি ।
কাঁদিয়া কহিল, “ভাইয়া কি দিলি দাওয়াই
লাগাইনু কামে এবে জান যায় তাই ।”
বর্ণিল তাবৎ বাৎ, মতীন শূনিল
আদর করিয়া ভায়ে কোলে তুলি নিল ।

বুলাইয়া হাত মাথে বুলাইয়া দেহ
 “বিড়াল মেরেছে” কয়, “নাই তো সন্দেহ ।
 ব্যাকরণে তবু, দাদা, কৈলা ভুল খাঁটি ।
 বিলকুল বরবাদ সব গুড়ু হৈল মাটি ।
 আসলে এলেমে তুমি করোনি খেলা
 শাদীর পয়লা রাতে বধিবে বিড়াল ।”
 বাণীয়ে বন্দিয়া বন্দিয়া বাঞ্ছিলো বয়ান
 দীন সিতু মিঞা ভণে শূনে পুণ্যবান ॥

* * *

মল্লিনাথস্য { স্বরাজ লাভের সাথে কালোবাজারীয়ে
 মারনি এখন তাই হাত হানো শিরে ।
 শাদীর পয়লা রাতে মারিবে বিড়াল
 না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পয়মাল ॥*

বেদে

ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর মিশরে চাকরি করার পর ইংরেজ রাসুল, পাশা (পাশা খেতাবটি তিনি মিশরীয় সরকারের কাছ থেকে পান) একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছেন । সা’দ জগলুল পাশা থেকে আরম্ভ করে বহু বাঘ বহু চিড়িয়ার সঙ্গে তাঁর বিস্তর যোগাযোগের ফলে এই কেতাবখানি লেখা হয়েছে ।

এমন কি বেদেরাও এ বইয়ে বাদ পড়ে নি । রাসুল পাশার মতে মিশরের বেদেরা আসলে ভারতীয় । শূধু তাই নয়, রাসুল পাশা পৃথিবীর আর সব পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন পৃথিবীর সব বেদেরই ভাষা নাকি আসলে ভারতীয়—তা সে ইয়োরোপীয় বেদেই হোক আর চীনে বেদেই হোক ।

পণ্ডিত নই, তাই চট্ করে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না । ইয়োরোপীয় বেদেরা ফর্সায় প্রায় ইংরেজের শামিল, সিংহলের বেদে ঘনশ্যাম । আচার-ব্যবহারেও বিস্তর পার্থক্য, বহু ফারাক । আরবিস্থানের বেদেরা কথায় কথায় ছোরা বের করে, জর্মণীর বেদেরা ঘুঁষি ওঁচায় বটে, কিন্তু শেষটায় বখেড়ার ফৈসালা হয় বিয়ালের বোতল টেনে । চীন দেশের বেদেরা নাকি রুপালি স্বর্ণগাতলায় সোনালী চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চুকুস চুকুস করে সবুজ চা চাখে ।

তবু আজ স্বীকার করি গুণীরাই হক্ কথা বলেছেন ॥

*

*

*

* ইরানে এ কাহিনী সঠিক্তরে বলা হয় না । শূধু বলা হয়, ‘গুরবে কুশডন, শব-ই-আওগুয়ল’ অর্থাৎ গুরবে=বিড়াল, কুশডন=মারা, শব=রাগি, আওগুয়ল=প্রথম । সোজা বাংলায় ‘পয়লা রাতেই মারবে বিড়াল ।’

আমার বয়স তখন পঁচিশ-ছাশ্বিশ। আজ যেখানে জার্মানীর রাজধানী, সেই নাদা-মাটা বন্স (Bonn) শহরে আমি তখন কলেজ যাই। এগারোটার ঝোঁকে কলেজের পাশের কাফেতে বসে এক পাত্র কফি খাই। ও সময়টায় বনের মত আধা-ঘুমন্ত পুরুরী কাফেতে খন্দেরের ঝামেলা লাগে না। খন্দের বলতে নিতান্ত আমারই মত দু'একটি কফি-কাতর প্রাণী।

সেদিনও তাই। আমি এক কোণে কফি সাস্ক করে উঠি-উঠি করছি, এমন সময় অন্য কোণের কাউন্টারে, আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল এসে এক বেদেনী। গোলাপী স্কার্ট, বেগুনি ব্লাউজ, লাল-নীলে ডোরা-কাটা স্কার্ফ, মিশকালো খোঁপাবাধা চুল। কেক্ আর কফির গুঁড়ো কিনতে এসেছে।

সুন্দা শেষ হয়ে গেলে পর যখন সে ঘুরে দাঁড়াল তখন হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার উপর। প্রথমটায় থ হয়ে তাকিয়ে রইল প্যাট প্যাট করে। তারপর কি এক বিজ্ঞাতীয় ভাষায় চীৎকার করে সোম্ব্লাসে এগিয়ে এল আমার দিকে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় সর্বমুখ টমাটোর মত লাল করে অনর্গল বকে যেতে লাগল সেই 'যাবনিক' ভাষায়। সে ভাষা আমার চেনা-অচেনা কোনো ভাষারই চোঁহিন্দি মাড়ায় না, কিন্তু শোনালো—তারই মূখের মত—মিষ্টি।

আমি জার্মানে বললুম, 'আমি তো আপনার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

মেয়েটি মুখ করল আরও লাল। বুঝলুম, চটেছে। ফের চলল সেই তুবড়ী বাজী—সেই বিজ্ঞাতীয় বুলিতে। কিছুতেই জার্মান বলতে রাজী হয় না।

আমি কাতর হয়ে কাফের মালিককে বললুম, 'একে বুঝিয়ে বলুন না, আমি ভারতীয়। এর ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

আমার সক্রমণ নিবেদনটা শেষ হওয়ার পূর্বেই মেয়েটা হুৎকার দিয়ে কাফে-ওয়ালাকে পরিষ্কার জার্মানে বলল, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। আমরা বেদে, ভারতবর্ষ আমাদের আদিম ভূমি। এও ভারতীয়। আমার জাত-ভাই। ভ্রমলোক সেজেছে, তাই আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না।'

আমি আর কি বলব? পিণ্ডিতেরাও তো এই মতই পোষণ করে। তবু বললুম, 'কিন্তু সত্যি বলছি, আমি আপনার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

চোখে-মুখে—এমন কি আমার মনে হল চুলে পৰ্বন্ত—ঘেন্না মেখে মেয়েটা গটগট করে কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বোকা বনে তাকিয়ে রইলুম।

কয়েক মিনিট পরে জানলার দিকে নজর যেতে দেখি সেই মেয়েটি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কফির দাম পূর্বেই চুকিয়ে দিয়েছিলুম—চুপ করে বেরিয়ে পড়ে তার মূখোমুখি হলুম।

ধবধবে দাঁতে হাসির ঝিলিক লাগিলে আমার অভ্যর্থনা করে নিয়ে বললো—দুস্তোর ছাই আমার সেই বিজ্ঞাতীয় ভাষায়—কি বললো, খোদায় মালুম। গড় গড় করে চোখে-মুখে হাসি মেখে, স্দুভোল দু'খানি বাহু দু'লিগে, সর্বাক্ষে সৌন্দর্যের ঢেউ তুলে।

আমি আবার জর্মনে বললুম, ‘সত্যি ফুলাইন (কুমারী), আমি তোমার ভাষা বুঝতে পারছি নে।’

কেউটে সাপের মতো ফণা তুলে যেন আমাকে ছোবল মারতে এল। আমি তড়াক করে তিন কদম পিছিয়ে গেলুম।

হঠাৎ মেয়েটা কি যেন ভেবে নিলে আবার হাসি মুখে বলল,—যাক্ বাঁচাল, এবার জর্মনে—‘সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু পাগলামি থাকে, তোমার বুঝি মাতৃভাষায় কথা না বলার? তা আমি সেটা সয়ে নিলুম। কিন্তু কেন এ স্নবরি, আপন ভাষাকে অবহেলা, ক্যফের লোকের সামনে আপন জনকে অস্বীকার করা? তাই তো তোমাকে বাইরে ডেকে আনলুম।’

আমি বললুম, ‘তোমার আপন জন হতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমি তো তা নই।’

ফের ফণা তুলতে গিয়ে নিজেকে চেপে নিলে বলল, ‘তোমার আপন জন নই আমি? দেখো দিকিনি তোমার রঙ আর আমার রঙ মিলিয়ে—একই বাদামী না? হাঁ, আমার একটু সোনালী বটে—তা সে আমি রোদবৃষ্টিতে ঘোরাঘুরি করি বলে। দেখো দিকিনি চুলের রঙ—মিশকালো, টেউখেলানো। নিজের চোখে দেখনি কখনো আয়না দিয়ে?—আমার চোখের রঙ তোমারই মত কালো। আর সব জর্মনদের দিকে তাকিয়ে দেখো, হাবা-গবার দল, শ্বেত কুষ্ঠের মত সাদা, মাগো!’

আমি চুপ।

বলল, ‘বুঝতে পেরেছি, বাপ, বুঝতে পেরেছি; বাপ তোমার দু’পয়সা রেখে গিয়েছে—হঠাৎ-নবাব হয়েছে। এখন আর বেদে বলে পরিচর দিতে চাও না—হাতে আবার খাতাপত্র—কলেজ যাও বুঝি? ভদ্রলোক সাজার শখ চেপেছে, না?’

আমি বললুম, ‘ফুলাইন, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার সাতপুরুষ লেখাপড়া করেছে, আমিও তাই করছি। ভদ্রলোক সাজা-না-সাজার কোনো কথাই উঠছে না।’

মেয়েটি এমনভাবে তাকালো যার সোজা অর্থ ‘গাঁজা গুল’। জিজ্ঞেস করল, তুমি ভারতীয় নও?’

আমি বললুম, ‘আলবাৎ!’

আনন্দের হাসি হেসে বলল, ‘ভারতীয়েরা সব বেদে।’

আমি বললুম, ‘সুন্দরী, তোমরা ভারতবর্ষ ছেড়েছ হাজার দু’হাজার বছর কিংবা তারও পূর্বে। বাদবাকী ভারতীয়রা এখনো গেরস্থালী করে।’

কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বলল, ‘তোমার সঙ্গে আর কাঁহাতক খামকা তর্ক করি। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে। আমাদের সার্কাসের গাড়ি শহরের বাইরে রেখে এসেছি। বাবা, মা সেখানে। তোমাকে পেলে ভারি খুশী হবেন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করো। তখন বুঝবে ঠালা কারে কয়। বাবা সব জানে। কাচের গোলার দিকে তাকিয়ে তোমাকে সব বাথলে দেবে।’

অনেকক্ষণ ধরে এ রকম ধারা কথা হয়েছিল। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, আমি বেদে নই, স্নব নই, সাদা-স্বাটা ভারতীয়।

*

*

*

এ-কথাটা কিন্তু সেদিন সার্ব বন্ধু গেলুম, দু'হাজার কিংবা তার বেশি বছর ধরে যাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তারা যদি বিদেশ-বিভূইয়ে দেখামাত্র আমাকে ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি আমাদের আপন জন', তখন কি করে বুক ঠুকে বলি—যদিও জানি, আজ আমাদের ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা—যে ওরা ভারতীয় নয় ??

ভাষাতত্ত্ব

প্যারিসে রেস্টুরায় বসে আছি। নিতান্ত একা; যাদের আসবার কথা ছিল তাঁরা আসেন নি। এমন সময় একটি অতি সুন্দরুণ এসে আমারই টেবিলের একথানা শূন্য চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন—অবশ্য প্রথমে ফরাসী কায়দায় বাও করে, আমার অনুমতি নিয়ে।

নিতান্ত মুখোমুখি তদুপরি কান্টিকের মত চেহারাখানা—বার বার আমার মূগ্ধ চোখ তাঁর চেহারার দিকে ধাওয়া করছিল। তিনিও নিশ্চয়ই এ রকম পরিস্থিতিতে জীবনে আরো বহুবার পড়েছেন; কি করতে হয় সেটা তাঁর রপ্ত আছে।

সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলছেন, 'ইচ্ছে করুন।'

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসীটা বলতে পারেন তো? আমি তো আর কোনো ভাষা জানি নে।'

আমি বললুম, 'ফরাসী ভাষাটা সব সময় ঠিক বন্ধুতে পারি কি না বলা একটু কঠিন। এই মনে করুন, কোনো সুন্দরী যখন প্রেমের আভাস দিয়ে কিছু বলেন, তখন ঠিক বন্ধুতে পারি আবার যখন ল্যান্ডলোডি ভাড়ার জন্যে তাগাদা দেন তখন ইঠাৎ আমার তাবৎ ফরাসী ভাষাজ্ঞান বিলকুল লোপ পায়।'

উচ্চাঙ্গের রসবিকাশ হল না সে কথা আমার সুরাসিক পাঠকেরা বন্ধুতে পেরে নিশ্চয়ই একটুখানি স্মিতহাস্য করবেন। আমিও এ-কথা জানি, কিন্তু বিদেশে যখন মানুষ নিতান্ত একা পড়ে এবং রাম, শ্যাম যে-কোনো কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতে চায় তখন ঐ হল একমাত্র পন্থা, অর্থাৎ তখন কাঁচা, পাকা যে-কোনো প্রকারের রসিকতা করে বোঝাতে হয় যে, আমি তখন সঙ্গসুখলিপ্সু।

ফরাসী ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'দেশজ্ঞান বড় ভাল জিনিস। বিদেশে ভাষা নিয়ে এ ভানটা অনায়াসে করা যায়। আমি করি কি প্রকারে? আমি যে ফরাসী সে তো আর বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারি নে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে না হয় হল। কিন্তু বলুন তো, শব্দাথ

আপনি ঠিক ঠিক ব্যবহৃত শিখেছেন? এই যদি আমি বলি যে, আমি “জার্নালিস্ট” তাহলে তার মানে কি হল?

একগাল হেসে বললুম, ‘তা আর জানি নে? তার মানে হল আপনি খবরের কাগজে লেখেন।’

‘উঁহু, হল না। ঠিক তার উল্টো; আমি লিখি নে। সে কথা যাক। আরেকটি উদাহরণ দি। আমি যদি বলি, “আচ্ছা তা হলে আরেকদিন দেখা হবে”, তবে তার মানে কি?’

আমি এবারে আরেক গাল আর হাসলুম না; বললুম, ‘তার মানে আরেক দিন দেখা হবে, এতে আর অস্পষ্টতাটা কোথায়?’

বললেন, ‘ফেল!’ তার মানে হল, “আপনি এবারে দয়া করে গ্যাংপাটন করুন।”

আমি খুশী হয়ে বললুম, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরাও যখন বাঙলায় বলি, “এবার তুমি এসো” তখন তার অর্থ “তুমি এবারে কেটে পড়ো।”

‘ঠিক ধরেছেন। তাই বলছিলাম, আমি জার্নালিস্ট; কিন্তু না-লেখার জন্য লোকে পরসাদ দেয়। খুলে কই।

‘এই ধরুন কয়েক মাস আগে খবর পেলুম, আমাদের ডাকসাইটে রাজনৈতিক মিস্যো অনুস্বার একটি রমণীর সঙ্গে ঢলার্চল করছেন। ওদিকে বাজারে তাঁর সুনাম আর খ্যাতি অতিশয় ধর্মভীরুরূপে—কোথায় জানি নে গির্জা মেরামত করে দিয়েছেন, কোন স্টেটের জন্মদিনে জাম্বাজাম্বা পরে পরবে পয়লা নম্বরী বনোছিলেন এইরকম ধারা কত কি? আমি খবরটা শুনে বললুম, “বটেই স্যাঙাৎ, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি।”

‘করলুম কি, লাগলুম তঞ্চ-তাবাশে। ডাক্তাররা নাকি এক্স-রে দিয়ে পেটের মধ্যখানের ছবি তোলেন? স্নেফ গাঁজা; তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী নাড়ী-ভূঁড়ির খবর মেলে কয়েক আউন্স রূপো ঢেলে, সোনা ঢাললে তার চেয়েও ভালো।

‘সেই নর্তকীর নামধাম সাকিন ঠিকানা হাড়হুন্দের তাবৎ খবর পেয়ে গেলুম এক হস্তার ভিতর।’

সিগারেট ধরাবার জন্য কথা বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, ‘কিন্তু এ কর্মে একটুখানি খাবস্‌দরং হতে হয়। আমি—’ বলে থামলেন।

আমি বললুম, ‘আপনার চেহারা সম্বন্ধে কি আর বলব—’

বাধা দিয়ে বললেন, ‘থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।’

তারপর করলুম কি জানেন, একপ্রস্ত উত্তম সূট পরে, গোর্ফে আতর মেখে লেগে গেলুম নর্তকীর পিছনে। প্রেমের কবিতাগুলো ঝালিয়ে নিলুম আচ্ছা করে, টাসো ওয়ালটস নাচের নবীনতম “অবদানগুলো” রপ্ত করে নিয়ে দিলুম হানা। জানতুম, রাজনৈতিক মিস্যো অনুস্বারের টাকার জোয়ারের উপর আমি থ্যাডো কেলাস খোলামকুঁচি, কোথায় ভেসে যাব কেউ পান্ডাটি পাবে না, কিন্তু খোলামকুঁচি না হয়ে যদি পক্ষফুল হই—চেহারাটা বিবেচনা করুন—তা

হলে নর্তকী কি কি একটুখানি মোলায়েম হবেন না ?

আমি অবিশ্য নর্তকীকে প্রিয়রূপে চিরকালের জন্য জিতে নিতে চাই নি। মিসরো অনুস্বার তাকে নিয়ে প্রেমসে প্রেমের ট্যাংকাল করুন আমার তাতে নসি। আমি শূদ্ধ চাই একটুখানি খবর।

কিছুটা ভাবসাব হলে যাবার পর আমি আভাসে ইঙ্গিতে বন্ধুকে দিলুম যে, তিনি যদি অন্য সূত্র থেকে অর্থাৎ অনুস্বারের কাছ থেকে টাকা মারেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তিনি দু'ঘোড়া না চড়ে আড়ই শট্টা চড়ুন আমি আপনাদের দেশের ফকিরের মত নিবিকার। আমি একটুখানি প্রেমেরই খুশী।

‘কাজেই আশ্চে আশ্চে প্রেমের নেশায় বানচাল হয়ে নর্তকী খবর দিয়ে ফেললেন, কোন্ হোটেলে কবে তাঁরা গোপনে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করেছেন, কোন্ ইয়েটে কবে ক’দিন ক’রাস্তির ফটিয়েছেন। সেই খেই ধরে তাবৎ গোপনীয় খবর যোগাড় করে গেলুম, অনুস্বারের কাছে। তাঁকে বললুম, “নিছক সাহিত্যের খাতিরে আমি তাঁর জীবনী লিখতে চাই, তাতে অবশ্য নর্তকী সম্পর্কীয় কিঞ্চিৎ প্রামাণিক সংবাদও থাকবে। তবে কিনা, কিছু অর্থ পেলে আমি এসব ছাপবো না।”

অনুস্বারে জড়ির এবং ঘড়েল লোক। যেসব হোটেলে জাল সই করেছেন তার ফোটোগ্রাফ দেখে বন্ধুলেন আমিও কাঁচা নই।’

তাপপর বললেন, ‘লিখি নি বলেই তো টাকা পেলুম, হাজার দশেক। যাক্গে, এখন আমি চললুম।’

ব্যাপারটা বন্ধুতে আমার মিনিট খানেক লাগল। তখন ছুটে গিয়ে তাঁকে বললুম, ‘এটা কি তবে ব্ল্যাক-মেলিং হল না?’

হেসে বললেন, ‘অর্থাৎ “না-লিখিয়ে জানালিস্ট”। তাই তো বলছিলাম, ভাষা জিনিসটে অদ্ভুত।’

আমি স্বয়ং জানালিস্ট—আঁকে উঠলুম ॥

গিনিয়ের এপ্রেন্টিস্

কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থ যত পড়ুনো হয় তাদের কদর ততই বেড়ে যায়। নতুন যুগের লোক সে সব গ্রন্থ থেকে নতুন সমস্যার অতি প্রাচীন এবং চিরন্তন সমাধান পায় বলে তারা সব কেতাবকে অনায়াসে হার মানায়। শূদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নয়, কোনো কোনো গল্পও অজরামর হয়ে থাকে ঐ একই কারণে। তারই একটা অতি মমান্তিকভাবে কাল মনে পড়ে গেল—কুর্ডিটি টাকা জেবে নিয়ে বাজার ঘুরে এলুম, খুঁটি পেলুম না। গল্পটি হয়ত অনেকেই জানেন—তাঁরা অপরাধ নেবেন না।

গণেশ বেচারী এপ্রেন্টিস্ মাইনে পায় না। কাজ শিখছে, এর খাঁতানি ওর গদাঁতানি চাঁদপানা মদুখ করে সয়। আশা, একদিন পাকাপাকি চাকরি, মাইনে সব

কিছুই পাবে। চাকরি খালি পড়লও, কিন্তু বড়বাবু সেটা দিয়ে দিলেন তাঁর শালীর ছেলেকে—সে কখনো এপ্রেন্টিস করে নি। বড়বাবু গণেশকে ডেকে বললেন, ‘বাবা গণেশ, কিছু মনে করো না ; এ চাকরিটা নিতান্তই অন্য একজনকে দিয়ে দিতে হল। আসছেটা তোমাকে দেব নিশ্চয়ই।’

কাকস্য পরিবেদনা, আবার চাকরি খালি পড়ল, বড়বাবু ফের ফকিরকারি মারলেন, গণেশকে ডেকে আবার মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজালেন। এমনি করে দেদার চাকরি গণেশের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, তার এপ্রেন্টিসর আকির্ষ দিয়ে একটাকেও ধরতে পারল না। শেষের দিকে বড়বাবু আর গণেশকে ডেকে বাপদুরে, বাছারে বলে সান্ত্বনা মালিশ করার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

গণেশের চোখ বসে গেছে, গাল ভেঙে গেছে, রগের চুলের দড়ি এক গাছায় পাক ধরলো, পরনের ধূতি ছিঁড়ে গিয়েছে, জামাটা কোনো গাতিকে গায়ে ঝুলে আছে। গণেশ এ-টুলে ও-টুলে, এর কাজ, ওর ফাইফরমাশ করে দেয়—আর করে করে আপিসের বেবাক কাজ তার শেখা হয়ে গেল। চাকুরি কিন্তু হল না।

এমন সময় বড় সাহেব একদিন বড়বাবুকে দোতলায় ডেকে বললেন, ‘আমায় একটা জরুরী রিপোর্ট লিখে আজকেরই মেল ধরতে হবে। কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে। দরজার গোড়ায় একজন পাকা লোক বসিয়ে দাও, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়।’

দরোয়ানরা সেদিন করেছিল ধর্মঘট। বড়বাবু গণেশকে দিলেন দোরের সামনে বসিয়ে। বললেন, ‘কিছু মনে করো না বাবা গণেশ, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ’, ইত্যাদি। গণেশ টুলে বসে ছেঁড়া ধূতিতে গিঁট দিতে লাগল।

এমন সময় নিচের রাস্তায় হৈহৈ রৈরৈ। এক বন্ধ পাগল রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, পরনে কম্পিনটুকু পর্যন্ত নেই—ইংরেজিতে যাকে বলে ‘বার্থ-ডেস্টার্ট’—আর পিছনে রাস্তার ছোঁড়ারা তাকে লেলিয়ে লেলিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হাবি তো হ, পাগলা করল গণেশের আপিসের দিকেই ধাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে উপরের তলায় উঠে ঢুকতে গেল বড় সাহেবের ঘরে। গণেশ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পাগলকে বাধা দিল না।

মারমার কাটকাট কাণ্ড। পাগলের পিছনে পিছনে ছোঁড়াগুলোও গিয়ে ঢুকেছে বড়সাহেবের ঘরে। চীৎকার চেঁচামেচি। পাগলা আবার সাহেবকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ফেলে রিভলভিং-টিল্টিঙ চোয়ারে বসতে চায়।

তাই দেখে কেউ বাদ্য ডাকে
কেউ বা ডাকে পুঁলিশ,
কেউ বা বলে কামড়ে দেবে
সাবধানেতে তুলিস !

শেষটায় পুরো লালবাজার এসে ঘর সাফ করল।

সন্ধ্যাবেলাে কাঁই। বড়বাবুকে ধরে তো এই-মার কি তেই-মার লাগান আর কি। বললেন ‘তুমি একটা ইন্ডিয়েট, আর দোরে বসিয়েছিলে তোমার মত একটা ইম্বেসাইলকে। কোথায় সে, ডাকো তাকে।’

গণেশ এসে সামনে দাঁড়াল।

সারোব মারমুখো হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ প্রাইজ-ইন্ডিয়েট, পাগলকে তুমি ঠেকালে না কেন?'

গণেশ বড় বিনয়ী ছেলে। বললে, 'আমি ভেবেছিলাম, উনি আমাদের আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্টিস্। আমি তো জুনিয়র, ওঁকে ঠােকাবো কি করে?'

সাহেব তো সাত হাত পানিমে'। বললেন, 'হোয়াড্যা মীন বাই দ্যাট?'

গণেশ বললে, 'হুজুর, আমি তিন বৎসর ধরে এ আপিসে এপ্রেন্টিস্ করছি। খেতে পাই নে, পরতে পাই নে। এই দেখুন ধুতি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পটি হয়ে গিয়েছে। লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই। তাই এখন একে দেখলাম, আমাদের আপিসে ঢুকছেন, একদম অবজ্ঞার উলঙ্গ, তখন আম্মাজ করলাম, ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্টিস্। তা না হলে তাঁর এ অবস্থা হবে কেন? এখানে এপ্রেন্টিস্ করে করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়র এপ্রেন্টিস্ হয়েছেন।'

*

*

*

১৯৪৭ সালে স্বরাজ লাভ হয়। আমাদের এপ্রেন্টিস্ তখন শূন্য হয়। তখনো পরনে ধুতি ছিল, গায়ে জামা ছিল। আর আমাদের সিনিয়র এপ্রেন্টিস্ হওয়ার বেশী বাকী নেই। সবই আল্লার কেরামতী।

দাম্পত্য জীবন

যাঁদের বড়তি-পড়তি মালা কুড়িয়ে নিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছি—অর্থাৎ 'পঞ্চতন্ত্র' তৈরি করছি তাঁদের সঙ্গে 'দেশের পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র স্থাপন করার বাসনা এ-অধর্মের প্রায়ই হয়। তাঁদেরই একজন আমার এক চীনা-বন্ধু। সত্যিকার জহুরী লোক—লাওৎসে, কন-ফুৎসিয়ে টে-টম্বুর হয়ে আছেন। তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হলেই শাস্ত্রবচন ওষ্ঠাগ্রে। আমি যে পদে পদে হার মানি সে-কথা আর রঙ-ফুলিয়ে, তুলি-বুলিয়ে বলতে হবে না।

ক্লাবের সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি নিমগাছের ডলায় বসে তিনি আপিস ফাঁকি দিয়ে চা পান করেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এস্তার এলেম হাঁসিল করেছি—তারই একটা আপিস ফাঁকি দেওয়া। কাছে পৌঁছতেই একগাল হেসে নিলেন—অর্থ সুস্পষ্ট—ছোকরা কাবুল হয়ে উঠছে। আর ক'দিন বাদেই আপিস-ঘাওয়া বিলকুল বন্ধ করে পুরো তনখা টানবে।

ইতিমধ্যে এক ইংরেজও এসে উপস্থিত।

রসালাপ আরম্ভ হল। কথায় কথায় বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা। সাহেব বললে, 'লন্ডনে একবার স্বামীদের এক আড়াই মাইল লম্বা প্রসেশন হয়েছিল, স্ত্রীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য। প্রসেশনের মাথায় ছিল এক পাঁচ ফুট লম্বা টিউটিঙে হান্ডি-সার ছোকরা। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই ছ'ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক গুরং দুমদুম করে তার দিকে এগিয়ে

সৈয়দ মঈনুজ্জামান আলী রচনাবলী (১ম)—৫

গিয়ে তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, ‘তুমি এখানে কেন, তুমি তো আমাকে ডরাও না। চলো বাড়ি।’ স্ফুটস্ফুট করে ছোকরা চলে গেল সেই খাণ্ডার বউয়ের পিছনে পিছনে।’

আমার চীনা বন্ধুটি আদত-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন। সায়েব খুশী হয়ে চলে গেল।

গদ্যটিকের শব্দকনো নিমপাতা টেবিলের উপর ঝরে পড়ল। বন্ধু তাই দিয়ে টেবিলরূথের উপর আল্পনা সাজাতে সাজাতে বললেন, ‘কী গল্প! শুনো হাসির চেয়ে কান্না পায় বেশী।’ তারপর চোখবন্ধ করে বললেন,

‘চীনা গুশী আচার্য স্ন তীর প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে লিখেছেন, একদা চীন দেশের পেপিং শহরে অত্যাচার-জর্জরিত-স্বামীরা এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সভার উদ্দেশ্য, কি প্রকারে নিপীড়িত স্বামীকুলকে তাঁদের খাণ্ডার গৃহিণীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?’

‘সভাপতির সম্মানিত আসনে বসানো হল সবচেয়ে জাঁদরেল দাড়িওয়ালা অধ্যাপক মাওলীকে। ঝাড়া ঘাটটি বছর তিনি তাঁর দজ্জাল গিম্বীর হাতে অশেষ অত্যাচার ভুঞ্জেছেন সে কথা সকলেরই জানা ছিল।

‘ওজ্জ্বলী ভাষায় গম্ভীর কণ্ঠে বক্তৃতিমোক্ষ বক্তার পর বক্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন আপন অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগলেন। স্বাধীনতার অত্যাচারে দেশ গেল, ঐতিহ্য গেল, ধর্ম গেল, সব গেল, চীন দেশ হট্টেনটটের মূর্খকে পরিণত হতে চলল, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে! ধন-প্রাণ, সবস্ব দিয়ে এ অত্যাচার ঠেকাতে হবে। এস ভাই, এক জোট হয়ে—

‘এমন সময় বাড়ির দারোয়ান হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, “হজুররা এবার আসুন। আপনারদের গিম্বীরা কি করে এ সভার খবর পেয়ে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদিকে ধাওয়া করে আসছেন।”

‘যেই না শোনা, আর যাবে কোথায়? জানলা দিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে, এমন কি ছাত ফুটো করে, দেয়াল কাণা করে দে ছুটে, দে ছুটে! তিন সেকেন্ডে মিটিঙ সাফ—বিলকুল ঠাণ্ডা!

‘কৈবল্যমাত্র সভাপতি বসে আছেন সেই শাস্ত গম্ভীর মুখ নিয়ে—তিনি—বিশ্বদ্রব্য বিচলিত হন নি। দারোয়ান তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বার বার প্রণাম করে বলল, “হজুর যে সাহস দেখাচ্ছেন তাঁর সামনে চেন্সিস থানও তসলীম ঠুকতেন, কিন্তু এ তো সাহস নয়, এ হচ্ছে আত্মহত্যার শামিল। গৃহিণীদের প্রসেশনের সকলের পয়সা রয়েছেন আপনারই স্ত্রী। এখনো সময় আছে। আমি আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।” সভাপতি তবু চুপ। তখন দারোয়ান তাঁকে তুলে ধরতে গিয়ে দেখে তাঁর সবস্ব ঠাণ্ডা। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।’

আচার্য উত্থাপন। আমি উচ্ছ্বাসিত হয়ে ‘সাধু সাধু,’ ‘শাবাস, শাবাস’ বললাম। করতালি দিতে দিতে নিবেদন করলাম, ‘এ একটা গল্পের মত

গল্প বটে !’

আচার্য উ বললেন, ‘এ বিষয়ে ভারতীয় আশুপাক্য কি ?’

চোখ বন্ধ করে আল্লা রসূলকে স্মরণ করলুম, পীর দরবেশ গুরু ধর্ম কেউই বাদ পড়লেন না। শেষটার মৌলা আলীর দয়া হল !

হাত জোড় করে বরজলালের মত ক্ষীণ কণ্ঠে ইমন কল্যাণ ধরলুম।

শ্রীমশ্বারাজ রাজাধিরাজ দেবেশ্ববিজয় মন্থ কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অশ্বকার কোণে। খবর পেয়ে প্রধান মন্ত্রী এসে শুনালেন, ‘মহারাজের কুশল তো?’ মহারাজ রা কাড়েন না। মন্ত্রী বিজ্ঞর পীড়াপীড়ি করাতে হঠাৎ খ্যাক খ্যাক করে উঠলেন, ‘ঐ রাণীটা—ওঃ কি দম্ভজাল, কি খাণ্ডার! বাপরে বাপ! দেপলেই আমার বন্ধুর রক্ত হিম হয়ে আসে।’

মন্ত্রীর যেন বন্ধু থেকে হিমালয় নেমে গেল। বললেন ‘ওঃ! আমি ভাবি আর কিছ্। তাতে অতো বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ! বউকে তো সব্বাই ডরায়—আম্মো ডরাই। তাই বলে তো আর কেউ এরকমধারা গদম হয়ে বসে থাকে না।’

রাজা বললেন, ‘ঐ তুমি ফের আরেকখানা গুল ছাড়লে।’ মন্ত্রী বললেন, ‘আমি প্রমাণ করতে পারি।’ রাজা বললেন, ‘ধরো বাজি।’ ‘কত মহারাজ!’ দশ লাখ?’ ‘দশ লাখ।’

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি হল—বিষাদদবার বেলা পাঁচটায় শহরের তাবৎ বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েৎ হয়; মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চান।

লোকে লোকারণ্য। মাধ্যখানে মাচাঙ—তার উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, ‘মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।’

যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরু পালের মত, কালবৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ পাতার মত সব্বাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে পিষে, দলে, থেঁৎলে—তিন সেকেন্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে লোক সেই বিরাট মাঠের মাধ্যখানে লিকলিক্ করছে।

রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তিনি তার কল্পনাও করতে পারেন নি। মন্ত্রীকে বললেন, ‘তুমিই বাজি জিতলে। এই নাও দশ লাখ হার।’ মন্ত্রী বললেন, ‘দাঁড়ান, মহারাজ। ঐ যে একটা লোক রয়ে গেছে। মন্ত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বললেন, তুমি যে বড় ঔদিকে দাঁড়িয়ে? বউকে ডরাও না বন্ধু?’

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাদো কাদো হয়ে বললে, ‘অতলত বন্ধুনে,

হুজুর। এখানে আসবার সময় বউ আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, 'যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না।' তাই আমি ওদিকে যাই নি।'

আচার্য উ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভারতবর্ষেই জিৎ। তোমার গল্প যেন বাঁধন নী-বউ। আমার গল্প ভয়ে পালালো।'

তবু আমার মনে সন্দেহ রয়ে গিয়েছে। রসিক পাঠক, তুমি বলতে পারো কোন গল্পটাকে শিরোপা দি ? ?

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলেন, তাই যদি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেখি তাহলে আশা করি' সুশীল পাঠক এবং সহদয়া পাঠিকা অপরোধ নেবেন না।

রবীন্দ্রনাথ উত্তম উপন্যাস লিখেছেন, ছোট গল্পে তিনি মপাসী, চেখফক ছাড়িয়ে গিয়েছেন, নাট্যে তিনি যে-কোন মিস্টিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, কবিরূপে তিনি বিশ্বজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন, শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করেছেন তার গভীরতা পণ্ডিতদের নির্বাক করে দিয়েছে, সত্যপ্রসঙ্গ হিসাবে তাঁর ব্যাখ্যান ভক্তজনের চিত্তজয় করতে সমর্থ হয়েছে, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আরো কত বৎসর ভারতবাসীকে নব নব শিক্ষা নেবে তার ইয়ত্তা নেই আর গুরুরূপে তিনি যে শান্তিনিকেতনে নির্মাণ করে গিয়েছেন তার স্নিগ্ধচ্ছায়ার বিশ্বজন একদিন সুখময় নীড় লাভ করবে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এসব উত্তীর্ণ হয়ে অজরামর হয়ে রইবেন তাঁর গানের জন্য।

সূরের দিক দিয়ে বিচার করবে না। সুহৃদ শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে' এমন কোন জিনিস বাদ দেন নি যে সম্বন্ধে আপনি আমি আর পাঁচজনকে কিছু বলে দিতে পারি। আমি বিচার করছি, কিংবা বলুন মুগ্ধ হয়ে ভাবি যে, কতগুলো অপূর্ণ গুণের সমন্বয় হলে পর এ রকম গান সৃষ্ট হতে পারে। সামান্য যে দু'চারটে ভাষা জানি তার ভিতর আমি চিরজীবন যে রসের সন্ধান করেছি সে হচ্ছে গীতিরস। শেলি কীটস, গ্যোটে হাইনে, হাফিজ আন্তার, কালিদাস জয়দেব, গালীব জওক্ এঁদের গান বলুন কবিতা বলুন সব কিছুই রসান্বাদ করে এ জীবন ধন্য মেনেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বার বার বলেছি—

'এমনটি আর পড়িল না চোখে,

আমার যেমন আছে।'

তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বার বার হার মেনেছি। রবীন্দ্রনাথের গান এমনি এক অখণ্ড রূপ নিয়ে হৃদয় মন অভিভূত করে ফেলে যে, তখন সর্বপ্রকারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা লোপ পায়।

জর্মন যখন 'লীডার' কিংবা ইরানীরা যখন গজল গান একমাত্র তখনই আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত জাতীয় কিঞ্চৎ রস পেয়েছি। তাই একমাত্র সেগুন্ডোর

সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের গানের তুলনা করে ঈষৎ বিশ্লেষণ করা যায়।

তখন ধরা পড়ে :

রবীন্দ্রনাথের গানের অখণ্ড, সম্পূর্ণ রূপ। বহু লীডার এবং গজল শব্দে মনে হয়েছে এ গান অপূর্ণ, এ গান যদি আরো অনেককণ ধরে চলত তবে আরো ভালো লাগত অর্থাৎ শব্দ য়ে অতৃপ্ত রেখে গিয়েছে তাই নয়, অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়েছে এ ‘লীডার’ বা ‘গজল’ আরো কিছুকণ ধরে চলতে পারতো। রবীন্দ্রনাথের গান কখনই অসম্পূর্ণরূপে আমার সামনে দাঁড়ায় নি। তাঁর গান শব্দে যদি কখনো মনে হলে থাকে এ গান আমাকে অতৃপ্ত রেখে গেল তবে তার কারণ তার অসম্পূর্ণতা নয়, তার কারণ অতিশয় উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি মাত্রই ব্যঞ্জনা এবং ধ্বনিপ্রধান। তার ধর্ম সম্পূর্ণ তৃপ্ত করে ও ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি দিয়ে হৃদয়মন ভরে দেওয়া। তখন মনে হয়, এ গান আমার সামনে যে-ভুবন গড়ে দিয়ে গেল তার প্রথম পরিচয়ে তার সব কিছু আমার জানা হল না বটে, কিন্তু খেদ নেই, আবার শব্দব তখন সে ভুবনের আরো অনেকখানি আমার কাছে উন্মোচিত হয়ে উঠবে আর এমনি করে একদিন সে ভুবন আমার নিত্যত আপন হয়ে উঠবে। কোনো সন্দেহ নেই এরকম ধারাই হয়ে থাকে কিন্তু আরেকটি কথা তার চেয়েও সত্য : রবীন্দ্রনাথের কোনো গানই কখনো নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে না।

শব্দের চয়ন, সে শব্দগুলো বিশেষ স্থলে সংস্থাপন এবং হৃদয়মনকে অভিষিক্ত করণাতীত নূতন শব্দের ভিতর দিয়ে উন্মোচিত রেখে ভাবে, অর্থে, মাধুর্যের পরি-সমাশ্রিত পেঁছিয়ে দিয়ে গান যখন সাক্ষ হয় তখন প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম করি, এ গান আর অন্য কোনো রূপ নিতে পারতো না—নটরাজের মূর্তি দেখে যেমন মনে হয়, নটরাজ অন্য কোনো অঙ্গভঙ্গি দিয়ে আমার চোখের সামনে নৃত্যকে রূপায়িত করতে পারতেন না। তাই বলি, নটরাজের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির মত রবীন্দ্রনাথের গানের প্রত্যেকটি শব্দ।

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, চমৎকার সুর তাল জ্ঞান, মধুরতম কণ্ঠ, তবু কোনো কোনো গায়কের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান ফিকে, পানসে অর্থাৎ ফ্ল্যাট বলে মনে হয়। কেন এরকম ধারা হয় তার কারণ অনুসন্ধান করলে অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাবেন, গায়কের যথেষ্ট শব্দ-সম্মান বোধ নেই বলে প্রতিটি শব্দ রসিয়ে বসিয়ে গাইছেন না আর তাই যেন নটরাজের প্রতিটি অঙ্গ আড়ম্ব হয়ে গিয়ে তাঁর নৃত্য বন্ধ হয়ে গেল।

মুক্তিকার বন্ধন থেকে রবীন্দ্রনাথ কত শতবার আমাদের নিয়ে গিয়েছেন ‘নীলাম্বরের মর্মমাঝে’। আবার যখন তিনি আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তখন এই মুক্তিকাই স্বর্গের চেয়ে অধিকতর ‘মধুময় হয়ে ওঠে’।

‘তারায় তারায় দীপ্তিশিখার অগ্নি জ্বলে

নিদ্রাবিহীন গগনতলে—’

শব্দে কি কল্পনা করতে পারি যে

‘ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন,

কোথায় ছিল কোন স্বর্গে মোর নিমন্ত্রণ।’

তারপর যখন মনকে তৈরি করলুম সেই স্বর্গসভার নব নব অভিজ্ঞতার জন্য
তখন আবার হঠাৎ আমি

‘কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে ॥’

তারপর এ-খারার কি অপরূপ বর্ণনা

‘হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে ।

হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন
বনের পথে আঁধার-আলোর আলিঙ্গন ।’

কখনো স্বর্গে কখনো মর্ত্যে, আপন অজানাতে এই যে মধুর আনাগোনা,
মানুষকে দেবতা বানিয়ে, আবার তাকে দেবতার চেয়ে মহত্তর মানুষ করে তোলা
—মাত্র কয়েকটি শব্দ আর একটুখানি সুদূর দিয়ে—এ অলৌকিক কর্ম যিনি করতে
পারেন তিনিই ‘বিশ্বকর্মা মহাত্মা’।

তোতা কাহিনী

পারস্য দেশের গুণী-সুন্নানীরা বলেন, আল্লা যদি আরবী ভাষায় কোরান প্রকাশ
না করে ফার্সীতে করতেন, তবে মোলানা জালালউদ্দীন রুমী ‘মসনবি’ কেতা-
খানাকে কোরান নাম দিয়ে চালিয়ে দিতেন। এ ধরনের তারিফ আর কোন দেশের
লোক তাদের কবির জন্য করেছে বলে তো আমার জানা নেই।

মোলানা রুমী ছিলেন ভক্ত। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন কদম্ববনবিহারিণী
শ্রীরাধা বেরকম করে গোপীজনবল্লভ শ্রীহরিকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রেম দিয়ে।
রুমী তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মসনবিতে বর্ণনা করেছেন। বেশির ভাগ
গল্পগুলো, তারই একটি ‘তোতা কাহিনী’।

ইরান দেশের এক সদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা
জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস, সৌন্দর্যে রুডলফ ভেল্‌স্টিনো, পাণ্ডিত্যে
ম্যাক্সমুলার। সদাগর তাই ফুরসৎ পেলেই সেই তোতার সঙ্গে দৃঢ় রসালাপ,
তথ্যলোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সদাগর খবর পেলেন ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আল্লা
দরে। তখনই মনস্থির করে ফেললেন ভারতে যাবেন কার্পেট বেচতে। যোগাড়-
যন্ত্র তদন্তেই হয়ে গেল। সর্ব শেষে গোষ্ঠীকুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য
হিন্দুজ্ঞান থেকে কি সওয়া নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না—তাকেও
শুধালেন সের্গ সওয়াত চায়। তোতা বললে, ‘হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে
আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা থেকে মুক্তি চায় না
কোন চিড়িয়া? হিন্দুজ্ঞানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে
আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তার
প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ সওয়াতটা চাওয়া তো

কিছু অন্যাগও নয় ।

সদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পরিসা কামালেন, সগগাতও কেনা হল, কিন্তু তাতার সগগাতের কথা গেলেন বেকাক ভুলে । মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একঝাঁক তাতা পাখি দেখে । তখখুনি তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বন্দ হয়ে দিন কাটাচ্ছে । তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারো ?' কোনো পাখিই খেয়াল করল না সদাগরের কথার দিকে । শখু শখু সংবাদটা একটা পাখির বন্ধুকে এমনি বাজ হানল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল । সদাগর বিস্তর আপসোস করলেন নিরীহ একটি পাখিকে বেককা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্যে । স্থির করলেন, এ মুখামি দ্ব-বার করবেন না । মনে মনে নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে মারলেন গাড়া দুই চড় ।

বাড়ি ফিরে সদাগর সগগাত বিলোলেন দরাজ হাতে । সবাই খুশ, নিশ্চয়ই 'জয় হিন্দু' বলেছিল ব্যাটা-বাক্ষা সবাই । শখু তাতা গেল ফাঁকি—সদাগর আর ও-ঘরে যান না পাছে তাতা তাঁকে পাকড়ে ধরে সগগাতের জন্য । উঁহু, সেটি হচ্ছে না, ও খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে ।

কিন্তু হলে কি হয়—গোঁপ কামানোর পরও হাত ওঠে অজানাতে চাড়া দেবার জন্য (পরশুরাম উবাচ), বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তাতার ঘরে । আর যাবে কোথায়—'অস্-সালাম আলাই কুম, ও রহমৎ উল্লাহ, ও বরকত ওহু, আসুন আসুন, আসতে আশ্বে হোক । হুজুরের আগমন শখু হোক ইত্যাদি ইত্যাদি, তাতা চেঁচাল ।

সদাগর 'হে' 'হে' করে গেলেন ! মনে মনে বললেন, খেয়েছে !

তাতা আর শখু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তাতা শখু । বললে, 'হুজুর সগগাত ?'

সদাগর ফাটা বাঁশের মধ্যখানে । বলতে পারেন না, চাপতেও পারেন না । তাতা এমন ভাবে সদাগরের দিকে তাকায় যেন তিনি বেইমানস্য বেইমান । সগগাতের ওয়াদা দিয়ে গড্ড্যাম্ ফক্ককারি । মানুস জানোয়ারটা এই রকমই হয় বটে ! তওবা, তওবা !

কি আর করেন সদাগর । কথা রাখতেই হয় । দুম করে বলে ফেললেন ।

যেই না বলা তাতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল । তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্তানে তার দূরবস্থার খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এরকম একটা প্রাণঘাতী দ্ব-সংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায় ?

দিলের দোষ তাতাটি মারা যাওয়ায় সদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন । 'হায়, হায়, কী বেকুব, কী বে-আক্কেল আমি । একই ভুল, দুবার করলুম ।' পাগলের মত মাথা খাবড়ান সদাগর । কিন্তু তখন আর আপসোস ফায়দা নেই—ঘোড়া চুরির পর আর আশ্চাবলে তালা মেরে কি লভ্য ! সদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে তাতাকে বের করে আঙ্গিনায় ছুঁড়ে ফেললেন ।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি ! ছুঁড়ে ফেলতেই তোতা উড়ে বসল গিরে বাড়ির ছাদে । সদাগর তাম্বজব—হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে । অনেকক্ষণ পরে সম্ভবত ফিরে শূন্যলেন, ‘মানে ?’

তোতা এবারে প্যাঁচার মত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, ‘হিন্দুস্থানী যে তোতা আমার বদনসিবের খবর পেয়ে মারা যায়, সে কিন্তু আসলে মরে নি । মরার ভান করে আমাকে খবর পাঠালো, আমিও যদি মরার ভান করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাবো ।’

সদাগর মাথা নিচু করে বললেন, ‘বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু, যাবার আগে আমাকে শেষ তত্ত্ব বলে যাও । আর তো তোমাকে পাব না ।’

তোতা বললে, ‘মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষলাভ । মড়ার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই । সে তখন মৃত্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়ে গিয়েছে । মরার আগে মরবার চেষ্টা করো ।’

*

*

*

এই গল্প ভারতবর্ষে বহু পূর্বে এসেছিল । কবীর বলেছেন,

‘তাজো অভিমানা শিখো জ্ঞানা

সতগুরু সঙ্গত ভরতা হৈ

কহৈ কবীর কোই বিরল হংসা

জীবতহী জো মরতা হৈ ॥

(অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই দ্রাণ । কবীর বলেন, ‘জীবনেই মৃত্যুলাভ করেছেন সেরকম হংসসাধক বিরল’) ।

আর বাঙলা দেশের লালন ফকিরও বলেছেন,

‘মরার আগে মলে শমন-জদালা ঘুচে যায় ।

জানগে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয় ।’ ॥

ত্রাহি বিশ্বকর্মা

দিব্লিগ শহরে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না । শূন্য কুৎস্ব মিনারের গায়ে লাগানো কুণ্ডল-ইসলাম মসজিদের কয়েকটি অংশ যে প্রাচীন হিন্দু মন্দির থেকে নেওয়া হয়েছে সে কথা মসজিদের দেয়ালে পাথরে খোদাই করা রয়েছে আর সেগুলোর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না । কী সুদূরপাশ, সুদক্ষ দৃঢ় হস্তের কলাসৃষ্টি ! নৈসর্গিক সৌন্দর্য স্থপতি যে রকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন ঠিক তেমনি বিশ্বব্রুবনের সর্বরসবস্তুর অভেদ্য, সমষ্টিগত রূপও তিনি হৃদয়ঙ্গম করে উভয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ প্রকরণগারে প্রকাশ করেছেন কখনো অতি অল্প দৃ-একটি ইঙ্গিত দিয়ে, কখনো সুক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিবিড়তম ‘বর্ণনা’ এবং ব্যঞ্জনা দিয়ে ।

এ তো হল কারুকার্যের কথা । কিন্তু যে স্তম্ভগুলোর উপর এসব কারুকার্য খোদাই করা হয়েছে তাদের আকার-প্রকার দেখলেও মনে কোন সন্দেহ থাকে না যে এ স্তম্ভগুলো নিশ্চয়ই একদা কোনো মহৎ স্থাপত্যের অঙ্গরূপে

নির্মিত হয়েছিল। মনে কলামাত্র শ্বিথার অবকাশ থাকে না যে সে যুগের স্থাপত্য গাম্ভীৰ্য্যে এবং মধুরতায় অন্য যে-কোনো দেশের স্থাপত্যের সম্মুখে মস্তকোন্তোলন করতে পারত।

তারপর আরম্ভ হল নব পর্যায়। কুৎবুদ্দিনার, ইলতুৎমিশের কবর, আলাউদ্দিন খিলজির মসজিদ, গিয়াসুউদ্দীন তুগলকের কবর, সিকন্দর লোদীর মসজিদ, এবং গোর, হুমায়ূনের কবর, খানখানার কবর, জামি মসজিদ, লালকেল্লা, সফদরজঙ্গ আরো কত অজস্র কলা নিদর্শন। দেখতে দেখতে মাসের পর মাস কেটে যায়, দেশকালপাত্রস্তান সম্পূর্ণ লোপ পায়—দিল্লী ত্যাগ না করা পর্যন্ত সে রসের সাগরে ডুবে মরা থেকে বাঁচতে পারে না।

তারপর ইংরেজের বর্বরতা। সেক্রেটারিয়েট মেমোরিয়েল ও রাজা জর্জের প্রতিমূর্তি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যে হিন্দু-মুসলিম যুগের কলাসৃষ্টি দেখার পরও ইংরেজ কী করে এ সব গভম্ভাব (সুশীল পাঠক! ক্ষমা ভিক্ষা করি, অনেক ভাবিয়াও কোনো ভদ্র শব্দ খুঁজিয়া পাইলাম না) যতদূর নিক্ষেপ করে গেল। যে ইংরেজ আপন দেশে চরিত্রবান সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হলে অসাধু হয়ে যায়—যে ইংরেজ স্বদেশে স্ব-ঐতিহ্যে মধ্যম শ্রেণীর স্থাপত্য নির্মাণে সক্ষম সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের দম্ভে মদোন্মত্ত স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে সৃষ্টি করে—কি সৃষ্টি করে? অশ্লীল কথাটার আর পুনরাবৃত্তি করবো না।

ফরাসী গুণী ক্রেমাসো দিল্লীর ইংরেজ স্থাপত্য দেখে বলেছিলেন, ‘বাই গদ, হোয়াং ওয়াস্‌দারফুল রুইন্স্ দে উইল মেক্!’ এরপর এ-স্থাপত্য বাবদে এ অধম আর কি নিবেদন করবে?

*

*

*

কিন্তু এ সব কিছুর হার মানে এক নবীন পরিকল্পনার সম্মুখে। এক অতি আধুনিক শিল্পী মহাস্বাজীর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য একটি ‘আজব’ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। পম্মাসনে আসীন মহাস্বাজীর একটি ১৪০ ফুট উঁচু মূর্তি নির্মাণ করা হবে এবং সেই মূর্তির ভিতরে চারতলা এমারৎ ভাঁ থাকবে। যেহেতু মাস্তক চিন্তাধার তাই মূর্তির মস্তকে লাইব্রেরী থাকবে এবং সেই হিসেবে বক্ষে থাকবে অন্য কিছুর, নাসিকা কণ্ঠেও তাই সেই রকম জুংসই কিছুর একটা। সমস্ত পরিকল্পনাটা আমার মনে নেই; তবু অনুমান করি উপরের হিসাব মাফিক পেটে থাকবে হোটেল রেন্ডোরী!

শান্ত সমাহিত হয়ে ভাবুন দেখি আমরা কোথায় এসে পৌঁচেছি। সেই বিরাট মূর্তি প্যাটপ্যাট করে তাকিলে থাকবে তামাম দিল্লী শহরের দিকে অষ্টপ্রহর—হয়ত বা চোখে দুটি জোরালো সার্চ-লাইট জুড়ে দেওয়া হবে। মূর্তিটি যদি কলাসৃষ্টি হিসাবেও অতি উচ্চ পর্যায়ের হয় তবু তার বিরাট আকার আর সব সুক্ষ্মানুভূতিকে গলা টিপে মেরে ফেলে তাবৎ দিল্লীবাসীর মনে হরবকৎ জাগিয়ে রাখবে যে অনুভূতি সেটা হচ্ছে, ভয়-বিহ্বলতা।

অথচ ধর্ম সাক্ষী—মহাস্বাজীকে দেখে কেউ কখনো ভয়ে বিহ্বল হয় নি।

অতি পাষাণ্ড ইংরেজও তাঁর সামনে প্রস্থায়, সম্মুখে মাথা নত করেছে।

সে কথা থাক্। আমার প্রশ্ন, এই যে ব্যাপারটি হতে চলল—শূন্যলাম গ্রী গাড্‌গিল মূর্তিটির মডল্‌ দেখে উম্বাহু হয়ে নৃত্য করেছেন এবং পরিকল্পনাটির মূর্তমান করার মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী তাঁরই গ্রীহস্তে—সেটি কলাসৃষ্টির দৃষ্টিবিশুদ্ধ থেকে দেখতে গেলে তাকে কি বলা যায়?

অবিমিশ্র ভাস্কর্য? তা তো নয়। স্থাপত্য? তাও তো নয়। কারণ ভাস্কর্যের ভিতর স্থাপত্য থানা গাড়েন না। তদুপরি সর্বকলাসৃষ্টির একটা বিশেষ পরিমাণ আছে—মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব হতে পারেন কারণ তিনি এপিক, কিন্তু মেঘদূত অষ্টাদশপর্ব হতে পারেন না, এবং মহাভারতও মেঘদূতের আকার ধরতে পারেন না। তাজমহলকে আরও দশগুণ বড় করে বানালে তার মাধুর্য সম্পূর্ণ লোপ পাবে; মার্বেলে তৈরী যে ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে তাজ লোকে ড্রাইংরুমে সাজিয়ে রাখে তার থেকে আসল তাজের কোনো রসই পাওয়া যায় না। একশ চিল্লিশ ফুট উঁচু মূর্তি ভাস্কর্যের রস দিতে পারবে না।—যদি কোনো রস দেয় তবে সে বীভৎস—সে কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। হায়, মহাত্মাজীকে দেখতে হবে বিরাট দানবের মূর্তিতে?

আরেকটি কথা পেশ করতে আমার বড় বাধা বাধা ঠেকছে। কিন্তু না করে উপায়ও নেই। সংক্ষেপে বলি। মূর্তির ভিতর যখন চারতলা বাড়ি থাকবে, লাইব্রেরী হাসপাতাল থাকবে তখন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে স্নানাগার ও তৎসংলগ্নীয় যাবতীয় শৌচাগারও থাকবে। একদিকে গ্রামের মেয়েরা এসে সেই বিরাট মূর্তির সামনে সান্ত্বনায় প্রাণপাত করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির ভিতরে স্নানাগারে, শৌচালয়ে—থাক্!

হিন্দু-মুসলমান তুর্ক-পাঠান অনেক কিছু রেখে গিয়েছে দিল্লী শহরে—তাই দেখবার জন্যে দুনিয়ার লোক হিন্দুমুসল হয়ে জমায়েত হয় সেখানে। বিস্ময়ে তারা নির্বাক হয়, বিশুদ্ধ কলারসে তারা নির্মল্জিত হয়, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা প্রশান্তিবাণী আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে, যেন ওগুলো নিতান্ত আপনার আমার তৈরী, সাতদিন থাকবে বলে দিল্লীতে এসে থাকে সাতমাস, আর প্রাণ ভরে, প্রেমসে অভিসম্পাত দেয় ইংরেজদের বানানো নিউ দিল্লীকে।

আমার মনে হয়, এ মূর্তি গড়া হলে ইংরেজ পর্যন্ত আমাদের অভিসম্পাত না করে হুইস্কি স্পর্শ করবে না।

কিংবা লন্ডনে বসে মূর্তিটির ছবি দেখেই যে ঠাট্টা অট্টহাস্য ছাড়বে তার শব্দ আমরা ভারত-পাকিস্তান সর্বত্র শুনতে পাবো।

রেডুক্‌সিয়ো আড্‌ আবস্তুডুম!

গিয়ে দেখলুম ক্লাবের প্রত্যন্ত প্রদেশে সেই নিমগাছের তলায় চীনা বন্ধু, গুণী অধ্যাপক উ বসে আছেন। নিমপাতা এখন বর্ষণ রসে টেটস্বদর বলে টেবিলের উপর ঝরে পড়ে না। তাই উ বকুল ফুল দিয়ে আত্মনা আঁকছেন।

আমি চীনা কায়দায় ঝুঁকে ঝুঁকে দুলতে দুলতে বললাম, ‘জয় হিন্দ !’

অধ্যাপক মৃদু হাস্য করে মাথা নাড়িয়ে বললেন, ‘আলাইকুম সালাম আজ তোমাদের ইদের পারব না ?’

আমি বললাম, ‘ছুটির বাজার, তাই আপনার কাছ থেকে তত্ত্বকথা শুনতে এলাম।’

‘তৎপূর্বে বল, এ ফুলের নাম কি ?’

মূল বক্তব্যের সঙ্গে এ প্রশ্নোত্তরের কোনো যোগ নেই তবু বাঙালীর মনে বিমলানন্দের সৃষ্টি হবে বলে নিবেদন করছি।

বললাম, ‘বাঙলা, মারাঠী, সংস্কৃতে “বকুল”, হেথাকার নেটিভ ভাষাতে “মোলশী”।’*

অনেকক্ষণ ধরে মাথা দু'লিয়ে দু'লিয়ে বললেন, ‘বকুল, মোলশী,—মোলশী বকুল। উহু, বকুলটিই মিষ্টি।’ বাঙালীর ছাতি তিন বিষয় ফুলে উঠল তো ?

আমি বললাম, ‘মিষ্টি নামই যদি রাখবেন তবে “প্রাণনাথ” বলে ডাকলেই পারেন।’

ভুরু কঁচকে বললেন, সে আবার কি ?’

‘প্রাণনাথ মানে, মাই ডালিৎ।’

‘আরো বদ্বিয়ে বলো।’

আমি বললাম, আমি বাঙাল। আমারই দেশের এক “চুকুমবুদাই” অর্থাৎ এদিকে মৃৎখচোরা ওদিকে চটে যায় ক্ষণে ক্ষণে, এসেছে কলকাতায়। গেছে বেগুন কিনতে। দোকানীকে বললে, “দাও তো হে, এক সের বাইগন।” দোকানী পশ্চিম বাঙলার লোক। “বেগুনে”র উচ্চারণ “বাইগন” শব্দে একটুখানি গবের ঈষৎ মৌরী-হাসি হেসে শুনালো, “কি বললে হে জিনিষটার নাম ?” বাঙাল গেছে চটে, উচ্চারণ নিয়ে যত্নতর এরকম ঠাট্টা-মস্কারা করার মানে ?—চতুর্দিকে আবার বিস্তার “ঘটি” দাঁড়িয়ে। তেড়েমেড়ে বলল, “বাইগন কইছি তো বেশ কইছি হইছে কি” ?’

দোকানী আরেক দফা হাম্বড়াই আত্মশ্রিতার মৃদু হাসি হেসে বললে, ‘ছ্যাঃ, বাইগন, বাইগন। দেখো দাঁকিনি আমাদের শব্দটা কি রকম মিষ্টি—বেগুন, বেগুন।’

বাঙাল বলল, মিষ্টি নামই যদি রাখবা, তবে “প্রাণনাথ” ডাকলেই পারো। দাও, তবে এক সের প্রাণনাথ। প্রাণনাথের সের কত ? ছ’ পয়সা না সাত পয়সা।’

উ প্রাণভরে হাসলেন উচ্ছ্বসে। তারপর চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে। সব শেষে চেশায়ার বেড়ালের হাসিটার মত ‘আকাশে আকাশে রহিল ছড়ানো সে হাসির তুলনা।’

সুশীল পাঠক, তুমি রাগত হয়েছে, বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। এ বাসি মাল

* বানানে ভুল থাকতে পারে, আমি ধ্বংস শব্দেই, সেই রকমই লিখলাম।

আমি পরিবেশন করছি কেন ? এ গল্প জানে না কোন মকট ? পশ্চার এ-পারে কিংবা হে-পারে ?

তিষ্ঠ, তিষ্ঠ । এ গল্পের খেই ধরে চীনা-গুণী সেদিন তব্ব বিতরণ করেছিলেন বলেই এটাকে ‘এনকোর’ করতে হল ।

*

*

*

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, ‘এ গল্পে কি তব্ব লুক্কায়িত আছে ?’

খাইছে । আমি করজোড় বললুম, ‘আপনিই মেহেরবাণী করুন ।’

বললেন, “রেডক্‌সিয়ো আড্ আবস্‌ডুর্ম” কাকে বলে জানো ?

আমার পেটের এলেম আপনারা বিলক্ষণ জানেন । কাজেই বলতে লজ্জা নেই, অতিশয় মনোযোগের সহিত গ্রীবাঙ্কডুয়নে নিষদ্বন্দ্ব ললুম ।

বললেন, ‘কেন । জানো না, যখন কোনো বিষয় টানাটানি করলে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয় তখনই তাকে বলে “রেডক্‌সিয়ো আড্ আবস্‌ডুর্ম” ।’

ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি । সোৎসাহে বললুম, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, রিডাকশিও এ্যাড-এ্যাবসার্ডাম্ ।’ একটুখানি গর্বের হাসিও হেসে নিলুম ।

বাঁকা নয়নে তাকিয়ে বললেন, ‘কথাটা যখন লাতিন তখন ইংরিজি উচ্চারণ করছে কেন ? ইংরেজের মুখ না হলে তোমরা কোনো ঝাল খেতে পারো না বুঝি ?’

‘সে কথা থাক । শোনো ।’

আসল কথা হচ্ছে বাঙাল দেখিয়ে দিল, মিষ্টি নামই যদি রাখবে তবে যাও এক্সট্রমে । রাখো নাম “প্রাণনাথ” । তৎক্ষণাৎ প্রমাণ হয়ে গেল, মিষ্টত্বের দোহাই কত আবাসার্ড ।

এই দেখো না, মার্কিন জাতটা কি রকম আবাসার্ড । কোনো কর্মে সুনিন্দুগ হতে পারাটা অতীব প্রশংসনীয় । এতে সন্দেহ করবে কে ? কিন্তু এরও তো একটা সীমা থাকা দরকার । গল্প দিয়ে জিনিসটে বোঝাচ্ছি ।

‘ব্রুকলিন ব্রিজ যখন বানানো হয় তখন দু’পাড় থেকে দু’দল লোক পুঁল তৈরি করে মাঝ গাঙ্গের দিকে রওয়ানা হল । এমনি চৌকশ তাদের হিসেব, এমনি সুনিন্দুগ তাদের কলকব্বা যে মধ্যখানে এসে যখন পুঁলের দু’দিকে জোড়া লাগল তখন দেখা গেল এক ইঞ্জির আঠারো ভাগের উঁচু-নীচুর ফেরফার হয়েছে । তারিফ করবার মত কেরদানী, কোনো সন্দ নেই ।

‘পক্ষান্তরে আমার স্বর্ণভূমি চীনদেশে কি হয় ? দু’দল লোককে এক পাহাড়ের দু’দিকে দেওয়া হয়েছিল সুড়ঙ্গ বানানোর জন্য । এদিক থেকে এনারা যাবেন, ওদিক থেকে এনারা আসবেন । মধ্যখানে মিলে গিয়ে খাসা টানেল ।

কিন্তু কার্যত হল কি ? দেখা গেল, ডবল সময় চলে গেল তব্ব মধ্যখানে দু’দলের দেখা নেই । তারপর এক সুপ্রভাতে দু’দল বেরিয়ে এলেন দু’দিকে । মধ্যখানে মেলামেলি, কোলাকুলি হয় নি ।’

আমি চোখ টিপে ইশারায় জানালুম, এ কি রঙ্গ বুঝতে পেরেছি ।

তিনি বললেন, ‘আদপেই না। মার্কিনরা সুইনপুণ, সেই নৈপুণ্যের প্রসাদাৎ তারা পেল কুল্পে একখানা রিজ। আর আমরা পেয়ে গেলুম, দু’খানা টানেল। লাভ কার বেশী হ’ল বল তো।’

তাই বলি অত্যধিক নৈপুণ্য ভালো নয়।

‘রেডুক্‌সিয়ো আড্‌ আবস্‌ডু’ম।’

ইউরোপে ভারতীয় শাস্ত্র-চর্চা

সুইটজারল্যান্ডের মত দেশেও লোকে সংস্কৃত পড়ে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সুইসদের কৌতূহলও আছে—যদি সে দেশে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয় ও তাতে সংস্কৃতের অধ্যাপক কুল্পে একজনই। সেই অধ্যাপকটি এসেছেন এদেশে—সেদিন দেখা হল এখানে। অমায়িক লোক, চেহারাটি খাবসুদরং, ইংরেজি বলেন ভাঙা-চাঙা, নিজের ভুলে নিজেই হেসে ওঠেন। ভারতবর্ষের নীল আকাশ, সোনারি রোদ আর সবুজ ঘাসের যা তারিফ করলেন তা শুনে আমি লাজুক হাসি হেসে ‘হা, হা’ করে গেলুম, এমনি কায়দায় যেন ওগুলো নিতান্ত আমারই হাতে গড়া, এগজিবিশানে ছেড়েছি, দু’চার পরসা পেলে বিক্রি করতেও রাজী আছি। সুইটজারল্যান্ডের পাষ্টা প্রশংসাও করলুম, ‘আহা, কী চমৎকার শাদা বরফ, নীল সরোবর আর চকচকে ঝকঝকে বাড়ঘরদোর।’ সায়েব হাসিমুখে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

জিজ্ঞেস করলুম, ‘সায়েব, তোমার দেশে সংস্কৃত এগোচ্ছে কি রকম?’

সায়েব বললেন, ‘মন্দ না, তবে কেতাবপত্রের বড় অভাব। আর সংস্কৃত ক’টা ছেলে পড়ে না-পড়ে সেইটাই তো আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাঁচজন সুইসের জ্ঞানগম্যি কতটুকু। সুইসরা ভাবে, ভারতবর্ষ দেশটা সাপে বাঘে জর্জিত, মধ্যখানে হরেকরকমের সাধু-সন্ন্যাসী আর ফকির-বৈরাগী ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের ঝোলা থেকে হরবকত হরেকরকমের সাপ লাফ দিয়ে দিয়ে বেরোচ্ছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দেবার মত প্রামাণিক বই কেউ তো লেখে না যেগুলো সাধারণ সুইস পড়তে পারে। ইংরিজি জানে ক’টা সুইস?’

এই থেই ধরে দু’দণ্ড রসালাপ হল।

*

*

*

গেল শতকের মাঝামাঝি এবং শেষের দিকে বিস্তর ভারতীয় কেতাবপত্রের ইংরিজি, ফরাসী, জার্মান অনুবাদ হয়। ঠিক সেই সময়েই বিজ্ঞানের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের লোক ক্রমেই ঈশ্বর, ধর্ম এবং পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাতে থাকে। অথচ গুণী-জ্ঞানীরা জানতেন যে ঈশ্বর ধর্ম আত্মা এসব ব্যাপারে অনেকখানি কুসংস্কার মেশানো থাকলেও সব কিছুর ‘গাঁজাখুরি’ বলে এক ঝটকায় বেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিতও নয়। তাই তারা এমন কিছুই সম্বন্ধে করেছিলেন যাতে ঊনবিংশ শতকের ‘মুক্ত’, ‘কুসংস্কারবর্জিত’, ‘বৈজ্ঞানিক’ মনও চরম তত্ত্বের সম্বন্ধ পায়।

তাই বৌদ্ধধর্ম তাদের মনকে বেশ একটা জোর নাড়া দেয়। কারণ, বৌদ্ধধর্মে ভগবানের বালাই নেই, আত্মাটাকে পর্ষত্ত কবুল জবাব দেওয়া যায়। ওদিকে ইরানী কবি ওমর খৈয়ামের ‘কিস্মৎ’ অর্থাৎ অদৃষ্টবাদ ইয়োরাপকে পাগল করে তুলেছে, তাদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের ‘ধর্মচক্রে’র অলংঘ্য নিয়মও বেশ খাপ খেয়ে গেল।

পল্লবগ্রাহীরা ওমরকে নিয়ে পড়ে রইল আর যারা ‘এহ বাহা’ জানতেন তাঁরা বৌদ্ধধর্মের খেই ধরে ভারতবর্ষের আর পাঁচটা তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। উপনিষদ না জেনে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে পরিচয় হয় না। তাই বিশেষ করে উপনিষদের উত্তম উত্তম অনুবাদ ইংরিজি, ফরাসী, জার্মানে বেরুলো। তারই দৃষ্টান্ত ‘দ্য লুক্স’ সংস্করণ এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর গীতার তো কথাই নেই।

এবং সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এসব কেতাবপত্র যে পিণ্ডিতেরাই পড়লেন তা নয়—সর্বসাধারণের মধ্যে এসব অনুবাদ এবং তাদের নিয়ে গড়ে তোলা মৌলিক বইও ছড়িয়ে পড়ল। জাতকের বিস্তার গল্প কাছাকাছাদের জন্য অনুবাদ করা হল, মাসিকে ধারাবাহিক হয়ে বেরতে লাগল।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটলো, তার জন্য কে দায়ী তা আমি জানি নে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ইয়োরাপীয় পিণ্ডিতেরা তখন ভাবখানা দেখাতে আরম্ভ করলেন যে, এ সব তত্ত্বজ্ঞানের বস্তু সাধারণ লোকের বিদ্যোবুদ্ধির বাইরে। এসব জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন গুণী-জ্ঞানীরা, এসব কেতাবপত্রের টীকা-টিপ্পনী লিখবেন যাদের ‘শাস্ত্রাধিকার’ আছে তাঁরাই।

তখন ব্যাপারটা কিসে গিয়ে দাঁড়ালো আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে কার্ণক্ষেপে দেখা গেল, যেসব অনুবাদ বেরোয় তাতে অনুবাদেদের চেয়ে টীকাটিপ্পনী বেশী, ফুটনোটে ফুটনোটে ছয়ালপ আর অনুবাদেদের ভাষাও দিনকে দিন এমনি টেকনিক্যাল এবং ‘হিং টিং ছটে’ ভর্তি হতে লাগল যে সেগুলো সাধারণ পাঠক আর বুঝতে পারে না!

সর্বজনপাঠ্য যেসব অনুবাদ আগে বেরোত সেগুলোতে ভুল থাকত বটে এখানে ওখানে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেগুলো অস্তত পড়ত এবং পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারত। শব্দ তাই নয় এমন লোকও আমি চিনি যিনি, বৌদ্ধ দর্শন ও নীতি অতি সামান্য মাত্রায় পড়ে নিয়েই আপন জীবন সেই অনুসারে চালাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মচরণ তো অশ্রুভেদী পিণ্ডিতের উপর নির্ভর করে না।

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় শাস্ত্রচর্চার জন্য ইয়োরাপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়, সেগুলো থেকে প্রতি বৎসর প্রামাণিক অনুবাদ, মূল গ্রন্থ, এমন কি মোটা মোটা প্রৈমাসিকও বেরতে লাগল, ইংরিজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় রুশ ভাষায়। কিন্তু তার প্রায় সব কটাই এমনি পশ্চাত্তে লেখা এবং তার কায়দা-কৈত এমনি পাকা-পোক্ত যে, তাতে কামড় দিতে হলে পিণ্ডিতের লৌহদন্তের প্রয়োজন, সাধারণ মানুষ কামড় দিতে গিয়ে দাঁত হারায়,

হজমের তো কথাই ওঠে না। এবং সঙ্গে সঙ্গে সব জনবোধ্য অনুবাদের বই বেরতে লাগল কম—যা দু'একখানা বেরলো সেগুলো পল রাস্টনের রগরগে বই কিংবা মিস মেয়োর মত প্রপাগান্ডা মেথানো।

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আর ওরিয়েন্টালিস্ট্‌স্‌ কনফারেন্সের ভিতর হারেমবন্দ্য হলেন।

তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপ গেলেন তখন এল এক নতুন জোয়ার। বিশেষ করে, কমিউনিস্টে রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি জানবার জন্য বহু লোকের আগ্রহ দেখা গেল। ফ্রান্সে রেনে গ্রুসের মত লোক আবার চেষ্টা করলেন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরবার জন্য। দু'চারজন পণ্ডিত ব্যক্তিও এ-কর্মে যোগ দিলেন কিন্তু কেন জানি নে, এ আন্দোলন খুব বেশী লোকের ভিতর ছড়াতে পারলো না।

হয়ত ইয়োরোপে তখন যে অশান্তি দেখা দিয়েছিল—কম্যুনিজম নাৎসিজম দুই-ই সে অশান্তির পিছনে ছিল—তার মাঝখানে সাধারণ মানুষ মনস্তির করে কোনো ভালো জিনিসই গ্রহণ করতে পারছিল না? প্রতিদিন নতুন সমস্যা, অস্বপ্নের নতুন নতুন অনটন, চতুর্দিকে পালোয়ানীর পায়তারা কষার হুঙ্কারধ্বনি, এর মাঝখানে মানুষ পড়বেই বা কি, ভাববার সময়ই বা তার কোথায়?

শুধু ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, চীনা, আরবী-ফারসী, প্রাচীন মিশর, বাবিলনীয় সব প্রকারের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসন্ধান তখনো একেবারে নির্মম ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিতরেই সীমাবদ্ধ। বাইরের লোক তখন প্রাণপণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাতে ব্যস্ত। অন্য জিনিসের জন্য ফুসৎ কই?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটতে না কাটতেই এটম বম, চীন, কোরিয়া।

এদিকে ভারতবর্ষ স্বরাজ্য পেল। দেশ-বিদেশে আমাদের আপন রাজদূতাবাস বসল। অনেকেই আশা করলেন, এইভাবে হয়ত একটা শীঘ্রই হবে—কিন্তু সে কাহিনী আরেক দিনের জন্য মূলতুবী রইল।

*

*

*

ইয়োরোপের উপস্থিত যে উত্তেজনা উদ্‌যাদনা চলেছে তার মাঝখানে ইয়োরোপীয় ছাত্র যখন শ্লাতো-আরিস্ততল, ক্লিকেরো-টাকিটুস পড়া ছেড়ে দিয়েছে—ক্রাসিক্‌স্‌ যখন 'নিজ বাসভূমে' মরমর তখন ভরত-শঙ্কর পড়বে কে?

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের কি নিতান্তই কোনো কিছুই করবার নেই??

চরিত্র পরিচয়

গল্প শুনেছি, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান আর স্কচ এই চারজনে মিলে একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল। বন্দোবস্ত হল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ইংরেজ নিয়ে এল বেকন আর আণ্ডা, ফরাসী নিয়ে এল এক বোতল স্যাম্পেন জার্মান নিয়ে এল ডজনখানেক সসেজ, আর স্কচম্যান—? সে সঙ্গে নিয়ে এল

তার ভাইকে।

এ জাতীয় বিশ্বর গল্প ইয়োরোপে আছে। স্কচদের সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ হলেই মনে মনে প্রত্যাশা করতে পারবেন যে গল্পটার প্রতিপাদ্য বস্তু হবে, হয় স্কচদের হাড়কিপ্‌টোর্মিগারি নয় তাদের হুইস্কির প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা। এদিকে আবার বিশ্বসংসার জানে স্কচরা ভয়ঙ্কর গোড়া ক্রীশ্চান আর মারাত্মক রকমের নীতিবাগীশ (বঙ্গজ হেরম্ব মৈত্র অতুলনীয়)। তাই এই তিনগুণে মিলে গিয়ে গল্প বেরল;—

এক স্কচ পাদ্রী এসেছেন লন্ডনে, দেখা করতে গেছেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে। গিয়ে দেখেন হেঁহে রৈরৈ, ইলাহি ব্যাপার, পেপ্লাই পার্টি, মেয়েমশ্বেদ গিসগিস করছে। বন্ধুর স্ত্রী হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এসে কাঁচুমাচু হয়ে পাদ্রীকে অভ্যর্থনা জানানেন। কারণ জানতেন স্কচ পাদ্রীরা এরকম পার্টি পরবের মাতলামো আদপেই পছন্দ করেন না। অথচ ভদ্রতাও রক্ষা করতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে শূধালেন,

‘একটুখানি চা খাবেন?’

পাদ্রী হুঙ্কার দিয়ে বললে, ‘নো টী!’

আরো ভয়ে ভয়ে শূধালেন, ‘কফি?’

‘নো কফি!’

‘কোকো?’

‘নো কোকো!’

ভদ্রমহিলা তখন মরীয়া। মৃদুস্বরে কাতর কণ্ঠে শেষ প্রশ্ন শূধালেন, ‘হুইস্কি সোডা?’

‘নো সোডা!’

অথচ কলকাতায় একবার অনুসন্ধান করে আমি খবর পাই, যে সব ব্রিটিশ এদেশে দানখরাত করে গিয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগই স্কচ—ইংরেজের দান অতি নগণ্য। তারপর বিলেতে খবর নিয়ে জানলুম, স্কচরা হুইস্কি খায় কম, বেশীর ভাগ রপ্তানি করে দেয়, আর নিজেরা খায় বিহার!

ঠিক সেই রকমই বিশ্বদুনিয়ার বিশ্বাসী ফরাসী জাতটা বড়ই উচ্ছৃঙ্খল। পঞ্চমকার নিয়ে অষ্টপ্রহর বেঞ্চেয়ার। তাই ইংরিজী ‘কারিইঙ কোল্ টু নিউ কাসলের’ ফরাসী রূপ নাকি ‘কারিইঙ এ ওয়াইফ টু প্যারিস’।

এ প্রবাদটি আমি ফরাসী ভাষায় শুনিনি; শুনছি ইংরেজের মুখে ইংরেজি ভাষাতে। তাই প্যারিস গিয়ে আমার জানবার বাসনা হল ফরাসীরা সত্যি উপরের প্রবাদবাক্য মেনে চলে কিনা?

খানিকটা চলে, অস্বীকার করা যায় না। যৌন ব্যাপারে ফরাসীরা বেশ উদার কিন্তু একটা ব্যাপারে দেখলুম তারা ভয়ঙ্কর নীতিবাগীশ। ফস্টিনস্টি তারা অনেকখানি বরদাশ্ত করে—অবশ্য নিয়ম, সেটা যেন বিয়ের পূর্বে না করে পরেই করা হয়—কিন্তু সেই ফস্টিনস্টি যদি এমন চরমে পৌঁছয় যে স্ত্রী স্বামীকে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে তাল্যক দিতে চায় তবে ফরাসী মেয়েমশ্বেদ দু’দলই

চটে যায়। ‘পরিবার’ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ফরাসী জাত বড়ই সম্ভ্রমের সঙ্গে মেনে চলে। তাই পরকীয়া প্রেম যতই গভীর হোক না কেন তারই ফলে যদি কোনো পরিবার ভেঙে পড়ার উপক্রম করে তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, নাগর-নাগরী একে অন্যকে ত্যাগ করেছেন।

কাজেই মেনে নিতে হয়, এ-ব্যাপারে ফরাসীদের যথেষ্ট সংযম আছে।

ঈষৎ অব্যস্ত, তবু হঠাৎ পাঠক প্রশ্ন শূন্যাবেন, তাহলে এই যে শূন্যে পাই প্যারিসে হরদম ফুটি সেটা কি তবে ডাহা মিথো?

নিশ্চয়ই নয়। প্যারিসে ফুটির কন্মতি নেই। কিন্তু সে ফুটিটা করে অফরাসীরা। যৌন ব্যাপারে ইংরেজের ভণ্ডামি সকলেই অবগত আছেন—লরেন্স সেটা বিশ্বসংসারের কাছে গোপন রাখেন নি। তাই ইংরেজ মোকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে। পাড়াপ্রতিবেশী তো আর সেখানে সঙ্গে যাবে না—বেশ যাচ্ছেতাই করা যাবে। শূন্য ইংরেজ নয়, আরো পাঁচটা জাত আসে, তবে তারা আসে খোলাখুলি স্বাস্থ্যভাবে—ইংরেজের মত ‘ফরাসী আট’ দেখার ভান করে না। কোন জর্মানে যদি বার্লিনে শূন্যে পেতুম বলছে, ‘ভাই হস্তাথানেকের জন্য প্যারিস চললুম’ তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেতুম আর পাঁচজন মিটিমিটিয়ে হাসছে—অবশ্য প্রথম জর্মানে সে হাসিতে যোগ দিতে কসুর করছে না।

তা সে যাই হোক, একটা প্রবাদ আমি বিশ্বাস করি। ফরাসীরা বলে ‘পারফিডিয়স অ্যালবিসন’ অর্থাৎ ‘ভণ্ড ইংরেজ’। একটি গল্প শুনুন।

শ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার খবর শুনলে এক বড়ো শিখ মেজর জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে?’

‘ইংরেজ-ফরাসী জর্মনির বিরুদ্ধে।’

সদরজী আপসোস করে বললেন, ‘ফরাসী হারলে দুনিয়া থেকে সৌন্দর্যের চর্চা উঠে যাবে আর জর্মনি হারলেও বুঁরি বাৎ, কারণ জ্ঞানবিজ্ঞান কলকৌশল মারা যাবে।’ কিন্তু ইংরেজ হারা সম্বন্ধে সদরজী চুপ।

‘আর যদি ইংরেজ হারে?’

সদরজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, ‘তবে দুনিয়া থেকে বেইমানি লোপ পেয়ে যাবে।’

আড্ডা

আড্ডা সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকটি উত্তম উত্তম লেখা বাঙলায় বেরনোর পর ইংরিজিতেও দেখলুম আড্ডা হামলা চালিয়েছে। চন্ডীমণ্ডপের ভগচাষ এবং জমিদার-হাবেলির মৌলবী যেন হঠাৎ কোট-পাতলুন-কামিজ পরে গট্‌গট্‌ করে স্টেটসম্যান অফিসে ঢুকলেন। আমার তাতে আনন্দই হল।

কিন্তু এ সম্পর্কে একটি বিষয়ে আড্ডার কিছু বক্তব্য আছে। আড্ডাবাজরা বলতে চান, বাংলার বাইরে নাকি আড্ডা নেই। কথাটা ঠিকও, ভুলও। তুলনা সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (১ম)—৬

দিয়ে নিবেদন করছি। সিম্বুদ উজিরে যে মাছ ধরা পড়ে, তার নাম ‘পাল্লা’—অতি উপদেশ মৎস্য। নর্মদা উজিরে ভরোচ শহরে যে মাছ ধরা পড়ে তার নাম ‘মাদার’—সেও উপদেশ মৎস্য। আর গঙ্গা পশ্চা উজিরে যে মাছ বাঙালীকে আকুল উতলা করে তোলে, তার নাম ইলিশ—খোটা (মাফ কীজীরে) মূল্যকে পৌঁছনর পর তার নাম হয় হিলসা।

উপযুক্ত সর্ব মৎস্য একই বস্তু—দেশভেদে ভিন্ন নাম। তফাৎ মাত্র এইটুকু যে সরষে বাটা আর ফালি ফালি কাঁচা লংকা দিয়ে আমরা যে রকম ইলিশ দেবীর পূজো দি বাদবাকীরী গুরুমথারা পারে না। অর্থাৎ আড্ডা বহু দেশেই আছে, শব্দ আমাদের মত তরিবৎ করে রসিয়ে রসিয়ে চাখতে তারা জানে না। অপিচ ফুললে চলবে না সিম্বীরী আমাদের সরষে-ইলিশ খেয়ে নাক সিঁটকে বলেন, ‘কী উদ্দা চীজকে বরবাদ করে দিলে।’ ভৃগুকচ্ছের (ভরোচের) মহাজনগণও সিম্বীরী রান্না পাল্লা খেয়ে ‘আল্লা আল্লা’ বলে রোদন করেন।

কে সুক্ষ্ম নিরপেক্ষ বিচার করবে? এ যে রসবস্তু—এবং আমার মতে ভোজনরস সর্বরসের রসরাজ।

তাই কাইরোর আড্ডাবাজরা বলেন, একমাত্র তঁরাই নাকি আড্ডা দিতে জানেন।

কাইরোর আড্ডা কখনো কোনো অবস্থাতেই কারো বাড়িতে বসে না। আড্ডাবাজরা বলেন, তাতে করে আড্ডা নিরপেক্ষতা—কিংবা বলুন গণতন্ত্র—লোপ পায়। কারণ যার বাড়িতে আড্ডা বসলো, তিনি পানটা-আসটা, খিচুড়িটা, ইলিশ-ভাজাটা (আবার ইলিশ! সুশীল পাঠক, ক্ষমা করো। ঐ বস্তুটির প্রতি আমার মরাত্মক দুর্বলতা আছে। বেহেশতের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বকং নামাজ পড়ে সেখানে যাবার কণামাত্র বাসনা আমার নেই) ‘ফির্লি’ দেন বলে তাঁকে সবাই যেন একটু বস্ত বেশী তোয়াজ করে। আড্ডাগোলের মিশরী নিকিষা মহাশয়রা বলেন, বাড়ির আড্ডার ‘মেল’ মেলে না।

অপিচ, পশ্য পশ্য, কোনো কাফেতে যদি আড্ডা বসে, তবে সেখানে কেউ কাউকে খয়ের খাঁ বানাতে পারে না—যেন পুরীর মন্দির, জাতফাত নেই, সব ভাই, সব বেরাদর।

এবং সব চেয়ে বড় কথা বাড়ির গিন্নী ‘মুখপোড়া মিনষেরা ওঠে না কেন’ কখনো শুনিয়ে, কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে অকারণে অকালে আড্ডার গলায় ছুরি চালাতে পারেন না। তার চেয়ে দেখো দীর্ঘনি, দীর্ঘ কাফেতে বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছ, পছন্দমায়িক মমলেট কটলেট খাচ্ছে, আড্ডা জমজমাট ভরভরাট, কেউ বাড়ি যাবার নামটি করছে না, কারো গিন্নী এসে উপস্থিত হবেন সে ভয়ও নেই—আর চাই কি?

শতকরা নব্বই জন কাইরোবাসী আড্ডাবাজ এবং তার দশ আনা পরিমাণ অধিক জীবন কাটায় কাফেতে বসে আড্ডা মেরে। আমাদের আড্ডা বসত ‘কাফে দ্য নীল’ বা ‘নীলনদ কাফেতে’। কফির দাম ছ’ পয়সা, ফি পাস্তুর। রাবড়ির মত ঘন, কিন্তু দুধ চাইলেই চিঙির। সবাই কালো কফি খায়, তাই দুধের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিছু ঘাবড়াবেন না, দু’দিনেই অভ্যাস হয়ে যায়।

কালো কফি খেলে রঙভাী ফর্সা হয় ।

আমাদের আঙাটা বসত কাফের উত্তর-পূর্ব কোণে, কাউটারের গা ঘেঁষে । হরেক জাতের চাঁড়িয়া সে আঙায় হরবকং মোজ্জুদ থাকত । রমজান বে আর সম্ভ্রাদ এফেগি খাঁটি মিশরী মঙ্গলমান, ওয়াহাব আতিয়া কণ্ট ক্রীশ্চান অর্থাৎ ততোধিক খাঁটি মিশরী, কারণ, তার শরীরে রয়েছে ফারাওদের রক্ত । জুর্নো ফরাসী কিন্তু ক'পদ্রুধ ধরে 'কাইরোর হাওয়া বিবাক্ত করছে' কেউ জানে না, অতি উত্তম আরবী কবিতা লেখে আর সে কবিতার আসল বক্তব্য হচ্ছে, সে তলওয়ার চালিয়ে আড়াই ডজন বেদুইনকে ঘায়েল করে প্রিয়াকে উটের উপর তুলে মরুভূমির দিগদিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যদিও আমরা সবাই জানতুম, জুর্নো যেটুকু মরুভূমি দেখেছে সে পিরামিডে বেড়াতে গিয়ে, তাও জীবনে একবার মাত্র, যদিও পিরামিড কাইরো থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে । উট কখনো চড়ে নি, ষ্ট্রামের ঝাঁকুনিতেই বমি করে ফেলে । আর তলওয়ার ? তওবা, তওবা ! মার্কোস জাতে গ্রীক, বেশী নয় কুলে আড়াই হাজার বৎসর ধরে তারা মিশরে আছে । মিশর রাণী, গ্রীক রমণী ক্লিয়োপাত্রার সঙ্গে তার নাকি খেণকুটুম্বতা আছে । হবেও বা, কারণ প্রায়ই ব্যবসাতে দাঁও মেয়েছে বলে ফালতো এবং 'ফির্' এক রৌদ কফি খাইয়ে দিত । তাতে করে কাফের 'গণতন্ত্র' ক্ষুন্ন হত না, কারণ মার্কোসকে 'কাটা ফালাইলে'ও আঙার ঝগড়া-কাজিয়ায় সে কম্বনকালেও হিস্যা নিত না ; বেশীর ভাগ সময় চেয়ারের হেলানে মাথা রেখে আকাশের দিকে হাঁ করে ঘুমুতো কিংবা খবরের কাগজ থেকে তুলোর ফটকা বাজারের তেজি-মন্দির (ব্দল এ্যাণ্ড বিয়ার) হালহাঁককং মদুখস্থ করতো ।

আর বাঙলা দেশের তাবৎ চ'ডীম'ডপ, বেবাক জমিদার-হাবেলীর আঙার প্রতিভূ হিসেবে আপনাদের আশীর্বাদে আর শ্রীগুরুর কৃপায় ধূলির ধূলি এ-অধম ।

আমার বাড়ির নিত্যন্ত গা ঘেঁষে বলে নিছক কফি পানার্থে ঐ কাফেতে আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যা যেতুম । বিদেশ-বিভূ'ই, কাউকে বড় একটা চিনি নে, ছমের মত হেথা-হোথা ঘুরে বেড়াই আর দেশভ্রমণ যে কি রকম পীড়াদায়ক 'প্রতিষ্ঠান' সে সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক কেতাব লিখব বলে মনে মনে পায়তারা করি । এমন সময় হঠাৎ খেয়াল গেল কাফের কোণের আঙাটির দিকে । লক্ষ্য করি নি যে কফি-পানটা ওদের নিত্যন্ত গৌণকর্ম, ওরা আসলে আঙাবাজ ।

আম্মো যে আঙাবাজ সে তঞ্চটা ওদেরও মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই স্বাক্ষমুহুর্তে । সে 'মহালগনে'র বর্ণনা আমি আর কি দেব ? সুরসিক পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো শ্রীহরি শ্রীরাধাতে, ইউসুফ জোলেখাতে, লায়লী মজনুতে, ত্রিষ্ঠান ইজোলদেতে কি করে প্রথম চারি চক্ষু বিনিময় হয়েছিল । কী ব্যাকুলতা, কী গভীর তৃষা, কী মহা ভবিষ্যতের প্রগাঢ় সুখস্বপ্ন, কী মরুতীর পার হয়ে সুখাশ্যামলিম নীলাম্বুজে অবগাহনানন্দ সে দৃষ্টি-বিনিময়ে ছিল । এক ফরাসী কবি বলেছেন, 'প্রেমের সব চেয়ে মহান দিবস সেদিন, যেদিন প্রথম বলেছিলুম, আমি তোমাকে ভালোবাসি ।' তঞ্চটা হৃদয়ঙ্গম হয় সেই স্বাক্ষ

মুহুর্তে'।

তারী-তুলসী-গজাজল নিয়ে আসুন, স্পর্শ করে বলব, তিন লহমাও লাগে নি, এই ব্রাত্যের উপনয়ন হয়ে গেল, বেদ শাখা ঋষি স্থির হয়ে গেলেন—সোজা বাঙাল্য বলে, জাতে উঠে গেলুম। আমিরা ছানিয়া, নয়ন হানিয়া বললুম, 'এক রৌদ কফি?'

আস্তার মেম্বররা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরিতোষের স্মিতহাস্য বিকশিত করলেন। ভাবখানা, ভুল লোককে বাছা হয় নি।

কাফের ছোকরাটা পৰ্বত ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। আমার ছন্নছাড়া ভাবটা তার চোখে বহু পূর্বেই ধরা পড়েছিল। রৌদ পরিবেশন করার সময় নীলনদ-ডেকটার মত মুখ হাঁ করে হেসে আমি যে অতিশয় ভদ্রলোক—অর্থাৎ জোর টিপস্‌ দি—সে কথাটা বলে আস্তার সামনে আমার কেস রেকমেণ্ড করলো।

জুর্নো তাড়া লাগিয়ে বললেন, 'যা, যা, ছোঁড়া মেলা জ্যাঠামো করিস নে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাসা আরবী বলেন আপনি।'

রবিঠাকুর বলেছেন—

‘এত বলি সিন্ধুপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া

সমস্ত লাজুনা যেন লইল মুছিয়া

বিদেশীর অঙ্গ হতে—’

ঠিক সেই ধরনে আমার দিকে তাকিয়ে জুর্নো যেন আমার প্রবাস-লাজুনা এক খাবড়ায় ঝেড়ে ফেললেন, আমার অঙ্গ থেকে।

আমি কিন্তু মনে মনে বললুম, 'ইয়া আল্লা, তেরো দিনের আরবীকে যদি এরা বলে খাসা তবে এরা নিশ্চয়ই খানদানী মনিষ্য।' করজোড়ে বললুম, 'ভারতবর্ষের নীতি, সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না; আপনাদের নীতি দেখাচ্ছি আরো এক কদম এগিয়ে গিয়েছে, প্রিয় অসত্যও বলবে।'

আজ্ঞা তো—পালিমেন্ট নয়—তাই হরবকৎ কথার পিঠে কথা চলবে এমন কোনো কসমদাব্য নেই। দুম্ করে রমজান বে বললে, 'আমার মামা (আমি মনে মনে বললুম, 'যিগাদাসের মামা') হজ করতে গিয়েছিলেন আর বছর। সেখানে জনকল্লেক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারা নাকি পাঁচ বকৎ নামাজ পড়ত আর বাদবাকী তামাম দিনরাত এক চায়ের দোকানে বসে কিচিরমিচির করত। তবে তারা নাকি কোন এক প্রদেশের—বিজালা, বাঙালী—কি যেন—আমার ঠিক মনে নেই—'

উৎসাহে উত্তেজনার ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে আমি শুধালুম, 'বাঙালী?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলুম, শ্রীমাক্ষদেব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম বাঙালী। কিন্তু কই, কখনো তো এত গর্ব অনুভব করি নি যে, আমি বাঙালী। এই যে নমস্ মহাজনরা মক্কা শহরে আজীবাজ হিসেবে নাম করতে পেরেছেন—নিশ্চয়ই বিস্তর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—তাঁরা আলবৎ, শ্রীষ্ট, নোয়াখালি, চাঁটগা, কাছাড়ের বাঙালী খালাসী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকতা নগরীর উপকণ্ঠে

খিদিরপুরে আঙা মারতে শিখে 'হেলায় মক্কা করিলা জয়' !

আম্বে আম্বে চেয়ার থেকে উঠে ডান হাত বৃকের উপর রেখে মাথা নিচু করে অতিশয় সবিনয় কণ্ঠে বললুম, 'আমি বাঙালী'।

গ্রীক সদস্য মার্কেস প্রথম পরিচয়ের সময় একবার মাত্র 'সালাম আলাইক্' করে খবরের কাগজের পিছনে ডুব মেরেছিলেন। তাঁর কানে কিছূঁ যাচ্ছিল কি না জানি নে। আমি ভাবলুম, রাশভারী লোক, হয়ত ভাবছেন, নতুন মেম্বর হলেই তাঁকে নতুন জামাইয়ের মত কাঁধে তুলে ধেই ধেই করেই নাচতে হবে একথা আঙার কনস্টিটুশানে লেখে না। মূত্থের উপর থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'দাঁও মেরেছি। একটা শ্যাম্পেন হবে? আমাদের নতুন মেম্বর—' কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল মালিক; তার দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত গোল করে বোতল ধরার মূদ্রা দেখিয়ে ডান হাত দিয়ে দেখালেন ফোয়ারার জল লাফানোর মূদ্রা। ম্যানেজার কুঞ্জে দুই ডিগ্রী কাৎ করে ঘাড় নাড়ল।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'এ দোকানে তো মদ বেচার লাইসেন্স নেই।'

মার্কেস বললেন, 'কাফের পেছনে, তার ড্রইংরুমে। ব্যাটা সব বেচে;—আফিম, ককেইন, হেরোইন, হশীশ যা চাও।'

ছোকরাকে বললেন, 'আর একটা তামাকও সাজিস।'

বলে কি? কাইরোতে তামাক! স্বপ্ন নুঁ মায়া নুঁ মতিভ্রম নুঁ?

দিব্য ফশী' হুকো এল। তবে হনুমানের ন্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয় আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন যেন ভৌতা ভৌতা। জরির কাজ করা আমাদের ফশী' কেমন যেন একটু 'নাজুক', মোলায়েম হয়—এদের যেন একটু গাইয়া। তবে হ্যাঁ, চিলিমটা দেখে ভক্তি হল—ইয়া ডাবর পরিমাণ। একপো তামাক হেসেথলে তার ভিতর থানা গাড়তে পারে—তাওয়াও আছে। আগুনের বেলা অবিশ্য আমি টিকের খিকিখিকি গোলাপী গরম প্রত্যাশা করি নি, কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকে বানাবার গৃহ্যতথ্য সেখানকার রসিকরাও জানেন না।

আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।

পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইঞ্জিপশিয়ন সিগারেট ভুবনবিখ্যাত। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তরিবৎ করে বানাতে শিখল কি করে? আইস, সে সম্বন্ধে ঈষৎ গবেষণা করা যাক। এই সিগারেট বানানোর পিছনে বিজ্ঞান ইতিহাস, এস্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়নশাস্ত্র লুঙ্কায়িত রয়েছে।

সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রুশের কাসাগরের পারে পারে। ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া থায়, কিছুটা গ্রীক, কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে তাকিশ এবং ইঞ্জিপশিয়ন নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর আধিপত্য করতো তুর্কী এবং তুর্কী গ্রীসের বেবাক তামাক ইচ্ছাম্বলে নিয়ে এসে

কাগজে পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কক্ষাতে, তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মাখিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনালী নিৰ্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ান সিগারেটে।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন চায়ের টিন যদি রান্নাঘরে ভালো করে বন্ধ না রাখা হয়, তবে ফোড়নের ঝাঁঝে চা বরবাদ হয়ে যায়, অর্থাৎ আর কিছু না হোক খুশবাইটি আঁতুড়ঘরে নুন-খাওয়ানো বাচ্চার মত প্রাণত্যাগ করে। মালজাহাজ লাদাই করা যে অপিসারের কর্ম তিনিও বিলক্ষণ জানেন, যে-জাহাজে কাঁচা তামাক লাদাই করা হয়েছে তাতে কড়া গন্ধওলা অন্য কোনো মাল নেওয়া হয় না—পাছে তামাকের গন্ধ এবং কিণ্ডং স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়।

তাই তামাকের স্বাদ নষ্ট না করে সিগারেটকে খুশবাইয়ে মজানো অতীব কঠিন কর্ম। সিগারেটে একফোঁটা ইউকোলিপ্টস তেল ঢেলে সেই সিগারেট ফর্কে দেখুন, একফোঁটা তেল আশ্চ সিগারেট একদম বরবাদ করে দিয়েছে। পাঁচ বছরের বাচ্চাও তখন সে সিগারেট না কেশে অনাস্রাসে ভস্ ভস্ করে ফর্কে যেতে পারে (বস্তুত বস্তু বেশি ভেজা সিঁদে হলে অনেকে এই পদ্ধতিতে ইউকোলিপ্টস্ সেবন করে থাকেন—যাঁরা সিগারেট সহিতে পারেন না তাঁরা পর্যন্ত)।

বরঞ্চ এমন গুণী আছেন যিনি এটম বমের মাল-মসলা মোশানোর হাড়হন্দ হালহাককং জানেন, কিন্তু তামাকের সঙ্গে খুশবাই! তার পিছনে রয়েছে গুটতর, রহস্যাবৃত ইন্দ্রজাল।

কিছু বাড়িয়ে বলছি নে। অজ্ঞতার দেওয়াল এবং ছবির রঙ কোন্ কোন্ মসলা দিয়ে বানানো হয়েছিল, পাঠানযুগে পাথরে পাথরে জোড়া দেবার জন্য কি মাল কোন্ পরিমাণে লাগানো হয়েছিল আমরা সে তত্ত্বগুলো মাথা খুঁড়েও বের করতে পারি নি এবং পারে নি বিশ্বসংসার বের করতে কি কৌশলে, কি মসলা দিয়ে মিশরীরা তাদের মমীগুলোকে পচার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

স্বীকার করি, মিশরীরাই একদিন সে কান্দা ভুলে মেরে দিয়েছিল—পাঠান-মোগল যুগে যে রকম আমাদের অনেকখানি রসায়নবিদ্যা অনাদরে লোপ পায়। তবু তো আমরা আজও মকরধ্বজ, চাবনপ্রাশ বানাতে পারি—ভেজাল তো শূরু হল মাত্র সেদিন, আমাদেরই চশমার সামনে।

মিশরীরাও ঠিক সেই রকম সুগন্ধ-তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুলে যায় নি। ঝড়তি-পড়তি যেটুকু এলেম তখনো তাদের পেটে ছিল তাই দিয়ে তারা সেই সমস্যা সমাধান করলো, তামাকে কি করে খুশবাই জোড়া যায়, তামাকের ‘সোয়াদ’টি জখম না করে।

তাই যখন কোনো ডাকসাইটে তামাক কদরদারের (হায়! এ গোত্র পৃথিবীর সর্বত্র কি কাবুল, কি দিল্লী, কি কাইরো—সুকুমারের ভাষায় বলি—হুশ হুশ করে মরে যাচ্ছে) তদারকিতে কাইরোর কাফেতে তামাক সাজা হয় এবং সেই কদরদার যখন সে তামাকের নীলাভ খঁয়োটি ফুরফুর করে নাকের ভিতর দিয়ে

ছাড়েন এবং নীলনদের মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া যখন সেই ধূঁরোটির সঙ্গে রসকেলি করে তাকে ছিন্নভিন্ন করে কাফের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, তখন রাস্তার লোক পর্যন্ত উন্মাদিক হয়ে থমকে দাঁড়ায়, পাড়ি সিগারেথেকো, পাইকারি সিগারেটফোঁকা পর্যন্ত বৃক্কের উপর হাত রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে ‘অলহমদুলিল্লা’ (খুদাতালাার তারিফ) বলে।

আর হীলিশের বেলা যে-রকম হয়েছিল, এ অধম ঠিক সেই রকম তাজ্জব মানে, বেহশতের বর্ণনায় এ তামাকের বয়ান নেই কেন? তা হলে পাপ করে নরকে যেত কোন্ মূর্খ?

বাঙালী তার চুলটিকে কেতাদুরস্ত করে রাখতে ভালোবাসে, কাবুলী বেলা-অবেলা মোকা পেলেই তার পায়জারে গুটিকয়েক পেরেক ঠুকিয়ে নেয়, ইংরেজ আয়না সামনে পেলেই টাইটা ঠিক মধ্যখানে আছে কি না তার তদারকিতে বাস্তব হয়ে পড়ে, পেশাওয়ারী পাঠানের প্রধান শিরঃপাড়া তার শিরাভরণ নিয়ে, আর মিশরীর চরম দুর্বলতা তার জুতো জোড়াটিকে ‘বালিশ’ (আরবী ভাষায় ‘প’ অক্ষর নেই, তাই ইংরাজি ‘পালিশ’ কথাটা মিশরীতে ‘বালিশ’ রূপ ধারণ করেছে) রাখার জন্যে।

অতএব কাফেতে ঢোকামাত্রই কাফের ‘বুৎ-বালিশ’ (অর্থাৎ বুট পালিশ করনেওলা) ছোকরা এসে আপনাকে সেলাম ঠুকবে। আপনি তাকে বিলক্ষণ চেনেন, তাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলবেন, ‘যা, যা’—তার অর্থ ‘আচ্ছা পালিশ কর।’ সে বরিশখানা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে আপনার ‘বুৎ-বালিশ’ কর্মে নিষ্পত্ত হবে।

সদস্যদের কেউ বলবেন, ‘শুভ দিবস’ কেউ ‘এই যে’, কেউ একটু মৃদু হাস্য করবেন, আর কেউ মৃদু খবরের কাগজের আড়ালে রেখেই কাগজখানা ঈষৎ দুলিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে আপনার কক্ষ এসে উপস্থিত। ওয়েটার ঠিক জানে, আপনি কতটা কড়া, কতখানি চিনি আর কোন্ ঢঙের পেয়ালার কক্ষ খেতে পছন্দ করেন। আপনি বলবেন, ‘চিঠিপত্র নেই?’

অর্থাৎ গৃহিণীর ভয়ে আপনি প্রিয়াকে কাফের ঠিকানা দিয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, ‘ফোন?’

‘আজ্ঞে না। তবে ইউসুফ বে আপনাকে বলতে বলেছেন, তিনি একটু দেরিতে আসবেন। আপনি যেন না যান।’

‘চুলোয় যাক গে ইউসুফ বে। আমি জিজ্ঞেস করছি, চিঠি বা ফোন নেই?’

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, ‘আজ্ঞে না।’ জানে আজ আপনি দরাজ হাতে বখশিশ দেবেন না।

‘যাও, চিঠির কাগজ নিয়ে এস।’

কাফের নাম-ঠিকানা-লেখা উত্তম চিঠির কাগজ, খাম, ব্রটিং প্যাড যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এক মিনিটের ভিতর উপস্থিত হবে। আপনি পাশের টেবিলে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রেমপত্র লিখে যখন ঘণ্টাখানেক পরে আন্তার টেবিলে ফিরে ওয়েটারকে বলবেন, চিঠিটা ডাকে ফেলতে, তখন হঠাৎ রমজান বে শুধাবে,

‘কাকে লিখলে?’ যেন কিছুই জানে না।

চটে গিয়ে বলবেন, ‘তোমার তাতে কি?’

রমজান বে উদাস সুরে বলবে, ‘না, আমার তাতে কি। তবু বলছিলাম, সকালে বিল্কিসের সঙ্গে দেখা। সে তোমাকে বলে দিতে বললে, তুমি যেন সাড়ে এগারোটায় “ফামিনা” সিনেমার গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা করো।’

আরো চটে গিয়ে বলবেন, ‘তাহলে এতক্ষণ ধরে সেটা বলো নি কেন?’

‘সাড়ে এগারোটা বাজতে তো এখনো অনেক দেরি।’

‘আঃ, সে কথা হচ্ছে না। আমি যে মিছিমিছি এক ঘণ্টা ধরে চিঠিটা লিখলাম।’

রমজান বে আরো উদাস সুরে বলবে, ‘জানি নে, ভাই, তোমাদের দেশে প্রেমের রেওয়াজ কি। এদেশে তো জানি, প্রিয়া পাণের ঘরে, আর এ-ঘরে বসে প্রেমিক পাতার পর পাতা প্রেমপত্র লিখে যাচ্ছেন।’

এতক্ষণ একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থিত হল। রেশনশপ খোলা মাত্রই মেয়ে-মস্দের যে রকম দোকানের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তামাম আস্থা ঠিক সেই রকম প্রেমপত্র লেখার সময়-অসময়, মোকা-বে-মোকা, কায়দা-কেতা সম্বন্ধে আলোচনা জুড়ে দেবে।

ক্রমে ক্রমে আলোচনার বিষয়বস্তু হটতে হটতে পৌঁছবে সেই সনাতন প্রশ্নে, কোন্ দেশের রমণী সব চেয়ে সুন্দরী হয়।

অবান্তর নয়, তাই নিবেদন করি, দেশ-বিদেশ ঘুরেছি, অর্থাৎ ভ্যাগাবন্ড হিসাবে আমার ঈশ্বর বদনাম আছে। কাজেই আমাকে কেউ শূদধান, কোন্ দেশের রান্না সবচেয়ে ভাল, কেউ শূদধান, তুলনাত্মক কাব্যচর্চার জন্য কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশস্ততম, আর অধিকাংশ শূদধান, কোন্ দেশের রমণী সব চেয়ে সুন্দরী?

আমি কলির পরশুরামের স্মরণে উত্তর দি, ‘এনারা আছেন, ওনারাও আছেন।’ কারণ যারা দেশ-বিদেশ ঘোরেন নি, তাঁদের সঙ্গে এ-আলোচনাটা দানা বাঁধে না, বস্তু একতরফা বস্তুতার মত হয়ে যায়, আর সবাই জানেন, বস্তুতা আন্ডার সব চেয়ে ডাঙর দৃশ্যমান।

এ সংসারে যদি কোনো শহরের সত্যকার হক থাকে, উপযুক্ত প্রাণাভিরাম বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তবে কসম খেয়ে বলতে পারি, সে শহর কাইরো। কারণ কাইরোতে খাঁটি বাসিন্দারূপে যুগ যুগ ধরে আছে গ্রীক, আরব, তুর্কী, হাবশী, সুদানী, ইতালীয়, ফরাসিস, ইহুদী এবং আরো বিস্তর চিড়িয়া। এদের কেউ কেউ বোরকা পরেন বটে, তবু অক্লেশে বলা যেতে পারে, কাকের দরজার দিকে মুখ করে বসে, আঙা অনায়াসে নিজের মূখে ঝাল খেয়ে নিতে পারে।

আর শীতকাল হলে তো পোয়া বারো। কাইরোতে বছরে আড়াই ফোঁটা বৃষ্টি হয়, সাহারার শূকনো হাওয়া যক্ষ্মারোগ সারিয়ে দেয়, পিরামিড কাইরোর বাইরেই ঠায় বসে, ফুর্তি-ফার্তির নামে কাইরো বে-এস্তিয়ার, মসজিদ-কবর কাইরো শহরে বে-শুয়ার, শীতকালে না-গরম-না-ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সবসুখ জড়িয়ে মড়িয়ে

কাইরো টুরিস্টজনের ভ্ৰম্ভবর্গ এবং টুরিস্টদেরও বটে।

তদুপরি মার্কিন লক্ষপাত্রীরা আসেন নানা ধান্দায়। তাঁদের সম্মানে আসেন তাবৎ দুনিয়ার ডাকসাইটে সুন্দরীরা। তাঁদের সম্মানে আসেন হালিউডের ডিরেক্টররা এবং তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন আরেক ঝাঁক সুন্দরী।

কিন্তু থাক্ সুশীল পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো, কামিনী-কাক্স সম্বন্ধে আলোচনা শাস্ত্রে নিষেধ। গুরুদুর বারণ।

*

*

*

মিশরী আন্তাবাজরা (দাঁড়ান, ব্যাকরণে ভুল হয়ে গেল, মিশরী মাত্রই আন্তাবাজ : এমন কি সাদ্ জগল্লু পাশা পর্যন্ত দিনে অত্যন্ত একবার আন্তার সম্মানে বেরতেন। তবে, হাঁ, তিনি কোনো টেবিলে গিয়ে বসলে কেউ সাহস কবে সে টেবিলের গ্লিসীমানায় ঘেঁষত না। নেখান থেকে তিনি চোখের ইশারায় এঁকে ওঁকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আন্তা জমাতেন) দৈবাৎ একই আন্তায় জীবন কাটান। বিষয়টা সবিষ্মর বদ্বিয়ে বলতে হয়।

এই মনে করুন, আপনি রোজ আপিস ফেরার পথে 'কাফে দ্য নীলের' উক্তর-পূর্ব কোণে বসেন। সেই টেবিলটায় আপনার জন-পাঁচেক দোস্ত বসেন। আন্তার ফুল স্টেন্থ্ জন দণ—সবাই কিন্তু সব দিন এ আন্তাতেই আসেন না। তাই হরে-দরে আপনার টেবিলে জন পাঁচ-সাত নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

এ ছাড়া আপনি সম্ভাহে একদিন—জোর দু'দিন, বাড়ির পাশের সেমিরামিস কাফেতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসেন। এ আন্তার সদস্যরা কিন্তু আপনার 'কাফে দ্য নীলের' সদস্যদের বিলকুল চেনেন না। এরা হয়ত চ্যাংড়ার দল, কলেজে পড়ে, কেরানীগির করে, বেকার, কিংবা ইনিশিওরেন্স এজেন্ট (তার অর্থও বেকার)। এদের আলোচনার বিষয়বস্তু রাজনীতি, অর্থাৎ কোন পাশার কউ কোন মিনিষ্টারের সঙ্গে পরকীয় করেন বলে তাঁর বোনপো পার্টিতে ভালো নোকার পেয়ে গেল, কিংবা আলোচনার বিষয়বস্তু সাহিত্য, অর্থাৎ কোন প্রকাশক এক হাজারের নাম করে তিন হাজার ছাপিয়ে বেণ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া অবশ্যই দুনিয়ার হাজারো জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়, তা না হলে আন্তা হবে কেন। এ আন্তার সদস্যদের সবাই সবজান্তা। এরা মিশর তথা তাবৎ দুনিয়ার এত সব গুহা এবং গরম গরম খবর রাখেন যে এদের কথাবর্তা, হাবভাব দেখে আপনার মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না যে এদের প্রত্যেকের চোখের সামনে এক অদৃশ্য, অশ্রুত টেলিপ্রিন্টার খবর জানিয়ে যাচ্ছে এবং সে খবরের যোগান দিচ্ছেন রাশার বেরিয়া, জার্মানির হিমলার আর কলকাতার টেগার্ট। রোজ বাড়ি ফেরার সময় আপনি তাম্ভব মানবেন, এদের সাহায্য ছাড়া মিশর তথা দুনিয়ার বাদবাকী সরকারগুলো চলছে কি করে। আপনার মনে আর কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না যে, এদের যদি মট্‌স্কা, বার্লিন, ল'ডন, দিল্লীর বড়কর্তা বানিয়ে দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ায় কুল্ল সমস্যার সাকুল্য সমাধান এক লহমায়ই হয়ে যাবে। মনে মনে বললেন, 'হায়, দুনিয়া, তুমি জানছো না তুমি কি হারাছো।'

আপনি এদের চেয়ে বছর দশেক বড়, তাই এরা আপনাকে একটুখানি সম্মিহ করে, যদিও আড় না হয়েই বিড়ি টানে। কারণ এদেশে সে রেওয়াজটা তেমন নেই। আপনি নিতান্ত বিদেশী বলেই এ আড্ডায় ছিটকে এসে পড়েছেন। এদের কাউকে পয়সা আড্ডায় নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি নিজে গিয়েছিলুম; বেচারী সেখানে রা'টি কাড়ে নি যদিও দূসরা আড্ডাতে সেই তুড়পাতো সব চেয়ে বেশী।

তা ছাড়া আপনি মাসে এক দিন কিংবা দু' দিন শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা কাফেতে যান। আপনার এক বন্ধু সে কাফেটারই উপরতলায় থাকেন। খাসা জায়গায়—সামনেই নীল নদ বয়ে যাচ্ছে। আপনারই বন্ধু এখানকার এ-আড্ডায় সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে প্রথম খুঁজবেন কাফেতে—সেখানে না পেলে অবশ্য তাঁর ফ্যাটে যেতে পারেন, তাতে কিন্তু কোনো লাভ নেই।

এ কাফে আপনাকে উৎসাহ দেয় অভ্যর্থনা করবে যেন আপনি অনেক দিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরে-পাওয়া ভাই। কারণ আপনি এখানে আসেন কালে-ভদ্রে। আপনাকে পেয়ে এঁদের বিশেষ আনন্দ কারণ পক্ষাধিক কাল ধরে তাঁরা যে সব বিষয় কেটেকুটে ঘষে পিষে চাটানি বানিয়ে ফেলেছিলেন সেগুলো তাঁরা নতুন করে হাড়কাটে ঢুকিয়ে রাম দা' ওঁচাবেন। আপনার রায় জানতে চাইবেন। যে রায়ই দিন না কেন আপনার উদ্ধার নেই। আপনি যদিও গাঁধীর দেশের লোক—আপনি অবশ্য একশ' বার ওঁদের বলেছেন যে, গাঁধীর সঙ্গে আপনার কোনো প্রকারে সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, কিন্তু তাতে করে কোনো ফায়দা ওঁরায় না—যদিও আপনার স্তানগমিতে কারো কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আপনি গৃহ্য ষষ্ঠেন্দ্রিয় ধারণ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তবু স্বীকার করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি নিখাৎ শেষ বাস্ মিস করবেন। বন্ধুর ফ্যাটে সোফার উপর চতুর্থ বাম ঘাপন করে পরদিন সকাল বেলা বাড়ি ফিরবেন।

ধূপ-ছান্না

জাহাজে শেষ রাতি। পরদিন ভেনিস পৌঁছব।

তিনদিন ধরে কারো মুখে আর কোনো কথা নেই—শেষ রাতে যে জহর ফ্যান্সি বল হবে তাই নিয়ে সুবো-শাম জল্পনা-কল্পনা! মহিলারা কে কি পরবেল তাই ভেবে ভেবে আকুল হয়ে উঠেছেন কিন্তু কে কোন্ বেশ ধরবেন সে কথা একে অন্যের কাছ থেকে একদম চেপে যাচ্ছেন। নিতান্ত বিপদে পড়লে তবু বরঞ্চ কোনো পুরুষের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিন্তু স্ত্রীলোক?—নৈব নৈব চ। বুদ্ধলুম, আমাদের দেশে ভুল বলে না, 'বরঞ্চ যমের হাতে স্বামীকে তুলে দেব তবু সতীনের কোলে নয়'। এস্থলে বরঞ্চ অপরিচিত, অধঃপরিচিত হুলোর সাহায্য কবুল, তবু কোনো মেনির ছান্না মাড়াব না।

আমি নির্ঝঞ্জিট মানুষ, বরষে চ্যাংড়া, চম্বিশ হয় কি না হয়। ভয়ে কারোর

সঙ্গে কথা কই নে, পাছে এটিকেটের ব্যাকরণ-ভুল হয়ে যায়। আমার কেবিনে—বিবেচনা করুন খুদ কেবিনে, ‘ডেকে’ না, ‘লাউঞ্জে’ না—এক গরীবনী ফরাসিনী ভামিনী এসে উপস্থিত, ‘মিস্সো, তিন সতি দাও, কাউকে বলবে না, তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি।’

বাপ মা আদর করে বলতেন আমার নাকি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আমি বিলক্ষণ জ্ঞানি, আমার বর্ণ কি? আমারই এক বন্ধু আমার রঙ দেখিয়ে দোকানদারকে বলেছিলেন, ঐ রঙের বট-পলিশ দিতে। লঙ্জায় সেই বর্ণ টিকেয় আগুন ধরার রঙ চড়ালো। সাত বার খাবি খেয়ে বললুম, ‘ইয়েস, ইয়েস, উই, উই, উই; বিলক্ষণ, বিলক্ষণ!’

বললেন, ‘আপনার সিলেক্ট প্যাগড্‌টো এক রাতের মত ধার দিন।’ আমার মত কালো কুচ্ছংকে তিনি প্রেমনিবেদন করবেন সে দুঃশা আমি করি নি কিন্তু নিতান্ত গদ্যময়ী প্যাগড্‌! কে বলে ফরাসিনী সুরসিকা?

তা যাক্‌ গে—এইটে আসল বক্তব্য নয়। মোশদা কথা, এই করে করে ফ্যান্সি বল্‌ ‘রূপায়িত’ হল।

ইলাহি ব্যাপার, পেঞ্জাই কাণ্ড। শিখের বাচ্চা দাড়িমাড়ি বাগিয়ে ভলগা-মাঝির পোশাক পরে নাচছে চীনা পাজ্যমা-কুর্তা পরা নধরা ভিয়েনা-সুন্দরীর সঙ্গে, বগলে ঝাড়ু দেবে মেথরানীর বেশ পরে ফরাসিনী খেই খেই করছেন স্প্যানীয় রাজপুত্রের বেশে মিশকালো নিগ্রোর সঙ্গে, রেড্‌ ইন্ডিয়ানের রঙ মেখে জাপানী তুকাঁ-নাচন নাচছেন এক পাসী নারীর সঙ্গে—তার সর্বাঙ্গ প্যাকিঙের ব্রাউন-পেপারে মোড়া, তদুপরি কালো হরফে লেখা ‘ফ্রেজাইল, উইথ কেয়ার’—কাঁচের বস্তু, ভঙ্গুর, সাবধানে নাড়াচাড়া করো।’

এ সব বস্তু রপ্ত হতে বাঙালী ছেলের সময় লাগে।

আমি কি পরে গিয়েছিলুম তা আর বলব না। একেই তো মর্কটের মত চেহারা, তাকে ‘ফিন্সি’ করলে বাড়ি শুকনোর সময় কাগ তাড়াবার জন্য পাড়ার ডাক পড়বে।

‘বারে’ গিয়ে দাঁড়ালুম।

উঃ! চ্যাংড়া-চিংড়ীরা কী বেদম ফুঁতটাই না করতে জানে। হোল্লির দিনে যেমন মানুষ গায়ে রঙ মাখে এরা ঠিক তেমনি দূ পান্তর রঙিন জল গিলে মনে রঙ লাগিয়ে নিরেছেন। চোখ অল্প অল্প গোলাপী হয়ে গিয়েছে—বিশ্ব-সংসার গোলাপী রঙে ছোপানো বলে মনে আমেজ লাগছে। না হয় খর্চা হয়েই গেল শেষ কড়ি—খর্চা না করলে খুদা আরো পয়সা দেবেন কি করে? না হয় নাচলই লক্ষ্মীছাড়া মেরিটা ঐ খাটাশ-মুখো সেপাইটার সঙ্গে তোমাকে ছোলাগাছ দেখিয়ে—ভয় কি, আরো মেলা মেরি ফেনী রয়েছে। মনে আরেক পৌচ রঙ লাগিয়ে লাও হে লাটুবাবু, বাবুদা যখন অত করে কইচেন। বেবাক বাৎ ভুলে যাবে। অত সিরিয়স হনো না মাইরি, এই শেষ পরবের রান্তরে।

তার সঙ্গে একোণে ও কোণে, হেথা-হোথা, একে অন্যর কানে কানে কত ‘মুদু মমর গানে মমের বাণী বলা’, কত ‘বেদনার পেয়ালা’ ভরে গেল কত হিয়ার,

কত গান উঠলো বৃকে বৃকে, 'পিয়ো হে পিয়ো'।'

অরকেশ্ট্রা কিন্তু ঢাক ঢোল কন্ডাল বাজিয়ে হৃৎকার দিচ্ছে—

'ওগো, ডনা ক্লারা, তোমাকে আমি নাচতে দেখেছি

ওগো ডনা ক্লারা, তোমার সোনার ছবি বৃকে এঁকেছি।'

*

*

*

বাইরে এসে ডেকের সুন্দরতম প্রান্তে একখানা চেয়ার টেনে একলাটি চুপ করে বসলুম। সিগার সিগারেটের অত্যাচারে সমুদ্রের লোনা হাওয়া জলসাঘরে নাক গলাতে পারে নি; আমাকে পেয়ে খুশী হয়ে আমার সর্বাঙ্গে আদর করে হাত বুলিয়ে গেল।

আজ কি অমাবস্যা? এরকম অন্ধকার শ্রাবণ-ভাদ্রের মেঘাচ্ছন্ন অমা-ষামিনীতেও দেশে কখনো দেখি নি। গাছপালা, বাড়িঘরদোর যেন অন্ধকারের খানিকটে শুষ্ক নেয় বলে ডাক্তার অন্ধকার সমুদ্রের অন্ধকারের চেয়ে অনেকখানি হালকা। এখানে দিনের বেলাকার নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ রাত্রিবেলায় যেন এক হয়ে মিশে গিয়ে জমে উঠে গড়ে তুলেছে এক ঘনকৃষ্ণ অন্ধ-প্রাচীর, না—আরো কাছে এসে আমার চোখে মাখিয়ে দিয়ে-গেছে কৃষ্ণাঞ্জন।

শুধু চিলিক মেরে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে প্রপেলারের তাড়ায় ভেসে-ওঠা ফেনা আর বৃন্দবৃন্দ। ঐ ফেনাটুকু মাঝে মাঝে না দেখতে পেলো মনে ভয় জাগত অন্ধ হয়ে গিয়েছি, জলসাঘরের দিকে ছুটে গিয়ে আলো দেখে সেখান থেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে হত।

জাহাজের ফ্লুপিংড যেন ধপ্ ধপ্ করছে—তাই অষ্টপ্রহর একটা একটানা মৃদু শিহরণ জাহাজের সর্বাঙ্গে লেগেই আছে। সে শিহরণ এমনিতে দেহেমনে অস্বস্তি জাগায় কিন্তু আজ এই মৃত্যু-অন্ধকারে সে স্পন্দন যেন আমার চৈতন্যবোধকে গভীরতম সুস্বপ্ন থেকে বাঁচিয়ে রাখল।

কান্নার শব্দ?

তাজা হাওয়া পাওয়ার জন্য কে যেন সুন্দর জলসাঘরের একখানি জানাঙ্গা খুলে দিয়েছে। তারই ক্ষীণ আলোতে দেখি একটি মেয়ে রেলিঙে মাথা রেখে কাঁদছে।

এ মেয়ে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল তার স্বামীর সঙ্গে হিন-মুন যাপন করতে। সেখানে স্বামী হঠাৎ মারা যায়। দেশে ফিরে যাচ্ছে একা ॥

মেশেদিনী

আরেক জাহাজে একটি মহিলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বয়স, এই ধরুন চল্লিশের সামান্য এদিক-ওদিক। লিপস্টিক, রুজ, পাউডার মাখলে অনায়াসে পরিচিশ বলে চালিয়ে নিতে পারতেন। মৃদু আর রঙ দেখে বোঝা গেল ইনি খাঁটি মেম নন, কিন্তু ঠিক কোন্ দিশী সেটা অনুমান করতে পারলুম না। পরনে পুরনো ধরনের লম্বা ফ্রক আর গায়ে লম্বা-হাতা ব্লাউজ। চোখে মৃদু ভারী একটা প্রশান্তির ভাব লেগে আছে—একটুখানি কেমন যেন উদাস-উদাস বললেও স্কুল

বল্ল হইয়া না।

কিন্তু তাঁর চেহারা, বেশভূষা, ধরনধারণ সেইটে আসল কথা নয়। তিন চার দিন যেতে না যেতেই লক্ষ্য করলুম, এযাবৎ তাঁকে কারো সঙ্গে একটি মাত্র কথাও বলতে শুনি নি। সমস্ত দিন লাউজের এক কোণে একা বসে বসে কাটান; তাঁর টেবিলে অন্য কাউকে এসে কথা বলতেও দেখি নি। ওঁর চেয়ে দেখতে খারাপ, বয়সে বেশী, এমন রমণীরাও যখন প্রৌঢ়দের নেকনজর পাচ্ছেন, দু'দু' রসালাপ করাবার অবকাশও পাচ্ছেন, তখন ইনিই বা জাহাজ-যন্ত্রশালার প্রান্তভূমিতে সঙ্গরসের উপেক্ষিতা কেন?

কাউকে জিজ্ঞেস করার মত সাহসও খুঁজে পাই নে। উনি আমার মা হতে পারেন, বেশী জিজ্ঞেসবাদ করলে ঠোটকাটারা হয়তো বলে বসবে, 'ইডিপস কম্পুলেক্স' কিংবা ঐ ধরনেরই কিছু একটা।

তখন হঠাৎ একদিন দেখি, আমারই পরিচিত এক সহযাত্রী লাউজের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ওঁকে নমস্কার করলেন, উনিও উত্তর দিলেন। তাঁকে তখন সুবিধে মত এটা, ওটা, পাঁচটা কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, মহিলাটি কারো সঙ্গে কথা কন না কেন? ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করে কথা বলবেন? উনি তো ফার্সী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানেন না। ওঁর বাড়ি মেশেদ'। তারপর বললেন, 'আপনি না কাবুলে ছিলেন? সেখানকার ভাষা পশতু না ফার্সী' কি যেন?'

আমি বললুম, 'ফার্সী' অনেকখানি ভুলে গিয়েছি; তবে এককালে ফার্সী'র মাধ্যমে কাবুলে ইংরিজি পড়িয়েছি।'

আর যাবে কোথায়। আমাকে হিড়'হিড় করে হাতে ধরে টেনে নিয়ে চললেন সেই মহিলার দিকে—যেন জলে-ডোবা মানুষকে দম দেবার জন্য বদী খুঁজে পেয়েছেন। আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে এমন একখানা মিষ্টি হাসি ছাড়লেন, যেন তিনি এখুঁনি আমাকে আপন হাতে গড়ে তৈরি করেছেন। নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া ব্যাটাকেও বোধ হয় বাপ এতখানি দেমাকের সঙ্গে দু'নিয়ার সামনে পেশ করে না।

তারপর বললেন শুধু একটি কথা—'ফার্সী'।'

মহিলাটিও এই হুস্তোড়ের মাঝখানে একটুখানি ভাষাচাচাকা থেয়ে গিয়েছেন। সামলে নিয়ে শূন্যলেন, 'আপনি ফার্সী' বলতে পারেন?'

আমি সবিনয় বললুম, 'এককালে পারতুম।'

ভারী একটা পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'বসুন।'

তারপর বললেন, 'আমি যে বেশী কথা কইতে ভালবাসি তা নয়, তবে এই পাঁচ দিন ধরে একটি কথাও বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠছি। আমি সমস্ত জীবন কাটিয়েছি ইরানের মেশেদ শহরে। তারপর গেল আট বছর লন্ডনে।'

আমি শূন্যলুম, 'ইংরিজি শেখেন নি সেখানে?'

বললেন, 'না, লন্ডনে তো আমি ইচ্ছে করে যাই নি। আমার স্বামী মেশেদে সর্বস্বান্ত হয়ে লন্ডন গেলেন তাঁর কাকার কাছে। আমরা ইহুদি,

জানেন তো, আমরা ব্যবসা করি দু'নিয়ার সর্বত্র। সেখানে ও'র দু'পয়সা হয়েছে, কিন্তু আমাদের আর ইংরিজি শেখা হল না। ইরান ইহুদিরা যে দু'চারজন ল'ডনে আছেন, তাঁদের সঙ্গেই মেলামেশা করি, কথাবার্তা কই। তবে হাট করতে গিয়ে "গ্রীন পীজ, কলি-ফাওয়ার, টাপেস, ট্রাপেস-হে পেনি" বলতে পারি, বাস।'

আমি বললুম, 'ইংরিজি তো তেমন কঠিন ভাষা নয়, আর আপনি যে, দু'চারটে ইংরিজি বললেন সেগুলো তো খুব শৃঙ্খল উচ্চারণে।'

মহিলাটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি করে শিখি বলুন? আমার মন পড়ে আছে সেই মেশেদ শহরে। ল'ডন সাফসংরো জায়গা, বিজলি বাতি, জলের কল, খাওয়াদাওয়া, থিয়েটার সিনেমা সবই ভালো—কোথায় লাগে তার কাছে বড়ো গরিব মেশেদ? তবে যদি জানতুম একদিন সেই মেশেদে ফিরে যেতে পারবো, তাহলেও না হয় ল'ডনটার সঙ্গে পরিচয় করার চেষ্টা করতুম, কিন্তু এখনই ভাবি ঐ শহরে আমাকে একদিন মরতে হবে, আমার হাড় ক'খানা বাপ-পিতামোর হাড়ের কাছে জায়গা পাবে না, তখন যেন সমস্ত শহরটা আমার দুশমন, আমার জল্পাদ বলে মনে হয়।'

আমি বললুম, 'আপনার এমন কি ব্যস হয়েছে যে আপনি মরার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন?'

'তেমন কিছু নয়, জানি, কিন্তু এখন এ কথাও জানি যে, ল'ডনেই মরতে হবে, তখন যেন ব্যসের আর গাছ-পাথর থাকে না।'

আমি শূন্যলম্ব, 'মেশেদে ফিরে যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? আপনি না বললেন, আপনাদের দু'পয়সা হয়েছে।'

মহিলাটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। বুদ্ধলম্ব, সব কিছু আমাকে প্রথম পরিচয়েই বলবেন কি না, তাই নিজে মনে মনে তোলাপাড় করলেন। শেষটার বললেন, 'দুঃখ তো সেইখানেই। আজ আমাদের যা টাকা হয়েছে, তাই নিয়ে আমরা মেশেদের পুরনো ভিটে, জমিজমা সব কিছু কিনতে পারি, নতুন ব্যবসা ফাঁদতে পারি।'

আবার নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দুঃখ তো সেইখানেই। আমার স্বামী যেতে চান না। ল'ডন তাঁর ভালো লেগে গিয়েছে। ভূতের মত খাটেন, পয়সা কামান আর মোটর-হোটেল, রেস্টুরাঁ-ক্লাব, কনসার্ট-কাবারে করে করে বেড়ান। আমার উপরও চোটপাট, আমিও কেন সঙ্গে সঙ্গে হেঁ-হেঁ করি না।'

বললেন, 'বুঝলেন--এখন তিনি ল'ডনের প্রেমে; বড়ী মেশেদকে বেবাক ভুলে গিয়েছেন।'

জাহাজে যে ক'দিন ছিলুম রোজ দু'একবার ও'র কাছে গিয়ে বসতুম। ভদ্রমহিলা নিজের থেকেই একদিন বললেন, 'আপনি যেন না আবার ভাবেন আমি আপনার এক বোঝা হয়ে উঠলুম। যাদের সঙ্গে হেঁহল্লা করতে আপনি ভালোবাসেন তাঁদের বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে বেশী সময় কাটাবার কোনো

প্রয়োজন নেই।’

আমি আপত্তি জানালুম।

তবু তিনি শান্তভাবে লাউজে আপন কোণে বসে থাকতেন; কথা বলার জন্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো চেষ্টাই করতেন না। আমি কাছে গেলেই মিষ্টি হেসে বলতেন, ‘বসুন’; তার পর শূন্যতনে, ‘কি খাবেন বলুন।’ জাহাজে খাবার ব্যবস্থা কুলীন শব্দরুবাড়ির মত, কাজেই এস্থলে ‘খাবার’ বলতে পানীয়ই বোঝায়।

আমি একদিন বললুম, ‘প্রতিবারেই আপনি আমাকে কিছুর একটা খেতে বলেন কেন, বলুন তো?’

অবাক হয়ে বললেন, ‘কী আশ্চর্য! আপনি মেশেদে অর্থাৎ ল’ডনে আমার বাড়িতে এলে আপনাকে ভালোমন্দ খেতে দিতুম না?’

আমি বললুম, ‘কিন্তু এটা তো আপনার বাড়ি নয়।’

তিনি বললেন, ‘সে কি কথা! আমার কাছে এলেন তার মানে আমার বাড়িতে এলেন।’

তারপর বললেন, ‘কিন্তু এখানে দিই বা কি? আচ্ছা বলুন তো, আপনি জাহাজের এই বিলিতি রান্না খেতে ভালোবাসেন?’

আমি বললুম, ‘এ জাহাজের রান্নার খুশনাম আছে। আমি কিন্তু আমাদের দিশী রান্নাই পছন্দ করি।’

হেসে বললেন, ‘তবে আপনার রসবোধ আছে! এই আইরিশ স্টু আর বাঁধাকপি-সসন্ধ্য মানুষ কি করে খায় খোদায় মালুম। সেদিন আবার পোলাও রেখেছিল—মাগো! ছিরি দেখে ভিরমি যাই।’

আমি শূন্যতন, ‘মেশেদের লোক পোলাও খায়?’

বললেন, ‘হায়, জাহাজে আপন রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই তা না হলে আপনাকে এয়াসা পোলাও খাইয়ে দিতুম যে জীবনভর তার সোয়াদ জিভে লেগে থাকত। ভালো কথা, আপনি তো বোম্বাই যাচ্ছেন সেখানে আপনাকে আচ্ছাসে পোলাও খাইয়ে দেব।’

আমি বললুম, ‘আমি তো ভেবেছিলাম আপনি মিশর যাচ্ছেন।’

তিনি বললেন, ‘ওঃ, আপনাকে বলি নি বন্ধি, আমি বোম্বাই যাচ্ছি—আমার মেয়ের সেখানে বিয়ে হয়েছে। যে ভদ্রলোক আপনাকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি আমার স্বামীর বন্ধু। উনি বিপদে-আপদে সাহায্য করতে পারবেন বলেই এই জাহাজে যাচ্ছি।’

তারপর একটুখানি লাজুক হাসি হেসে বললেন, ‘আমি যে দিদিমা হতে চললুম।’

তারপর রোজই গল্প হত তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে। আমাকে কতবার জিজ্ঞেস করতেন, বোম্বাইয়ে ভালো ডাক্তার-বদ্যার ব্যবস্থা আছে কি না। আমি বলতুম, ল’ডনের মত না, তবে ব্যবস্থা মেশেদের চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো। ইঞ্জেক জর্মীনেতে পাস-করা ইহুদী ডাক্তারও বোম্বাইয়ে আছেন।

বললেন, ‘ও কথা বলবেন না, মশাই ; মেশেদে আমাদের যে বড়ী ধাইন্স ছিলেন তাঁর হাতে কখনো কোনো পোয়াতী মরে নি, কোনো বাচ্চা কোনো জখম নিয়ে জখ্মান নি । আর তাঁর সব কেরদানি তো শুধুমাত্র দু’খানা খালি হাত দিয়ে —ডাক্তারদের যন্ত্রপাতির তো উনি ধার ধারতেন না ।’

আমি বললুম, ‘আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে এখনো এ রকম ধাই আছেন তবে বোম্বাই শহর, সেখানে সায়েব-সুবোদের ব্যাপার ।’

উৎসাহিত হয়ে বললেন, ‘আপনি ঠিক ধরেছেন কিন্তু আজকের দিনের বড় শহরে কেউ আর একথা মানে না । আমার মেয়েকে চিঠিতে ঐ কথা লিখেছিলুম, সে তো হেসেই উড়িয়ে দিল ।’

চুপ করে থেকে বললেন, ‘আর দেবেই না কেন ? ওর ছেলেবেলা ও মেশেদে কাটিয়েছে কিন্তু মেশেদের জন্য তো ওর এতটুকু দরদ নেই । আমার শ্বামীরই মত, ল’ডন-প্যারিসের নামে অজ্ঞান ।’

আমি সান্দ্রনা দিয়ে বললুম, ‘আপনি এ নিয়ে এত শোক করেন কেন ? সে সব কাল গেছে, জমানা বদলে গিয়েছে ; এখনও মানুষ আঁকড়ে ধরে থাকবে নাকি মেশেদ কারবালা, কান্দাহার হিরাত ?’

বললেন, ‘কেন, আপনি তো প্যারিস ভিয়েনা ল’ডন বার্লিন দেখেছেন—তবু তো ফিরে যাচ্ছেন কোথাকার এক ছোট শহরে ।’

আমি ঘাড় চুলকে বললুম, ‘আমার যে মা রয়েছে ।’

বললেন, ‘একই কথা ; মা যা মায়ের শহরও তা ।’

*

*

*

বোম্বাইয়ে জাহাজ ভিড়েছে । এক সুন্দরী তরুণী আর ছোকরাকে দেখে আমার পরিচিতা মহিলা আকুল হয়ে উঠলেন । তাঁরা জাহাজে উঠতেই তিন-জনে জড়াজড়ি কোলাকুলি । আমি একটুখানি কেটে পড়লুম ।

তা হলে কি হয়, আমার নিষ্কৃতি নেই । আমাকে পাকড়ে ধরে নিয়ে মেয়ে জামাইকে বার বার বলেন, ‘এই আমার বশু দিল-জানের দোস্ত, আমার সঙ্গে ফাসাঁ কথা করেছে, ফুতি-ফাতি হৈ-হল্লা ছেড়ে দিয়ে ।’

মেয়ে যতই জিজ্ঞেস করে, জাহাজে ছিলে কি রকম, খেলে কি, বাবা কি রকম আছেন, কে বা শোনে কার কথা, সত্য-সত্যি জাহাজে যেন ‘সমুদ্রে রোদন’ । তিনি বার বার বলেন, ‘বুঝালি, নরমি, একে আচ্ছাসে খাইয়ে দিতে হবে । পোলাওর সব মালমসলা আছে তো বাড়িতে ?’

ভেবেছিলুম হোটেনে উঠব । মহিলা শোনামাত্র আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন তাঁদের সঙ্গে, আমাকে কড়া নজরে রাখলেন কাস্টম অফিসে, যেন আমি চোরাই মদ—পাছে কাস্টমস্ আমাকে পাকড়ে নিয়ে যায় ।

তিন দিন তাঁদের সঙ্গে থেকে অতি কষ্টে নিষ্কৃতি পাই ।

সে তিন দিন কি রকম ছিলুম ? মাছ যে রকম জলে থাকে । ভুল বলা হল ; মাছকে যদি শুধান, ‘কি রকম আছো ?’ তবে সে বলবে, ‘সৈয়দের ব্যাটা যে রকম ইহুদী পরিবারে ছিল ।’ ॥

কোন্-ভিনারের মা

বরোদার চাকরি নেবার কয়েকদিন পরেই ডাঃ এনস্ট কোন্-ভিনারের (অর্থ্যাৎ ভিয়েনার Cohn) সঙ্গে আলাপ হয়। যদিও নাম থেকে বোঝা যায়, 'কোন্' পরিবার এককালে ভিয়েনায় বসবাস করতেন তবু ইনি বার্লিনেই জন্মান, পড়াশুনো করে সেখানে নামজাদা অধ্যাপক হন এবং হিটলার ইহুদীদের উপর চোটপাট আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ লন্ডন চলে যান। বড়ো মহারাজ তৃতীয় সন্ন্যাসীরাও তাঁকে সেখান থেকে পাবড়াও করে নিয়ে এসে বরোদা যাদুঘরের বড়কর্তা বানিয়ে বসিয়ে দেয়।

লোকটির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং তাঁর স্ত্রীও এতখানি লেখাপড়া জানতেন যে তিনি তাঁর স্বামীকে পর্যন্ত কাজকর্মে সাহায্য করতে পারতেন। সন্ন্যাসীরাওয়ার পাঠানো 'ভিনাস দি মিলো,' মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরী 'মোজেস' ও 'মুন্সু দাসের' প্লাস্টার-কাস্ট যেদিন বার্লিন থেকে বরোদা এসে পৌঁছল, সেদিন ফ্রাউ কোন্-ভিনারের কী উত্তেজনা-উৎসাহ! স্টেশনে গিয়ে সেই বিরাট বিরাট বাস্ক নিজে তদারকি করে নামালেন, আহা! নিদ্রা শিকয়ে তুলে দিয়ে কাস্ট-গুলোকে যাদুঘরে সাজালেন,—সে সময় তিনি যাদুঘরে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন,—তারপর ফোলা-ফোলা লাল-লাল চোখ নিয়ে বেরলেন, আমাদের খবর দিতে, প্রভুরা বহাল-তবিয়তে যাদুঘরে আসার জমিয়ে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। পাছে আমি হুজুরদের কিম্বৎ ঠিকমত মালুম না করতে পেরে তেনাদের 'তাচ্ছিল্য' করি, তাই আমাকে তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে গিয়ে হুজুরদের সঙ্গে নিজে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হুজুরদের নাম-গোত্র, হাল-হকিকৎ, হাড়-হম্ম এমনি গটগট করে বয়ান করে দিলেন যে, তার থেকেই বুঝতে পারলুম যে এঁর এলেমের এক কাহন পেলো আমি সুবে বোম্বাই-বরোদা-আহমদাবাদের 'কলা-বাজারে' বাকী জীবন বেপারোয়া হয়ে দাবড়ে বেড়াতে পারব।

আর হার উষ্টর কোন্-ভিনারের পাণ্ডিত্য আমাকে ফলিয়ে বলতে হবে না। নন্দন-শাস্ত্র এবং বিশ্ব-স্থাপত্যের বিভিন্ন শৈলী সম্বন্ধে তিনি ঘেসব কেতাব লিখে গিয়েছেন, সেগুলো নাৎসী-পতনের পর ফের ছাপা হতে শুরু হয়েছে।

স্থাপত্যে পাণ্ডিত্য অথচ বালাকালে তিনি লেখাপড়া শেখেন রাশিদের (ইহুদী পদুষ-পাণ্ডিত) টোলে। তাই ইহুদী ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর; অথচ ইহুদীদের আচার-বাবহার, তাদের কপ্তানি নিয়ে তিনি ঠাট্টা-মস্করা করতে ইহুদীর শত্রু ক্রীস্টানের চেয়েও ছিলেন বাড়া। সেসব রসিকতা একদিন মোকা-মাফিক ছাড়ার বাসনা আমার আছে।

স্বামী স্ত্রী দুজনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পুত্র-কন্যা হয় নি, অথচ দুজনেই স্তব্ধ ছিল স্নেহে ভরা। 'দেগে'র পাঠক এই ইঙ্গিত থেকেই টক্ করে বুঝে যাবেন, আমি তাঁর নসিকে সুযোগ নিতে কসুর করি নি। যতদিন কোন্-ভিনাররা এদেশে ছিলেন, ততদিন জর্মনি বই, মাসিক, খবরের কাগজের জন্য আমাকে কিছুমাত্র দুর্ভাবনা করতে হয় নি।

‘সে বছরে ফাঁকা, পেন্নু কিছু টাকা’ ধরনে কি করে যে কিছু টাকা আমার হাতে ‘৩৮ (‘ইংরেজিতে’) জমে গিয়েছিল, সেটা নিতান্ত আমি বলছি বলেই আজ আমার বিশ্বাস হয়—হায়, এখন যা অবস্থা, ‘৩৮-এর মুজতবা আলীকে পথে পেলে ‘দাদা, বাছা’ বলে তার কাছ থেকে দু-পয়সা হাতিন্তে নিতুম।

তা সে কথা যাকগে। সে জমানো টাকাটা হাতে বস্ত বেশি চুলকোচ্ছিল বলে বাসনা হল জর্মনিতে গিয়ে সে-টাকাটা পুঁড়িয়ে আসি। বন্ধুবান্ধব সে দেশে মেলা, ওদিকে হিটলার যা নাচন-কুদন আরম্ভ করেছে, কখন না দুম করে লড়াই লেগে যায়, আর তাঁরাও সেই বেপায়ে পড়ে প্রাণটা হারান।

বরোদা ছোট জায়গা—তাই খাসা জায়গা। তিন দিনের ভিতর পাসপোর্ট হয়ে গেল। বোম্বাই কাছে; ট্রাঙ্ককল করে জাহাজের টিকিট কাটা হয়ে গেল—আর গরম সুটমুট তো ছিলই। শিকের হাড়ি থেকে নামিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে তৈরি করে নিলুম।

কোন্-ভিনারদের বললুম, জর্মনি যাচ্ছি।

শুনে দুজনেই চমকে উঠলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। বন্ধুলুম, দেশের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—যে-দেশ আবার দেখবার সৌভাগ্য হয়ত তাঁদের জীবনে আর কখনো আসবে না। আর কিছু বন্ধি না বন্ধি, বিদেশে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে বুকটা যে কি রকম তেলে-ফেলা বেগুনের মত ছাঁৎ করে ওঠে, সেটা বিলক্ষণ বন্ধি; এবাবতে আমি বিস্তর পোড়-খাওয়া গরু। চুপ করে রইলুম।

কোন্-ভিনার শূধালেন, ‘আপনি কি বালিন’ন যাবেন?’

আমি বললুম, ‘এবারে জর্মনি যাচ্ছি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। তারা তামাম জর্মনি ছাড়িয়ে। বন্, কলোন, হানোফার, বালিন’ন অনেক জায়গায়ই যেতে হবে।’

কোন্ ভিনার বললেন, ‘আমরা বালিন’ন ছাড়ি ‘৩৩এ। এদেশে আসি ‘৩৫এ। এখানে আসার পর আমার পরিচিত কেউ বালিন’ন যায় নি; আমার বড়ী মাঝে এই তিন বৎসরের ভিতর কেউ গিয়ে বলতে পারে নি যে সে আমাকে দেখেছে, আমি ভালো আছি। আমি ছাড়া আমার মায়ের এ সংসারে আর কেউ নেই। আপনি যদি—’

আমি বললুম, ‘আমি অতি অবশ্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব; আপনি নিশ্চিত থাকুন।’

খানিকটা কিস্তু-কিস্তু করে কোন্-ভিনার শেষটায় বললেন, ‘তবে দেখুন, একখানা পোস্টকার্ড লিখে তার পর যাবেন। আমার মার বয়স আশীর কাছাকাছি। আপনি যদি ইঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হন তবে তিনি জোর শক্ পাবেন। সেটা সামলাবার জন্য--’

আমি বললুম, ‘নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি খবর দিয়েই যাব।’

কোন্-ভিনার বললেন, ‘আর দেখুন, আমার যে হার্ট-ট্রাবল সেটা একদম চেপে যাবেন। কি হবে বড়ীকে জানিয়ে? আমার বাবাও হার্টের রোগে মারা যান।

আমি বললুম, ‘বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। এ-জিনিস সবাই করে থাকে। আমি শুঁকে বলব, আপনারা দুজনেই আরামে দিন কাটাচ্ছেন। এই তো?’

পবননন্দনপাশ্চাত্যে এক লম্ফে বার্লিন পৌঁছেই নি। বোম্বাই, জেনওয়া, জিনীভা, লেজাঁ, বন্, কলোন, ডুসেলডর্ফ, হানোফার হয়ে হয়ে শেষটায় বার্লিন পৌঁছলুম। পূর্বেই নিবেদন করেছি, বিষ্ণুচক্রে কতিত খণ্ড খণ্ড সতীদেহের ন্যায় আমার বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়ে আছেন দেশ-বিদেশে।

৩২এ নাৎসিরা রাষ্ট্রায় কম্যুনিষ্টদের উপর গুন্ডামি করতো, ৩৪এ তারা ছিল দম্ভী—এবারে ৩৮এ গিয়ে দেখি, তাদের গুন্ডামিটা চলছে ইহুদীদের উপর। তার বর্ণনা অনেকেই পড়েছেন, আমাকে আর নতুন করে বলতে হবে না।

পোস্টকার্ডে লিখলুম, ‘আমি এন’স্ট কোন্-ভিনারের মিত্র; বরোদা থেকে এসেছি, আপনার সঙ্গে বৃশ্চবীর দিন সকাল দশটায় দেখা করতে আসব।’

যে মহল্লায় কোন্-ভিনারের মা থাকতেন আমি সে পাড়ায় পূর্বে কখনো ঘাই নি। যে বিরাট চক-মেলানো বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হলুম, সেখানে অশ্রুত চল্লিশটা ফ্ল্যাট থাকার কথা। অথচ অবাক হলুম, জার্মান বাড়ির দেউড়িতে যে স্বকম সচরাচর সব পরিবারের নাম আর ফ্ল্যাটের নম্বর লেখা থাকে এখানে তার কিছুই নেই। ওদিকে দেউড়ির চেহারা দেখে মনে হল, এককালে নেমস্লেট-গুলো দেউড়ির পাশের দেয়ালে লাগানো ছিল। যে দু’একটি লোক আনাগোনা করছে তাদের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল এরা ইহুদী,—অনুমান করলুম, সমস্ত বাড়িটাই ইহুদীদের—এবং চোখেমুখে কেমন যেন ভীত-সম্ভ্রান্ত ভাব। আমার দিকে তাকালও সন্দেহের চোখে, আড়নয়নে।

বুড়ীর ফ্ল্যাটের নম্বর আমি জানতুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, ‘বারো নম্বর ফ্ল্যাট যেতে হলে কোন্ সিঁড়ি দিয়ে ক’তলায় যেতে হয় বলতে পারেন?’ ‘না’ বলে লোকটা কেটে পড়ল। আরো দু’তিনজনকে জিজ্ঞেস করলুম, সবাই বলে ‘না’।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলুম, কারণ আমার অজানা ছিল না যে ইহুদীরা পাড়াপ্রতিবেশীর খবর রাখে সবচেয়ে বেশী—এবং বিশেষ করে প্রতিবেশী যদি আপন জাতের লোক হয়।

তখন হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে পড়ল, দশ বৎসর পূর্বে কাবুলেও আমার ঐ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেখানেও রাষ্ট্রায় কেউ কারো বাড়ি বাৎলে দেয় না। কারণ অনুসন্ধান করাতে এক বিচক্ষণ কাবুলী বলেছিলেন, ‘বলতে যাবে কেন? তুমি যদি লোকটার বন্ধু হও, তবে তার বাড়ি কোথায়, সে-কথা তো তোমার জানা থাকার কথা। হয়ত তুমি স্পাই, কিংবা রাজার কাছ থেকে এসেছ তাকে তলব করতে। সেখানে হয়ত তার ফাঁসি হবে। লোকটার বাড়ি বাৎলে দিয়ে আমি তার

অপমৃত্যুর গোণ কারণ হতে যাব কেন ?

এখানে ইহুদীরাও ঠিক সেই পন্থাই ধরেছে। হয়ত আমি নাৎসি স্পাই—
কি মতলবে এসেছি কে জানে ?

শেষটার অনেক ওঠা-নামা করে বারো নম্বর ফ্ল্যাট খুঁজে পেলুম—ফ্ল্যাটের
নম্বর পর্যন্ত ইহুদীরা সরিয়ে ফেলেছে। ঘণ্টা বাজাতে দরজার একটা কাচের
ফুটো (এ ফুটোটা আবার পিতলের চাক্তি দিয়ে ভিতর থেকে ঢেকে রাখা হয়)
দিয়ে কে যেন আমার দেখে নিলে। আমি একটু চেঁচিয়ে আমার পরিচয়
দিলুম।

একটি তরুণী—তারও মুখে উত্তেজনা আর ভীতি—দরজা খুলে দিল।
আমি ঢুকতেই তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

আমাকে নিয়ে গেল ড্রয়িং-রুমে। সেখানে দেখি এক অথর্ব ধূরধূরে বড়ী
কৌচের এক কোণে কৌচেরই চামড়ার সঙ্গে হাত আর মুখের শূকনো চামড়া
মিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়বার চেষ্টা
করলেন। আমি বললুম, 'করেন কি, করেন কি, আমি এন'স্টের বন্ধু, আমার
সঙ্গে লৌকিকতা করতে হবে না।'

তবু বড়ী অতিকণ্ঠে উঠে দাঁড়ালেন। দুখানা হাণ্ডি-সার ফালি ফালি
হাত দিয়ে আমার দু-বাহু ধরে বললেন, 'বারান্দায় চলুন—সেখানে আলোতে
আপনাকে ভালো করে দেখব।'

বাইরে বসিয়ে আমাকে তাঁর ঘোলাটে চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন।

তারপর হঠাৎ ঝর ঝর করে দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল—আমি তাঁর চোখের
দিকে তাকিয়েছিলুম, হঠাৎ যে এ রকম দু'চোখ ভেঙে জল নেমে আসবে তার
কণামাত্র পূর্বভাষা পাই নি।

চোখ মুছে বললেন, 'মাপ করবেন, আমি কাঁদছিলুম না, আমার চোখ
দিয়ে যখন-তখন এ রকম জল নেমে আসে। আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে।
আমি এখন কাঁদব কেন? আমি কত খুশী। এন'স্ট কি রকম আছে? তার
বউ?'

আমি বললুম, 'বড় আরামে আছেন। জানেন তো, ভারতবর্ষ খারাপ দেশ
নয়। এন'স্টের কাজও শক্ত নয়। ভালো বাড়িঘর পেয়েছেন। আর জানেন
তো এন'স্টের স্বভাব—দু'বছর হয়েছে মাত্র এংই মধ্যে অনেক বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে
নিয়েছেন। আপনার বৌমা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাদের লাণ্ড'ডিনার খাওয়ান।
আমাকে বড় স্নেহ করেন।'

দেখি বড়ী কাঁপছেন আর বার বার রুমাল বের করে চোখ মুচছেন।

আমার হাত দুখানি ধরে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমি বড়
উত্তেজিত হয়ে পড়েছি—কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছি নে। আমার
বুকের ভিতর কি যেন হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কাল
আবার আসতে পারবেন? না,—হয়ত আপনার অনেক কাজ?'

আমি বুঝতে পারলুম, বড়ী নিজেকে সামলাবার জন্য সময় চান। বললুম,

‘নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি কাল আসব। আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমার তো এখানে কোনো কাজ-কর্ম নেই; ছুটি কাটাতে এসেছি মাত্র।’

বানিয়ে বানিয়ে গল্প জমাচ্ছি না, তাই যদি বিবরণটি নন্দনশাস্ত্রসম্মত স্বরূপ গ্রহণ না করে তবে আশা করি সুশীল পাঠক অপরাধ নেবেন না। কোন-ভিনারের মার বেদনা নিয়ে সুন্দর গল্প রচনা করা যায় জানি, কিন্তু আমার মনের উপর সে এমনই দাগ কেটে গেছে যে সেটাকে গল্পের খাতিরে ফের-ফার করতে আমার বড় বাধা বাধা ঠেকে। সুরাসিক পাঠক সেটা হয়ত বুঝতে পারবেন না, তবে সহৃদয় পাঠকের সহানুভূতি পাব সে আশা মনে মনে পোষণ করি।

শ্বিতীয়বারে বড়ী অতটা বিচলিত হলেন না। এবারেও কাঁদলেন তবে জর্মনি বিজ্ঞানের দেশ বলে তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিলেন; বললেন, চোখের কাছের যে স্যাক্ থেকে জল বেরায়, বড়ো বয়সে মানুষ নাকি তার উপর কতৃৎ হারিয়ে ফেলে। হবেও বা, কিন্তু বিদেশে ছেলের কথা ভেবে মা যদি অঝোরে কাঁদে তবে তার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন?

শুধালেন, ‘এস্পেরেগাস্ থাকেন—একটুখানি গলানো মাখনের সঙ্গে?’

আমি তো অবাক। এস্পেরেগাস্ মানুষ খায় পশ্চিম বাঙালয় যে রকম আসল খাওয়া হয়ে গেলে টক খাওয়া হয়। বলা নেই কওয়া নেই, সকাল বেলা দশটার সময় সুস্থ মানুষ হঠাৎ টক খেতে যাবে কেন?

মজাটা সেইখানেই। আমি এস্পেরেগাস্ খেতে এত ভালোবাসি যে রাত তিনটের সময় কেউ যদি ঘুম ভাঙিয়ে এস্পেরেগাস্ খেতে বলে তবে তক্ষুনি রাজী হই। ভারতবর্ষে এস্পেরেগাস্ আসে টিনে করে—তাতে সত্যিকার সোলাদ পাওয়া যায় না—তাজা ইলিশ নোনা ইলিশের চেয়েও বেশী তফাৎ। সেই এস্পেরেগাসের নামেই আমি যখন অজ্ঞান তখন এখানকার তাজা মাল।

মা-ই বললেন, ‘আমি যখন এনস্টের কাছ থেকে খবর পেলুম, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তখন বউমাকে লিখলুম, আপনি কি খেতে ভালোবাসেন সে খবর জানাতে। বউমা লিখলে পুরো লাগ খাওয়াতে হবে না, শুধু এস্পেরেগাস্ হলই চলবে। সৈয়দ সাহেব মোষের মত এস্পেরেগাস্ খান—বেলা-অবেলায়।’

বড়ী মধুর হাসি হেসে বললেন, ‘পুরো লাগ এখন আমি আর রাখতে পারি নে, বউমা জানে। তাই আমার মনে কিছু-কিছু রয়ে গিয়েছে, হয়ত আমাকে মেহনত থেকে বাঁচবার জন্য লিখেছে আপনি বেলা-অবেলায় এস্পেরেগাস্ খান।’

আমি বললুম, ‘আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।’

‘দেশের চতুর পাঠকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে আর কস্যা লভা যে আমি হপটুক। উল্টে তাঁরা বুঝে যাবেন, মিথোবাদীও বটে।

এস্পেরেগাসের পরিমাণ দেখে আমার চোখ দুটো পটাং করে সকেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। মহা মর্শকিল সেগ্দুলো কার্পেট থেকে কুড়িয়ে নিয়ে

সকেটে ঢুকিয়ে এস্পেরেগাস্ গ্রাস করতে বসলুম।

জানি, এক মণ বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু প্লাজ, আধ মণ না মানলে আমাকে বস্তু বেদনা দেওয়া হবে। সুকুমার রায়ের 'খাই-খাই' খানে-ওলালাও সে-খানা শেষ করতে পারত না।

আমি ঐ এক বাবদেই আমার মাকে খুশী করতে পারতুম—গুরুভোজনে। ধর্মসাক্ষী, আর সব বাবদে মা আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। কোন্-ভিনারের মা পর্ষত খুশী হলেন, তাতে আর কিমাশ্চর্যম্!

হায় রে দুর্বল লেখনী—কি করে কোন্-ভিনারের মায়ের এস্পেরেগাস্ রাম্যার বর্ণনা বর্তারবৎ বয়ান করি! অমিগ্রাক্ষর ছন্দে শেষ কাব্য লিখেছেন মাইকেল, শেষ এস্পেরেগাস্ রেখেছেন কোন্-ভিনারের মা।

আহারাদি শেষ হলে পর কোন্-ভিনারের মা বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

আমি বললুম, 'আদেশ করুন।'

তিনি বললেন, 'আপনি যদি না করতে পারেন, তবে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না।'

একটি অপরূপ হিরে লাগানো সোনার আংটি বের করে বললেন, 'নাৎসিরা এখন আর কোনো দামী জিনিস জর্মনির বাইরে যেতে দেয় না—সে নিয়ে তাদের উপর আমার কোনো ক্ষোভ নেই—আমি কি করে জানবো দেশের মঙ্গল কিসে। কিন্তু এ আংটিটা এনস্টের প্রাপ্য। তার বাপঠাকুন্দা চোন্দপুরুষ এই আংটিটা পরে বিয়ে করেছিলেন; এ আংটিটা তাকে দেবেন।'

আমার আঙুলে ঠিক লেগে গেল। আমি বললুম, 'আপনাকে ভাবতে হবে না।'

একটা সোনার চেনে ঝোলানো জড়োয়া পদক দিয়ে বললেন, 'এটা এনস্টের বাপ আমাকে বিয়ের রাতে বাসরঘরে দিয়েছিলেন, (পঞ্চাশ বছর পরে সেই পরবের স্মরণে তিনি একটুখানি লাজুক হাসি হাসলেন) এটা বউমার প্রাপ্য। এটা আপনি তাকে দেবেন।'

আমি কলার খুলে গলায় পরে নিয়ে বললুম, 'নিশ্চিত থাকুন।'

কোন্-ভিনারের মা পই পই করে বললেন, 'কাস্টম্‌সের বিপদে পড়লে জানলা দিয়ে ফেলে দেবেন কিংবা ওদের দিয়ে দেবেন। আমি কোন শোক করব না। ছেলে, বউকে আমি চিঠিতে এ বিষয়ে কিছুই জানাচ্ছি নে। তাদেরও কোনো শোক করতে হবে না।'

বরোদা ফিরে আমি কোন্-ভিনারকে আংটি দিলুম, তাঁর বউকে পদক দিলুম।

*

*

*

ছ'মাস পরে বড়ী মারা যান। কোন্-ভিনার এক বছর পরে মারা যান। তাঁর স্ত্রী এখন কোথায় জানি নে।

কৌদণ্ড মুখহানা

(জীবনী)

শিবতীয়বার বিলেতে যাওয়ার সময় জাহাজে চড়ে যে অনুভূতিটা হয়, তার সঙ্গে দোজবরের মনের অবস্থা তুলনা করা যেতে পারে। ঔৎসুক্য, আশংকা সব কিছুরই তখন কর্মতি ঘটে, বাড়িতে থাকে শূন্যমাত্র হুঁশিয়ারিটা, অর্থাৎ প্রথমবারে যে-সব ভুল করেছি, আবার যেন সেগুলো নতুন করে না করতে হয়। প্রথমবারের উৎসাহের চোটে বউকে কুমার জীবনের দ্ব'একটা রোমাণ্টিক কাহিনী বলে ফেলে যে মারাত্মক ভুল করেছিলুম, এবারে আর সেটি করব না। প্রথমবার বিলেতে যাওয়ার সময় প্রকাশ করে ফেলেছিলুম যে পকেট লাইট-ওয়াটে চেস্পিয়ান, এবারে আর সে পাঁচালি না, এবার ব্রাফ দিয়ে স্টুয়ার্ড, কৌবনবয় সঙ্কলের কাছ থেকে পুরোমাত্রায় প্যাসেজের উশুল করে মামুলী টিপ দিয়েই মোকামে পৌঁছাব।

তারই ব্যবস্থা করতে করতে খানার ঘণ্টা বেজে গেল। প্রথমবার বিলেতে যাবার সময় ঘণ্টা শূনে জেলের কয়েদীর মত হস্তদস্ত হলে ছুট মেরেছিলুম খানা-কামরার দিকে, এবারে গেলুম ধীরে-সুস্থে, গজ মস্থরে। এবারে ভয় নেই, ভরসাও নেই!

ভেবেছিলুম, গিয়ে দেখব, সায়েব-মেমের হৈ-হল্লার এক পাশে নেটিভরা মাথা গুঁজে ছুরি-কাটার সঙ্গে ধম্মাধম্ম করতে এমনি ব্যস্ত যে একে অন্যের মৃত্যুর দিকে তাকাবার ফুরসৎ পাচ্ছেন না, কিন্তু যা দেখলুম, তাতে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

উত্তম বিলিতি কাটের ডবল-ব্রেস্ট কোট, মানানসই শার্ট-কলার, শিশু-সংযত টাই-পরা এক শ্যামবর্ণের দোহারা গঠন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক তুর্কী টুপি-র ট্যাসেল দু'লিমে মাথা নেড়ে নেড়ে গম্প বলে আসর জমিয়ে তুলেছেন আর আটজন ভারতীয় অন্নগেলা বস্ত্র করে গোয়াসে তাঁর গম্প গিলছে। আমি টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক অতিশয় সপ্রতিভভাবে গম্প বলা বস্ত্র করে উঠে দাঁড়ালেন। ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে মৃদু হেসে বললেন, 'এই যে আসুন, ডাক্তার সাহেব, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। টেবিলের মাথাটা আপনার জন্যেই রেখেছি, আর তো সব ছেলে-ছোকরার দল! এদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।' বলে বেশ গট গট করে বোস্, চাটুজো, শূক, মিশ্র, চৌধুরী ইত্যাদি আটজন ভারতীয়ের নাম অবলীলাক্রমে বলে যেতে লাগলেন।

লোকটি গুণী বটে! দশ মিনিট হল যাবার ঘণ্টা পড়েছে। এর মধ্যে আটজন লোকের সঙ্গে শূধু যে আলাপই করে নিয়েছে তাই নয়, সঙ্কলের নাম বেশ স্পষ্ট মনেও রেখেছে।

সব শেষে বললেন, 'আমার নাম মুখহানা।'

এ আবার কোন্ দিশা নাম রে বাবা ! পরনে স্ফুট, মাথায় তুর্কী'র টুপি । গড়গড় করে ভুল-শুদ্ধ-মেশানো ইংরিজি বলছে । মিশরের লোক ? উহু ! সিংহলী ? কি জানি । মুসলমান তো নিশ্চয়ই—তুর্কী' টুপি যখন রয়েছে ।

দু'খানা ফক' হাতে তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এঁদের রাসুল্ পাশার গল্প শোনাচ্ছি ।' বলে গোড়ার দিকটা যে আমি শুনতে পাই নি, তার জন্যে যেন মাপ চাওয়ার মূদু হাসি হেসে বললেন, 'আশ্চর্য লোক রাসুল্ পাশা । প্রথম তো মিশর থেকে তাড়ালেন হসীস । তারপর এসে জুটল ককেইন । সে যে কি অশুভ কার্যদায় মিশরে ঢুকতো, তার সম্বন্ধ না পেয়ে সি. আই. ডি. যখন হার মানলো, তখন রাসুল্ পাশাই কার্যদাটা বের করলেন । কি করে যে লক্ষ্য করলেন, ভিয়েনা থেকে টেবিলের পায়ার ভিতরে করে গুপ্তি ককেইন আসছে, সেটা তাকে না জিজ্ঞেস করে সি. আই. ডি. পর্যন্ত ঠাহর করতে পারে নি । রাসুল্ পাশাই বুঝিয়ে বললেন, "ভিয়েনার চেয়ে কাইরোর কাঠের আসবাব অনেক বেশী মিহিন, সম্ভ্রাও বটে । তার থেকেই বুঝলুম, নিশ্চয়ই কোনরকম শয়তানির খেল রয়েছে । একটা টেবিলের পায়ার ভাঙতেই ককেইন রেরিয়ে পড়ল ।" বুঝুন, লোকটার কড়া চোখের তেজ । কাস্টম অফিসে কি মাল আসছে-যাচ্ছে, তাতে যেন এক্ষরে হয়ে ঢুকছে বেরুচ্ছে ।'

তারপর গল্প ক্ষান্ত দিবে নিপুণ হাতে দু'খানি ফক' দিয়ে মাছের কাটা বাছতে লাগলেন । ভদ্রলোকের খাওয়ার তরীখটা দেখবার মত হেকমৎ—যেন পাকা সার্জনের অপারেশন । এবং তার চেয়েও তারিফ করবার জিনিস তাঁর গল্প করা এবং সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে যাওয়ার মেকদার জ্ঞান । খাওয়ার সময় যারা গল্প বলতে ভালোবাসে, তাদের বেশীর ভাগই খাওয়াটা অবহেলা করে শেষের দিকে হড়হড় করে সব কিছু গিলে ফেলে । এ ভদ্রলোক দুটোই একসঙ্গে চালালেন ধীরে-সুস্থে, তাড়াহুড়ো না করে । আমি বললুম, 'আপনি দেখাচ্ছি মিশরের অনেক কথাই জানেন ।' তাঁর মুখে তখন মাছ । কথা না বলে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন । ভাবখানা এই 'একটু দাঁড়ান, গ্রাসটা গিলি, তারপর বলব ।'...বললেন, 'জানব না ? আমি আঠার বছর কাইরোতে কাটালুম যে ।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মিশর ছাড়লেন কবে ?'

তিনি বললেন, 'ছাড়বো কেন, এখনও তো সেখানেই আছি ।'

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলুম । বললুম, 'বিলাত থেকে ফেরার মুখে কিছুদিন মিশরে কাটানো আমার বাসনা । কাইরোতেই থাকব ভাবছি ।'

শ্লেটের মাছের দিকে তাকিয়েই বললেন, 'হু' ।'

আমি তো অবাক । এরকম অবস্থায় দেশের লোক অন্ততপক্ষে বলে, আসবার খবরটা দেবেন, সম্ভব লোক নানাপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় । এ ভদ্রলোকের কথাবর্তা চালচলন দেখে তো মনে হয়েছিল, ইনি কাইরোর মত পাণ্ডববর্জিত দেশে স্বদেশবাসীকে লুফে নিন আর নাই নিন, গতানুগতিক ভদ্রতার সম্বন্ধনাটা অন্তত করবেন । তাই তাঁর দরদহীন 'হু'-টার ভেজাকম্বল আমার সর্বাস্থে যেন কাঁপন লাগিয়ে দিল । আর পাঁচজনও যে একটু আশ্চর্য হয়েছেন স্ফুট বুঝতে

পারলুম। তারপর গালগল্প তেমন করে আর জমলো না।

খাওয়ার পর উপরে এসে ডেকচেয়ারে শুয়ে বিরস বিবর্ণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার মুখে তিনি ঈষৎ অবহেলার ভাব লক্ষ্য করলেন কিনা জানি নে, তবে বেশ সপ্রতিভভাবেই আমার পাশের ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, ‘আপনি আমায় মাপ করুন।’ আমি বললুম, ‘সে কি কথা, কি হয়েছে?’ বললেন, ‘আমি ভারতবাসী, তাই ভারতীয়দের প্রতি আমার একটু অভিমান আছে। এই আঠার বৎসর ধরে আমি মিশর ভারতবর্ষ করে আসছি। প্রতিবারই দু’চারজন ভারতীয় উৎসাহের সঙ্গে কাইরো আসবে বলে প্রতিজ্ঞা করে—আজ পর্যন্ত কেউ আসে নি। আপনি আসবেন কিনা জানি নে; তবে স্ট্যাটিস্টিক্স যদি পাকাপাকি বিজ্ঞান হয়, না আসার সম্ভাবনাই বেশী। তাই আমার অভিমান, এখন কেউ কাইরো যাবার প্রস্তাব করলে আমি গা করি নে।’

তারপর তিনি হঠাৎ খাড়া হয়ে এসলেন। বেশ একটু গরম সুদে বললেন, ‘আশ্চর্য হই বার বার স্বদেশবাসী ছাত্রদের দেখে। বিলেতে ডিগ্রী পাওয়া মাত্রই ছুট দেয় দেশের দিকে, সেই ক্যাশ সাটিফিকেট ভাঙাবার জন্যে। কতবার কত ছেলেকে বন্ধিয়ে বেলোছি, মিশরীয় সভ্যতা ভাল করে দেখবার জিনিস, ওর থেকে অনেক কিছু শেখবার মত আছে, এমন কি নেমন্তন্ন করেছি আমার বাড়িতে ওঠবার জন্যে কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কি হবে এদের দিয়ে বুঝতে পারি নে।’

আমি চুপ করে শুনে গেলুম। কি আর বলব? তারপর বললেন, ‘আমি নিজে লেখাপড়া করবার সুযোগ-সুবিধে পাই নি। বাবা অল্প বয়সে মারা যান বলে। তাই—’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘সে কি কথা? আপনি তো চমৎকার ইংরিজি বলছেন।’

মুখহানা মূর্চকি হেসে বললেন, ‘ইংরেজ চাষা আমার চেয়ে ভাল ইংরিজি বলে। তাই বলে সেও শিক্ষিত নাকি? আপনিও এই কথাটা বললেন? আপনি না হের ডক্টর!’

এক মাথা লজ্জা পেলুম।

বললেন, ‘তবু আপনার নেমন্তন্ন রইল। ইউরোপ থেকে ফেরবার মুখে আসবেন? তবে আলেকজ্যান্ড্রিয়ায় নেমে আমাকে তার করবেন। আমার স্টেলিগ্রাফী ঠিকানা “মোহিনী টী”, আমার চায়ের ব্যবসা।’

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘মিশরের লোক কি চা খায়?’

বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, ‘আগে খেত না। এখন তার বাপ খায়। আমি খাইয়ে ছেড়েছি। আপনি কিন্তু ঠিকই জিজ্ঞেস করেছেন—আগে তারা শুধু কফি খেত।’

আমি আরও আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘আপনি খাইয়ে ছেড়েছেন, তার মানে?’

খুব একগাল হেসে নিয়ে বললেন, ‘তাহলে আপনার সামনে একটু উঁচু ঘোড়া

চড়ে নিই। আপনাদের তো লেখাপড়ার হাই-জম্প লও-জম্প। আমার ব্যবসারে। বলব সব?’

আমি বললুম, ‘ভারতের লোক মিশরে চা বেচছে, একথা শুনে কার না আনন্দ হয়? আপনি ভাল করে সব কিছ্‌ বলুন।’

মুখহানা বললেন, ‘তবে শুনুন। আমার বাড়ি কুর্গে। বাবা অল্প বয়সে মারা যান, আগেই বলেছি। তাই ১৯১৬ সনে ঢুকে পড়লাম কুর্গ পল্টনে, জানেন তো, কুর্গের লোক আর সব ভারতীয়ের চেয়ে আলাদা। রাইফেলটা, লড়াইটার নাম শুনলে ভয় পায় না। আমাদের পল্টনের সঙ্গে সঙ্গে আমি গেলুম আলেকজ্যান্ড্রিয়া। তারপর তাতা দামনহুর্নু জগাজিগু করে করে শেষটার কাইরো। আড়াই বছর ছিলুম কাইরোতে। তারপর লড়াই থামল। মহাত্মা গান্ধী শুরু করেছেন অসহযোগ আন্দোলন। ইংরেজের উপর আমারও মন গিয়েছে বিগড়ে—বিশেষ করে লড়াইয়ের সময় কালো-খলায় তফাৎ করার বাঁদরামি দেখে দেখে। ভাবলুম, কি হবে দেশে ফিরে গিয়ে? তার চেয়ে এখানে যদি জগলুল পাশার দলে ভিড়ে যেতে পারি, তবে ভারতবর্ষের আন্দোলনের সঙ্গে এদের স্বাধীনতা আন্দোলন মেলাবার সুবিধে হলে হয়েও যেতে পারে।

‘পড়ে রইলুম কাইরোয়। পল্টন থেকে খালাস পাওয়ার সময় যা-কিছ্‌ টাকা-কড়ি পেয়েছিলুম, তাই দিয়ে বাঁধলুম ছোট একটি বাসা—অর্থাৎ ফ্ল্যাট। জগলুলের দলের সঙ্গে যোগাযোগও হল, কিন্তু মুশকিলে পড়লুম অস্বস্তির সমস্যা নিয়ে। ওঁরা অবশ্য আমার এসব ভাবনা পার্টির কাঁধে তুলে নিতে খুশী হয়েই রাজী হতেন, কিন্তু হাজার হোক ওঁরা বিদেশী ওঁদের টাকা আমি নেব কেন? তাই ফাঁদতে হল ব্যবসা। খুললুম চায়ের দোকান। পার্টির মেম্বাররাই হলেন প্রথম খন্দের। ওঁরা আমার ফ্ল্যাটে চা খেয়ে খেয়ে চায়ের তব্ব সমঝে গিয়েছিলেন।

‘তখন লাগল আমাতে কফিতে লড়াই। আর সে লড়াই এমনি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো যে, বাধা হয়ে আমাকে পলিটিক্স ছাড়তে হল। নেংটি পরে অসহযোগ করতে পারে গান্ধী, আমি পারি নে। অবশ্য লড়াইয়ের লুট তখন কিছ্‌ কিছু আসতে আরম্ভ করেছে—অর্থাৎ দু’পয়সা কামাতে শুরু করেছি। পার্টি-মেম্বারদের চাটা-আঁসটা ফ্রি খাওয়াই, তাইতেই তাঁরা খুশী। টাকা-কড়িও মাঝে-মাঝে—কিন্তু সেকথা যাক।’

আমি দুটো শরবতের অর্ডার দিলুম। মুখহানা আমার হাত চেপে ধরে বললেন, ‘আপনি এখনো কামাতে শুরু করেন নি—আমি কারবারী, বিলটা আমিই সই করি।’

আমি কাঁহুমাচু হয়ে বললুম, ‘সামান্য দু’পয়সা—’

হেসে বললেন, ‘ইক্সেকুট্‌লি। বেশী হলে দিতুম না।’

আমি শুধালুম, ‘আপনার সঙ্গে কফির লড়াইটা কতদিন চলেছিল?’

‘বহু বৎসর। এখনো চলছে। কিন্তু পয়সা রৌদে মার খেয়েই বৃষ্ণতে পারলুম, মাত্র একখানা চায়ের দোকান সমস্ত দেশের কফির সঙ্গে কখনই লড়তে

পারবে না। তাই আরম্ভ করলুম চায়ের পাতা বিক্রি। কিন্তু ব্রুকব'ড লিপ্টন বিক্রি করে আমার লাভ হয় কম, আর যে ইংরাজকে দেখলে আমার ব্রন্ধারম্ভ দিয়ে খঁরো বেরোয়, তার হয় মায় প'বারো। কাজেই আনাতে হল চায়ের পাতা আসাম থেকে, দার্জিলিং থেকে, সিংহল থেকে। কিন্তু ব্রেন্ডিঙের জিনি নে কিছুই চায়ের স্বাদও ভাল করে বুঝতে পারি নে—ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি কফি, কারণ কুর্গের লোক মিশরীদের মতোই কফি খায়। তখন জিহ্বাটাকে স্বাদকাতর করবার জন্য বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল সিগার, খাবারদাবার থেকে বর্জন করতে হল লঙ্কা আর সব'প্রকারের গরমমসলা।'

আমি বললুম, 'এর চেয়ে অল্প কুছ'সাধনে তো মিশরের রাজকন্যা পাওয়া যেত।'

'তা যেত। কিন্তু আমি তখনও কফির ড্রাগনের সঙ্গে ধস্তাধস্ত করছি। আরেবটা কথা ভুলবেন না। মিশরীয়রা যদি ভারতের কফি খেত, তাহলে আমি ভারতীয় চা'কে ভারতীয় কফির পেছনে লেলিয়ে দিতুম না। ভায়ে ভায়ে লড়াই আমি আদপেই পছন্দ করি নে। যাক্ সেকথা! আমি দেশে থেকে হরেক রবম চা আনিয়ে ব্রেন্ড করে ব্র্যা'ড ছাড়লুম, তারই নাম দিলুম "মোহিনী টী", মোহিনী আমার মায়ের নাম।'

বলে যেন বড় লঙ্কা পেলেন। আমি তো বুঝলুম না এতে লঙ্কার কী আছে। কফির সঙ্গে একা লড়নেওয়ালো, বঠোর কুছ'সাধনের ঘড়েল-ব্যবসায়ী মায়া-দরদহীন কারবারের মাঝখানে যে মায়ের কথা স্মরণ রেখেছে, এ যেন মিশরীয় মরুভূমির মাঝখানে সুখশ্যামলিল মরুদ্যান। কিন্তু আমাকে কোনও কথা বলতে না দিয়েই তিনি যেন লঙ্কা ঢাকবার জন্যেই উঠে দাঁড়ালেন। 'আরেক দিন হবে' এরকম ধারা কি যেন খানিকটে বলে আশ্বে আশ্বে আপন কোবিনের দিকে রওয়ানা হলেন।

আমার তখন খেয়াল হল মোহিনী নামটার দিকে। মুসলমান মেয়ের নাম মোহিনী হল কি করে? আর হবেই না কেন? বাংলা দেশে যদি 'চাঁদের মা' 'সুরুষের মা' হতে পারে, কুর্গের মেয়ের 'মোহিনী' হতে দোষ কী?

*

*

*

আশ্বে আশ্বে মুতহানা সর্বশেষ অনেক কিছুই জানতে পারলুম। কিন্তু সব চেয়ে বেশী দুঃখ হল একাদিন যখন শুনলুম, কফিকে খানিকটে হার মানিয়ে তিনি যখন মোহিনীকে চালু করতে সক্ষম হয়েছেন, তখন বাজারে এসে জুটল লিপ্টন আর ব্রুকব'ড। তারা তাঁর পাকা ধানে মই দিলে না বটে, কিন্তু ধানের বেশ খানিকটা বড় ভাগ তুলে নিজে খেতে লাগল। মুতহানা বললেন, 'আমি হার মানি নি বটে, কিন্তু এদের সঙ্গে লড়বার মত পুঁজি আমার গাটে নেই। ভারতবর্ষের দু' একজন চায়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করে দেখলুম, তারা আমার লড়াইটাকে বুনো মোষ তাড়া করার পর্ষায়ে ফেলে দিয়েছেন—নাইলের জলে আপন রেষ্ঠ ডোবাতে চান না।

অথচ ব্যক্তিগতভাবে কোনও ইংরেজের সঙ্গে তাঁর কোনও দৃশমনি নেই।

জাহাজ ভর্তি ইংরেজের প্রায় সব কটাই দেখি তাঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কয়। এ-লাইনের সব কটা জাহাজ তিনি ভাল করে চেনেন বলে কি ভারতীয় কি ইংরেজ সকলেরই ছোটখাটো সুখ-সুবিধা অনায়াসে করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক যেন প্যাসেঞ্জার আর জাহাজ-কর্তাদের মাঝখানে বেসরকারী লিয়েজৌ অফিসার।

কিন্তু তাঁর আসল কেরামতি স্বপ্রকাশ হল আদন বন্দরে এসে।

আদন বন্দরে কোনও প্রকারের শৃঙ্খল নেই বলে আদনের আরব ব্যবসায়ীর দূনিয়ার হরেক রকম জিনিস জাহাজে বেচতে আসে। আর মেমসাহেবরাও এ তত্ত্বা জ্ঞানেন বলে হনো হয়ে থাকেন দেশের পাঁচজনের জন্য আদন বন্দরে সম্ভায় সওগাত কিনবেন বলে।

ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ করে দরকষাকষি দেখাছিলুম—আর সব ভারতীয়েরা আদন দেখতে গেছেন, প্রথমবারে আমিও গিয়েছিলুম—এমন সময় হেলদুলে মুখহানা এসে উপস্থিত। আর যায় কোথায়? সব মেম একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, ‘আসুন, মিস্টার মুখহানা। এই আরবদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান।’

মুখহানা আশ্চর্য হবার ভান করে বললেন, ‘সে কি মেদাম, ইংরেজ হল ব্যবসায়ীর জাত। তাকে ঠকাচ্ছে আরব? আর ব্যবসায়ে কানা আমি ভারতীয় বাঁচাবো সেই ইংরেজকে? ড্রাগনকে বাঁচাবো ডেমসেলের হাত থেকে?’

তারপর ছোটালেন আরবী ভাষার তুবড়ী। সঙ্গে সঙ্গে কখনও ব্যঙ্গের হাসি, কখনও ঠাট্টার অটুহাস্য, কখনও অপমানিত অভিমানের জলদ গর্জন, কখনও সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ার ভয়ে দুর্বলের তীক্ষ্ণ আতঁরব, কখনও রুদ্রের দক্ষিণ মুখের প্রসন্ন কল্যাণ অভয়বাণী, সবশেষে দু’চার পয়সা নিয়ে ছেলে-ছোকরার মত কাড়াকাড়ি। আমি গোটাপাঁচেক স্ন্যাপশট নিলুম।

কিন্তু আরবরা বেহুদ খুব। হাঁ! লোকটা দরদস্তুর করতে জানে বটে। এর কাছে ঠকেও সুখ। তার উপর মুখহানা কপচাচ্ছেন মিশরের আরবী—অতি খানদানী, তার সর্বশরীরে নীল নদের মত নীল রক্ত, আদনের আরবী তার সামনে সুকুমার রায়ের—

“কানের কাছে নানান সুরে
নামতা শোনার একশো উড়ে।”

দরদস্তুর, কারবার-বেসতি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি মূগ্ধ হয়ে বললুম, ‘কি চমৎকার আরবী বলতে পারেন আপনি!’

মুখহানা বললেন, ‘আবার! মিশরের যে-কোনো গাড়োয়ান আমার চেয়ে ভাল আরবী বলতে পারে এবং গাড়োয়ানের মতই আমি না পারি আরবী লিখতে, না পারি পড়তে।’

আমি বললুম, ‘খানিকটে নিশ্চই পড়তে পারেন। মধ্যবিস্ত ঘরের সব মুসলমানই তো ছেলেবেলায় কুরান পড়তে শেখে।’ মুখহানা বললেন, ‘তুর্কী চুপি দেখে আপনিও আমাকে মুসলমান ঠাউরে নিচ্ছেন, কিন্তু আমি তো

মুসলমান নই।' তারপর একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'হিন্দুই বা বলি কি প্রকারে? হিন্দু ধর্মের কি ই বা জানি, কি-ই বা মানি।'

তারপর বললেন, এবারে যখন মাকে দেখতে গেলুম কুর্গে, তখন গাঁয়ের মুসলমানরা আমার খানিকটা জমি কিনতে চাইল মসজিদ গড়ার জন্য। আমি বললুম, 'এক-রাস্তি জমির জন্য আর পরসো নেব না। মুসলমান দেশের নুন-নিমক খাই, না হয় দিলুম তাদের জাতভাইদের মসজিদ বানাবার জায়গা।' ওদিকে মহাশূর দরবারে কে গিয়ে লাগিয়েছে আমি নাকি 'আজী প্রভোকাভর', কমুনাল রাষ্ট্র লাগাবার তাগে ইংরেজ আমাকে দেশে পাঠিয়েছে। কী মুশ্কিল! এল এক ডেপুটি তদন্ত করার জন্য। আমাকে দেখেই শূধাল, 'আপনি হিন্দু, আপনার মাথায় তুর্কী টুপি কেন?' আমি বললুম, 'আপনি হিন্দু, আপনার পরনে কেবেরস্তানি সূট কেন? আপনি যদি বিলেতে না গিয়েও সূট পরতে পারেন তবে মিশরে আঠারো বৎসর থাকার পরও কি আমার তুর্কী টুপি পরার হুকু বর্তালো না?' আশ্চর্য, আপনিই বলুন তো, সিংহের মাথায় "লর্ড" পরালে যদি মানুষ ইংরেজ না হয় তবে আমার মাথায় তুর্কী টুপি চড়ালেই আমি মুসলমান হয়ে যাব কেন? যে দেশে থাকবে, সে দেশের পাঁচজনকে হিন্দুীতে যাকে বলে 'আপনাতে' হবে অর্থাৎ আপন করে নিতে হবে। তার জন্য বেশভূষা, আহা-বিহার, সব বিষয়েই মনকে সংস্কারমুক্ত না রাখলে চলবে কেন? কিন্তু আপনাকে এসব বলার কি প্রয়োজন? আপনিও তো অনেক দেশ দেখেছেন।'

এমন সময় আবব কারবারীরা এসে আমাদের কাছে দাঁড়াল। মুখহানা চেয়ার থেকে উঠে তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। কথা কহিলেন এমনভাবে যেন জন্ম-জন্মান্তরে পরম আত্মজন! বুদ্ধলুম, কারবারীরা এসেছিল বিশেষ করে তাঁর কাছ থেকেই বিদায় নেবার জন্য। যাবার সময় বলে গেল, এ জাহাজে তাদের অর্থলাভ হয় নি বটে কিন্তু বন্ধুলাভ হল।

তারপর যে কদিন তিনি জাহাজে ছিলেন, প্রায় সমস্ত সময়টা কাটালেন গাদা গাদা চিঠিপত্র টাইপ করে। কিন্তু লৌকিকতার স্মিতহাস্য, সী সিকদের তত্ত্বাবাশ, পাঁচজনের সাতটা ফরমাইশ-সুপারিশ করাতে তৎপর। আর তুর্কী টুপির ট্যাসেল দুলিয়ে দুলিয়ে থানা-টেবিলে যে বিলক্ষণ তৃপ্ত-গরম রাখলেন, সে-কথা আমি না বললেও এন্‌কর লাইন জাহাজ কোম্পানী হলপ খেয়ে বলবে।

সুখেজবন্দরে তিনি নেমে গেলেন—জাহাজ অন্ধকার করে। এর চেয়ে ভাল বর্ণনা আমি চেষ্টা করে খুঁজে পেলুম না। এমন সব পুরনো অলংকার আছে যার সামনে হালফ্যাশান হামেশাই হার মানবে।

ইউরোপে দশ মাস কেটে গেল এটা-সেটা দেখতে দেখতে। তার প্রথম চার মাস কাটল কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক পণ্ডিত অজিত বসুর সঙ্গে। তিনি সস্ত্রীক ফ্রান্স, সুইটজারল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ঘুরলেন যক্ষ্মা-হাসপাতাল দেখে দেখে—আমি ছিলাম দোভাষী হয়ে। কবি সাদী বলেছেন, 'কয়লাওয়ালার সঙ্গে দোস্তী করলে গায়ে কিছু না কিছু কয়লার গুঁড়ো লাগবেই,

আতরওয়ারলার সঙ্গে আশনাই হলে গায়ে কিঞ্চিৎ খুশবাই লাগবেই।’ বিয়ান্নিশটা স্যানার্টারিয়া ঘুরে আমার গায়ে কয়লা না আতর লাগল সে সমস্যা এখনও সমাধান করতে পারি নি তবে যক্ষ্মার যে বিশেষ কোনও চিকিৎসা নেই সে কথাটা দোভাষী-গিরি করে বেশ ভাল করেই স্বদয়ঙ্গম হল।* ডাক্তারে ডাক্তারে কথা বলার সময় সাধারণত সত্য গোপন করে না।

তারপর একদিন শুব প্রাতে ভেনিস বন্দরে পৌঁছলুম। শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে লিডোতে সীতার কেটে, সিনমার্ক দর্শন করে, চন্দ্রালোকে গণ্ডোলা চড়ে, টুরিস্ট ধর্মের তিন আশ্রম পালন করার পর ভেনিস থেকে সন্ন্যাস নিলুম। তিন দিন পরে আলেকজ্যান্ডিয়া বন্দর। সেখান থেকে কাইরোর ট্রেনে চাপবার পূর্বে তার করলুম, ‘মোহিনী টীকে।

এ দশ মাস ইচ্ছে করেই মুখহানাকে কোনও চিঠিপত্র লিখি নি। স্থির করে-ছিলুম ভদ্রলোককে তাক লাগিয়ে দেব। আর পাঁচটা ভারতীয়ের তুলনায় বাঙালী যে প্রতিজ্ঞা পালনে জান-কবুল, সে কথাটা হাতে-নাতে দেখিয়ে দেব—“বাঙালীর বাত নড়ে তো বাপ নড়ে”।

কাইরো স্টেশনে নেমে কিছু তাক লাগল আমারই। যে-লোকটি নিজেকে মুখহানা বলে পরিচয় দেয় তার সঙ্গে জাহাজের মুখহানার যে কোনোখানে মিল আছে সে কথা আপন স্মৃতিশক্তিকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস না করে মানবার উপায় নেই। ওঁর গায়ে সূঁচটি পরা ছিল যেন সার্জের হাতে রবারের দস্তানা—এর গায়ে সূঁচ ঝুলছে যেন ভিখিরির ভিক্ষের ঝুলি। ওঁর মুখে ছিল উজ্জ্বল হাসি, ওঁর ছিল পুরুষুঁ টোল-থেকো বাচ্চা ছেলের তুলতুলে গাল, এর দোঁখ কপালের টিপি আর দুই ভাঙা গালের উনুনের ঝাঁক। উঁচু কলারের মাঝখানে এই যে কণ্ঠা প্রথম দেখলুম, সেটাকে তিন ডবল সাইজ করে দিলেও মাঝখানের ফাঁক ভরবে না।

আর সেই চোখ দুটি গেল কোথায়? কেউ হাসে দাঁত দিয়ে, কেউ হাসে ঠোঁট দিয়ে, বেশীর ভাগ লোক মুখ আর গাল দিয়ে—মুখহানা হাসতেন সূঁচ দুটি চোখ দিয়ে। আর তার ঝিলিমিলি এতই অশুভ যে, তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে জোয়ার জলের চাঁদের ঝিকিমিকি।

এর বয়স তো এখনও আটত্রিশ পেরোয় নি। এ বয়সে তো চোখে ছানি পড়ে না।

ট্যান্ডি ডাকলেন। আমার তো আবছা-আবছা মনে পড়ল, নিজের গাড়ির কথা যেন কোনও কথার ফাঁকে আপন অনিচ্ছায় জাহাজে বলেছিলেন। কি জানি, হয়ত গাড়ি কারখানায় গিয়েছে।

কস্তারা-তুল-দিক্কা স্টেশন থেকে দূরে নয়। ফ্রাট পাঁচতলায়। মুখহানা ড্রয়িংরুমের সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে প্রাণপণ হাঁপাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, ‘আপনার কি হয়েছে বলুন।’ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ‘কিছু না,

* ১৯৩৩-৩৪ এর কথা : এখন অবস্থা অন্য রকম।

একটু কাশি।' এই মূখহানা সেই মূখহানা। আমি চূপ করে গেলুম।

স্ট্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। নাম হেলেনা। সাইপ্রিস স্ট্রীপের গ্রীক মেয়ে। গ্রীক ছাড়া জানেন অতি অল্প কিচেন-আরবী আর তার চেয়েও কম ইংরিজি। আমি জানি গ্রীক ব্যাকরণের শব্দরূপ ধাতুরূপ—ক্লাস নাইনের ছোকরা যেমন উপক্রমণিকা জানে। অনুমান করলুম, গ্রীক রমণী বিদেশীর মুখে ভুল উচ্চারণে আপনার ভাষার ধাতুরূপ শোনার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্ন হবে না। তাই আরবী ইংরিজির গুরু চুড়ালী দিয়ে যতটা পারি ভদ্রতা রক্ষা করলুম। মূখহানা গ্রীক বললেন অক্রেশে।

দুবার যে ভুল করেছি সে ভুল আর করলুম না। শূধু জিজ্ঞেস করলুম, 'গ্রীক শিখতে আপনার ক'বৎসর লেগেছিল?' বললেন, এই আঠারো বছর ধরে শিখছি। এখানকার কারবারী মহলে গ্রীক না জেনে ব্যবসা করা কঠিন।' ব্যাস, সুস্থ প্রশ্নের উত্তরটুকু। জাহাঙ্গে হলে এরই খেই ধরে আরো কত রসালাপ জমত।

খানা-কামরা নেই। ডুইংরুমে টেবিল সাফ করে খানা সাজানো হল। একটি ন'দশ বছরের ছোকরা, ছুরিটা, কীটাটা এগিয়ে দিল। মোট খাটুনিটা গেল হেলেনার উপর দিয়ে। বুকলাম রেংধেছেনও তিনিই। চমৎকার পরিপাটী রান্না।

খাওয়ার সময় টেবিলে বসলেন মূখহানার বিধবা শালী তাঁর ছোট মেয়ে নিয়ে। আভাসে ইঙ্গিতে অনুমান করলুম, এঁরা তাঁর পুঁথি।

ইতিমধ্যে আমার মনে আরেক দূর্ভাবনার উদয় হল। হাত ধুতে যাবার সময় চোখে পড়েছে মাত্র দু'খানা শোবার ঘর। আমি তবে শোবো কোথায়? হোটেলের যাবার প্রস্তাব মূখহানার কাছে পাড়ি-ই বা কি প্রকারে? ভদ্রলোক যে-রকম ঠোঁট সেলাই করে নীরবতার উইয়ের টিবিবর ভিতর শামুকের মত বসে আছেন তাতে আমি সুচাগ্রও ঢোকাবার মত ভরসা পেলুম না। তবে কি ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করব, মমিকে যে-রকম এদেশে কাঠের কফিনে পুরে রাখে অতিথিকেও তেমনি রাখে কাঠের বাস্ত্রে তালাবন্ধ করে রাখার রেওয়াজ আছে কিনা!

আহরাদির পর হেলেনা আমার প্রথম সিগারেটটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রাগের মত বিদায় নিলেন। খনিবক্ষণ পরে রান্নাঘরে বাসনবত'ন ধোয়ার শব্দ শুনতে পেলুম।

মূখহানা সোফায় শুয়ে ছিলেন। আমাকে বললেন, 'পাশে এসে বসুন, কথা আছে।' আমি আরেকটি সিগারেট ধরালুম। বললেন, 'আপনি আমার দেশের লোক, আপনাকে সব কথা বলতে লজ্জা নেই। সংক্ষেপেই বলব, আমার বেশী কথা বলতে কষ্ট হয়।

'জাহাঙ্গে আপনার সঙ্গে অনেক কথাই খোলাখুলি বলেছিলুম। তার থেকে হয়ত আপনি আন্দাজ করেছিলেন, আমার দু'পয়সা আছে, বাড়ি-গাড়িটাও আছে, আর এখন দেখছেন আপনাকে শূতে দেবার মত আমাদের একখানা ফাল্‌তো কামরা পর্যন্ত নেই। হয়ত আপনি ভাববেন, আমি ধাম্পা দিয়েছিলুম

আপনি কখনো মিশরে আসবেন না এই ভরসায়।’

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু মুখহানা তাঁর হাঙ্গিসার হাতখানা তুলে আমাকে ঠেকালেন। বললেন, ‘না ভেবে থাকলে ভালই। আপনাদের শরণ-বাবদর এক উপন্যাসে—আমি মাতৃভাষা কানাডায় পড়েছি, যে অবিশ্বাস করে লাভবান হওয়ার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকা ভাল। যাক সে কথা।’ বলে বেশ একটু দম নিয়ে কি বলবেন সেটা যেন মনের ভিতর গুঁছিয়ে নিলেন।

‘সংক্ষেপেই বলি। যে গ্রীক রাস্কেলটার হাতে আমি আমার ব্যবসা সঁপে দিয়ে দেশে গিয়েছিলুম, ফিরে দেখি সে সব কিছু ফুঁকে দিয়েছে। বাড়িভাড়া দেয় নি, ওভার ড্রাফট নিয়েছে, শেষটায় শটকের চা পর্যন্ত জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে। এখানে এখানে কত ছোটোখাটো ধার যে নিয়েছে, তার পুরো হিসাব এখনও আমি পাই নি। আমার নাম জাল করেছে যখনই দরকার হয়েছে। আপনি ভাবছেন আমি এরকম লোকের হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে গেলুম কেন? কী করে জানব বলুন? দশ বৎসর ধরে সে আমার সঙ্গে কাজ করছে, বিয়েরটা সিগারেটটা পর্যন্ত স্পর্শ করত না। আর সব কিছু ফুঁকে দিয়েছে—’ একটুখানি হেসে বললেন, ‘ফাস্ট উইমেন আর স্লো হর্সের পিছনে।’

নিজে দুর্দৈবের কাহিনী বলার ভিতরেও রসিকতা করতে পারেন যার মনের কোণে—হয়ত নিজের অজানাতেই ধনজনের প্রতি জন্মলব্ধ বৈরাগ্য সঞ্চিত হয়ে আছে। ‘বহু দেশ ঘুরেছি’ এ কথাটা বলতে আমার সব সময়েই বাধা বাধা ঠেকে, কিন্তু এখানে বাধা হয়ে সে কথাটা স্বীকার করতে হল, মুখহানার এই দুর্লভ গুণটির পরিপ্রেক্ষিত দেখবার জন্য।

জিজ্ঞেস করলুম, ‘আপনার স্ত্রীও জানতে পারেন নি?’ বললেন, ‘তিনি তখন সাইপ্রসে, বাপের বাড়িতে। কিন্তু আজকের মত থাক এসব কথা। আমার সংসারের অবস্থা দেখে আপনি বাকীটা আন্দাজ করে নিতে পারবেন।

‘শুয়ে শুয়ে তাই নিয়ে কিন্তু অত্যাধিক দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আবার সব কিছু গড়ে তুলবো। এই আপনার চোখের সামনেই। এখন শুয়ে পড়ুন, আমি ওমরকে ডেকে দিচ্ছি। সে আপনার বিছানা ঐ কোণে দিভানটার উপর করে দেবে। কষ্ট হবে—।’ আমি বাধা দিলুম। মুখহানাও চুপ করে গেলেন।

সেই ছোকরা চাকরটি এসে বেশ পাকা হাতে বিছানা করে দিল। বন্ধুত্বলুম, মুখহানার অতিথিদের জন্য প্রায়ই তাকে এরকম বিছানা করে দিতে হয়।

ঘর থেকে বেরদুবার সময় মুখহানা শেষ কথা বললেন, ‘আমি কিন্তু সব কিছু আবার গড়ে তুলব। আমি অত সহজে হার মানি নে।’ একমাত্র জার্মান বৈজ্ঞানিকদের গলায় আমি এরকম আত্মবিশ্বাসের অকুণ্ঠ ভাষা শুনেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখহানার গলা থেকে বেরুল একটু খুসখুসে আওয়াজ।

অতি অল্প, কিন্তু আমার ভাল লাগল না।

শুনেছি রাজশয্যায় নাকি শুবরাজেরও প্রথম রাতে ভাল ঘুম হয় না। সত্যি মিথ্যে জানি নে, কিন্তু কইসোতে যে হবে না সে বিষয়ে আমার মনে বিশ্বাস

নেই। আধো ঘুম আধো জাগরণে সেই পাঁচতলার উপর থেকে শুনছিলুম সমস্ত রাত ধরে ফারাও-প্রজাদের ফুটি'র পিছনে ছুটোছুটি হুটোপুটি'র শব্দ।

কলকাতা ঘুমোয় এগারোটায়, বোম্বাই বারোটায় আর কাইরো দেখলুম অশ্বকারে ঘুমোতে ভয় পায়। সকাল বেলা আটটার সময় বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখি, কাইরো শহর রাত বারোটার ভাতঘুমে অচেতন। স্থির করলুম, একদিন ভোরের নমাজের সময় মসজিদে গিয়ে দেখতে হবে ইমাম (নমাজ পড়ানোয়লা) আর মুয়াত্ত্বিন (আজান দেনোয়লা) ছাড়া কজন লোক মসজিদে সে সময় হাজিরা দেয়। অনুমান করলুম ব্যাপারটা—দস্তুর প্রবন্ধ লেখার মত। তিনি লেখার ইমাম আর কম্পজিটর পড়ার মুয়াত্ত্বিন। কিন্তু যাক এসব কথা—আমি কাইরোর জীবনী লিখতে বসি নি।

সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে মুখহানা পরের চিন্তায় মাতা ঘামাতে আরম্ভ করলেন সকালবেলা থেকে। দেখি, দু'দিনের যত বিপদগ্রস্ত লোক আস্তে আস্তে তাঁর ড্রইংরুমে জড়ো হতে আরম্ভ করেছে। বেশীর ভাগ ভারতীয়, প্রায় সকলেরই পাসপোর্ট নিয়ে শিরঃপূড়া। এদের সকলেই দীর্জ—এ দেশে আমি কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে এসেছিল চাকরি নিয়ে। কন্ট্রাক্টররা চলে যাওয়ার পর এখানেই ঘর বেঁধেছে—কাইরোর অতি সাধারণ মেয়েও পাঞ্জাবী দীর্জর হৃদয়খানা খান্‌খান্‌ করে ফেলতে পারে। কারো কারো হৃদয় ইতিমধ্যে জোড়া লেগে গিয়েছে অর্থাৎ নেশা কেটে গিয়েছে। এখন কেটে পড়তে চায়, কিন্তু পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছে—মুখহানা যদি ব্রিটিশ কন্সুলেটে গিয়ে একটুখানি সুপারিশ করেন। কারো বা মিশরে বসবাস করার মেয়াদ পেরিয়ে গেছে—মুখহানা যদি মিশরে বিদেশী দপ্তরে গিয়ে একটুখানি দস্তাবেজ করে আসেন। কেউ বা তার পাসপোর্টখানা কালো-বাজারে ইহুদীকে বিক্রি করে দিয়েছিল (ইহুদী কোমকাল দিয়ে তার ফটো মুছে ফেলে প্যালেস্টাইনী জাতভাইয়ের জন্য তাই দিয়ে জাল পাসপোর্ট বানিয়ে ধর্ম আর অর্থ দুইই সঞ্চয় করবে), এখন মুখহানা যদি কোনও মালজাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলে কয়ে কিংবা 'টু পাইস' দিয়ে তাকে চোরাই মালের মত দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেন।

দু'একজন পরসাপোয়লা পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্টরও এলেন। মুখহানা যদি রেজিমেণ্টের কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে একখানা নতুন বুইক ভেট দিয়ে আসেন। না অন্য কোনও রকম লুব্রিকেশনের খবর তিনি বলতে পারেন?

দুপুর বেলা খাবার সময় মুখহানাকে দু'একখানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই বুঝতে পারলুম, জাহাজে যেরকম তিনি প্যাসেঞ্জার ও কতাদের মাঝখানের বেসরকারী লিয়েঞ্জী অফিসার ছিলেন এখানেও তিনি তেমনি দুঃস্থ ভারতীয় ও মিশরী, ইংরেজ সর্বপ্রকার কতাব্যক্তির মাঝখানের অনাহারী লিয়েঞ্জী অফিসার।

শবীর সুস্থ থাকলে বনের মোষ তাড়ানোটা বিচক্ষণ জনের কাছে নিশ্চিন্দাই হলেও স্বাথোর পক্ষে সেটা ভালো, কিন্তু এই দুর্বল শরীর নিয়ে ভদ্রলোক কেন যে হয়রান হচ্ছেন সে-কথার একটু ইঙ্গিত দিতেই মুখহানা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আ-আমি কি করব? আমি যে এখানকার ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের

সেক্রেটারি।’

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ‘মেম্বার কারা?’

‘ঐ দর্জির পাল আর দু-চারটে ভ্যাগাব’ড।’

‘আর কেউ সেক্রেটারি হতে পারে না?’

‘সব টিপসইয়ের দল। কনসুলেটে গিয়ে ইংরিজিতে কথা বলবে কে?’

‘তাহলে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন না কেন?’

‘প্রেসিডেন্টের পক্ষে কনসুলেটে ছুটোছুটি করা কি ভাল দেখায়? এসোসিয়েশনের তো একটা প্রেসিডেন্ট দেখানো চাই।’

‘প্রেসিডেন্ট কে?’

‘এক বড়ো দর্জি। ইংরিজিতে নাম সই করতে পারে।’

আমি আর বাক্যব্যয় করলুম না। এরকম লোককে কোনো প্রকারের সদ্ব্যবহার দেখা অরণ্যে রোদন—এবং সেই অরণ্যেই যেখানে সে মোষ তাড়াচ্ছে, শূনেও শুনবে না।

মুখহানা আপিসে চলে গেলেন। আমি হেলেনাকে জিজ্ঞেস করলুম, ‘মুখহানার এই কাশিটা কবে হল এবং কি করে?’

হেলেনা বললেন, ‘খেটে খেটে। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসে যখন দেখলেন কারবার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন গাড়ি বেচে দিয়ে বড় বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে উঠলেন। তারপর নতুন করে ব্যবসা গড়ে তোলবার জন্য এই দশ মাস ধরে দিন নেই রাত নেই চব্বিশ ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করছেন। বাড়ি ফেরেন রাত দুটো, তিনটে, চারটে। কথা শোনেন না, ফিরে এসে ঠান্ডাজলে স্নান করেন, কখনও কখনও আবার খেতেও রাজী হন না, বলেন ক্ষিদে নেই। আগে তিনি সব সময় আমার কথামত চলতেন, এই নতুন করে কারবার গড়ে তোলার নেশা যবে থেকে তাকে পেয়েছে তখন থেকে তিনি আর আমার কোনও কথা শোনেন না। এর চেয়ে তিনি যদি অন্য কোনো স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়েও আমাকে অবহেলা করতেন, আমি এতটা দুঃখ পেতুম না। তবু তো তিনি সুস্থ থাকতেন!’

আমি কথাটার মোড় ফেরাবার জন্য বললুম, ‘জ্বর-টর হয়েছিল?’ বললেন, ‘প্রায় মাস তিনেক আগে তিনি ভেঙে পড়েন। দিন পনেরো শূয়ে ছিলেন, আর সেই পনেরো দিনেই যেন শরীর থেকে সব মাংস-চর্বি খসে পড়ে গেল। আর জানেন, তিনি কখনও ডাক্তার ডাকান নি।’

আমি বললুম, ‘এ কথা তো বিশ্বাস করা যায় না।’

হেলেনা উঠে চলে গেলেন। আমি থামলুম না। একা একা যতক্ষণ খুশি কাঁদা যায়।

চারের সময় আমি মুখহানাকে বেশ পরিষ্কার, জোর গলায় বললুম, তিনি যদি ভাল ডাক্তার না ডাকান, তবে আমি কাল সকালেই বিছানা-পত্র নিয়ে তাঁর বাড়ি ত্যাগ করব। তিনি যদি অভিমান করতে পারেন, ভারতীয়েরা প্রতিজ্ঞা করেও কাইরো আসে না বলে, তবে আমি অভিমান করতে পারি

ষে-ভারতীয় স্বদেশবাসীর সামান্যতম অনুরোধ পালন করে না, তার মূখদর্শন না করলেও আমার চলবে।

ডাক্তার এল। যক্ষ্মা। বেশ এঁগিয়ে গেছে। এক্সরে না করেই ধরা পড়ল।

তারপর যে এগারো মাস আমি কাইরোতে কাটালুম তার স্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। ওমর খৈয়াম বলেছেন :—

প্রথম মাটিতে গড়া হলে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবাব হবে যে ধান্যে, তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই
বিচারকর্ষী প্রলয় রাতি পাঠ যা করিবে ভাই ॥

—সত্যেন দত্ত।

আর আইনস্টাইনও নাকি বলেছেন, পৃথিবীর সব কিছু চলে এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে। ওমর খৈয়াম ছিলেন আসলে জ্যোতির্বিদ—কাজের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি রুবাইয়াৎ লিখেছেন মাত্র—এবং আইনস্টাইনের চোখও উপরের দিকে তাকিয়ে। এই দুই পণ্ডিত গ্রহনক্ষত্রের নিয়ম-মানা দেখে যা বলেছেন, আমি মূখহানার জীবনে তাই দেখতে পেলুম।

কত অনুনয়বিনয়, কত সাধ্যসাধনা, কত চোখের জ্বল ফেললেন হেলেনা—আমার কথা বাদ দিচ্ছি—না, না, না, তিনি তাঁর কারবার ফের গড়ে তুলবেনই। ডাক্তার পই পই করে বলে গিয়েছেন, কড়া নজর রাখতে হবে তিনি যেন নড়াচড়া না করেন—কিন্তু থাক্, ডাক্তারের বিধানের কথা তুলে আর কি হবে, মধ্যবিস্ত্র কোন বাঙালী পাঠক সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে যক্ষ্মার সঙ্গে পরিচিত নয়—সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি বেরুতেন রোজ সকালে চায়ের কারবারে। তাও না হয় বুঝতুম তিনি যদি শূন্য অফিসে ডেক-চেয়ারে শূন্যে থাকতেন। কতদিন মনিং-কলেজ থেকে ফেরার মুখে দেখেছি মূখহানা চলেছেন ক্রান্ত, শ্লথ গতিতে, শ্বিপ্রহর রৌদ্র উপেক্ষা করে, বড়-বড় খন্ডের আফিসে আরও কিছু চা গছাবার জন্য। বাড়ি ফিরতেন রাত আটটা, নটা, দশটা।

খৈয়াম আইনস্টাইন ঠিকই বলেছেন সব কিছু চলেছে এক অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য নিয়মের বেগধাতে। মূখহানা-পতঙ্গ ধেসে চলেছে কারবারের আগুনে আপন পাখা পোড়াবে বলে।

খুন্ খুন্ তখন অদম্য হয়ে উঠেছে। শালী টের পেয়ে মেয়েকে নিয়ে পালালেন। সুভাষিতে আছে, ‘পরাম্ভং দুল্ভং লোকে’ কিন্তু সে পরাম্ভ যদি যক্ষ্মার বীজাণুতে ঠাসা থাকে, তবে তা সর্বথা বর্জনীয়।

হেলেনা কিন্তু হাসিমুখে বোনকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

আশ্চর্য এই মেয়ে হেলেনা ! মূখহানাকে যা সেবা করলেন, তার কাছে মনে হয়, বাঙালী মেয়ের সেবাও হার মানে। অন্য কোনও দেশে আমি এ জিনিস দেখি নি, হয়ত এরকম দুর্যোগ চোখের সামনে ঘটে নি বলে।

ঘুম থেকে উঠে কতবার তিনি মৃত্যুহানার শরীর মূছে দিতেন, সে শব্দ তাঁরই বলতে পারবেন যারা যক্ষ্মা রোগীর সেবা করেছেন। ডাক্তার নিশ্চয়ই বারণ করেছিলেন, তবু হেলেনা মৃত্যুহানার সঙ্গে এক খাটেই শূতেন। আমি তাই নিয়ে যখন হেলেনাকে একদিন অত্যন্ত কাতর অনুন্নয়বিনয় করলাম, তখন তিনি বললেন, ‘আমি কাছে শব্দে তাঁর বন্ধুর উপর হাত রাখলে তিনি কাশেন কম, ঘুম হয় ভাল।’ আমি বললাম, ‘এ আপনার কল্পনা।’ হেসে বললেন, ‘এ কল্পনাটুকুই তো তিনি বিষ্মে করেছেন। আমি তো আর আসল হেলেনা নই।’ আমি চুপ করে গেলুম।

কতনা হাটাহাটি খোঁজাখুঁজি করে তিনি নিয়ে আসতেন বাজার থেকে সব চেয়ে সেরা জাফার কমলালেবু, কী অসমী ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর করতেন টম্বাটোর রস, রান্না করতেন স্বামীর কাছ থেকে শেখা ভারতীয় কায়দায় মাংসের ঝোল, ফোপ্তা-পোলাও, মাদ্রাজী রসম্, স্নান করিয়ে দিতেন স্বামীকে আপন হাতে, মৃত্যুহানা বেশী কাশলে জেগে কাটাতেন সমস্ত রাত। তিনি নিজে রোগা, কিন্তু ধর্মাত্মরী যেন তখন তাঁকে বর দিয়েছেন যমের সঙ্গে লড়বার জন্য।

কাইরোতে বৃষ্টি হয় বছরে দেড় না আড়াই ইঞ্চি, আমার মনে নেই। দিনের পর দিন মেঘমুক্ত নীলাকাশ দেখে দেখে বাঙালীর মন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। যখনই উপরের দিকে তাকাই, দেখি নীল আকাশ প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। প্রথমবার যখন ইয়োরোপের পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তখন মাঝে মাঝে নীলচোখো মেমসাহেবরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকত—এই অশ্রুত জংলী লোকটার বিদ্যুটে চেহারা দেখে, আর অস্বাভিতে আমার সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠত। কাইরোর সেই নীলাকাশ সেই নিলজাদের নীল চোখের মত হরবকত আমার দিকে তাকিয়ে আছে, একবার পলক পর্ষত ফেলে না; মেঘ জমে না, দরদের অশ্রুবর্ষণ বিদেশী ঐরহীর জন্য একবারের তরেও ঝরল না।

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে কত রকমের হাওয়া কাইরোর উপর দিয়ে বয়ে গেল, কত না মূখের বোরকা সরিয়ে ক্ষণেকের তরে নিশিকৃষ্ণ চোখের বিদ্যুৎ ঝলক দেখিয়ে দিলে, কিন্তু তাদের কেউই এক রস্তু মেঘ সঙ্গে নিয়ে এলো না। সাহারা থেকে, লাল দরিয়া পেরিয়ে, হাবশী মন্ড্রকের পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে মধ্য-সাগরের মাধ্যাকান থেকে চার রকমের হাওয়া বইল, যেন হলদে, লাল, কালো, নীল রঙ মেখে কিন্তু মেঘ আর জমে ওঠে না।

ভুল বললাম, মেঘ জমে উঠতে লাগল হেলেনার মূখের উপর। পূর্ব-সাগরের পার হতে একদা যে নীল মেঘ সাইপ্রিস রমণীর চিত্তাকোশ প্রেমের বেদনায় ভরে দিয়েছিল, আজ সে মেঘ তার সমস্ত মূখও ছেয়ে ফেলল। দু’চোখের চতুর্দিকে যে কালো ছায়া জমে উঠল, সে যেন চক্রবাল-বিস্তৃত বর্ষণ-বিমূখ খরা মেঘ; আমি মেঘের দেশের লোক, আমার বাড়ি চেরাপুঞ্জির গা ঘেঁষে, ছেলেবেলা থেকে মেঘের সঙ্গে মিতালি—কিন্তু হে পর্জনা! এ রকম মেঘ যেন আমাকে আর না দেখতে হয়।

কানাড়া ভাষায় উত্তম বিরহের কবিতা আছে, এ কথা কখনো শুনিনি।
কুর্গের লোক খুব সম্ভব মেঘের দিকে নজর দেয় না। মূথহানা হেলেনার
মূথের উপর জমে-ওঠা মেঘ দেখতে পেলেন না।

দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস অজ্ঞান, তুমি লক্ষ্যবস্তু ভিন্ন অন্য কিছুর দেখতে
পাচ্ছ কি? তোমার ব্রতগণ, তোমার আচার্য, তোমার পিতামহ?'

অজ্ঞান বললেন, 'না গুরুদেব, আমি শূন্য লক্ষ্যবস্তু দেখতে পাচ্ছি।'

মূথহানার নজর কারবারের দিকে।

কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার মনে খোঁকা লাগল, মূথহানা লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন
কি না। বিশেষ করে যেদিন শূন্যলক্ষ্য, তাঁর রেক্স নেই বলে তিনি ব্যাঙ্কের
মুছল্দিগারিতে মাল ছড়াচ্ছেন। সে মাল মজুদ থাকে ব্যাঙ্কেই—মূথহানা
কিছুটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করে দাম শোধ করলে আরো খানিকটা পান।
ঊদিকে রুকবন্ড লিপটন অটেল মাল ঢেলে দিয়ে যায় দোকানে দোকানে বিনি
পয়সায়, বিনি আগামে। ব্যাঙ্কের গুদোমে রাখা মাল লড়বে দোকানে দোকানে
সাজানো মালের সঙ্গে!

ব্যাঙ্কের টাকার সুদ তো দিতেই হয় বৃকের রক্ত ঢেলে, তার উপর গুদোম-
ভাড়া। মিশরী ব্যাঙ্কের নির্দয়তার সামনে সাহারা হার মানে।

কাজেই মূথহানার মাথার ঘাম যদি ব্যবসা গড়ে তোলাকে এগিয়ে দেয় এক
কদম, যক্ষ্মাকে এগিয়ে দেয় এক ক্রোশ।

ততক্ষণ মূথহানা বুঝতে পারেন নি। তিনি ব্যবসা নিয়ে মশগুল। আমি
তো ব্যবসা জানি নে। কিন্তু সিগারেট যে খায় না, গন্ধ পায় সেই বেশী।

মূথহানার সব চেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল ঐ পাঁচতলা বাড়ির বিরীশখানা
সিঁড়ি। সুস্থ মানুষ আমাদের ফ্ল্যাট চড়ে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়, ড্রাইংরুম
পৌঁছে প্রথম দশ মিনিট সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে ম্যালেরিয়া রোগীর মত
খোঁকে, অথচ মূথহানাকে ভাঙতে হচ্ছে প্রতিদিন অস্তত দুবার করে এই গৌরী-
শঙ্কর। একতলা বাড়ির জন্য মূথহানা যে চেষ্টা করেন নি তা নয়, কিন্তু কই-
রোতে নতুন বাড়ির সম্মান নতুন কারবার গড়ে তোলার চেয়েও শক্ত। সেলামীর
টাকা যা চায়, তা দিয়ে কলকাতায় নতুন বাড়ি তোলা যায়।

ছোকরা চাকর ওমরকে নাকি মূথহানা কোনও এক ড্রেন থেকে তুলে এনে
বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তার বয়স যখন চার। মূথহানার তখন পয়সা ছিল, ওমরের
তখন সেবা করেছে এক ফ্যাশনেবল আয়া আর স্বয়ং হেলেনা। আজ দশ
বৎসরের ওমর নিজের থেকে ছোকরা চাকরের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির
ছেলের মত অনায়াসে সব কাজ করে, আমার ভুল আরবী ভুল আরবী শূনে মিট-
মিটিয়ে হাসে আর হেলেনার গ্রীক পড়ানো থেকে পালাবার জন্য অস্থি-সস্থির
সম্মানে থাকে।

এইটুকু ছেলে, কিন্তু মূথহানার প্রতি তার ভক্তি-ভালবাসার অস্ত ছিল না।
স্নানোত্তরে কাজ করছে কিন্তু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ দীর্ঘ করে তার কান যেন গিয়ে
কস্টে আছে ফুটপাথের সঙ্গে (আমরা কেউ কিছুর শুনতে পাই নি—হঠাৎ কাজ-

কর্ম ফেলে ছুটলো বেতের হালকা চেয়ার নিয়ে নিচের তলার দিকে। কি করে যে সামান্যতম খক্‌খক্‌ শুনতে পেত, তা সে-ই জানে। প্রতি তলার সে চেয়ার পাতবে, মুখহানা বসে জিরোবেন। এই করে করে সে মুখহানাকে পাঁচতলার নিজে আসত। কেউ বাতলে দেয় নি, আবিষ্কারটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

মুখহানাকে কখনো দেখি নি ওমরের সঙ্গে আদর করে কথা কইতে। অল্প কথা বলতেন, না অন্য কোনও কারণে জানি নে, কিন্তু এটা জানি তাঁর চলাফেরাতে আচারব্যবহারের কি যেন এক গোপন যাদু লুকোনো ছিল, যার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে থাকা যেত না—বাচ্চা ওমরও বাদ পড়ে নি।

পয়লা ষ্ট্রায়েলেই খুশ হয়ে ওমর ঈদের জোশ্বা আঁকড়ে ধরেছিল। মুখহানা কিন্তু তিন-তিন বার এদিকে কাটালেন, ওদিকে ছাটালেন। ঈদের দিন ওমর যখন নতুন জোশ্বা পরে আমাদের সবাইকে সেলাম করল, তখন মুখহানা বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ওমর তো আমাদের ডাগর হয়ে উঠেছে, কনের সম্মানে লেগে যাও।’

মিশরেও আমাদের দেশের মত অল্প বয়সে বিয়ে হয়। ওমর তিন লক্ষ ঘর ছেড়ে পালালো। মিশরের বাচ্চারাও বিয়ের কথা শুনলে লজ্জা পায়।

এরকম মানুষকে পরোপকার করার প্রবৃত্তি থেকে ঠেকানো আজরাঈলেরও (যমেরও) অসাধ্য। আমি গিয়েছিলুম ব্রিটিশ কনসুলেটে পাসপোর্ট রেজিস্ট্রি করাতে। গিয়ে দেখি, মুখহানা কনসুলেটের এক কেরানীকে আদি, রৌদ্র, বীর, হাস্য সব প্রকারের রস দিয়ে ভিজিয়ে ফেলে কোন এক ভবঘুরের জন্য একথানা পাসপোর্ট যোগাড় করতে লেগে গেছেন। সাহেব যতই বুদ্ধি বলে, ‘ভারতীয় জন্মপত্রিকা না দেখানো পর্যন্ত আমরা কি করে জানব লোকটা ভারতীয়, আর ভারতীয় সপ্রমাণ না হলে আমরা পাসপোর্ট দেব কি করে?’ মুখহানা ততই ইমান-ইনসাফ দয়াধর্মের শোলোক কপচান, কখনো সাহেবের হাত দু’খানা চেপে ধরেন, কখনো রেডক্রসে পয়সা দেবেন বলে লোভ দেখান, কখনও ‘দি ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন লিমিটেড, কাইরোর প্রতিভূ হিসাবে সমস্ত সগর্বে দু’হাতে বুক চাপড়ান!

রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মোছেন নি—নবরসের ঐটুকুই বাদ পড়েছিল। সাহেব না হয়ে কেরানী মেম হলে সেটাও বোধ হয় বাদ পড়ত না।

সাহেব যখন শেষটার রাজী হ'ল, তখন দেখা গেল, লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরেটার কাছে পাসপোর্টের দাম পাঁচটি টাকা পর্যন্ত নেই। এক লহমার তরে মুখহানা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সামলে নিয়ে অতি সপ্রতিভভাবে জেব থেকে টাকাটা বের করে দিলেন।

এ টাকা তিনি কখনও ফেরত পান নি। আমি যখন বললুম, ‘টাকাটা এসোসিয়েশনের খর্চায় ফেলুন,’ তখন তিনি হঠাৎ ভেড়ে খেঁকখেকিয়ে বললেন, ‘লোকটা হজ্জে যেতে চায়। সুদিন থাকলে আমি কি শুধু পাসপোর্ট—’

আমি তাড়াতাড়ি মাপ চাইলুম। মুখহানা চুপ করে গেলেন। উঠে যাবার সময় আমার সামনে এসে মাথা নিন্দু করে বললেন, ‘আমার মেজাজটা একটু

তিরিক্ষি হয়ে গেছে। আপনি আমার মাফ করবেন।' আমি তাঁর হাত দু'খানি ধরে বললুম, 'আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত।'

আমি কাইরো আসার পরও মূত্থানা আট মাস কারবার গড়ে তোলবার জন্য লড়াই করেছিলেন। তারপর একদিন হার মানলেন। কারবারের কাছে নয়, স্বক্ষ্মার কাছে।

গ্রীসের রাজকুমারীর সঙ্গে ইংলন্ডের রাজকুমারের বিয়ে। কাইরোবাসী হাজার হাজার গ্রীক আনন্দে আত্মহারা। সবাই যেন জাতে উঠে যাচ্ছে, চাউল যেন দৈবযোগে পৈতে পেয়ে যাচ্ছে। এবার থেকে গ্রীকদের সময়ে চলতে হবে। রাজপুত্দের শালার জাত, বাবা-চালাকি নয়! আমাদের পাড়ার গ্রীক মৃদুটি পৃথক পিরামিডের মত মাথা খাড়া করে মোরগটার মত দোকানের সামনের ফুটপাথে গটর-গটর করে টহল দেয়, আমাকে আর সেলাম করে না। কি আর করি, রাজপুত্দের শালা, বাবা, চাটুখানি কথা নয়, আমি সেলাম করে জিজ্ঞেস করি, 'বর-কনে কিরকম আছেন?' মিশররাণী গ্রীক-রমণী ক্রিওপাত্রার দম্ভ মুখে মেখে আমার দিকে সে পরম তচ্ছল্যভরে তাকিয়ে বলে, 'কনগ্রেচুলেট করে তার করেছে, জবাব এলেই খবর পাবে!'

আমি তো ভয়ে মর-মর। সিস্থী ভাষায় প্রবাদ আছে—সিংহটাও নাকি শালাকে ডরায়।

সেই বিয়ের পরবের ফিল্ম এলো কাইরোয়। গ্রীক-মেয়ের গর্ভের বাচ্চা পৃথক ছুটলো সে ছাঁব দেখতে। আমাদের ওমর আধা-ভারতীয়, আধা-গ্রীক (যদিও রক্তে খাশ মিশরী)। সে ধরে বসলো ছাঁব দেখতে যেতেই হবে। আমিও সায় দিলুম। ভাবলুম মূত্থানার মনটা যদি চাক্ষুষ হয়। হেলেনা বায়োস্কেপ যেতে ভালবাসতেন। কিন্তু স্বামীর অসুখ হওয়ার পর থেকে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

গিয়ে দেখি 'কিউ' লম্বা হতে হতে পাঁচ খেয়ে 'ইউ' হয়ে তখন 'ডবল ইউ' হওয়ার উপক্রম। আমরা সবাই একটা কাফেতে গিয়ে বসলুম। ওমর কালা-বাজার থেকে টিকিট আনল।

ভিতরে গোলমাল, চেঁচামেচি, চিংকার। বাঙালী যজ্ঞবাড়িকে চিংকারে গ্রীকরা হার মানায়। মূত্থানা যে ক্রান্ত হয়ে পড়েছেন, আমরা লক্ষ্য করি নি। সিনেমা থেকে ফিরেই গলা দিয়ে অনেকখানি রক্ত উঠল। আমরা বিচলিত হয়ে পড়েছি দেখে হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রীকগুলো হন্যে হয়ে উঠেছে। ওদের দেখলে ভাবখানা কি মনে হয় জানেন?'

আমি বললুম, 'না।'

বললেন, 'মনে হয় না, যেন বলতে চায় "হেই, ঐ ড্যাম দু'নিয়াটার দাম কত বল তো, আমি ওটা কিনব?"'

হাসলেন না কাশলেন ঠিক বুদ্ধিতে পারলুম না। অসুখ, খিটখিটেমি আর খাপছাড়া রসিকতা—এ তিনের উদ্ভট সংমিশ্রণের সামনে আমি ভ্যাবাচাকা থেকে গেলুম।

অনেক রাত অমি ঘুম এলো না। মনটা বিকল হয়ে গিয়েছে। ষষ্ঠ্যাত্রে মরে বহু লোক, তার উপর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এ মানুষটা রক্ত-স্রব দিয়ে দিনের পর দিন মরণ-বন্ধুর ডান হাতে রাখী বেঁধেই চলেছে। যে ব্যবসায়ী মশ্রু এতদিন তাঁকে অম্ব-বন্দ্র ভোগ-বিলাস দিচ্ছিল, আজ যেন সেই হঠাৎ এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মত তাঁর হাতছাড়া হয়ে তাঁরই কণ্ঠরুদ্ধ করে সবলে দুই বাহু দিয়ে নিষ্পেষিত করে বিস্ফুট-বিস্ফুট রক্ত নিঙড়ে নিচ্ছে।

হঠাৎ শুনি হেলেনার কান্না। দরজা খুলে বেরুতেই দেখি, মুখহানার শোবার ঘরের দরজা খোলা আর মুখহানা ঠাস-ঠাস করে হেলেনার গালে চড় মারছেন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরতেই তিনি যেন চৈতন্য ফিরে পেয়েছেন এরকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে খাটে শুইয়ে দিয়ে আপন ঘরে ফিরে এলাম।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল। দেখি ঘরে আলো জ্বলছে আর হেলেনা আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। আমি আশ্চর্য হলাম না, বললাম, 'বসুন।'

আমি স্থির করেছিলাম, সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁকে বন্ধিয়ে বলব, তিনি যেন মুখহানাকে মাপ করেন। অসুখে ভুগে ভুগে মানুষ কিরকম আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে, সে কথা বন্ধিয়ে বলব। অতত এটা তো বলতেই হবে—তা সে সত্যি হোক আর মিথ্যেই হোক—সেবার পরিবর্তে ভারতবাসী আঘাত দেয় না।

কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হল না। হেলেনা চোখের জল দিয়ে আমাকেই অনুনয়-বিনয় করলেন আমি যেন মুখহানাকে ভুল না বন্ধ। এ মুখহানা সে মুখহানা নয় যিনি তিন বৎসর ধরে তাঁকে সাধাসাধনা করেছিলেন তাঁর প্রেম গ্রহণ করতে। বাড়ি-গাড়ি টাকা-পয়সা, তাঁর সর্বস্ব তিনি হেলেনাকে দিয়ে তিন বৎসর ধরে বার বার তাঁকে বলোছিলেন তিনি তাঁকে গ্রহণ না করলে তিনি দেশত্যাগী হবেন।

হেলেনা বললেন, 'আপনি ভাবছেন, দেশত্যাগী হবেন শুধু কথার কথা। তা নয়। আমার মামা তো ব্যবসায়ের ভিতর দিয়ে মুখহানাকে চিনতেন দশ বৎসর ধরে। তিনিই বলেছেন, 'এই কাইরোর মত শহরে মুখহানা কোনও মেয়ের দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকান নি। সাত বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে, টাকা-পয়সা যখন তাঁর ছিল তখন কত ফরাসী কত হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে তাঁর পিছু নিয়েছে, কিন্তু এই সাত বছরের ভিতর একদিন একবারের তরেও আমার মনে এতটুকু সন্দেহ হয় নি যে তিনি আমার ফাঁকি দিতে পারেন। মুখহানা তো ফাঁকির মানুষ নন।'

আমি চুপ করে শুনতে লাগলাম। বললেন, 'আজ না হয় তিনি দূরবস্থায় পড়েছেন বলে আমাকে তাঁর ব্যাণ্ণের হিসেব দেখান না, কিন্তু এমন দিনও তো ছিল যখন তিনি স্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে বলতেন—'সব টাকা উড়িয়ে দাও হেলেনা, আমি তাহলে বেশী কামাবার উৎসাহ পাব।' আমার গায়ে হাত তুলেছেন? তুলুন, তুলুন। ঐ করে যদি তাঁর রোগ বেরিয়ে যায় তবে তিনি জুড়োবেন, তাঁর শরীর সেয়ে যাবে।'

তারপর বললেন, ‘বলুন, আপনি মুখহানাকে ভুল বোঝেন নি?’

আমি বললুম, ‘না। আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। আপনি মুখহানাকে যে সেবা করেছেন, তার চেয়ে বেশী সেবা আমার মাও আমার বাবাকে করতে পারতেন না।’

এর বাড়া তো আমি আর কিছু জানি নে। হেলেনার মুখে গভীর প্রশান্তি দেখা গেল। বললেন, ‘আপনি আমায় বাঁচালেন। সব সময় ভয় মুখহানা হয়ত ভাবেন, বিদেশী মেয়ে বিয়ে করে তিনি হয়ত মনের মত সেবা পেলেন না। আমার বৃকের কতটা ভার নেবে গেল আপনি বুঝতে পারবেন না।’

কথাটা ঠিক। আমি অতটা ভেবে বালিও নি। পরদিন ছুটি ছিল। মুখহানা এসে কোনও ভূমিকা না দিয়েই বললেন, ‘কথা আছে।’

তৃষ্ণুর নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘শ্বর করেছি, কারবার গুটিয়ে ফেলব।’

আমি আশ্চর্য হলাম, খুশীও হলাম, বললুম, ‘সেই ভাল।’ বললেন, ‘আমি হার মানি নি; গুটোতে হচ্ছে অন্য কারণে। আমার দম নিতে বড় কষ্ট হয়। আর এই কাইরোতে আমার শরীর সারবে না। কুর্গে এক মাস থাকলেই আমার শরীর সেরে যাবে।’ তারপর খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, ‘আপনি তো কখনও কুর্গে যান নি, তা না হলে আমার কথাটার মর্ম বুঝতে পারতেন। এই সাহারার হাওয়া আমি একদম সহিতে পারি নে। আমার বুক যেন ঝাঁঝা করে দেয়।’

কিছু বললুম না। কারণ জানতুম, জেনে-শুনে মিথ্যা কথা বলছেন না। সহারায় এই বালু-ছাঁকা শূন্যকো বাতাস দিয়ে ফুসফুস পরিষ্কার করার জন্য অগ্নুগতি ইয়োরোপীয় যক্ষ্মা রোগী প্রতি বৎসর মিশরে আসে।

উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ‘জানেন হের ডক্টর, ট্যামারিণ্ড ট্রি কাকে বলে?’

আমি বললুম, ‘বিলক্ষণ।’

‘আমার ব্যাড্র সামনে এক বিরাট তেঁতুল গাছ আছে। তারই ছাওয়ায় যদি আমি তিনটি দিন ডেক-চেয়ারে শুতে পারি তাহলে সব কাশি সব ব্রঙ্কাইটিস ঝেড়ে ফেলতে পারব। যক্ষ্মা না বহু! হোয়াট রট্।’

আপন মনে মূর্চক মূর্চক হাসলেন। বললেন, ‘আমি কী বোকা! এতদিন এ কথাটা ভাবি নি কেন বুঝতে পারি নে। আর কাঁজির কথা কেন মাথায় খেলে নি তাও বুঝতে পারিনে। খাবো মায়েস হাতে বানানো কাঁজি, শুয়ে থাকব তেঁতুল-তলায়, দম নেব তেঁতুল-পাতা-ছাঁকা হাওয়া! বাস্! তিন দিনে সব ব্যামো বাপ্ বাপ্ করে পালাবে। যক্ষ্মা! হোয়াট ননসেন্স!’

তারপর হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল। বললেন, ‘হেলেনা যে খারাপ রাঁধে তা নয়। কিন্তু কাঁজি বানানো তো সোজা কাম’ নয়! আর এ মিশরী চালে কাঁজি হবেই বা কী রে?’

উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘কারবার গুটোনোও তো কঠিন কাজ।’ তারপর খুব সম্ভব ঐ কথাই ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু রাম উঠো বৃদ্ধলেন। মুখহানা খাটতে লাগলেন টপ গিগারে। আমি

জেলে নই তা বলতে। পারব না, জাল ফেলাতে মেহনত বেশী না গুটোতে। তবে এ কথা জানি, নদী-পুকুরে আবর্জনা থাকে বলে জাল আকসারই হেথা হোথা জড়িয়ে যায় আর ছাড়াতে গিয়ে চোখের জলে নাকের জলে হতে হয়। মুখহানারও হল তাই।

এখন শুধু আর ওমরের চেয়ারে চলে না। দারোয়ান ধরে ধরে উপরের তলার উঠিয়ে দিয়ে যায়। আর কথা বলা বেড়ে গিয়েছে।

‘বুঝলেন হের ডক্টর, আমার মা অজ্ঞ পাড়াগোঁয়ে মেয়ে। নামটা পর্যন্ত সই করতে জানে না। আপনার মা জানেন?’

ভাড়াবার প্রলোভন হয়েছিল কিন্তু মিথোবাদীর স্মরণশক্তি ভাল হওয়া চাই।

একটু যেন নিরাশ হয়ে বললেন, ‘তাহলে আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমাদের অঞ্চলের সবাই জানে, হেন ব্যামো নেই মা যার দাওয়াই জানে না। আসলে কিন্তু দাওয়াই নয়, ডক্টর। মা সারায় পাঁথা দিয়ে। কচু, ঘেঁচু, দুনিয়ার সব সব বিদঘুটে আবোল-তাবোল দিয়ে মা যা রাঁধে, তা একবার খেলেই আপনি বঝতে পারবেন ওর হাতে যাদু আছে। কিন্তু ও সব কিছুই দরকার হবে না আমার। ঐষে বললুম কাঁজি আর তেঁতুলের ছায়া! তারপর ফিরে এসে দেখিয়ে দেব ব্যবসা গড়া করে কয়!’

একদিন লক্ষ্য করলুম, আগে বরষ মুখহানা মাঝে মাঝে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরতেন, এখন প্রতি দিন হেঁটে। তাই নিয়ে একটুখানি মতামত প্রকাশ করলে পর মুখহানা বললেন, ‘আপনাকে সব কথা খোলসা করে বলি নি, শুনুন। আমি চাই হেলেনাকে যতদূর সম্ভব বেশী টাকা দিয়ে যেতে। ওর তো কেউ নেই যে ওকে থাওয়াবে। আমি অবশ্য শিগুগিরই ফিরে আসব। কিন্তু ও বেচারী এ ক’মাস বস্তু খেটেছে, এখন একটুখানি আরাম না করলে ভেঙে পড়বে যে।’

আমি বললুম, ‘ও’কে বলেছেন যে আপনি একা দেশে যাচ্ছেন?’

মুখহানা ক্ষীণ স্বরে বললেন, ‘হঁ, বস্তু কাদছে।’

আমি বললুম, ‘দেখুন মিস্টার মুখহানা, আর যা করুন—করুন, কিন্তু দুটি টাকা বেশী রেখে যাবার জন্য ব্যামোটা বাড়াবেন না।’

বুনো শ্লোয়ের মত মুখহানা ঘোঁৎ বরে উঠলেন। বললেন, ‘যান, যান, বেশী উপদেশ কপচাতে হবে না। বিয়ে তো করেন নি যে বঝতে পারবেন হেলানা আমার কে?’

তারপর গট গট করে রান্নাঘরে গিয়ে লাগালেন ওমরকে দুই ধমক। সে অবশ্য এসব ধমককে খোড়াই কেমার করে।

ফিরে এসে বললেন, ‘সৈয়দ সাহেব?’

‘জী?’

‘রাগ করলেন?’

‘পাগলা না কি।’

বললেন, ‘আমার মা’র কথা বলছিলাম না আপনাকে? অশুভ মেয়ে।

বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমার বয়স এক। বিশেষ কিছু রেখে যেতেও পারেন নি। কি দিয়ে যে আমার মানুষ করলো, এখনও তার সম্বন্ধ পাই নি। এই যে আমি কারবারে হার মানি নে, কনসুলেটে ঘাবড়াই নে, ইংরেজ গুপ্তচরকে ডরাই নে—সে-সব ঐ মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছি। আপনি বললেন, লেখাপড়া শেখে নি—’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘আমি কক্সনো বলি নি।’

চোখ দুটি অগাধ স্নেহে ভরে নিয়ে বললেন, ‘যদি কোনদিন কুর্গ আসেন তবে নিজেই দেখতে পাবেন।’ তারপর হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বললেন, আমি না থাকলেও আসতে পারেন—নিশ্চয়ই আসবেন। শূধু বলবেন, ‘আমি মুখহানাকে চিনি,’ বাস্ আর দেখতে হবে না। বড়ী আপনাকে নিয়ে যা মাতামাতি লাগাবে। কিন্তু কথা কইবেন কি করে? মা তো কানাড়া ছাড়া আর কিছু জানে না।’

*

*

*

পূর্ণ তিনটি মাস আমি মুখহানার কাছ থেকে তাঁর মায়ের গল্প শুনছি। একই গল্প পাঁচ সাত বার করে। আমার বিরক্তি ধরে নি। কিন্তু এ কথাও মানি আর কেউ বললে আমি এ কথা বিশ্বাস করতুম না। এক মাস যেতে না যেতেই আমার মনে হল, ফটোগ্রাফের দরকার নেই, গলার রেকর্ডের দরকার নেই, মুখহানার মাকে আমি হাজার পাঁচেক অচেনা মানুষের মাঝখানে দেখলেও চিনে নিতে পারব।

কুর্গ গেলে আমি প্রথম দিন কি খাবো তাও জানি, নাইতে যাবার সময় লাল না নীল কোন রঙের গামছা পাবো তাও জানি, শূধু-গায়ে চলাফেরা করলে মায়ের যে আপত্তি নেই তাও জানি এবং বিশেষ করে জেনে নিয়েছি, বিদ্যার নেবার সাত দিন আগের থেকে যেন রোজই যাবার তাগাদা দিই, না হলে বোম্বায়ে এসে জাহাজ ধরতে পারব না।

এ তিন মাসের প্রথম দু মাস মুখহানার জীবনে মাত্র দুটি কর্ম ছিল। ধূকতে ধূকতে ঠোঙ্গর খেয়ে পড়ি-মরি হয়ে এ দোকান, ও দোকান ঘুরে-ঘুরে সমস্ত দিন ব্যবসা গুটোনো, আর রাতে আমাকে মায়ের গল্প বলা।

তারপর মুখহানাকে শয্যা নিতে হল। এদিকে আমার পয়সাও ফুরিয়ে এসেছে। মুখহানা জানতেন, আমি একমাস পরেই দেশে ফিরব। টাকা থাকতেই আমি টিকিট কেটে রেখেছিলাম। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আরও কিছু দিন থাকার কিন্তু তাহলে হেলেনার হিম্মত ভাগ বসাতে হত। সে তো অসম্ভব।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান পেতে অপেক্ষা করছেন, আমি কখন বাড়ি ফিরব।

‘হের ডট্টর!’

‘আপনি আমাকে সব সময় “ডট্টর”, “ডট্টর” করেন কেন?’

‘রাগ করেন কেন? আমি তো লেখাপড়া শিখি নি। আমার বন্ধু “ডট্টর”, সেটা ভাবতে ভাল লাগে না? কিন্তু সে কথা যাক। বলছিলাম কি, আমার

‘মা—না থাক্—’

আমি বললুম, ‘আপনাকে বলতেই হবে।’

‘আপনি শক্ট্ হবেন। আর কেন যে বলছি তাও জানি নে। আমার মা ব্রাউজ-শেমিজ পরেন না, শূধু একথানা শাড়ি।’

আমি বললুম, ‘আমার মাও গরমের দিনে ব্রাউজ শেমিজ পরেন না।’

‘আঃ, বাঁচলেন।’

* * *

কাইরো ছাড়ার দিন সাতেক আগে মুখহানা তাঁর ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। খান গ্রিগেজ খাম দিয়ে বললেন, ‘এই ঠিকানা সব খামে টাইপ করে দিন তো।’

দেখি লো,

C. D. Muthana

Virarajendrapeth

Marcara

South Ceorg. India.

বললেন, ‘হেলেনা শূধু গ্রীক লিখতে পারে। তাই এই খামগুলো দেশে যাবার সময় তার কাছে রেখে যাব। আমাকে চিঠি লিখতে তাহলে তার কোনও অসুবিধে হবে না। আমিও তো শিগ্গিরই দেশে যাচ্ছি।’

টাইপ করছি আর ভাবছি, এর কটা খামের প্রয়োজন হবে? এ বড় অমঙ্গল চিন্তা, পাপ চিন্তা—কিন্তু শত চেষ্টা করেও মনকে তার থেকে মুক্ত করতে পারলুম না।

কাইরো ছাড়ার আগের দিন মুখহানা আমাকে ডেকে বললেন, ‘ওমর বলছিল আপনি নাকি বিকেলের দিকে আজহর অঞ্চলে যাবেন। আমার জন্যে তিনখানা কুরান শরীফ কিনে আনবেন?’

আমি বললুম, ‘কার জন্যে কিনছেন?’

‘আমার গাঁয়ের মোল্লাদের জন্য। তারা বলেছিল, ভারতবর্ষে ছাপা কুরানে নাকি বিস্তার ছাপার ভুল থাকে। কাইরোর কুরান নিয়ে গেলে তারা যা খুশীটা হবে।’

আমার ভুল অমূলক। বিদায় নেবার দিন দেখি মুখহানা তাঁর খুশী-মুখ। বার বার বললেন, ‘শিগ্গিরই ভারতবর্ষে দেখা হবে।’ হেলেনা—থাক সে কথা। ওরকম অসহায়ের কান্না আমি জীবনে কখনও দেখি নি, কখনও দেখতে হবে না, তাও জানি।

দেশে ফিরেই মুখহানাকে চিঠি লিখলুম। জবাব পেলুম না। তখন অতি ভয়ে ভয়ে তাঁর মাকে লিখলুম, ‘কোদশের শরীর একটুখানি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলে তিনি কিছুদিনের জন্যে দেশে আসবেন বলেছিলেন। আপনার কথা আমাকে সব সময় বলতেন আর দেশের ঘরবাড়ির জন্যে তাঁর মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমি তাঁর সঙ্গে এক বৎসর একই বাড়িতে ছিলাম। আপনার কথার

সব সময় ভাবতেন আর আমাকে রোজই আপনার কথা বলতেন। কম্ব ছেলেই মাকে এত ভালোবাসে। আপনি আমার প্রণাম নেবেন।' বহু ভেবে-চিন্তে এই কটি কথা লিখেছিলুম, পাছে আমার কোনও কথা তাঁর মনে ব্যথা দেয়।

এ চিঠিরও উত্তর পেলুম না।

তার মাস খানেক পর কাইরো থেকে খবর পেলুম, কোদ'ড মত্থানানা আমি চলে আসার তিন দিন পর ইহলোক ত্যাগ করেন।

মাদ্রাজ উপকণ্ঠের বেলাভূমি

এই যে সামনের বালুপাড়ের উপর জেলেপাড়া এর সঙ্গে মানব-সভাতার কোথায় যোগসূত্র—এই পাড়ার বাইরে যে সংসার তার উপরে সে কথাটা নির্ভর করে, কি পরিমাণ সহযোগিতা পায়?

এদের ঘরে যা তৈজসশত তা বিক্রি করলে দু টাকার বেশী উঠবে না। যে সব বাসনকোশন সামনের রাস্তার কলতলায় ধুতে নিয়ে আসে তার অধিকাংশ মাটির। দৈন্য বোধ হয় এদের চরম, কারণ হাড়ি-কলসীগুলোও অত্যন্ত মামুলী—ভাদের আকাবপ্রকারে সামান্যতম সৌন্দর্যের স্থান নেই। এমনই এবড়ো-থেবড়ো যে কোনো গতিকে দাঁড় করানো যায় মাত্র—ভার-কেন্দ্র বলে কোনো জিনিস বেশির ভাগ হাড়ি-কলসীতে নেই।

পুরুষরা কাজকর্ম করে সুস্থ একখানা কালো রঙের এক বিষণ্ণ চওড়া নেংটি আর ঘুনসি পরে। সন্ধ্যাবেলায় দেখেছি কেউ কেউ ধুতি-শার্ট পরে—বেশীর ভাগ যে জামা-কাপড় পরে সেগুলো দেখে মনে হয় যেন মাছের বদলে কুড়িয়ে-নেওয়া পরিত্যক্ত বৃশ-শার্ট, বোতামহীন শার্ট। ময়লা ঝোলাঝালা শার্ট-শার্ট দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, নিতান্ত হিম বাতাসের কনকনানিতে বাধ্য হয়ে পরেছে।

মেয়েরা পরেছে উত্তর ভারতে তৈরী মিলের শাড়ি। দক্ষিণ ভারতের সুন্দর সবুজ-সোনালী, মেরুন-নীল রঙের মামুলী শাড়ি কেনার পয়সা এদের নেই। এক-রঙা জামা যা পড়েছে তা সে এমনি বিবর্ণ আর রুদ্ধ যে সেটা পরার কোন অর্থ বোঝা যায় না—পরার কি প্রয়োজন? আমাদের জেলেনীরাতো পরে না। দু'একজনের পায়ে আংটি, হাতে বালা, নাকে ফুল—সবই রূপোর।

এরা কেরোসিনের ডিবে জ্বালায় না, রৌড়ির তেলের পিদিম এখনো বুদ্ধে উঠতে পারে নি। আর সে জ্বালানোই বা কতক্ষণের জন্য? সন্ধ্যা ভালো করে ঘনাতে না-ঘনাতেই সাঁঝের পিদিম দেখিয়ে এরা আলো নিভিয়ে ফেলে।

এদের মাছ-ধরার জাল, খানকয়েক এবড়ো-থেবড়ো তক্তায় জোড়া কাটামারুন ভেলা, দড়াদাড়ি সব কিছই এদের নিজের হাতে তৈরী—সামান্য সীসের গুলি আর লোহার পেরেক হয়ত সভ্য মানবের কাছ থেকে কিনে নেওয়া।

এদের ছেলেমেয়েরা ইঁস্কুল যায় না, ব্যামো শক্ত না হলে ডাক্তার হাসপাতালের স্থান করে না।

শহরের সভ্যতার কাছ থেকে এই নগণ্য,—প্রায় উজ্জ্বলিতলব্ধ—ন্যাকড়াটুকু গুলিপেরেকটার বদলে এরা সকাল সম্ভা খাটে। যে মাছ ধরে তার অতি সামান্য অংশ খায়, বেশীর ভাগ ‘বিক্রি’ করে দিতে হয় ঐ ন্যাকড়াটুকু, ঐ পেরেকটা আর শূন্যমুঠো চালের জন্য। ‘বেচাকেনা’র নামে এই নগ্ন প্রবঞ্চিত চোখের সামনে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

‘নগ্ন প্রবঞ্চিত?’ চক্ষুস্মান লোকের সামনে এ নগ্নতা ধরা পড়ে।

আর সবাই দেখছে সেই গল্পের রাজা যেন ফকিরদের জামা-কাপড় পরে শোভাযাত্রা চলেছেন। ‘সভ্যতা’র এই শোভাযাত্রা মাঝখানে সেই সরল বালকের চেঁচানো কেউ শুনতে পায় না—কিংবা চায় না।

* * *

সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের হাহাকারে যতক্ষণ বারান্দা মূখরিত থাকে, ততক্ষণ রাস্তার কলতলার শব্দ কানে আসে না—শুধু দেখি সমুদ্রপারের জেলেরা আসছে পথের পাশের কলতলায় নাইতে অথবা কাপড় কাচতে; মেয়েরা আসছে জল নিতে, বাসন ধুতে, কাপড় কাচতে, কাচা-বাচ্চাদের নাওয়াতে, মাথা ঘষতে। কল থেকে জল বেরোয় অতি মন্দগতিতে—একটি কলসী ভরতে আধ ঘণ্টাটুক লাগে।

বেশী ভিড় না থাকলে দূর গায়ের মেয়েরা শহরে যাবার মুখে মাথা থেকে চূবিড় নামিয়ে দূদ’ড জিরিয়ে নেয়, কলে হাত পা ধোয়।

আপিস কিংবা কারখানা যাওয়ার তাড়া থাকলে নিশ্চয়ই কলতলায় ঝগড়া-ঝাঁটি বেধে যেত। এখানে সব কিছুর ধীরে-সুস্থে এগোয়। ঐ যে জেলেটা আরাম করে কলতলায় গা এলিয়ে দিয়েছে তার জন্য কলসীহাতে মেয়েটার কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। যে কথাবার্তা হচ্ছে তা সমুদ্রের গর্জনে আর বাতাসের শনশনানিতে শোনা যাচ্ছে না।

আজ বাদলার দিন। নাইবার চাড় নেই বলে কলতলায় ভিড় কম। কাচা-বাচ্চারা তো একদম আসে নি। কিন্তু কড়া গরম পড়লে এখানে রীতিমত হাট বসে যায়। কড়া গরম পড়ার মানে যে তখন হাওয়া বন্ধ, কাজেই তখন একটু আধটু চিংকারও শোনা যায়—মেজাজও তখন কড়া হয়ে যায় বলে।

কলতলায় ভিড় কমে এসেছে। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, একটি জেলেনী কলসী ভরে দাঁড়িয়ে আছে—কলতলায় আর কেউ নেই যে কলসীটা মাথায় তুলে দেবে।

এমন সময় এক রিক্সা-ওলা যাচ্ছিল। রিক্সা দাঁড় করিয়ে সে কলসীটা তুলে দিয়ে ফের রিক্সা টানতে টানতে চলে গেল।

মেয়েটা একবার কৃতজ্ঞ নয়নে তাকালো পর্ষিত না। রিক্সা-ওলাও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাহায্যটুকু করে গেল—যেন এরকম ধারা করাটা তার হামেশাই লেগে আছে।

একেই বলে খাঁটি ভদ্রতা।

আনিকি পাসিকিভি

এক বাঙালী দম্পতির সঙ্গে জিনীভার এক বড় হোটেলে উঠেছি। প্রথম দিনই খানাঘরে লক্ষ্য করলুম, আমাদের টেবিলের দিকে মূখ্য করে বসেছেন এক দীর্ঘাঙ্গী যুবতী। দীর্ঘাঙ্গী বললে কম বলা হয়, কারণ আমার মনে হল এঁর দৈর্ঘ্য অন্তত পক্ষে পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি হবে—আর আমরা তিনজন বাঙালী গড়গড়তায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হই কি না-হই।

দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মিলিয়ে সুগঠিত দেহ—সেইটেই ছিল তাঁর সৌন্দর্য, কারণ মুখের গঠন, চুলের রঙ এবং আর পাঁচটা বিষয়ে তিনি সাধারণ ইয়োরোপীয় রমণীদেরই মত।

ভদ্রতা বজায় রেখে আমরা তিনজনই যুবতীটিকে অনেকবার দেখে নিলুম। ফিস ফিস করে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ভিতরে আলোচনাও হল। তখন লক্ষ্য করলুম, আমাদের দিকে তিনিও দু'চারবার তাকিয়ে নিয়েছেন।

সেই সম্ভাষ্য বাঙালী ভদ্রমহিলাটি হোটেলের ড্রসিংরুমে বারোয়ারী রেডিয়োটো নিয়ে স্টেশন খোঁজাখুঁজি করছিলেন; আমি একপাশে বসে খবরের কাগজ পড়াছিলাম। হঠাৎ সেই যুবতী ঘরে ঢুকে সোজা মহিলাটির কাছে গিয়ে পরিষ্কার ইংরিজিতে বললেন, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি? আপনি কি কোনো বিশেষ স্টেশন খুঁজছেন? আমার বেতরবাই আছে।'

পরিচয় হয়ে গেল। রোজ খাবার সময় আমাদের টেবিলেই বসতে আরম্ভ করলেন। নাম আনিকি পাসিকিভি—দেশ ফিনল্যান্ড।

ফিনল্যান্ডের আর কাকে চিনব? ছেলেবেলায় ফিন্ লেখক জিলিয়াকুসের 'রুশ বিদ্রোহের ইতিহাস' পড়েছিলাম আর তাঁর ছেলে জিলিয়াকুসও বিখ্যাত লেখক—প্রায়ই 'নিউ স্টেটসম্যানে' উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। বাস্।

কিন্তু তবু যেন পাসিকিভি নামটা চেনাচেনা বলে মনে হয়। সে কথাটা বলতে আনিকি, একটুখানি লজ্জার সঙ্গে বললেন, 'আমার বাবা ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট।'

আমরা তিন জনেই একসঙ্গে বললুম, 'অ।'

আনিকির সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমাদের ভারি সুবিধে হল। বাঙালী সম্পত্তি ইংরিজি আর বাঙলা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানতেন না, কাজেই আমাকে সব সময়ই ওঁদের সঙ্গে বেরতে হত। আনিকি অনেকগুলো ভাষা জানতেন; তিনি তাঁদের নিয়ে বেরতেন আর আমি স্লুনিভার্সিটি, লাইব্রেরি, মিটিং-মাটিং করে বেড়াতুম।

সুইস খানা যদিও বেজায় পুষ্টিকর তবু একটুখানি ভোঁতা—আনিকি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কয়ে তার পরিপাটি ব্যবস্থা করে দিলেন। শামুনিবক্স দেখতে যাবার জন্য মোটর ভাড়া করতে যাচ্ছি—আনিকি এক দোকানের গাড়ি ফিরি-গ্যাটিস-অ্যা'ড-ফরনাথিং যোগাড় করে দিলেন। তা ছাড়া জিনীভা, লজান, মন্ট্রা, ভিল্নভ্ (রমা রলাঁ সেখানে থাকতেন) সম্বন্ধে দিনের পর দিন নানা-প্রকারের খবর দিয়ে আমাদের ওয়াকিবহাল করে তুললেন।

সুক্ষ্ম রসবোধও আনিকির ছিল। আমি একদিন শূখালুম, ‘আপনি অভগ্নলো ভাষা শিখলেন কি করে?’

বললেন, ‘বাধ্য হয়ে। ইয়োরোপের খানদানী ঘরের মেয়েদের মেলা ভাষা শিখতে হয় বরের বাজার কন্টার করার জন্য। ইংরেজ ব্যারন, ফরাসী কাউন্ট, ইতালিয়ান ডিউক সঙ্কলের সঙ্গে রসালাপ না করতে পারলে বর জুটবে কি করে?’

তারপর হেসে বললেন, ‘কিন্তু সব শ্যাম্পেন টক্! এই পাঁচ ফুট এগারোকে বিয়ে করতে যাবে কোন্ ইংরেজ, কোন্ ফরাসি? তাকে যে আমার কোমরে হাত রেখে নাচতে হবে বিয়ের রাতের বল ডান্সে। যা দেখতে পাচ্ছি, শেষটায় জাতভাই কোনো ফিন্কেই পাকড়াও করতে হবে!’

আমি শূখালুম, ‘ফিন্কা কি বেজায় ঢাঙা হয়?’

বললেন, ‘ছয় ছয় তিন, ছয় ছয় হামেশাই। তাই তো তারা আর পাঁচটা জাতকে আকসার হাইজাম্প হারায়।’

রসবোধ ছাড়া অন্য একটি গুণ ছিল আনিকির। হাজির-জবাব। কিছু বললে চট করে তার জুংসই জবাব তাঁর জিভে হামেহাল হাজির থাকত।

একদিন বেড়াতে বেরিয়েছি তাঁর সঙ্গে। এক ডে’পো ছোঁকরা আনিকির দৈর্ঘ্য দেখে তাকে চেঁচিয়ে শূখালে, ‘মাদমোয়াজেল, উপরের হাওয়াটা কি ঠাণ্ডা?’

আনিকি বললেন, ‘পরিষ্কার তো বটেই। তোমার বোটকা প্রশ্বাস সেখানে নেই বলে।’

আনিকির সঙ্গে আমাদের এতখানি স্নদ্যতা হয়েছিল যে তিনি আমাদের সঙ্গে লজ্জান, মশ্বেয়া, লুৎসেন, ইন্টেরলা কন, ওসুঁরিণ সব জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন।

বিদায়ের দিন শ্রীমতী বসু তো কেঁদেই ফেললেন।

*

*

*

দু’এক বৎসর আমাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার ছিল। তার পর যা হয়—আন্তে আন্তে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

তারপর বহু বৎসর কেটে গিয়েছে, এখানে এক ফিন্ মহিলার সঙ্গে আলাপ। শূখালুম, ‘প্রেসিডেন্ট পার্সার্কিভর মেয়েকে চেনেন?’

গুম্ হয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ। তারপর শূখালেন, ‘আপনার সঙ্গে এখন কি তাঁর যোগাযোগ নেই?’

আমি বললুম, ‘বহু বৎসর ধরে নেই।’

বললেন, ‘তিনি চার মাস ধরে হাসপাতালে। পেটের ক্যান্সার। বাঁচবেন না। আপনি একটা চিঠি লিখুন না। অবশ্য অসুখের কথা উল্লেখ না করে। জাস্ট, এমনি, হঠাৎ যেন মনে পড়েছে।’

সে রাগেই লিখলুম।

দিন চারেক পরে আরেক পার্টিতে সেই ফিন্ মহিলার সঙ্গে দেখা। শূখালেন, ‘চিঠি লিখেছেন?’

আমি বললুম, ‘হ্যাঁ।’

বললেন, ‘দরকার ছিল না। কাল দেশের কাগজে পড়লুম, মারা গেছেন।’

বিদেশে

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে হয়, ‘সব চেয়ে কোন্ দেশ ভাল?’

‘মাই কানট্রি রাইট অর রঙ, মাই মাদার ড্রান্‌ক্ অর সোবার’ জাতীয় পাড় লোক হলে তো কথা নেই, চট করে বলবে, তার দেশই সব চেয়ে ভালো। কিন্তু আপনি যদি সে গোত্রের প্রাণী না হন তবে কি উত্তর দেবেন? কেউ যদি প্রশ্ন শুধায়, ‘সব চেয়ে খেতে ভালো কি?’ তা হলে যে রকম মৃদুশব্দে পড়তে হয়।

তখন উল্টে শুধাতে হয়, ‘ভালো দেশ’ বলতে তুমি কি বোঝো? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া, আহারাদি, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, সৌন্দর্যের পূজা, ধন-দৌলত, আতিথেয়তা, তুমি চাও কোনটা? ‘সব কটা মিলিয়ে হয় না?’ ‘আজ্ঞে না।’

তবু যদি কেউ পিস্তল উঁচিয়ে বলে, ‘এখুনি তোমায় এদেশ ছাড়তে হবে; কোথায় যাবে বলো!’ (যাদের ভ্রমণে শখ তাঁরা অবশ্য উল্লসিত হয়ে বলবেন, ‘পিস্তল ওঁচাতে হবে না, একবার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেই হল’) তা হলে বোধ হয় সুইটজারল্যান্ডের নামই করব।

ধরে নিচ্ছি খর্চাটা আপনিই দিচ্ছেন—কারণ খর্চা যদি না দেন তবে তো সঙ্কলের পয়লাই ভাবতে হবে কোন্ দেশে গেলে দ্ধু’ মূঠো অন্ন জুটবে। তা হলে ‘সাউথ সী আয়লেন্ড’ বা আফ্রিকার এমন কোন দেশের কথা ভাবতে হবে যেখানে এস্তার কলা-নারকেল রয়েছে, জীবন সংগ্রাম কঠোর নয়—বেছোরে প্রাণটা যাবার সম্ভাবনা কম। সৈদিক দিনে অর্বাশ্য মালম্বীপ সব চেয়ে ভালো। এদেশে কেউ কখনো শখ করে যায় নি তাই ‘অতিথি’ শব্দটা মালম্বীপের ভাষায় ঝাঁ চকচকে নতুন হয়ে পড়ে আছে, কখনো ব্যবহার হয় নি। মালম্বীপের প্রত্যেকটি ম্বীপ এত ছোট যে, যে-কেউ যে-কোনো ম্হুর্তে আপন বাড়ি ফিরে যেতে পারে—অতিথি হতে যাবে কে কার বাড়ি? এখানে অবশ্য পালা নেমস্তম্ভের কথা উঠছে না। তাই কেউ যদি কখনো পাকে-চক্রে মালম্বীপ পেঁছায় তবে তাকে এর বাড়িতে ওর বাড়িতে এ ম্বীপে ও ম্বীপে দ্ধু’দিন চারদিন থাকতে গিয়ে হেসেখেলে বছর তিনেক কেটে যায়। আমার জীবনে আমি মাত্র একটি মালম্বীপ-বাসীর সঙ্গে কাইরোতে পরিচিত হই। প্রতিবার দেখা হলেই ভদ্রলোক মালম্বীপ যাবার আমন্ত্রণের কথাটি আমার স্মরণ করিয়ে দিতেন।

তাই বলছিলাম, খর্চা যখন আপনিই দিচ্ছেন তবে সুইটজারল্যান্ড সহী। সুইটজারল্যান্ডের মত আকর্ষণ দেশ ইউরোপে আর নেই—সেখানকার খর্চা যদি আপনি বরদাশ্ত করতে পারেন তবে আর সর্বদেশ তো ফাউ। টুক করে প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ঘুরে আসতে পারবেন। খর্চা সুইটজারল্যান্ড থাকলে যা বার্লিন ঘুরে এলেও তা।

স্বপ্নেই যখন যাচ্ছেন, তখন ভাত কেন পোলাওই খান (সিদ্ধী প্রবাদে বলে, ‘স্বপ্নের পোলাওই যখন রাধেছো তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুসি করছো কেন?’), স্বপ্নেই যখন ভ্রমণ করছেন তখন থার্ড ক্লাস কেন, গোটা জাহাজ চাট্টার করে ডা সৈয়দ মৃজতবা আলী রচাবলী (১ম)—৯

লব্ধ কর্বেনে কিম্বা প্রেশারাইজড্ স্পেনে করে জিনীভা চলে যান।

লেক অব জিনীভার পারে একটি ছোট, অতি ছোট কুটির (শালে) ভাড়া নেবেন আর একটি রাঁধুনি যোগাড় করে নেবেন।

শুনেই নাভিস্বাস উঠলো তো? বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, তার চুরি-চামারি ঠেকাবে কে? হিসেবে আলদুর সের আড়াই টাকা দেখিয়ে বলবে না তো, 'কস্তা, দাঁওয়ে মেরেছি, না হলে আসলে দাম তিন টাকা?'

এই হল সুইটজারল্যান্ডের প্রথম সুখ। ছুঁচোমো, ছ্যাঁছড়ামো ওদেশ থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে। সুইটজারল্যান্ডের হোটেলেও তাই। আক্সা বটে—বসবাস খাই-খরচের জন্য হয়ত দৈনিক কুড়ি টাকা নিল কিন্তু তার পরও আপনাকে মাখনটাতে ফাঁকি, মদুগাঁটাতে জুদোয়ারি এসব করে না। আপনার খাওয়া দেখে যদি তার সন্দেহ হয় আপনি পেট ভরে খান নিন তবে এসে বলবে, 'আপনি বিদেশী, এ রান্না আপনার হয়ত পছন্দ হয় নি। আপনি কি খেতে চান বাংলাে দিন, আমরা সে রকম রেঁধে দেব।'

আপনি নিশ্চিত থাকুন; আপনার রাঁধুনী আপনাকে ফাঁকি দেবে না।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই বিছানার পাশের বোতামটি টিপবেন। পাঁচ মিনিটের ভিতর গরম কফি, মদুরমদুরে রুটি আর শিশির-ভেজা মাখনের গুলি। রাঁধুনী বলবে, 'স্যর, চমৎকার ওয়েদার। আপনি বেরুচ্ছেন তো? আমি বাজার চললাম।'

লেকের পারে এসে একখানা বোর্ডিংয়ে বসবেন। খবরের কাগজটি পাশে রেখে তার উপর হ্যাট চাপা দেবেন।

আহা, কী গভীর নীল জল জিনীভা লেকের। লেকের ওপারে যে আল্প্‌স সেও যেন নীল, আর তার মাথায় মাথায় সাদা সাদা বরফের টুপি। তার উপর চড়োর কাটা-কাটা সাদা ঝালরে সাজানো আকাশের ঘন নীল চন্দ্রাতপ। আর আকাশ-বাতাস, হ্রদের জল, পাহাড়ের গা, বরফের টুপি সব বিছু ভরে দিয়েছে কাঁচা হলুদের সোনালি রোদ। সকাল বেলায় বাতাস একটু ঠাণ্ডা; কিন্তু প্রতিক্ষণে আপনার গালে কানে আদর করে সে বাতাস কুসুম-কুসুম গরম হতে থাকবে। ওভার-কোটের বোতামগুলো খুলে দিয়ে পাইপটা ঠাসতে আরম্ভ করবেন। হয়তো গুনুগুনু করতে আরম্ভ করবেন, 'আমি চিনি, চিনি, চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।'

নীল জলের উপর দিয়ে সাদা জাহাজের এ-পার ও-পার খেয়া। জলের উপর আল্প্‌সের কালো ছায়া পড়েছে, ফাঁকে ফাঁকে নীল জল, তার উপর সাদা জাহাজ। মেই আল্পনার উপর জাহাজের চাকার তাড়ায় ভেঙে পড়ছে লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের চুম্বিক। যেন কোন্‌ খেরালি বাদশা টাকশাল থেকে এইমাত্র বেরনো টাকা নিয়ে খোলামকুচির খেলা লাগিয়েছেন।

পাল তুলে দিয়ে চলেছে জেলের নৌকো। অতি ধীরে অতি মন্থরে। জাল টেনে তোলার সময় রোদ এসে পড়ছে ভেজা জালে। কালো জাল বাদুর ছোঁয়া লেগে রূপোর জাল হয়ে গেল।

এই রকম রূপের জাল দিয়ে আপনার প্রিয় তার খোঁপা জড়াতো না ?

তৎক্ষণাৎ বৃকট চড়চড় করে ইস্-পার-উস্-পার ফেটে যাবে। কোন মূর্খ বলে দেশ-ভ্রমণে অবিমিশ্র আনন্দ ?

রববারে জিনীভার লোকের পাড় আরও চমৎকার।

বিশ্বের নরনারী জাহাজ চড়ে বেরিয়েছে ফুঁত করতে। এসব জাহাজ ‘ইম্পিশাল’—লম্বালম্বি লোকের এপার ওপার হয়। সমস্ত দিন জাহাজে কাটিয়ে উত্তম আহারাদি করে (হে বাঙালী, লোকের মাছ খেতে চমৎকার

বাপ রে সে কি বিরাট মাছ উদর আশ্রয়

মুখে দিলে মাখন যেন জঠর ঠাণ্ডা হয়),

জাহাজের ব্যাণ্ডের সঙ্গে টাঙ্গের ধাগিনাতি নাকখিন আর ওয়াল্ট্‌সের ধা খিন না, ধা তিন না নেচে, কিংবা মাউথ-হারমনিয়াম বাজিলে, ছোঁড়াছড়িদের সঙ্গে দু’দু’ রসলাপ করে, কিংবা জাহাজের এক কোণে আপন মনে বসে খুদাতালার আসমান-পানি, পাহাড়-পর্বত দেখে দেখে সমস্ত দিনটা দিব্য কেটে যায়।

সুইসরা ইংরেজের মত গেরেমভারী লোক নয়। যদি দেখে, আপনি বিদেশী, এক কোণে একা বসে আছেন তবে কোনো একটু ছুতো ধরে আপনার সঙ্গে আলাপ করে নেবেই নেবে। অবশ্য আপনি যদি খেঁকিয়ে ওঠেন তবে আলাদা কথা, কিন্তু আপনি তো বদরাসিক নন—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনি ‘পঞ্চতন্ত্র’ পড়েন—আপনি খুশী হয়েই সাড়া দেবেন।

কিন্তু সুশীল পাঠক, এই বেলা তোমাকে বলে রাখি। দেশভ্রমণের ষোল-আনা আনন্দই বরবাদ-পরমাল যদি তুমি সে দেশের ভাষায় কথা কইতে না পারো। ভুল বললুম, বলা উচিত ছিল, যদি বুঝতে না পারো। কথা কইবার প্রয়োজন অত বেশী নয়, সুইস যদি দেখে যে তুমি তার ভাচার ভাচার বুঝতে পারছো, মাঝে মাঝে মোকা-মাফিক ‘হু’ ‘হু’ করছো কিংবা বুড়া রাজা প্রতাপ রায়ের মত সমে সমে মাথা নাড়ছো তা হলেই সে খুশী।

সুইস কেন, পৃথিবীর প্রায় সব জাতের লোকই বিদেশী সম্বন্ধে কৌতুহলী। বিশেষ করে মেয়েদের উৎসাহ এ বাবদে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী। অথচ মেয়েরা লাজুক তাই তারা পুরুষকে অগ্রদূত হিসাবে পাঠায় কলেকৌশলে আলাপ জমাবার জন্য। তার পর

‘দীন যথা যায় দূর, তীর্থ দশরশনে

রাজেন্দ্র সঙ্গমে—’

কিংবা কালিদাসের বজ্রমণি সমুৎকীর্ণ হওয়ার পর সূত্র যে রকম সুড়ুং করে উঠে যায় (সংস্কৃতটা আর ফলালুম না, ভুল হয়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা), মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেবে।

সাবধানী পাঠক, ভয় পেয়ো না। যে মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য ছোঁড়াটাকে পাঠিয়েছিলেন সে ফালতো। তার বোন ছোকরাটির ফিন্নাসে। এবান সঙ্গে আছে, সে বোচারী একা একা কি করে ?

চামড়া আর চুলের রঙ তাঞ্জাব জিনিস।

আমরা ফর্সা রঙের জন্য আকুল, যার চুল একটুখানি বাদামী তার তো দেমাকে মাটিতে পা পাড়ে না। আর বেশীর ভাগ উত্তর এবং মধ্য ইয়োরোপীয় বাদামী চামড়া আর কালো চুলের জন্য জান্ কোরবানী দিতে কবুল।

চট করে একটা ঘটনার উল্লেখ করে নেই। এ ঘটনা অধমের জীবনে একাধিকবার হয়েছে।

এরকম এক জাহাজে এক কোশে একা বসে আছি। আমার থেকে একটু দূরে এক পাল ইস্কুলের মেয়ে মাস্টারনীর সঙ্গে ফুঁত করতে জাহাজে চেপেছে। সবাই আপন আপন স্যাণ্ডউইচ বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। স্যাণ্ডউইচগুলো টেবিলের মাধ্যখানে বারোয়ারি করে রাখা হয়েছে, আর জাহাজ থেকে তারা অর্ডার করেছে লেমনেড।

কী চেঁচামেচি! ‘দেখ দেখ, ফ্রিডির মা কি রকম খাসা বেকন্-স্যাণ্ডউইচ পাঠিয়েছে,’ ফ্রিড লজ্জার টমাটো হয়ে বলছে, ‘না না, মাস্টার্ড ছিল না বলে স্যাণ্ডউইচ ভালো হয় নি,’ ‘ক্রারার মা’র পাঠানো স্যালাডটা খা ভাই, জানিস ও’র বাগানে যা লেটিস আর টমাটো হয়!’ আর টীচার শব্দ বলছেন, ‘চুপ চুপ, অত করে চ্যাঁচাতে নেই। লোকে কি ভাববে?’

ধর্ম সাক্ষী লোকে কিছু ভাবে না। বরঞ্চ ওরা না চ্যাঁচালে পাঁচজন অস্বস্তি অনুভব করত; ভাবত কালো-বোবাদের ইস্কুল পিকনিকে বোরিয়েছে।

সব কটা মেয়ে—ইস্টেক টীচার—আড়নয়নে ভদ্রতা বজায় রেখে আপনার কালো চুল আর বাদামী রঙের দিকে তাকাবে।

পরের স্টেশনে হুড়মুড় করে সবাই নেমে গেল। আমার মনটা উদাস হয়ে গেল।

তখন দেখি একটি আট ন’বছরের মেয়ে টেবিলের তলায় লুকিয়ে ছিল, গুড়ি গুড়ি আমার কাছে এসে কার্টাস করে (অর্থাৎ দৃষ্টি হাতে ফ্লক একটুখানি তুলে হাটু ভেঙে) বললে, ‘গুটেন্ টাখ্ (সুপ্রভাত)!’

আমি চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললুম, ‘গুটেন্ টাখ্, মাইন জ্যুসবেন (সুপ্রভাত, মিষ্টি মেয়ে)।’

লজ্জার কাঁচুমাচু হয়ে, চুলের ডগা পর্যন্ত লাল করে বললে, ‘আপনি রাগ করবেন না?’

আমি বললুম, ‘নিশ্চয় না।’

‘তবে বলুন তো, আপনি কি দিলে চুল কালো করেছেন! আমি কাউকে বলবো না, তিন সতি।’

আমি তখন তার সোনালি চুলের দিকে মদুখ নয়নে তাকিয়ে। বললুম ‘ডালিৎ, তোমার কী সুন্দর সোনালি চুল!’

গাল ফুলিয়ে বললে, ‘রাবিশ, আমি কালোচুল চাই।’

কিছুতেই বোঝাতে পারি নে, আমি চুলে রঙ রাখাই নি।

শেষটায় হঠাৎ বৃষ্টি থেলে। কোটের আঁঠিন সরিয়ে দেখালুম আমার লোমও কালো। বললুম, ‘ওগুলো তো আর বসে বসে কালো করি নি।’

বিশ্বাস তখন তার হল। মুখে গভীর বিষাদ মেখে, মাথা হেঁট করে আঁঙ্গে আঁঙ্গে জাহাজ থেকে নেমে গেল।

দু’টাকা জোর ন’সিকে দিয়ে টিকিট কেটে বসেছেন। এমন আর কি আশ্রয় হল? সমস্ত দিন কাটাতে গেলে বায়স্কাপেও তার চেয়ে বেশি খরচা হত।

হুবহু গোয়ালন্দী জাহাজ। কেবিনের বালাই নেই—সব খোলা ডেক। রেলিঙের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চারজনের বসবার মত ছোট ছোট টেবিল সাজানো। নীল সাদায় ডোরা কাটা করবরে টেবিল ক্রথ। ক্রিপ দিয়ে টেবিলের সঙ্গে সাঁটা, পাছে হাওয়াতে ভর করে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে লেকের ‘হে-পারে’ চলে যায়।

‘হে-পারে?’ চট করে মনটা পশ্চার দিকে ধাওয়া করলো তো?

আমারও মনে পড়েছিল পশ্চার-কথা। জীবনে কতবার প্রদোষের আধা-আলো-অশ্বকারে চাঁদপুর থেকে জাহাজে করে গোয়ালন্দের দিকে রওনা হয়েছি। বিনীত রজনীর ক্লান্তিতে সর্বদেহমন অবসন্ন—বাড়ি ছাড়ার সময় মা অমঙ্গলের চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি, সে কথা বার বার বুকের ভিতর কঁটার মত খোঁচা দিচ্ছে, বহু চেষ্টা করেও মন থেকে সেটাকে সরাতে পারছি নে।

পশ্চার সূর্যোদয় মনের অনেকখানি বেদনা প্রতিবারই কমিয়ে দিয়েছে। রেলিঙের পাশে বসে, তারই উপর মাথা কাৎ করে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে, যেখানে কালো-সাদার মাঝখানে আঁঙ্গে আঁঙ্গে গোলাপী আভা ফুটে উঠছে। পশ্চার জল রাঙা হয়ে গেল, মহাজনী নৌকোর পাল ফুলে উঠে মাঝখানটায় গোলাপী মেখে নিলেছে, দু’রের পাখি আর এ-পৃথিবীর পাখি বলে মনে হচ্ছে না, কোন নন্দনকাননের মেহদি পাতার রস দিয়ে যেন ডানা দু’টি লাল করে নিয়েছে।

ঐ তো সূর্য ঐ তো সন্ধ্যা !

জাহাজ জোর ফালতো স্টীম ছাড়ছে। তারই উপর ক্ষণে ক্ষণে রামধনুর রঙ খেলে যাচ্ছে। মাঝি-মাল্লাদের চেঁচামেচি কেমন যেন আর ককঁশ বলে মনে হচ্ছে না। পাশে মোল্লাজীর নমাজ পড়া শেষ হয়েছে। সূর্য করে কোরান পড়তে আরম্ভ করেছেন। হাওয়াতে তাঁর দাড়ি দুলছে, পাগড়ীর ন্যাজ দুলছে। বর-যাত্রীর দল যাচ্ছে, না কনে শব্দুরবাড়ি যাচ্ছে, কে জানে—একমাথা সিঁদুর-মাথা একটি মেয়ে ঘন ঘন শাঁখ বাজাচ্ছে। হিঁদু বাড়িতে তো শাঁখ শুনোঁছ সন্ধ্যাবেলায়, ভোরেও বাজায় নাকি? কে জানে?

উত্তমার্ধ নন্দন, জাহাজের রশির মত মোটা ধবধবে পৈতে-খোলানো এক ব্রাহ্মণ বললেন, ‘দেখো তো, মিল্লা, ঠিক ঠিক রাজবাড়ির টিকিট দিয়েছে তো? যা ঠিক ছিল, কি দিতে কি দিয়ে বসছে কে জানে? চশমাটাও হারিয়ে গিয়েছে।’

রসভঙ্গ হল অস্বীকার করি নে, কিন্তু কাতর বৃন্দ ব্রাহ্মণ ; অবহেলা অবিনয় করলে মশীদ-মুরদ্বারী মারাত্মক অভিসম্পাত লাগবে। বেশ করে দেখে নিলে বললুম, ‘আজ্ঞে (আগে হলে একথা বলার প্রয়োজন হত না যে, মুরদ্বারীরা ছেলেবেলাই আমাদের পই-পই করে শিখিয়েছিলেন, হিন্দু গুরুজনের সঙ্গে কথা কইতে হরদম ‘আজ্ঞে’—বাঙাল ভাষায় ‘আইগা’ বলতে হয়) ঠিকই দিয়েছে ; আপনাকে ঠকাতে যাবে কোন পাশ’ড ?’

ব্রাহ্মণ ভারী খুশী। আমার পাতা বিছানাতে পরম পরিতৃপ্তিভরে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

তরকারি-বেচনে-ওলা গেছে জাহাজ ইন্সটিশানে টিকিট কাটতে—

‘বাবু অ—অ—অ, অ—বাবু, নারান্জোর (নারায়ণগঞ্জ) এ্যাথ্‌খান টিকস্ দিবাইন নি ?’

বাবু বললেন, ‘ছ আনা।’

তরকারি-ওলা বললে, ‘বাবু অ—অ—অ, চারি আনায় অইব না ?’

বাবু পশ্চিম বাঙলার লোক, ওনাদের মেজাজ আমাদের দ্যাশে এলে একটু-খানি মিলিটারি হয়ে যায়। থে’কিয়ে বললেন, ‘দে ব্যাটা দে, ছ’ আনা দে।’

গভীর বেদনা সহকারে তরকারি-ওলা বললে, ‘বাবু অ—অ—, তুমি আমার দোকানে রোজ রোজ আও। কলাডা মূলাডা কিনো। দরদাম করো। আর আমি আইলাম তোমার দোকানে এগ্‌ দিন। দরদাম করতা গেলাম—তুমি অমন খাটাশের মতন মুখডা করলা ক্যান্ ?’

মনে আমার সন্দেহ জাগছে, চতুর পাঠক বিশ্বাস করতে চান না জিনীভার জাহাজে বসে আমার এ ‘নারান্জী’ (নারায়ণগঞ্জী) গল্প সত্যই মনে পড়েছিল কি না।

কেন পড়েছিল বলছি।

ইয়োরোপের সব দেশের ভিতর সুইটজারল্যান্ডই সবচেয়ে ‘এক দরে বিক্রি’। সেখানে দরদস্তুর করতে গেলে (আমি বাঙাল, তাই করেছিলুম) সুইস এমনই বোকার মত তাকায়, কিংবা থে’কিয়ে ওঠে যেন তাকে আমি ড্যাম্ মিথোবাদী বলে সন্দ করছি।

অথচ দেখুন, ইয়োরোপীয়রা আমার দেশে হামেশাই দরদস্তুর করে। আমি যদি তরকারি-ওলার মত ওদেশে একবার গিয়ে দরদস্তুর করি, তবে ওরা ‘খাটাশের মত মুখ করবে ক্যান ?’

ইতিমধ্যে মধ্য দিনের তপ্ত হাওয়া আমার মন উদাস করে দিয়েছে। মেঘের ডাকে, নব বরষণে বাঙালীর মন কেমন যেন গভীর বেদনায় ভরে যায়, আর সে মনটা উদাস হয়ে যায় দুঃপূর বেলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন বৃকে বেজে ওঠে, আমি এ সংসারের নই, এখানকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু ওরকম ধারা মন খারাপের দাওয়াই জাহাজে মজুদ। হঠাৎ অকস্মাৎ

বেজে উঠল :

‘গোলাপবাগানে, সান্‌সুদিস গোলাপবাগানে—’

কি হয়েছিল ?

‘সেই গোলাপবাগানে আমি মেরিকে চুমো খেয়েছিলুম—’

প্রথম চুম্বন তো মানুষ জীবনে কখনো ভুলতে পারে না ।’

ট্রেনে বসে আছেন ; চট করে আপনার সঙ্গে কেউ আলাপ জমাতে যাবে না— আপনি হয়ত চূপ করে বসে থাকাকাটাই পছন্দ করেন । কিন্তু ফুতির জাহাজে যখন বসেছেন, তখন নিশ্চয়ই ফুতি করতে চান—বাঙলা কথা । একা বসে বসে ফুতি হয় না, তাই কেউ যদি আপনার সঙ্গে পরিচয় করে সুখদুঃখের গল্প জুড়তে চায়, তা হলে আপনার আপত্তি না থাকারই কথা এবং আশ্চর্য, মানুষ অনেক সময় পরদেশীর সঙ্গে যতখানি প্রাণ খুলে কথা কইতে পারে, স্বদেশবাসীর সঙ্গে ততটা পারে না । প্রাণের কোণে বছরের পর বছরের জমানো কোনো এক গভীর বেদনা আপনি লজ্জায় কখনো কাউকে স্বদেশে প্রকাশ করেন নি ; হঠাৎ একদিন দেখতে পাবেন, অজানা-অচেনা বিদেশবিভূঁইয়ে এক ভিনদেশীর সামনে আপনি আপনার সব দুঃখ কাহিনী উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন । তার সঙ্গে জীবনে আপনার আর কখনো দেখা হবে না—সেই কারণেই হয়ত আপনার হৃদয়ের আকুবাকু তার বন্ধুর উপর চেপে বসা জগন্দল পাথর সরিয়ে ফেলে নিষ্কৃতির গভীর আরাম পায় । ইয়োরোপের লোক তাই কোনো এক গোপন বেদনা নিয়ে যখন হন্যে হবার উপক্রম করে, তখন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায়—সেখানে বেদনার বোঝা নামিয়ে দিয়ে সে আবার সুস্থ মানুষ হয়ে সংসারের দুঃখ-কষ্টের সামনাসামনি হয় ।

বোধ হয়, ঐ একই কারণে কখনো কখনো মানুষ বিদেশে স্বদেশবাসীর কাছেও তার বেদনার স্বার খুলে দেয় ।

একদা প্রাগ শহরে দেখি, এক ভারতীয় বৃদ্ধ—খুব সম্ভব দাক্ষিণাত্যের—রাজ্য বেকুবের মতন দাঁড়িয়ে আছেন । মূখের ফ্যাল-ফ্যাল ভাব দেখে অনুমান করলুম, হয়ত রাজ্য হারিয়ে ফেলেছেন, কিংবা হয়ত পার্সটাও গেছে । কাছে গিয়ে শুধালুম ‘ব্যাপার কি ?’

ভদ্রলোক তো আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন আর কি । শুধু যে হোটেল হারিয়ে বসেছেন তাই নয়, হোটেলের নামটা পর্যন্ত বেবাক ভুলে গিয়েছেন ।

কি করে তার হোটেল খুঁজে পেলুম সে এক নয়, পাঁচ—মহাভারত । শ্রীজ্ঞানলাল তো আর মিছে বলেন নি, ‘একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয় ।’ লঙ্কা রাক্ষসের দেশ, প্রাগে ভদ্রসন্তানের বসবাস । আমার মত লেখাপড়ায় পাঠা বঙ্গ সন্তানের মাথায় এসব ফান্‌দিকির বিস্তর খেলে—সাক্ষাৎ শার্লক হোম্‌স্‌ আর কি—সে কথা ‘দেশের পাঠককে হাইজাম্প-লুণ্ঠজাম্প দিয়ে বোঝাতে হবে না ।

কিন্তু আমি মনে মনে পাঁচশবার তাজ্জব মানলুম, এই নিরীহ তামিল রাজ্যের

প্রাণে আসার কি প্রয়োজন? তখনকার দিনে প্রতি শহরে মেলা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স বসত না যে, তিনি ভেটেরানারির ‘রিভারপেস্ট’ কিংবা ভারত বিদেশে ক’শ’ মণ গাঁজাগুলি চালান করতে পারবে, তাই নিজে পাণ্ডববর্জিত প্রাণে ভারতের প্রতিভূ হয়ে আলোচনা করতে আসবেন।

হোটেলে পৌঁছতে দেখি, সেখানেও আরেক কুরুক্ষেত্র। এরকম নিরীহ বিদেশী প্রাণী হোটেলের লোকও কখনো দেখে নি—প্রাণ তো প্যারিস নয়—তাই তারা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে দশটায় বেরিয়ে লোকটা আটটা অবধি ফেরে নি কেন? তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য আমি সেখানে শালক হোমসেরই কদর পেলুম।

ভদ্রলোক চেপে ধরলেন, তাঁর সঙ্গে থানা খেতে যেতে হবে।

অপেরার টিকিট আমার কাটা ছিল—প্রাণের অপেরা ডাকসাইটে—কিন্তু আমার মনে হল, ‘প্রাণে তামিল ব্রাহ্মণ’ যে-কোনো অপেরার টাইটলকে হার মানাতে পারে।

বললেন, ‘থানাটা কিন্তু আমার ঘরেই হবে—ডাইনিংরুমে না।’

আমি বললুম, ‘নিশ্চয়, নিশ্চয়।’

ঘরে ঢুকেই তড়িৎবাড়ি স্মৃতি খুলে ফেলে শ্রুতি বের করে মাদ্রাজী কায়দার সেটাকে লুপ্তি বানিয়ে পরলেন, গায়ে চাপালেন শার্ট, আর কাঁধে ঝোলালেন তোয়ালে।

চেয়ারে বসে খাটে দু-পা তুলে দিলে বললেন, ‘আঃ!’

এরকম দরাজ-দিল লোক আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি।’

ওয়েটার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যখন বলে, এটা আনবো কি, সেটা আনবো কি, তিনি মাথা দুর্লিয়ে বলেন, ‘ইয়েস, ইয়েস, ব্রিং, ব্রিং।’

বড় হোটেল। সেখানে ‘আ লা কাত’ অস্তত একশ’ পদ রান্না হয়, তিনশ’ রকমের মদ মজুদ আছে। আমি বাধা দিতে গেলে তিনি বলেন, ‘কি জ্বালাতন, ভালো করে খেতে দেবে না কি?’

অথচ তিনি খেলেন, আলু-কপি-মটর-সেঞ্চ, রুটি-মাখন, স্যালাড্ আর চা। বললেন, ‘বুড়ো বয়সে আর মাছ-মাংসটা খরে কি হবে?’

তবে তিনি নিশ্চয়ই এই প্রথম ইয়োরোপ এসেছেন। যে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে অনাকে মাংস খাওয়ার সে যৌবনে এলে নিজেও চেখে নিত।

ক্রমে ক্রমে পরিচয় হল। আই সি এস থেকে পেশন নিয়েছেন। ওঁদিকে সাম্রাজ্যী ঘরের ছেলে—বিস্তার সংস্কৃত স্ফুর্ভাষিত মুখস্থ। একটানা নানা রকমের গল্প বলে যেতে লাগলেন—প্রধানত শঙ্কর রামানুজের জীবনের চুটকিলা ঘটনা নিয়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে, ‘লাইটার সাইড’। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে লাগলুম।

তবে কি রাতের অশ্বকার যেমন যেমন ঘনাতে লাগে, মানুষের মনের অশ্বকার ঘর তার দরজা আসতে আস্তে খুলে দেয়? আমরা আহাঙ্গারির পর বেলকনিত্তে ডেকচেয়ারে লম্বা হয়ে শূন্যে, চোখ আকাশের দিকে। চতুর্দিকের ফাটের

আলো আর রাস্তার বাতি নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারা জ্বল-জ্বল করে ফুটে উঠছে। চেনা ঘরদোরের তুলনায় মানুষ তেমন কিছু ক্ষুদ্র জীব নয়, কিন্তু বিরাট গম্ভীর আকাশের মূর্তি যখন তারায় তারায় ফুটে ওঠে, তখন তার ক্ষুদ্র হৃদয় আর তার ক্ষুদ্রতর লৌকিকতা, সংকীর্ণতা কেমন যেন আশ্চে আশ্চে লোপ পেয়ে যায়।

কোনো ভূমিকা না দিয়ে বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন, 'যার সঙ্গে আলাপচারি হয় ; সেই ভাবে, এ-বুড়ো ইয়োরোপে এসেছে কি করতে ? কি যে বলব, ভেবে পাই নে।'

এ তো তিনি আমাকে বলেছেন না, আপন মনে ভাবছেন এবং হয়ত তাঁর অজানাতেই গলা দিয়ে সে ভাবনা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। আমি যে শব্দ চূপ করলুম, তাই নয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও প্রায় বন্ধ করে আনলুম, যাতে তার চিন্তাধারা কোনো প্রকারের টক্কর না খায়।

না, ভুল বুঝেছি। তিনি আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ সচেতন।

বললেন, 'দেশের অনেকেই জানে, কিন্তু কেউ আমাকে কখনো জিজ্ঞেস করে নি। এদেশে জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দিই নে। কিন্তু তোমাকে বলি। এতে অসাধারণ কিংবা কেলেকারির কিছুই নেই—থাকলে মানুষ চূপ করে থাকে না, সব সময়েই ফালিয়ে বর্ণনা করে আপন সাফাই গায়।

'আমি বড় সূখী ছিলাম। স্ত্রী, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। দুটি ছেলেই ফাস্ট ক্লাস পেয়েছে এম. এ.-তে, সংস্কৃতে আর ইকনমিক্সে। মেয়েটির বিয়ে ঠিক—জামাইরের চেহারা কন্দর্পের মত।

'চাকরি জীবনে মাদুরা, কাশ্মী, তাজোর বহু জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু পৈতৃক ভদ্রাসনে যাবার কখনো সুযোগ হয় নি ; আমিও গ্রাম ছেড়েছি, ষোল বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পরেই।

'হঠাৎ গৃহিণী চেপে ধরলেন—আমি তখন সবেমাত্র পেন্সন নিয়েছি—তিনি তাঁর শব্দরের ভিটে দেখতে যাবেন। ছেলেরাও বলে যাবে, মেয়েটার তো কথাই নেই। আমি অনেক করে বোঝালুম, সেখানে এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই, সাপ আছে, খবরের কাগজ নেই, মশা আছে, পাইথানার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু কাকস্যা পরিবেদনা, তারা যাবেই যাবে। আমারও যে সামান্য দুর্বলতা হয় নি, সে কথা হালফ করে বলতে পারব না।

'বিশ্বেস করবে না, বাবা, তারা গ্রাম দেখে মুগ্ধ। আমি তো ঘ্রেনে পই করে গ্রামটাকে যতদূর সম্ভব কালো করে এঁকেছিলাম, তাদের শকটা যেন বস্তু বেশি কঠোর কঠিন না হয়। তারা গাইলে উল্টো গান। ইঁদারা থেকে জল তুললো হৈ-হৈ করে—মাদ্রাজে কলের জল বন্ধ হলে এরাই 'দি হিন্দু' কাগজে কড়া কড়া চিঠি লিখত—, মেয়েটা দেখি, ছোট ছোট ইঁট নিয়ে বাস্তু-ভিটের গর্ত-গুলো বন্ধ করছে, গৃহিণী শুনকো তুলসীভায়া অনবরত জল ঢালছেন।

'বড় আরাম পেলুম। গৃহিণীর কথা বাদ দাও, তিনি সত্যী-সাদ্বী, কিন্তু

আমার 'মর্জান' ছেলেমেয়েরাও যে আমার চতুর্দশ পদ্রুবের ভিটেকে তাচ্ছিল্য করল না, তাই দেখে আমার চোখে জল ভরে এল।

'আমার ছেলেবেলার যারাই গ্রাম থেকে চলে যেত, তারা আর ফিরে আসত না। আমার বাবা তাই আমাকে কতবার বলেছেন, তার ঠিক নেই, 'বেগু-গোপলা, দেশের ভিটেমাটি অবহেলা করিস নি, আর যা কর কর।'

'চাকরির খান্দায় আমি তাঁর সে আদেশ পালন করতে পারি নি। এখন দেখি, আমার ছেলেমেয়েরা তাঁর সে আদেশ পালন করছে। বসে বসে প্ল্যান কষছে, কোথায় রজনীগন্ধা ফেটাবে, কোথায় পাঁচিল তুলবে, কোথায় নাইট স্কুল খুলবে। আমার গৃহিণী সার্থক গর্ভধারিণী।'

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। আমি আরো বেশি চুপ। বললেন, 'এর পর আর বলার কিছু নেই, তাই সংক্ষেপে বলি। মাত্র দুদিন কেটেছে; তিন দিনের দিন সকাল বেলা মেয়েটার কলেরা হল, ঘণ্টাখানেকের ভিতরে ছেলে দুটোরো। লোক ছুটিয়ে মাদ্রাজে তার করলুম। আরো লোক ছুটলো এখানে-সেখানে ডাক্তার-বদ্যার স্থানে। দশ ঘণ্টার ভিতরে তিনজনই চলে গেল। গৃহিণীর চোখের সামনে।

'তিনি গেলেন তার পরদিন। কলেরায় না অন্য কিছুতে বলতে পারি নে। আমি তখন সম্বিতে ছিলাম না।'

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'থাক, আর না।'

আমার আপত্তি যেন শুনতে পান নি। বললেন, 'মাদ্রাজে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে আমার ব্যাংকার আমার স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা কইতে চাইলে— সে জানতো আমাদের টাকা-পয়সার বিষয় আমি কিছুই জানি নে। তার কাছ থেকে শুনলুম, গৃহিণী ভালো ভালো শেয়ার কিনে লাখ তিনেকের মত জমিয়েছিলেন।

'তাই বেরিয়ে পড়েছি। টমাস কুক যেখানে নিয়ে যায়, সেখানেই যাই।

'ওদের ছবি দেখবে? চলো, ঘরের ভিতর যাই।'

মনোজ বসুর ভাষায় জাহাজে বসে 'কহাঁ কহাঁ মদ্রাজে' চলে গিয়েছিলুম, হঠাৎ হুশ হল আমি পশ্চাত্তর নই, প্রাগে নই আমি বসে আছি জিনীভা লেকের জাহাজে।

জাহাজে অক্সেস্টা গানের পর গান বজিয়ে যাচ্ছে আর ডেকের মাঝখানে বিস্তর লোক টাঙ্গো, ওয়াল্ট্‌স্‌, ফক্স ট্রট নাচছে। আর সে কত জাতবেজাতের লোক— বড় বড় চেক কাটা কোটে-পাতলুন-পর্যায় মার্কিন (আমাদের মারোয়াড়ী ভাইয়ারা যে রকম 'বড়া বড়া বড়োদার' নক্সা পছন্দ করেন) নিখুঁত, নিপুণ, লিপস্টিক-রুজ-মাখা তব্বজী ফরাসিনী, গাদা-গোদা হান্দা-হোন্দা জর্মেন আর ডাচ, গায়ে কালো নেট্‌ আর লেসের ওড়না জড়ানো বিদ্যুৎনয়নী হিম্পানী রমণী, আপন হাম্বাইয়ের দম্ভে-ভরা একটুখানি আলগোছে-থাকা ইংরেজ আর তাদের উঁচুনীচুর-উক্করহীন হাঁকির বাঘিনী, টেনিস-পাগলিনী স্পোর্টস রমণী।

এই হরভেন রুইভেন সাগ্নেব বিবির তাসের দেশে নিরীহ ভারতসন্তান কতক পাবে কি ?

তা পায়—আকসারই পায় ।

তার প্রধান কারণ, আর পাঁচটা ইয়োরোপীয় এবং মার্কিন জাত সুইটজার-ল্যান্ডে এসেছে ফুঁতি' করতে, এদেশের মেয়েদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে ফাঁটনিষ্ঠ করতে । তার কলকৌশল—নাচের ভিতর দিয়ে, ভাষার অঙ্গতার ভান করে, দামী দামী মদ খাইয়ে—এরা বিলক্ষণ জানে এবং কাজে খাটাতে কিছুমাত্র কসদুর করে না । এদের সম্বন্ধে তাই সুইস বাপ, ভাই, মা দিদি এমন কি মেয়েরাও একটুখানি সাবধান ।

ভারতীয় মাত্রই যে এদের তুলনায় 'ধর্মপুস্তক'র যুঁধিষ্ঠির' একথা আমি বলব না । কিন্তু ইয়োরোপ বাসের প্রথম অবস্থায় ভারতীয় মদ খেত কিংবা খাওয়াতে জানে না, নাচতে পারে না এবং সবচেয়ে বড় কথা তার ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে সে কণামাত্র তালিম পায় নি বিদেশিনীর সঙ্গে কি করে দোস্তী-ইয়াকি' জমাতে হয় ।

আমি 'ৎসুরিশ সংবাদ' পড়িছিলুম । পড়া শেষ হতে কাগজখানা টেবিলের উপর রাখামাত্রই আমার পাশের টেবিলের এক ছোকরা এসে আমাকে 'বাণ' করে বললে, 'আমার "বাজেল সংবাদে"র বদলে আপনার 'ৎসুরিশ সংবাদ'খানা এক মিনিটের জন্য পেতে পারি কি ?'

'নিশ্চয় নিশ্চয় ।'—এ ছাড়া আপনি আর কি বলবেন ?

কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল আলাপ জমাবার জন্য সরকারী রাজ্য ধরেই সে যাত্রা শুরুর করেছে । কারণ এতক্ষণ ধরে সে তার সঙ্গে দু'টি মেয়ের সঙ্গেই গল্পগাঢ় বা নাচ-গান করিছিল—কাগজ পড়ার ফুস'ৎ কই ?

তবু কাগজখানা যখন নিয়ে গিয়েছে তখন দু' মিনিট পড়ার ভান করতে হয় । তাই করল । ফেরৎ দেবার সময় ধন্যবাদ জানিয়ে হেসে বলল, 'আজকাল কিস্‌স্‌ নুতন খবর মেলে না ।'

আমি বললুম, 'একদম না ; সব যেন দড়কচ্চা মেরে গিয়েছে ।'

মাথা দু'লিয়ে দু'লিয়ে বললো, 'যা বলেছেন ।'

এরপর আপনাকে অবশ্যই বলতে হয়, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ; বসুন ।'

কিন্তু কিন্তু করে বসবে, তারপর আরো দু' মিনিট না যেতেই বলবে, 'তার চেয়ে চলুন না আমাদের টেবিলে । আমার সঙ্গে দু'টি বাম্ববী'রয়েছেন । তাঁরা বসে একলা পড়ে গেলেন ।'

আপনি বলবেন, 'রাম রাম । বসে ভুল হয়ে গেল আপনাকে ঠেকিয়ে রেখে ।'

'ছোকরা বলবে, 'সে কি কথা, সে কি কথা ।'

এই হল প্রধান সরকারী পন্থা, আলাপ-পরিচয় করার—অবশ্য আরো বহু গলিঘ'র্নিচও আছে ।

বড়িটির নাম গ্রেটে, ছোটটি ট্রুডে । ছেলেটার নাম পিট । পিট বলবে, 'কিছু একটা পান করুন ।'

আমি বললুম, 'এইমাত্র কফি খেয়েছি ; এখন আর থাক—অনেক ধন্যবাদ ।'

এইবারে যে আলাপচারি আরম্ভ হবে তার চৌহিন্দ বাতানো সরল কর্ম নয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা সত্যি পেরেকের বিছানায় দিনের পর দিন কাটাতে পারেন কিনা, গোখরোর বিষ ওষা নামাতে পারে কিনা, কিংবা যোগাভ্যাস করে মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উঠে যেতে কাউকে কখনো আমি দেখেছি কিনা?

ছেলেটা যদি দর্শনের ছাত্র হয় তবে হয়ত ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসবে, মেরেটির যদি বাজনা শখ থাকে তবে আপনাকে শূদ্রিষে বসবে, ভারতীয় সঙ্গীতে ক'রকমের তাল হয়।

এসব তাবৎ প্রশ্নের সদুত্তর কে দেবে? ব্রজেন শীল, সুদনীতি চাট্টাঘোষ, বিশ্বকোষ, সুকুমার রায়ের 'নোটবুক', গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা সব মিলিয়ে কক্টেল বানালেও ঐ প্রশ্নমরু তাকে বেমালাম শূদ্রিষে নেবে।

বিদেশী একথা বোঝে না যে, তার ঠিক যে জিনিসে কৌতূহল আপনার তাতে মহৎ নাও থাকতে পারে। তার উপরে আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আমরা ইংকুল-কলেজে যে তালিম পাই তাতে ক্রুসেডের তারিখ মুখস্থ করানো হয়—অজ্ঞতা, ধ্রুপদ শেখানো হয় না।

তবে অতি অবশ্য স্বীকার করবো, একটি প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিষ্ঠান আমি চিনি যিনি এসব প্রশ্নের উত্তর উত্তম উত্তর দিতে পারেন।

হেদোর ওতর-পূর্ব কোণের 'বসন্ত রেস্টুরেন্ট'! সেখানে আমরা সুবো-শাম রাজা-উজীর কতল করি, হেন সমস্যা, হেন বখেড়া নেই যার ফৈসলা আমরা পত্রপাঠ করে দিতে পারি নে।

'বসন্ত রেস্টুরেন্ট'র আমি আদি ও অকৃত্রিম সভা। তস্য প্রসাদাৎ আমি হরমুজকে হর-সওয়ালের জবাব দিতে পারি।

বিদেশীদের সম্বন্ধে ভারতীয়ের কৌতূহল কম। কলকাতায় বিশ্বর চীনা থাকে; আমি আজ পর্যন্ত একজন বাঙালীকেও দেখি নি, যিনি উৎসাহী হয়ে চীনাদের সঙ্গে আলাপচারি করেছেন। মাত্র একটি বাঙালী চিনি, যিনি ছেলেবেলা থেকে কাবুলীওয়ালাদের সঙ্গে ভাব করে দোস্তী জমিয়েছিলেন—কাবুলীরা এখন এদেশে দুর্লভ হয়ে যাওয়াতে তাঁর আর শোকের অন্ত নেই।

ইয়োরোপীয়রা সংস্কৃত যে রকম পড়ে, আরবী চীনা ভাষারও তেমনি চর্চা করে। তাই আমার মনে সব সময়েই আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে, ভারতীয় সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি কেন?

পিটকে জিজ্ঞেস করাতে সে বললে, 'পাণ্ডিতেরা কেন ভারতপ্রেমী হন, সে কথা আমরা বলতে পারবো না, তবে আমার মত পাঁচজন সাধারণ লোকের কথা কিছু বলতে পারি।

'প্রাচ্যের তিন ভূখণ্ডের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচয় আছে। ভারত, আরবভূমি আর চীন। তুর্কদেরও আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, কিন্তু তারা অনেকখানি ইয়োরোপীয় হয়ে গিয়েছে, আর তিব্বত সম্বন্ধে কৌতূহল পূর্বে আর লাভ কি? তিব্বতীরা তো এদেশে আসে না।

'আরবরা সেমিটি, চীনারা মঙ্গোলীয়। এদের ধরনধারণ এত বেশি আলাদা

যে, এরা যেন অন্য লোকের প্রাণী বলে মনে হয়। অথচ ভারতীয়রা আর্য—তাই তারা চেনা হলেও অচেনা। এই ধরুন না, যখন চীনা বা আরব ফরাসী-জার্মান বলে, তখন কেমন যেন মনে হয় ভিন্ন যন্ত্র বাজছে। অথচ ভারতীয়রা যখন ঐ ভাষাগুলোই বলে তখন মনে হয় একই যন্ত্র বাজছে, শুধু ঠিকমত বাঁধা হয় নি।

‘আরেকটা কারণ বোধ হয় খ্রীষ্টের পরই—সময়ের দিক দিয়ে নয়, মাহাত্ম্যে—মহাপুরুষ বলতে আমরা বুদ্ধদেবের কথাই ভাবি। এখন অবশ্য অনেকখানি মন্দা পড়েছে, কিন্তু এককালে এখানে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে প্রচুর বই বেরিয়েছিল। তার কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক ভগবানে বিশ্বাস হারায়, অথচ একথা জানত না যে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও শুধু যে ধার্মিক জীবনযাপন করা যায় তাই নয়, ধর্মপত্তন করা চলে। তাই যখন বুদ্ধের বাণী এদেশে প্রথম প্রথম প্রচার হল, তখন বহু লোক সে বাণীতে যেন হারানো-মাণিক ফিরে পেল। কেউ কেউ তো আদামশূনারীর সময় নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে জাহির করল।

‘এযুগে গাধী পরম বিস্ময়ের বস্তু। অস্পৃশ্য নাকরে বিদেশী ডাকুকে তাড়ানো যায় কিনা জানি নে। কিন্তু গাধীর প্রচেষ্টাটাই বিশ্বজগৎকে একদম আহাম্মুখ বানিয়ে দিয়েছে। আমি অনেক ধার্মিক ক্রীষ্টানকে চিনি, যারা গাধীর নাম শুনলেই ভীতিতে গদগদ হন। একজন তো বলেন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন খ্রীষ্ট এবং মাত্র একটি লোক সে ধর্ম স্বীকার করেছেন, তিনি গাধী।’

টুডে বললে, ‘টেগোরের নাম করলে না?’

‘পিট্ বললে, ‘টেগোরকে চেনে এদেশের শিক্ষিত লোক। তার কারণও রয়েছে। এযুগে সাধারণ লোক পড়ে প্রধানত খবরের কাগজ। খবরের কাগজে গাধীর কথা দুদিন অন্তর অন্তর বেরয়, কিন্তু টেগোরের কথা বেরয় তিনি যখন এদেশে আসেন।’

টুডে বললে, ‘আর বুদ্ধদেবের কথা বুদ্ধি খবরের কাগজে নিতি নিতি বেরয়, না তিনি প্রতি বৎসর এখানে স্কেট করতে আসেন?’

গ্রেটে বললে, ‘ছিঃ, বুদ্ধদেবকে নিয়ে ওরকম হালকা কথা কইলে বুদ্ধদেবের দেশের লোক হয়ত ক্ষুব্ধ হবেন।’

আমি বললুম, ‘আদপেই না। আমাদের দেশে দেবতাদের নিয়ে মজার মজার গল্প আছে।’

পিট্ বললে, ‘বুদ্ধদেব যে একশ বছরের স্টার্ট পেয়ে বসে আছেন।’

টুডে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, ‘আপনাদের ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে যে সব মজার গল্প আছে, তারই একটা বলুন না।’

আমি শিব বেজায়গায় একবার বর দিয়ে যে কি বিপদে পড়েছিলেন, আর শেষটায় বিচক্ষণ নারদ তাঁকে কি কৌশলে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সেই গল্পটি বললুম।

তিনজনেই হেসে কুটকুটি।

টুডে জিজ্ঞেস করলে, ‘শিব কি ডাঙর দেবতা?’

আমি বললাম, ‘নিশ্চয়। তবে কি না তিনি শ্মশানে থাকেন, ভূতের নৃত্য দেখেন, কাপড়চোপড়ও সব সমস্ত ঠিক থাকে না। দেবতাদের পার্লিমেণ্টে সচরাচর যান না।’

সবাই অবাক হয়ে শুধায়, ‘তবে তিনি ডাক্তার হলেন কি করে?’

এখানেই আমি হামেশাই একটু বিপদে পড়ে যাই। নীলকণ্ঠের বৈরাগ্য যে এদেশের ঘোর সংসারী মনকেও মাঝে মাঝে ব্যাকুল করে তোলে, সেটা ইয়োরোপীয়রা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ‘আরো চাই’, আরো চাই’য়ের দেশে ‘কিছু না’, ‘কিছু না’র তত্ত্ব বোঝাই কি প্রকারে? আমি যে বন্ধুকেছি তা-ও নয়।

তবে ইয়োরোপের সর্বত্রই মেয়েরা হরপার্শ্বতীর বিয়ের বর্ণনা শুনতে বড় ভালোবাসে। বিশেষ করে যখন বরযাত্রায় বলদের পিঠে শিবকে দেখে মেনকা চিৎকার করে তাঁকে খেদিয়ে দেবার জন্য আদেশ দিলেন, আর যখন শুনলেন তিনিই বর এবং ভিন্নি গেলেন—তখন মেয়েরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আমি তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে উত্তেজনাটা বাড়ানোর জন্য ধীরে ধীরে একটি সিগারেট ধরাই।

‘তারপর, তারপর?’ সবাই চেঁচায়।

জানি অসম্ভব। তবে তখন এক’টি ছত্র অনুবাদ করার চেষ্টা করি।

ভৈরব সৈদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত আঁখি

দেখে, তব শূন্যতনু রক্তাংশকে রীহিয়াছে ঢাকি

প্রাতঃসূর্য রুচি।

অস্থিম্বালা গেছে খুলে মাধবীবল্লরী মূলে

ভালে মাথা পুষ্পরেণু—চিতাভস্ম কোথা

গেছে মূর্ছি।

কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষ্মী কবি-পানে—

সে হাস্যে মন্দির বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে

কবির পরাগে ॥

*

*

*

এ দৃশ্য আমি একমাত্র সুইটজারল্যান্ডেই দেখেছি।

পশ্চিমের সূর্য হলে পড়েছে আর তার লাল আলো এসে পড়েছে পাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলোর হাজার হাজার কাচের শাশীতে। শাশীগুলো লালে লাল হয়ে গিয়ে একাকার—মনে হয় বাড়িগুলো বন্ধি মিনিটখানেকের ভিতরই পুড়ে থাক হয়ে যাবে। আগুনের জ্বিলের মত লালের আঁচ উঠেছে, আকাশের দিকে, আর তারই রঙ গিয়ে লেগেছে দু’র পাহাড়ের চূড়ায় সাদা বরফে। সেখানেও লেগে গেছে দাউ দাউ করে আগুন। পাহাড়ের কোলে বসা মেঘগুলোও সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যাচ্ছে; ওদিকে আকাশের এখানে ওখানে যে সব মেঘের টুকরো সমস্ত দিন সাদা ভেড়ার মত আকাশের নীল মাঠে শূন্যে ছিল তারা দেখি পূর্ব-পশ্চিমের আগুনে তেতে গিয়ে গোলাপী হয়ে উঠেছে। সেই লাল

রঙের আওতায় পড়ে নীল পাহাড় আর হ্রদের নীল জল ঘন বেগুনী রঙ মেখে নিয়েছে।

চতুর্দিকে হুলস্থূল কাণ্ড ; কিন্তু নিঃশব্দে। মেঘেমেঘে, আকাশে-আকাশে পাহাড়পর্বতে, ঘরবাড়িতে এমন কি জলেবাতাসে এই যে বিরাট অগ্নিকাণ্ডটা হয়ে যাচ্ছে তাকে নেভাবার জন্য চেঁচামেচি-চিৎকার হচ্ছে না, আগুনের তাপে কাঠ-বাঁশ ফেটে যাওয়ার ফট্-ফাট্ দৃশ্যদৃশ্য শব্দ হচ্ছে না, ঐ যে লেকের পাড়ে সোনালী বোজ্জিত বসে আছে মেরেটি তার সাদা ফুকে আগুন লেগেছে, সেও তো চিৎকার করে কেঁদে উঠছে না। এ কী কাণ্ড !

এ আগুনের কি জ্বালা নেই, না, এদেশের জনমানব-পশুপক্ষীকে কোনো এক ভানুমতী ইন্দ্রজাল দিয়ে অসাড়-অচেতন করে দিয়েছেন ? হাঁ, এ তো ইন্দ্রজালই বটে। এতখানি আগুন, লক্ষ লক্ষ কলসী থেকে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া এতখানি গলানো সোনা, হাজার হাজার মণ গোলাপী পার্শ্বাভরণ, না জানি কত শত জ্বালা আবিব-গুলাল এরকম অকুপণ হাতে ঢেলে দিলে, ছাড়িয়ে ফেললে স্বর্গপুত্রকেও লাল বাতি জ্বালাতে হবে—হয়ত এই আগুন থেকেই পিদিম ধরিয়ে নিয়ে।

এ তো কনে-দেখার আলো নয় ; এ তো সতীদাহের বহির্কুণ্ড।

গ্রেটে আর ষ্টুডের স্লেভ, চুল অদৃশ্য হেয়ার-ড্রেসারের হাতে সোনালি হয়ে গেল। পিট্ কথা বলবার সময় ঘন ঘন হাত নাড়ে ; মনে হচ্ছে যেন সোনালি জলে হাত দুখানি সাঁতার কাটছে।

সূর্য পাহাড়ের পিছনে অতি ধীরে ধীরে অস্তাচলে নেমে গিয়েছেন। আবার সেই ভানুমতী এসেছে। অদৃশ্যে তিনি ঘন ঘন এখানে ওখানে উড়ে গিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে মেঘের গা থেকে আবিব তুলে নিয়ে কাজল মাখিয়ে দিচ্ছেন, ফুঁ দিয়ে এক এক সার শার্শী থেকে আগুন নির্বিয়ে দিচ্ছেন, কখনো বা দোঁখি লেকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি জলের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন—যেন গোবর দিয়ে আগুনা লেপে দেওয়া হল।

এ দৃশ্য সুইটজারল্যান্ডেও নিত্য নিত্য ঘটে না। জাহাজের ব্যাণ্ড তাই দুই নাচের মাঝখানে এখন অনেকখানি সময় নিচ্ছে। জাহাজের বহু নরনারী স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। এরকম সূর্যাস্ত কমই হয় যেখানে তুমি আমিও হিসোদার—স্পষ্ট দেখলুম তোমার কাপড়ের আগুন লেগে গিয়েছিল আমার কাপড়েও। আপন অজানাতে আমাদের দেহ, আমাদের বেশভূষা এ রসের সায়রে ছোট ছোট দ'সৃষ্টি করে তুলেছে।

ষ্টুডে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দেশে এরকম সূর্যাস্ত হয় ?'

আমি বললুম, 'কাশ্মীরে হয় ; সেখানে বরফ আছে, পাহাড় আছে, লেক আছে। কিন্তু হাজার হাজার চক্চকে ঝক্‌ঝক্‌ জ্ঞানলার শার্শী নেই বলে হয়ত এতখানি আগুন ধরে না। তবে যদি হিমালয়কে ভারত বলে গোনা হয় তবে নিশ্চয়ই এর চেয়েও বেশী আগুন-জ্বালা সূর্যাস্ত সেখানে হয়—সুইস পর্বতক-দেরই লেখাতে পড়েছি।'

ভানুমতী দিকে দিকে কাজলধারা বইয়ে দিয়েছে। চতুর্দিক অন্ধকার।

শব্দ ফুটে উঠেছে অন্ধকার ঘাসের উপর লক্ষ লক্ষ বিজলি-বাতির ফুল। আকাশের ফরাশেও দেবতার জ্বালিয়ে দিয়েছেন অগ্নিগতি তারার মোমবাতি। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, পাহাড়ের উপরের দিকে যে আলোগুলো জ্বলছে সেগুলো মানুষের প্রদীপ না দেবতার তারা। মানুষ স্বর্গের দিকে ধাওয়া করে উঠেছে পাহাড়ে, আর দেবতার নেমে এসেছেন পৃথিবীর দিকে ঐ পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত—একে অন্যকে অন্ধকারের এপার ওপার থেকে সঁঝের পিঁদিম দেখাবার জন্য।

“মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে ব’লে।
সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে ॥
সেই আলোটি নেবে জ্বলে শ্যামল ধারার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যাখায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশিস আনি,
অমরশিখা আকুল হল মতশিখায় উঠতে জ্বলে ॥”

পিটু বললে, ‘একটি প্রেমের গল্প বলুন।’

আমি বললুম, ‘ভারতবর্ষে’ সত্যকার প্রেমের গল্প আছে একটি, যার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের গল্প পাল্লা দিতে পারে না। সে কাহিনীতে মাটির মানুষ তার আপন বিরহবেদনার বর্ণনা শুনতে পায়, আবার ভগবদপ্রেমের জন্য ব্যাকুল জনও সেই কাহিনীতে আপন আকুলি-বিকুলির নিবিড়তম বর্ণনাও শুনতে পায়। কিন্তু রাধামাধবের সে কাহিনী বলবার মত ভাষা আমার নেই।’

ট্রুডে বললে, আমি একখানি ছবি দেখেছি, তাতে রাধা কৃষ্ণের গায়ে পিচকারি দিয়ে লাল রং মারছেন। চরংকার ছবি!’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি পিটুকে বললুম, ‘তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি আপনার প্রেমের কাহিনী বলুন না?’

পিটু তো বেশ খানিকটা ঠা ঠা করে হাসল—দু পাতের পর মানুষ অঙ্গেপতেই হাসে কাদে—তারপর বললে, ‘হারগট্ হ্যারগট্ (রামচন্দ্র!) এ যুগে কি আর সে রকম প্রেম কারো জীবনে আসে বা নিয়ে রসিয়ে গল্প জমানো যায়?’

ট্রুডে বললে, ‘বলেই ফেল না ছাই তোমার সাদা-মাটা গল্পটা।’

গ্রেটে দেখি চুপ করে আছে।

পিটু বললে, ‘আমার প্রেমে পড়ার কাহিনীতে মাত্র সামান্য একটু বিশেষত্ব আছে। সেইটুকুই বুঝিয়ে বলি।

‘আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। ফাস্ট পিরিয়েন্ডে ক্লাস থাকত না বলে আমি বাড়ি থেকে বেরতুম ন’টার সময়। একদিন ন’টার কয়েক মিনিট পরে কলেজের কাছেই একটি মেয়ে আমার পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। হাবভাব দেখে মনে হল কলেজেরই ছাত্রী কিন্তু আসল কথা সেইটে নয়—আসল কথা হচ্ছে ওরকম সুন্দরী আমি আর কখনো দেখি নি।

‘আমার বন্ধুর রক্ত দূম্ করে জমে গেল ; আমার হাটটা যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে পৌঁছে গেল। আমি অনেকক্ষণ সেই রাক্ষাস উপর ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম। সেদিন আর ক্লাস করা হল না ; কলেজের বাগানে বসে বসে সমস্ত সকালটা কাটল।

‘পরদিন ঠিক ঐ সময়ই মেয়েটি আমাকে রাক্ষাস ক্রস্ করল। এবারে দুজনাতে চোখাচোখি হল—এক ঝলকের তরে। তারই ফলে আমাকে রাক্ষাস পাশের রেলিঙ ধরে সে নজরের ধাক্কা সামলাতে হল।

‘তারপর রোজই ঐ সময় রাক্ষাস দেখা হয়, এক লহমার চোখাচোখি হয়। বন্ধুদূম্ মেয়েটির সেকেন্ড পিরিয়েড ফ্রী তাই বোধ হয় বাড়ি কিংবা অন্য কোথাও যায়।

‘আগেই বলেছি, মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। রোজ সকালে নটার পর তার সেই এক ঝলকের তরে আমার দিকে তাঁকিয়ে দেখা যেন আমার গলায় এক পায় সোনালি মদ ঢেলে দিত আর বাদবাকী দিন আমার কাছে আসমানজমীন গোলাপী রঙে রাঙা বলে মনে হত।

‘করে করে তিন মাস কাটল।’

পিট্ মদের গেলাসে মূখ ঠেকাতে আমি শূধালুম, ‘পরিচয় করবার সুযোগ হল না, তিন মাসের ভিতর ? কলেজ ডান্সে, কলেজ রেস্তোরাঁ—কোথাও ?’

পিট্ বলল, ‘ভয়, ভয়, ভয়। আমার মনে হত এরকম সুন্দরী কখনোই, কোন অবস্থাতেই আমার মত সাদা-মাটাকে ভালোবাসবে না, বাসতে পারে না, অসম্ভব, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশ্বাস করবেন না, পাছে আলাপচারি হয়ে যায় আর সে আমার অবহেলা করে সেই ভয়ে কোনো নাচের মঞ্চলিমে দেখা হলে আমি তৎক্ষণাৎ উদ্বেগবাসে সে স্থল পরিত্যাগ করতুম। তার চেয়ে পরিচয় না হওয়াটাই ঢের ঢের ভালো।’

আমি বললুম, ‘টেগোরেরও গান আছে—

‘সেই ভালো সেই ভালো আমারে না হয় না জানো
দূরে গিয়ে নয় দূর দেবে কাছে কেন লাজে লাজানো ?’

পিট্ বলল, ‘আশ্চর্য, টেগোর তো অতি সুন্দরুষ ছিলেন। তিনি এরকম মর্মান্তিক অনুভূতিটা পেলেন কোথায় ?’

আমি শূধালুম, ‘কিন্তু মেয়েটিও তো আপনার দিকে তাকাত !’

‘ঠিক বলেছেন, কিন্তু আমার মনে হত মেয়েটি শূধু দেখতে চায়, এই বেশরম বাঁদরটা কত দিন ধরে এ তামাশা চালায়।’

আমি শূধালুম, ‘তার পর ?’

‘তিন মাস হয়ে গিয়েছে। আমি প্রেমের পাখায় ভর করে চন্দ্রসূর্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রেমের এ পাখা দানা-পানি অর্থাৎ প্রতিদানের তোহাফা করে না বলে এর কখনো ক্রান্তি হয় না ; এ প্রেম আমার মনের বাগানে ফোটা জুঁই,—কারো অবহেলা-অনাদরের খরতাপে এ ফুল কখনো শুকোবে না।

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (১ম)—১০

‘কলেজের বাগানে বসে একদিন চোখ বন্ধ করে আমি আমার প্রিয়াকে দেখছি এমন সময় কাঁধে হাত পড়ল। চোখ মেলে দেখি আমার গ্রামের একটি পরিচিত ছেলে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার স্বপ্নের ফুল। পালাবার পথ ছিল না, পরিচয় হয়ে গেল।’

‘তারপর?’

‘আমার একদম মনে নেই। যেটুকু মনে আছে বলছি। হঠাৎ দেখি ছেলটি উধাও, আর আমার স্বপ্ন তখনো মূর্তি ধরে পাশে বসে আছে। কিন্তু আসল কথায় ফিরে যাই। সেই যে ভয়ের কথা বলেছিলুম। প্রথম আলাপেই আমি যে তার সঙ্গে পরিচয় করতে ডরাই সে কথা কি জানি কি করে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি অবাক হয়ে শুনাল, “কিসের ভয়?” আমি বললুম, “আপনি বড় বেশী সুন্দর।” তখন যা শুনলুম সে আমি তখনো বিশ্বাস করি নি এখনো করি নে—তার বিশ্বাস, আমি একটা আশ্চর্য্য আডনিস্ এবং তাই আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে সে ভয় পেয়েছিল। শুনুন কথা!’

আমি বললুম, ‘আপনারা দুজনাই দেখতে চমৎকার কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা আছে এক ফাসী’ প্রবাদে, “লায়লীরা ব্যান্দ ব্ চশ্মে মজনুন দীদ!” লায়লীকে দেখতে হয় মজনুর চোখ দিয়ে।’

জাহাজ পাড়ে এসে ভিড়ল। সবাই নেমে পড়লুম। আবার দেখা হবে, বলে পিট্, গ্রেটে, ট্রুডে বিদায় নিল।

আপন মনে বাড়ির দিকে চলতে চলতে একটা কথা ভাবতে লাগলুম; এই যে ইয়োরোপীরা প্রাণ খুলে ফুঁতি করে, হৈ-হল্লা করে, আমরা এ-রকম ধারা আপন দেশে করতে পারি নে কেন? সার্বেসবুদোদের লেখাতে পড়েছি, আমরা নাকি বড় সিরিয়স, সংসারকে আমরা নাকি মায়ায় অনিত্য ঠাউরে নিয়ে মুখ গুমসো করে বসে আছি, ফুঁতি-ফাতি করার দিকে আমাদের আদপেই মন নেই।

‘জাতক’ তো ঋগ্বেদের বহু পূর্বে লেখা। তাতে যে হরেক রকম পাল্লার পরবের বর্ণনা পাই তার থেকে তো মনে হয় না, আমরা সে যুগে বড় রাশভারি মেজাজ নিয়ে আত্মচিন্তা আর তত্ত্বালাপে দিন কাটাতুম। স্পষ্ট মনে পড়ছে কোন এক পরবের দিনে এক নাগর তার প্রিয়ার মনস্তৃষ্টির জন্য রাজবাগানে ফুল চুরি করতে গিয়ে খরা পড়ে শুলের উপর প্রাণ দেয়। মরার সময় সে আক্ষেপ করেছিল, ‘প্রিয়া, আমি যে মরিছি তাতে আমার কোনো ক্লোভ নেই, কিন্তু তুমি যে পরবের দিনে ফুল পরে যেতে পারলে না সে দুঃখ আমার মরার সময়ও রইল।’

আমাদের কাব্যনাটক রাজরাজড়াদের নিয়ে— সেখানে হৃদিস মেলে না আমাদের সাধারণ পাঁচজন আনন্দ উৎসব করত কি না এবং করলে কি ধরনে করত। শুধু ‘মংশকটিকা’ আর ‘মালতীমাধবে’ সাধারণ লোকের সবিষ্কার বর্ণনা রয়েছে এবং এ দুটি পড়ে তো মনে হয় না এ সময়ের সাধারণ পাঁচজন আজকের দিনের ইয়োরোপীয়দের তুলনায় কিছু কম আয়েস করত। ‘মংশকটিকা’র রামাঘরের

যে বর্ণনা পাই তার তুলনায় সুইটজারল্যান্ডের যে-কোনো রেস্টরাঁ নস্যাৎ। আর 'মালতীমাধবে'র নাগর মাধববাবু তো জাহাজের পিট সাহেবকে প্রেমের লীলাখেলায় দু'কলম তালিম দিতে পারে।

তবে কি নিতান্ত এ যুগে এসেই আমরা হঠাৎ বদ্বীড়িয়ে গিয়েছি? তাও তো নয়। হুতোমের কেতাবখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিন—বাবুরা তো কিছু মাত্র কম টলটল করেন নি। তবে কি এই বিংশ শতকে এসে হঠাৎ আমাদের ভীমরতি ধরল? তাও তো নয়। ফুটবল খেলা দেখতে এক কলকাতা শহরই যা পরসা উড়োয় তার অধেক বোধ হয় তামাম সুইটজারল্যান্ডও করে না।

ফুটবল সিনেমা লোকে দেখুক—আমার আপত্তি আছে কি নেই সে প্রশ্ন উঠছে না। আমি শুধু ভাবি এসব আনন্দে উত্তেজনার ভাগটা এতই বেশী যে মানুষ যেন সেখানে স্থায়ী কোনো কিছু স্থান পায় না। আমার মনে হয়, স্টীমারে বা ট্রেনে, সত্যযুগে, যখন ভিড় বেশী হত না তখন ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করাতেও আনন্দ ছিল অনেক বেশী। বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে তবু এখনো মনে পড়ছে দু'একজন যথার্থ সুরসিককে। এঁরা কামরায় উঠেই পাঞ্জাবির বোতাম খুলে দিয়ে কৌচা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে যা গল্প জুড়তেন তার আর তুলনা হয় না। আমরা গুলটিকয়েক প্রাণী রোজই এক কামরায় উঠতুম আর এঁরা কামরাখানিকে গালগল্প দিয়ে প্রতিদিন রঙীন করে দিতেন। অসুখ করে আমাদের কেউ দু'দিন কামাই দিলে এঁরা রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, কোনো কৌশলে দুটো ডাব কিংবা চারটি ডালিম পাঠানো যায় কি না তার আশ্বেশা করতেন কিন্তু যাক, এ বাবতে 'রূপদশী' আমার চেয়ে ঢের বেশী ওকীব-হাল।

আমি ভাবছি, সেই সব আনন্দের কথা যেখানে অজানা জনকে চেনবার সুযোগ হয়। উদয়াস্ত তো আমরা বসে আছি সাংসারিকতার মুখোশ পরে। আপিসে যারা আমার কাছে আসে তারা আসে স্বার্থের খাতিরে, বাড়িতে যারা আসেন তাঁরা বন্ধুজন, তাঁদের আমি চিনি, তাঁরা আমায় চেনেন কিন্তু নতুন পরিচয় হবে কি প্রকারে?

তাই ট্রেনের স্বল্পপক্ষণের পরিচয় অনেক সময় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ট্রেনে তুমি আমাকে চেন না, আমি তোমাকে চিনি নে। আলাপচারিটা কোনো স্বার্থের খাতিরে আরম্ভ হয় না বলে শেষ পর্যন্ত সে যে কত অন্তরঙ্গতায় দু'জনকে নিয়ে যেতে পারবে তার কোনো স্থিরতা নেই।

অবশ্য এখন আমরা সব মেকি সায়েব হয়ে গিয়েছি। আগের আমলের মত কেউ যদি শুধান, 'বাবাজীর আসা হচ্ছে কোন্ থেকে' কিংবা 'বাবাজীরা—?' অথবা 'বাবাজী বামুন, কয়েত, না বাদ্য?' তাহলে আমরা বিরক্ত হই। কেন হই, তা এখনো আমি বুঝে উঠতে পারি নে।

ইংরেজ শুনোঁছ হয়। আমি বলতে পারব না। কারণ আমি পারতপক্ষে কোনো ইংরেজের সঙ্গে আলাপ জমাতে চাই নে। অবশ্য কোনো ইংরেজ আলাপ করতে চাইলে আমি থেকিয়ে উঠে তাকে স্নাবও করি নে। কিন্তু ফরাসী জার্মান সুইস অন্য ধরনের। তারা অনেক বেশী মিশ্রকে। কাফে বা মদের দোকানে

তারা যে রোজ সন্ধ্যায় আস্তা জমায় সেখানে কোনো সদস্য যদি কোনো নতুন লোক নিরে উপস্থিত হয় তবে আর পাঁচজন আনন্দিত হয়। ইংরেজের ক্লাবে যদি কোনো সদস্য আপন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তবে আর পাঁচজন তার দিকে আড়নয়নে তাকায়। কোনো কোনো ক্লাবে তো কড়া আইন, আপনি মাসে ক'দিন ক'জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন।

জার্মান, ফরাসী, সুইসদের ভিন্ন রীতি। 'পাবে', কাফেতে ইয়ারদোস্ত যোগাড় করার পরও তাদের প্রাণ ভরে ওঠে না বলে তারা ঘান্ন ফুর্তির জাহাজ চড়তে। সেখানে কত দেশের কত লোকের সঙ্গে আলাপ হবে—

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।

ময়ূরକଂ

নিবেদন

‘পদ্মতন্ত্র’ বাঙালী পাঠকের কাছে আশাতীত সমাদর লাভ করাতে আমার জানা-আজানা পাঠকের কেউ কেউ ঐ-জাতীয় আরেকখানি সংকলন প্রকাশ করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। আমার শরীর অসুস্থ থাকায় শিষ্য ও সখা দিল্লীবাসী শ্রীমান বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য আমার পূর্বনো লেখা থেকে অশেষ পরিশ্রম করে আপন রুচি-অনুযায়ী এই সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন। এ পুস্তিকার অধিকাংশ লেখা ‘আনন্দবাজার’, ‘বসুমতী’ ও ‘দেশ’-এ গেরিয়েছিল কোনো কোনো লেখা ‘দেশে-বিদেশে’র চেয়েও পূর্বনো।

গজনি সুলতান মাহমুদের সভাপাণ্ডিত অল-বীরুদীনী একাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত শিখে আরবী ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বর্ণনা দেবার সময় তিনি বলেন যে, ঐ সব ধর্মের মহাজনগণ আপন আপন ধর্মের যে ধারণা হৃদয়মনে পোষণ করেছেন তিনি সে-গুলোর বর্ণনা করেছেন মাত্র—কোনো মতের সমর্থন কিংবা খণ্ডন তিনি করতে চান নি। নানা ধর্ম বর্ণনার সময় আমি প্রাতঃস্মরণীয় অল-বীরুদীনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

‘বাঙালী’ বলতে আমি উভয় বাঙলার এবং বাঙলার বাইরেরও হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ বাঙলাভাষী জনকেই বুঝি।

সৈয়দ মুজতবা আলী

গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের শিষ্যদের ভিতর সাহিত্যিক হিসাবে সর্বোচ্চ আসন পান শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। তিনি যে রকম রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি, তেমনি বিধিদত্ত রসবোধ তাঁর আগের থেকেই ছিল। ফলে তিনি সরস, হালকা কলমে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবন, খুশ-গল্প, আড্ডা-মজলিস সম্বন্ধে যা লিখেছেন তারপর আর আমার কিছু লিখবার মত থাকতে পারে না। কারণ বিশীদা যে মজলিসে সবচেয়ে উঁচু আসন পেয়েছেন সে মজলিসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে যদি নিতান্তই আমাকে কোনো স্তোতাকাসন দেওয়া হয় তবে সেটা হবে সর্বনিম্নে।

কিন্তু বহু শাস্ত্রে বিধান আছে সর্বজ্যেষ্ঠ যদি কোনো কারণে শ্রদ্ধাজলি না দিতে পারে, তবে দেবে সর্বকনিষ্ঠ। এই ছেলে ধরার বাজারে কিছু বলা যায় না—গুরুদেবকে স্মরণ করার সময় আমরা সবাই একবয়সী ছেলেমানুষ, রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আজকের শিশুবিভাগের কনিষ্ঠতম আশ্রমিক—কাজেই বিশীদার যদি ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তবে আমার আকন্দাজলির প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে মা-বসুমতীর কাছে এটি গচ্ছিত রাখছি।

ব্যাপকার্থে রবীন্দ্রনাথ তাবৎ বাঙালীর গুরু, কিন্তু তিনি আমাদের গুরু শব্দার্থে। এবং সে গুরুর মহিমা দেখে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়েছি। ব্যক্তিগত কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকে কিন্তু এ স্থলে ছাত্রের কতব্য সমাধান করার জন্য বলি, শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর বার্লিন, প্যারিস, লন্ডন, কাইরো বহু জায়গায় বহু গুরুকে আমি বিদ্যাদান করতে দেখেছি কিন্তু এ গুরুর অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না। কত বৎসর হয়ে গেল, কিন্তু আজও মনের পটের উপর রবীন্দ্রনাথের আঁকা কীটসের ‘অটোমে’র ছবি তো মুছে গেল না। কীটস হেমন্তের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে যে আরও বেশি উজ্জ্বল করা যায়, এ কথা তো কেউ সহজে বিশ্বাস করবেন না। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে “You do not paint a lily”—তাই মনে প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়, রবীন্দ্রনাথ কীটসের হেমন্ত-লিলিকে মধুরতর প্রিয়তর করতেন কোন জাদু-মন্ত্রের জোরে?

তুলনা না দিয়ে কথাটা বোঝাবার উপায় নেই। ইংরিজী কবিতা পড়ার সময় আমাদের সব সময় মনে হয়, ইংরিজী কবিতা যেন রূপকথার ঘুমন্ত সুন্দরী। তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করি, কিন্তু তার বাক্য-হাস্য-নৃত্য রস থেকে বঞ্চিত থাকি বলে অভাবটি এতই মমন্তুদ হয় যে, শ্যামলী স্কুলাঙ্গী জাগ্রতা গোড়জার সঙ্গসুখ তখন অধিকতর কাম্য বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণনশৈলী ভানুমতী মন্ত্র দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতা তাঁর সোনার কাঠির পরশ দিয়ে কীটসের হৈমন্তীকে জাগিয়ে দিয়েছিল আমাদের বিদ্যালয়ের নিভৃত কোণে। গুরুদেব কীটসের এক ছন্দ কবিতা পড়েন, নির্দ্বিতা:

সুন্দরীকে চোখের সামনে দেখতে পাই। তিনি তাঁর ভাষার সোনার কাঠি ছোঁয়ান, সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী নয়ন মেলে তাকায়। গুরুদেবের কণ্ঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মস্ত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, সুন্দরী নৃত্য আরম্ভ করে। গুরুদেব তাঁর বাঁগার তারে করাঙ্গুলিস্পর্শে ঝংকার তোলেন, সুন্দরী গান গেয়ে ওঠে।

কীটস, শেলি, ব্রাউনিং, ওয়াডসওয়ার্থকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এ ইন্দ্রজাল কতবার দেখেছি আর ভেবেছি, হায়, এ বর্ণনা যদি কেউ লিখে রাখত তাহলে বাঙালী তো তার রস পেতই, বিলেতের লোকও একদিন ওগুলো অনুবাদ করিয়ে নিয়ে তাদের নিজের কবির কত অনাবিচ্ছৃত সৌন্দর্য দেখতে পেত। কিন্তু জ্ঞানি ভানুমতীর ছবি ফটোগ্রাফে ওঠে না, গুরুদেবের এ বর্ণনা কারো কলম কালিতে ধরা দেয় না। যেটুকু দিয়েছে সেটুকু আছে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের ভাণ্ডারে।

তারপর একদিন বেলজিয়মে থাকার সময় বিলেত যাবার দরকার হল। ইচ্ছে করেই যাওয়াটা পিছিয়ে দিলুম—তখন বসন্ত ঝড়। কীটসের ‘হৈমন্তী’র সঙ্গে দেখা হতে অনেক বাকী। সায়েব-মেমসায়েবরা অসময়ে দেখা করেন না।

বিলিভী হৈমন্তীকে দেখে মূগ্ধ হলুম, অস্বীকার করব না। কীটসের ফিরিস্তি মিলিয়ে ‘নখশির’ বর্ণনা টান-টান মিলে গেল, কিন্তু গুরুদেবের হৈমন্তীর সম্মান পেলুম না। কীটসের সুন্দরীকে বার বার তাকিয়ে দেখি আর মনে হয়, আগের দিনের বেলাভূমিতে কুড়িয়ে-পাওয়া ঝিনুক ঘরের ভিতরে এসে স্ফলন হয়ে গিয়েছে। গুরুদেবের গীতিশৈলী পূর্বদিনের সূর্যাস্তের সময় যে লীলাম্বুজ নীলাম্বরের সৃষ্টি করেছিল, যার মাঝখানে এই শক্তিই ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করেছিল, গৃহকোণের দৈর্ঘ্যদৈর্ঘ্যতার মাঝখানে সে যেন নিঃপ্রভ হয়ে গিয়েছে, ‘তুলসীর মূলে’ যে ‘সুবর্ণ দেউটি’ দর্শাদিক উজ্জ্বল করেছিল সেই দেউটি দেবপদস্পর্শলাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে স্ফলনমুখে আপন দৈন্য প্রকাশ করতে লাগল।

তারপর আরও কয়েক বৎসর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন শ্রীষদ্বক্ত অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে তার পেলুম, জার্মানির মারবুর্গ শহরে গুরুদেব আমাকে ডেকেছেন—জানতেন আমি কাছাকাছি আছি।

মারবুর্গের যে জনসভার বর্ণনা আমি অন্যত্র দিয়েছি। আজ শুধু বলি, গুরুদেব সেদিন যখন ‘ঘন ঘন সাপ খেলাবার বাঁশী’ বাজালেন তখন মারবুর্গের পরবে জমায়েত তাবৎ জার্মানির ‘গৃনগী-জ্ঞানী মাননী তত্ত্ববিদের সেরারা’ মস্তমুগ্ধ সর্পের মত অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘ এক ঘণ্টাকাল গুরুদেব বক্তৃতা দিলেন,—একটি বারের মত সামান্যতম একটি শব্দও সেই সম্মিলিত যোগসমাধির ধ্যান-ভঙ্গ করল না। আমার মনে হল গুরুদেব যেন কোন এক অজানা মন্ত্রবলে সভাস্থ নরনারীর শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত স্তম্ভন করে দিয়েছেন—ডাইনে বাঁয়ে তার শব্দটুকুও শুনতে পাই নি।

আমার মনে হরোঁছিল, সভাগৃহ থেকে বেরুতে গিয়ে দেখব সেই বিপুল-কলেবর অট্টালিকা বম্বীকঙ্কপে নিরুদ্ভ নীরস্ত হয়ে গিয়েছে।

সেই জনতার মাঝখানেই গুরুদেবকে প্রণাম করলুম—জানি নে তো কখন আবার দেখা হবে। এত সব গুণগীক্তানীর মাঝখানে আমার জন্য কি আর বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হবে? কিন্তু ভুলে গিয়েছিলুম গুরুদেবেরই কবিতা :—

আমার গুরুদর পায়ে তলে
শুধুই কি রে মানিক জ্বলে ?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাদে লক্ষ মাটি ঢেলায়ে ।
আমার গুরুদর অঙ্গন কাছে
সুবোধ ছেলে কজন আছে
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন
তাই আমি তাঁর চেলায়ে ।

বিশাল জনতার উদ্বেলিত প্রশংসা-প্রশস্তি পাওয়ার পরও, আমি যখন প্রণাম করে দাঁড়ালুম, তিনি মৃদুকণ্ঠে শুধালেন, ‘কি রকম হল?’

আমি কোনো উত্তর দিই নি।

শহরে উজ্জ্বল-নাজীর-কোটালরা গুরুদেবকে তাঁর হোট্টেলে পৌঁছে দিলেন। আমি পরে সেখানে গিয়ে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর কাছ থেকেই বিদায় নিতে চাইলুম। তিনি বললেন, ‘সে কি কথা, দেখা করে যান।’

আমি দেখা হবে শুনে খুশি হয়ে বললুম, ‘তাহলে আপনি গিয়ে বলুন।’

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী বললেন, ‘সে তো আর পাঁচজনের জন্য। আপনি সোজা গিয়ে নক করুন।’

গুরুদেবের ক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু হাসিমুখে বসতে বললেন। তারপর ভালো করে তাকিয়ে বললেন, ‘এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন?’

আমি মাথা নীচু করে চুপ করে রইলুম।

কিছু কথাবর্তা হল। আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে। যখন উঠলুম তখন বললেন, ‘অমিয়কে ডেকে দে তো।’

চক্রবর্তী এলেন। গুরুদেব বললেন, ‘অমিয়, একে ভালো করে খাইয়ে দাও।’

জানি পাঠকমণ্ডলী এই তামসিক পরিসমাপ্তিতে ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু সোক্রাতেসের চোখে যখন মরণের ছায়া ঘনিয়ে এল আর শিষ্যেরা কানের কাছে চাঁৎকার করে শুধালেন, ‘গুরুদেব, কোনো শেষ আদেশ আছে?’

তখন সোক্রাতেস বললেন, ‘হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পরশুদিন যে মৃগাটা খেয়েছিলুম তার দাম দেওয়া হয় নি। দিয়ে দিয়ো।’ এই সোক্রাতেসের শেষ কথা।

সব দিকে যার দৃষ্টি তিনিই তো প্রকৃত গুরু এবং তাও মৃত্যুর বহু পূর্বে ॥

নন্দলালের দেওয়াল-ছবি

তুর্কী-নাচন নাচেন নন্দবাবু
চতুর্দিকে ছেলেরা সব কাবু ।
তুলির গদ্বা ডাইনে মারেন, মারেন কভু বায়ে
ঘাড় বাঁকিয়ে, গোঁফ পাকিয়ে, দাঁড়িয়ে এক পায়ে ।
অষ্টপ্রহর চকীবাজী কীর্তি-মন্দিরে
ছেলেরা সব নন্দলালকে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিকে ফিরে ।

হচ্ছে 'নটীর পূজা'
রানীর সঙ্গে হল নটীর পূজা নিয়ে যুঝা ।
বরাদ্দনা ভিক্ষু নটীর নৃত্যচ্ছন্দ ধূপ—
তুলির আগুন পরশ পেয়ে নিল আবার সেই অপরূপ-রূপ
—বহু যুগের পরে—
চৈত্যভবন ভরে ।
গানের আসর পারা
—সন্ধ্যাকাশে ফোটে যেন তারার পরে তারা—
হেথায় সেতার কাঁপে ভীরু, হোথায় বঁগার মীড়
আধফোটা গুঞ্জরণের ভিড়
তার পিছনে মদু করুণ-বাঁশি
গদমগমিয়ে থেকে থেকে উঠছে ভেসে খোল-মদঙ্গের হাসি ।

এ যেন সুন্দরী —
প্রথমেতে নীলাম্বরী পরি,
সর্ব অঙ্গে জড়ায় যেন অলংকারের জাল ;—
তিলোত্তমা গড়েন নন্দলাল ।
চিহ্নপটে কিন্তু নটী ফেলে অলংকার
শূন্য যেন বলে চিহ্নকার,—
“তথাগতের দয়ায় যেন তেমনি ঘুচে তোমা সবার সকল অহংকার ।”

সাদামাটার রক্তবিহীন ঠোঁটে
লজ্জা নোহাগ ফোটে,
পাংশু দেয়াল আনন্দে লাল নন্দলালের লালে
তুলির চুমো যেই না থেলো গালে ॥*

* শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বরদারাজ্যের ‘কীর্তি-মন্দিরে’ রবীন্দ্রনাথের ‘নটীর পূজা’র স্কেন্সো ছবি আঁকবার সময় লেখক কর্তৃক এক বাম্ভবীকে আঁসিয়া দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র ।

বড় দিন

বাইবেলে বলা হয়েছে পূর্ব থেকে তিন জন ঋষি প্যালেস্টাইনের জুডেয়া প্রদেশের রাজা হেরোডের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহুদিদের নবীন রাজা কোথায় জন্ম নিয়েছেন? আমরা পূর্বকাশে তাঁর তারা দেখতে পেয়ে তাঁকে পূজো করতে এসেছি।'

সেই তারা-ই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বেৎলেহেম—যেখানে প্রভু যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। মা মেরী আর তাঁর বাগদত্ত যোসেফ পান্থশালায় স্থান পান নি বলে আশ্রয় নিয়েছিলেন পান্থশালার অশ্বশালয়ে। তারই মাঝখানে কুমারী মেরী জন্ম দিলেন এ জগতের নব জন্মদাতা প্রভু যীশুকে।

দেবদূতরা মাঠে গিয়ে রাখাল ছেলেদের সদুৎসাহ দিলেন—প্রভু যীশু, ইহুদিদের রাজা জন্ম নিয়েছেন। তারাও এসে দেখে, গাধা-খচ্চর, খড়্-বিচুলির মাঝখানে মা-জননীর কোলে শূন্যে আছেন রাজাধিরাজ।

এই ছবিটি এঁকেছেন যুগ যুগ ধরে বহু শিল্পী, বহু কবি, বহু চিত্রকর। নিরাশ্রয়ের ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন বিশ্বজনের আশ্রয়-দাতা।

*

*

*

বাইরের থেকে গম্ভীর গুঞ্জরণ শূনে মনে হল বিদ্যালয়ের ভিতর বৃষ্টি তরুণ সাধকেরা বিদ্যাভ্যাস করছেন। জানা ছিল টোল-মাদ্রাসা নয়, তাই ভিতরে ঢুকে ভিন্নমি যাই নি।

ক'শ নারী পুরুষ ছিলেন আদম-শুমারী করে দেখি নি। পুরুষদের সবাই পরে এসেছেন ইভনিং ড্রেস। কালো বনাতের চোম্ব পাতলুন—তার দুদিকে সিল্কের চকচকে দু'ফালি পটি; কচ্ছপের খোলার মত শক্ত শার্ট, কোণভাঙা কলার—ধবধবে সাদা; বনাতের ওয়েস্ট কোট আর কোটের লেপেলে সেই সিল্কের চকচকে ট্যারচা পটি; কালো বো ফুটে উঠেছে সাদা শার্ট কলারের উপর—যেন শেত সরোবরে কৃষ্ণ কমলিনী। পায়ে কালো বার্নিশের জুতো—হাতে গেলাস।

কিংবা শাক'-সিকনের ধবধবে সাদা মসৃণ পাতলুন। গায়ে গলাবন্ধ 'প্রিন্স কোট'—সিক্স-সিলিডারী অর্থাৎ ছ-বোতামওয়ালা। কালো বোতাম হাইদ্রাবাদী চৌকো, কারো বা বিদরী গোল—কালোর উপরে সাদা কাজ। একজনের বোতাম-গুলো দেখলুম খাস জাহাঙ্গীর-শাহী মোহরের।—হাতে গেলাস।

তারি মাধ্যখানে বসে আছেন এক খাঁটি বাঙালী নটবর। সে কী মোলায়েম মিহি চুনট-করা শান্তিপূরে ঘি রঙের মেরিনার পাঞ্জাবি আর তার উপরে আড়করা কালো কাশ্মীরী শালে সোনালি জরির কাজ। হীরের আংটি বোতাম ম্যাচ করা, আর মাথায় যা চুল তাকে চুল না বলে কৃষ্ণকুট বললেই সে তাজমহলের কদর দেখানো হয়। পায়ে পাম্প—হাতে গেলাস।

'দেশসেবক'ও দু'একজন ছিলেন। গায়ে খন্দর—হাতে? না, হাতে কিছু না। আমি আবার সব সময় ভালো করে দেখতে পাই নে—বয়স হয়েছে।

কিন্তু এ সব নস্যা। দেখতে হয় মেয়েদের। ব্যাটাছেলেরা যখন মনস্থির করে ফেলেছে, সাঁঝের ঠোঁকে সাদা কালো ভিন্ন অন্য রঙ নিয়ে খেলা দেখাবে না তখন এই দুই স্বর সা আর রে দিয়ে কি ভেটিকই বা খেলবে ?

হোথায় দেখো, আহা-হা-হা। দুধের উপর গোলাপী দিয়ে ময়ূরাক'ঠী-বাস্তালোরী শাড়ি! জরির আঁচল। আর সেই জরির আঁচল দিয়ে ব্লাউজের হাতা। ব্লাউজের বাদ-বাকী দেখা যাচ্ছে না, আছে কি নেই তাই বলতে পারব না। বোধ হয় নেই—না থাকতেই সৌন্দর্য বেশি। ফরাসীরা কি এ জিনিসকেই বলে 'দোকোলতে'? বুক-পিঠ-কাটা মেমসাহেবদের ইভনিং ফ্রক এর কাছে লজ্জায় জড়সড়।

ডান হাতে কনুই অবধি সোনার চুড়ি—বাঁ হাতে কবজের মত বাঁধা হোমিও-প্যাথক রিস্টওয়াচ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিনারের কত বাকি? কটা বেজেছে?' বলেই লজ্জা পেলেন, কারণ ভুলে গিয়েছিলেন নিজের হাতেই বাঁধা রয়েছে ঘড়ি। কিন্তু লাল হলেন না, কারণ রুজ আগে-ভাগেই এত লাল করে রেখেছে যে, আর লাল হবার 'পার্কিঙ-শ্লেস' নেই।

হাতে? যান মশাই,—আমার অতশত মনে নেই। হালকা সবুজ জর্জেটের সঙ্গে রক্ত-রাঙা বম্বাউজ। কপালে সবুজ টিপ। শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বাঁ হাতে ঝুলছে ব্যাগ, কিন্তু ব্যাগের স্ট্র্যাপটার রঙ মেলানো রয়েছে রক্ত-রাঙা বম্বাউজের সঙ্গে এবং তাকে ফের মেলানো হয়েছে স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে। আর কোথায় কোথায় মিল অমিল আছে দেখবার পূর্বেই তিনি সরে পড়লেন। ডান হাতে কিছূ ছিল? কী মর্শাকিল!

আরে! মারোয়াড়ী ভদ্রলোকরা কি পার্টিতে মহিলাদের আনতে শুরূ করেছেন? কবে থেকে জানতুম না তো।

একদম খাঁটি মারোয়াড়ী শাড়ি। টকটকে লাল রঙ—ছোটো ছোটো বোটারদার। বেনারসী-রূপার। সেই কাপড় দিয়েই স্লাউজ—জরির বোটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সকাল বেলা হাওড়ায় নামলে ব্রিজ পেরিয়ে হামেশাই এ রকম শাড়ি দেখতে পাই—মহিলারা স্নান সেরে ফিরছেন। সেই শাড়ি এখানে? হাতে আবার লাইফ বেল্ট সাইজের কাঁকন।

মাথার দিকে চেয়ে দেখি, না, ইনি মারোয়াড়ী নন। চুলটি গুঁটিয়েছেন একদম পাকাপোক্ত গ্রেতা গার্বো স্টাইলে। কাঁধের উপর নেতিয়ে পড়ে ডগার দিকে একটু-খানি ঢেউখেলানো। শূধু চুলটি দেখলে তামা-তুলসী স্পর্শ করে বলতুম, জীবনের শেষ স্বপ্ন সফল হল—গ্রেতার সঙ্গে মুন্থোমুখি হয়ে। কিন্তু কেন হেন জঙ্গলী শাড়ির সঙ্গে মডার্ন চুল?

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে ধ্যান করে হৃদয়ঙ্গম করলুম তত্ত্বটা। শাড়ি স্লাউজের কন্সট্রাস্ট ম্যাচিঙের দিন গেছে। এখন নব নব কন্সট্রাস্ট-এর সম্মান চলেছে। এ হচ্ছে প্রাচীন পন্থা আর আধুনিক ফ্যাশানের স্বন্দর। গলার নীচে প্রায়দশ শতাব্দী—উপরে বিংশ। প্রাগভরে বাঙালী মেয়ের বৃশ্ধির তারিফ করলুম। উচ্চকণ্ঠ করলেও কোনো আপত্তি ছিল না। সে হট্টগোলের ভিতর

এটম বমের আওরাজ্ঞও শোনা যেত না। কি করে খানার ঘণ্টা শুনতে পেলুম, খোদায় মালুম।

হাওড়া থেকে শেয়ালদা সাইজের খানা-টোবল। টার্কি পাখীরা রোস্ট হয়ে উধ্বপদী হয়েছেন অস্তত শ'জনা, মুরগী-মুসল্লম অগুনতি, সাদা কেঁচোর মত কিলবিলা করছে ইতালির মাক্কোরোনি হাইনৎসের লাল টমাটো সসের ভিতর, আঁড়ার রাশান স্যালাড গায়ে কম্বল জড়িয়েছে প্যোব ব্রিটিশ মায়াণেজের ভিতর, চকলেট রঙের শিককাবারের উপর আঁকা হয়েছে সাদা পেঁয়াজ-মুলোর আলপনা, গরম-মশলার কাথের কাদায় মুখ গুঁজে আছেন রুইমাছের বাঁক, ডাঁটার মত আটা আটা এসপেরেগাস টিন থেকে বোরিয়ে শ্যাম্পেনের গম্ব পেয়ে ফুলে উঠেছে পোলাওয়ের পিরামিডের উপর সসেজের ডজন ডজন কুতুর্মিনার।

কন্ট্রাস্ট, কন্ট্রাস্ট, সবই কন্ট্রাস্ট।

প্রভু যীশু জন্ম নিলেন খড়্গবিচুলির মাঝখানে—আর তার পরব হল শ্যাম্পেনে টার্কিতে !!

পাণ্ডা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

‘নামিন্দু শ্রীধামে। দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত

লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।’

এর পর পাণ্ডাদের সম্বন্ধ অত্যাচারের কথা ফলিয়ে বলবার মত সাহস আমাদের মত অর্বাচীন জনের হওয়ার কথা নয়। ওস্তাদরা যখন ‘মিল্লাকী তোড়ী’ অর্থাৎ মেয়া তানসেন রচিত তোড়ী রাগিনী গান তখন গাওয়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দুহাত দিয়ে দুটি কান ছুঁয়ে নেন। ভাবখানা এই ‘হে গুরুদেব, ওস্তাদের ওস্তাদ, যে-গান তুমি গেয়েছ সেটি গাইবার দম্ভ যে আমি প্রকাশ করলুম, তার জন্য আগে-ভাগেই মাপ চাইছি।’ সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদেরও তাই করা উচিত—মাইকেলও তাই করেছেন। আদি কবির স্মরণে বলেছেন, ‘রাজেশ্বরসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থদরশনে।’ কালিদাসও বলেছেন,—সংস্কৃতটা মনে নেই—‘বজ্রমণি ছেদ করার পর সূত্র যেমন অনায়াসে মণির ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে, বাস্মণীকির রামায়ণের পর আমার রঘুবংশ ঠিক সেইরূপ।’

শুধু এইটুকু বলে রাখি, পাণ্ডা বলতে ভারতীয় যে মহান জাতের কথা ওঠে তার কোনো জাত নেই। অর্থাৎ শ্রীধামের পাণ্ডা আর আজমীরের মুসলমান পাণ্ডাতে কোনো পার্থক্য নেই—যাত্রীর প্রাণটা নিমেষে কণ্ঠাগত করবার জন্য এঁদের বজ্রমুষ্টি ভারতের সর্বত্রই এক প্রকার। ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলনের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে? কংগ্রেস যদি এঁদের হাতে দেশের ভারটা ছেড়ে দিতেন তবে ভারত ছেদের যে কোনো প্রয়োজন হ’ত না সে বিষয় আমি স্থির-নিশ্চয়। এর জন্য মাত্র একটি প্রমাণ পেশ করছি।

উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সর্বপ্রকারের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ সে কথা সবাই জানেন ; কিন্তু এ তথ্যটি কি লক্ষ্য করেছেন যে, শিখরা তীর্থ করবার জন্য দিয়া পাকিস্তান যাচ্ছেন, পাকিস্তানের মুসলমানেরা হিন্দুস্থানের আজমীঢ় আসছেন, পূর্ব-পাঞ্জাবের কাতিয়ান গ্রামে যাচ্ছেন? পাণ্ডার ব্যবসা দুর্নিয়র প্রাচীনতম ব্যবসা—ওটাকে নষ্ট করা কংগ্রেস লীগের কর্ম নয়।

সে কথা যাক। আমি বলছিলাম, বিদেশ যাওয়ার পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল পাণ্ডা-জগতের অশোক-স্তম্ভ এবং কুতুবমিনার ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান পাণ্ডা। জেরুজালেমে গিয়ে সে ভুল ভাঙল।

আমি তীর্থপ্রাণ। অর্থাৎ তীর্থ দেখলেই ফুল চড়াই, 'শীরনী বিলাই। ভারতীয় তাবৎ তীর্থ যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন গেলুম জেরুজালেম। ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলমান এই তিন ধর্মের দ্বিবেণী জেরুজালেমে। বিশ্বপাণ্ডার ইউ.এন.ও. ঐখানেই। সেখানে থেকে গেলুম বেৎলেহেম—প্রভু যীশুর জন্মস্থান।

বড়দিনের কয়েক দিন পরে গিয়েছিলাম। জেরুজালেম-বেৎলেহেমের বাস-সার্ভিস আমাদের স্টেট বাসের চেয়ে অনেক ভালো (বাসের উপর পলায়মান ব্যাঘ্রের ছবি এঁকে কতারা ভালই করেছেন—বাঘ পর্যন্ত ভিড় দেখে ভয়ে পালাচ্ছে)। পকেটে গাইড-বুক—পাণ্ডার 'এরজাৎস'—কাঁধে ক্যামেরা—হাতে লাঠি। আধ ঘণ্টার ভিতর বেৎলেহেম গ্রামে নামলাম।

ভেবেছিলাম, দেখতে পাবো, বাইবেল-বর্ণিত ভাঙাচোরা সরাই আর জরা জীর্ণ আশ্রাবল—যেখানে যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। সব কম্পুর। সব কিছু ভেঙে চূরে তার উপর দাঁড়িয়ে এক বিরাট গির্জা।

গির্জাটি প্রিয়দর্শন অস্বীকার করি নে। আর ভিতরে মেঝের উপর যে মৌজায়িক বা পাথরে-খচা আলপনা দেখলাম তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত রস-সৃষ্টি সেন্ট সোফিয়া, সেন্ট পল কোথাও আমি দেখি নি। সে কথা আরেক দিন হবে।

গাইড বুক লেখা ছিল, গির্জার নিচে ভূগর্ভে এখনো আছে সেই আশ্রাবল—যেখানে প্রভু যীশু জন্মগ্রহণ করেন। সেই গহবরে ঢুকতে যেতেই দীর্ঘ সামনে এক ছ-ফুটি পাণ্ডা। বাবরী চুল, মান-মনোহর গাল-কমল দাড়ি, ইয়া গোঁপ, মিশকালো আলখাল্লা, মাথায় চিমনির চোঙার মত টুপি, হাতে মালা—তার এক একটি দানা বেবি সাইজের ফুটবলের মত। পাদ্রী-পাণ্ডার অর্থ-নারীশ্বর।

গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে শুধাল, 'হোয়াট ল্যান্‌গুইজ্? কেল লীগ? বেলশে শপ্রাথে? লিসান এ?'—প্রায় বারোটা ভাষায় জিজ্ঞেস করল আমি কোন ভাষা বুঝি।

সবিনয় বললাম, 'হিন্দুস্থানী।'

বললে, 'দস্ পিয়াস্তর।' অর্থাৎ দশ পিয়াস্তর (প্রায় এক টাকা) দর্শনী দাও ॥

'দস্' ছাড়া অন্য কোন হিন্দুস্থানী সে জানে না বুঝলাম, কিন্তু তাই বা কি

কম ? আমি অবাক হয়ে ইংরেজিতে বললুম, 'প্রভু যীশুর জন্মভূমি দেখতে হলে পয়সা দিতে হয় ?'

বললে, 'হ্যাঁ।'

অনেক তর্কাতর্কি হল। আমি বুঝিয়ে বললুম, 'আমি ভারতীয়, খ্রীষ্টান নই, তবু সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পেরিয়ে এসেছি সেই মহাপুরুষের জন্মভূমি দেখতে যিনি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিলেন গরীব-খনির তফাত-ফারাক ঘুটিয়ে দেবার জন্য, যিনি বলেছিলেন কেউ কামিজটা চাইলে তাকে জোশ্বাটি দিয়ে দেবে—আর তাঁরই জন্মভূমি দেখবার জন্য দিতে হবে পয়সা ?'

শুধু যে চোরা ই ধর্মের কাহিনী শোনে না তা নয়। আমি উলটো পথ নিলুম—পাণ্ডা ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

গাইড ব্লকে লেখা ছিল, গহ্বরে যাবার দুটি রাস্তা। একটি গ্রীক অর্থডক্স প্রতিষ্ঠানের জিম্মায়, অন্যটি রোমান ক্যাথলিকদের। গেলুম সেটির দিকে—গির্জাটি ঘুরে সোদিকে পৌঁছতে হয়।

এখানে দেখি আরেক পাণ্ডা—যেন পয়লাটার যমজ। বেশ-ভুষায় ঈষৎ পার্থক্য।

পুনরাপি সেই সদালাপ। 'ফেলো কড়ি মাথো তেল।' অম্মো না-ছোড়-বন্দা।

দিল-দরাজ, খোলা-হাত পাঠক হয়ত অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন, তুমি তো আচ্ছা তাঁদোড় বাপু ; এত পয়সা খর্চা করে পৌঁছলে মোকামে—এখন দু-পয়সার চাবুক কিনতে চাও না হাজার টাকার ঘোড়া কেনার পর ?' তা নয়, আমি দেখতে চাইছিলাম পাণ্ডাদের দৌড়টা কতদূর অবধি।

এবারে হার মানবার পূর্বে শেষ বাণ হানলুম।

বললুম, 'দেশে গিয়ে কাগজে লিখব, রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান কি রকম প্রভু যীশুর জন্মস্থান ভাঙিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। আমাদের দেশেও 'কমুনিটি আছে।'

বলে লাঠিটা বার তিনেক পাথরে ঠুকে ফিরে চললুম ঘোঁত-ঘোঁত করে বাস স্ট্যান্ডের দিকে।

পাণ্ডা ডাকলে, 'শোন।'

আমি বললুম, 'হুঃঃ।'

'তুমি সত্যি এত টাকা খরচ করে এখানে এসে দশ পিয়ান্তরে জন্য তীর্থ না দেখে চলে যাবে ?'

'আলবত। প্রভুর জন্মভূমি দেখার জন্য পয়সা দিয়ে প্রভুর স্মৃতির অবমাননা করতে চাই নে।'

খ্যাস-খ্যাস করে দাড়ি চুলকোল অনেকক্ষণ করে। তারপর ফিস্-ফিস্ করে কানের কাছে মূখ—বোটকা রসুনের গন্ধ—এনে বলল, যদি প্রতিজ্ঞা করো কাউকে বলবে না ফ্রী ঢুকতে দিয়েছি, তবে—'

আমি বললুম, 'আচ্ছা, এখানে তোমার ব্যবসা মাটি করব না। কিন্তু দেশে

গিয়ে বলতে পারব তো ?

তখন হার মানল। আমরা বহু লঙ্কা জয় করেছি !!

গীতা-রহস্য

গীতার মত ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল। তার প্রধান কারণ, গীতা সর্বযুগের সর্ব মানুষকে সব সময়েই কিছু না কিছু দিতে পারে। অধ্যাত্মলোকে চরম-সম্পদ পেতে হলে গীতাই অতুত্তম পদপ্রদর্শক, আর ঠিক তেমনি ইহলোকের পরম সম্পদ পেতে হলে গীতা যে রকম প্রয়োজনীয় চরিত্র গড়ে দিতে পারে, অন্য কম গ্রন্থেরই সে শক্তি আছে। ঘোব নাস্তিকও গীতাপাঠে উপকৃত হয়। অতি সবিনয় নিবেদন করছি, এ কথাগুলো আমি গতানুগতিকভাবে বলছি নে, দেশ-বিদেশে গীতাভক্তদের সাথে একসঙ্গে বসবাস করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছে।

তাই গীতার টীকা রচনা করা কঠিনও বটে, সহজও বটে। সর্বধর্ম সর্ব-মার্গের সমন্বয় যে গ্রন্থে আছে তার টীকা লেখার মত জ্ঞানবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অল্প লোকেরই থাকার কথা; আর ঠিক তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু না কিছু সমর্থন গীতাতে পায় তখন তার পক্ষে একমাত্র গীতার টীকা লেখাই সম্ভবপর হয়—একমাত্র গীতাই তখন সে-ব্যক্তির সামান্য অভিজ্ঞতা বিশ্বজনের সম্মুখে রাখবার মত সাহসে প্রলোভিত করতে পারে।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের ‘গীতারহস্য’ প্রথম শ্রেণীর টীকা। ‘গীতা রহস্য’ লোকমান্যের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অভিমতও আছে বটে, কিন্তু এ গ্রন্থের প্রধান গুণ, তার তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী। এই তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং এই শতকের প্রথম দিকেই সর্বপ্রথম সম্ভবপর হয়,—কারণ তার পূর্বে সর্বধর্মে জ্ঞান আহরণ করতে হলে সর্বভাষা আয়ত্ত করতে হত, এবং সে কর্ম অসাধারণ পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব। ঊনবিংশ শতকে নানা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হল এবং বিংশ শতকে সমস্ত উপাদান এরূপ সর্বাস্থ-সুন্দর সুসজ্জিত হয়ে গেল যে, তখনই প্রথম সম্ভবপর হল তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গীতা বিচার করা।

এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশে-বিদেশে বহুতর সাধক, গুণীজ্ঞানী গীতাকে কেন্দ্র করে নানা ধর্মালোচনা করেছেন। বাংলা ইংরেজী এই দুই ভাষাতেই গীতা সম্বন্ধে এত পুস্তক জমে উঠেছে যে, তাই পড়ে শেষ করা যায় না। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা, ফরাসী এবং বিশেষ করে জর্মনে গীতা সম্বন্ধে আমরা বহু উত্তম গ্রন্থ দেখেছি।

তৎসঙ্গেও বলতে বাধ্য লোকমান্যের গ্রন্থখানি অনন্যসাধারণ। এ পুস্তক লোকমান্য মাণ্ডালে জেলে বসে মারাঠী ভাষায় লেখেন।

“অনুবাদ সাহিত্য” প্রবন্ধ লেখার সময় আমি এই পুস্তকখানার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলাম। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পুস্তকখানির অনবদ্য

অনুবাদ বাংলা ভাষায় করে দিয়ে গিয়ে গোড়জনের চিরকুতজ্ঞতা-ভাজন হয়ে গিয়েছেন। এ অনুবাদের সঙ্গে করুণ রসও মিশ্রিত আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি,—

‘লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক তাঁহার প্রণীত ‘গীতা-রহস্য’ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ কামনায় বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে,— অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার শ্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়া ছিলাম। আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায়, এতদিন পরে উহা গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করিয়া আমার এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।’

তারপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যা বলেছেন, পাঠকের দৃষ্টি আমি সেদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে চাই :—

‘কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল—এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মহাত্মা টিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।’

যতবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদখানা হাতে নিই ততবারই আমার মন গভীর বিস্ময়ে ভরে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদ ৮৭২ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। এই অনুবাদ কর্ম প্রায় ষাট বৎসর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরম্ভ করেন। যৌবনে তিনি বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন মহারাষ্ট্রে ছিলেন তখন মারাঠী শিখিছিলেন এবং ততদিনে নিশ্চয়ই সে ভাষার অনেকখানি ভুলে গিয়েছিলেন—রাঁচীতে বসবাস করে দূর মারাঠা দেশের সঙ্গে সাহিত্যিক কেন, কোনো প্রকারের যোগ রাখাই কঠিন। তাই ধরে নিচ্ছি, সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি নূতন করে মারাঠী শিখে প্রায় তিন লক্ষ মারাঠী শব্দ বাংলার অনুবাদ করেছেন, মাসের পর মাস তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তার প্রকাশের তত্ত্বাবধান করেছেন, এবং সর্বশেষে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

‘গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।’

অর্থাৎ প্রুফ দেখার ভারও আসলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপরেই ছিল।

তাই বিস্ময় মানি যে, এই হিমালয় উত্তোলন করার পর যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন লোকমান্য ইহলোকে নেই তখন তিনি সেই শোক প্রকাশ করলেন, ‘কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল’ বলে। এ শোক, এ আক্ষেপ প্রকাশ করার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষাডারে কি ভাষা, বর্ণনশৈলী, ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য ছিল না? মূচ্ছকটিকা, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, নীলপাখী অনুবাদ করার পরও কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে করুণ রস প্রকাশ করার ক্ষমতা অলঙ্ঘ ছিল?

তাই মনে হয়, যিনি বহু রসের সাধনা আজীবন করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে সর্বরসে মিলে গিয়ে তাঁর মনে এক অনির্বচনীয় সামঞ্জস্যের অতীতপূর্ব শান্তি এনে দেয়। অথবা কি দীর্ঘ দিনযামিনী গীতার আসঙ্গ লাভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই বৈরাগ্য-

বিজয়ী কর্মযোগে দীক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যেখানে মানুষ কর্ম করে অনাসক্ত হয়ে কেবলমাত্র বিশ্ববজনের উপকারার্থে? তাই মনে হয়, সাধনার উচ্চমত স্তরে উত্তীর্ণ হয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতা লোপ পায় নি—লোকমান্যকে সম্পূর্ণ পুস্তক স্বহস্তে নিবেদন করতে পারেন নি বলে ব্যাখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু সে বেদনা প্রকাশ করেছেন শোকে আতুর না হয়ে, গাম্ভীর্য এবং শান্তরসে সমাহত হয়ে।

কিন্তু এ সব কথা বলা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। আমার ইচ্ছা বাঙালী যেন এ অনুবাদখানা পড়ে, কারণ লোকমান্য রচিত ‘গীতা-রহস্য’র ইংরেজী অনুবাদখানা অতি নিকৃষ্ট। যেমন তার ভাষা খারাপ, তেমনি মূলের কিছুমাত্র সৌন্দর্য কণামাত্র গাম্ভীর্য সে অনুবাদে স্থান পায় নি। অথচ বাংলা অনুবাদে, আবার জোর দিয়ে বলি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদে, মূলের কিছুমাত্র সম্পদ নষ্ট হয় নি, মূল মারাত্মী পড়ে মহারাজ্যবাসী যে বিস্ময়ে অভিভূত হয়, অনুবাদ পড়ে বাঙালীও সেই রসে নিমগ্ন হয়।

কিন্তু অতিশয় শোকের কথা—এ অনুবাদ গত আট বৎসর ধরে বাজারে আর পাওয়া যায় না। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার পর এ পুস্তকের আর পুনর্মুদ্রণ হয় নি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা কোনো উদ্যোগী বাঙালী প্রকাশক যে পুনরাস্ত্রে যোগসূত্র স্থাপন করে এ পুস্তক পুনরায় প্রকাশ করেন।

আমার কাছে যে অনুবাদখানি রয়েছে তাতে লেখা আছে :—

All rights reserved by
Messrs, R. B. Tilak and S. B. Tilak,
568 Narayan Peth, Poona City.*

বন

পশ্চিম-জার্মানীর রাজধানী বনবাসী হতে চললেন শূনে পাঠক যেন বিচলিত না হন। এ ‘বনে’র উচ্চারণ ‘ঘরে’র মত। বাংলা উচ্চারণের অলিখিত আইন অনুযায়ী ‘ন’ অথবা ‘ণ’ পরে থাকিলে একমাত্রিক শব্দে ‘অ’-কারটি ‘ও’-কারে পরিণত হয়। যথা—মন, বন, উচ্চারিত হয় মোন, বোন,—ইত্যাদি রূপে। কিন্তু এই জার্মান Bonn শব্দের উচ্চারণে ‘ব’য়ের স্বরবর্ণটি ‘ঘরের অ’-কারের মত উচ্চারিত হয়। তাই পরাধীন জার্মানী আজ বনে রাজধানী পেয়ে যেন ঘর পেয়েছে একথা অনায়াসে বলা যায়।

কাগজে বেরিয়েছে বনের লোকসংখ্যা এক লক্ষ। আমাদের দেশে যেমন বলা হয়, পাঁচ বৎসর লালন করবে, দশ বৎসর তাড়না করবে এবং ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের ন্যায় আচরণ করবে, জার্মানীতে ঠিক তেমনি

সম্প্রতি খবর এসেছে, বিশ্বভারতীতে পুস্তকখানি পাওয়া যাচ্ছে।

আইন, কোনো শহরের লোকসংখ্যা যদি একলক্ষে পৌঁছে যায় তবে তিনি সাবালক হয়ে গেলেন, তাঁকে তখন 'গ্রোস-স্টাট্' বা বিরাট নগররূপে আদর-কদর করে বার্লিন ম্যুনিক কলোন হামবুর্গের সঙ্গে একাসনে বসাতে হবে। অর্থাৎ মার্কিন ইংরেজ কর্তাদের মতে বন বিরাট নগর এবং জর্মণীর রাজধানী তাঁরা বিরাট নগরেই স্থাপনা করেছেন।

কিন্তু এই কেঁদে ককিয়ে টায়ে-টায়ে এক-লক্ষী শহরেই রাজধানী কেন করতে হল? আমি বন শহরে বহু কম'ক্লান্ত দিবস এবং ততোধিক বিনিম্ন যামিনী যাপন করেছি। বনে হাড়হন্দ আমি বিলক্ষণ জানি। তার লোকসংখ্যা কি কৌশলে ১৯৩৮ সালে এক লক্ষ করা হয়েছিল সেও আমার অজানা নয়। এক-লক্ষী হয়ে সাবালকত্ব পাবার জন্য বন কায়দা করে পাশের একখানা গ্রামকে আদমশুমারীর সময় আপন কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিল—যদিও সে গ্রামটি বনের উপকণ্ঠে অবাস্থিত নয়, দুয়ের মাঝখানে বিস্তর যব-গমের তেপান্তরী ক্ষেত।

আসল তত্ত্ব হচ্ছে বন রুশ সীমান্ত থেকে অনেক দূরে। মার্কিন ইংরেজ ধরে নিয়েছে আসছে লড়াইএ জর্মণী রুশের বিরুদ্ধে লড়াই এবং তখন রাজধানী যদি রুশ সীমান্তের কাছে থাকে, তবে তাতে মেলা অসুবিধা—প্যারিস ফ্রান্সের উত্তর সীমান্তে থাকায় তাকে যেমন প্রতিবারেই মার খেতে হয়, বেড়ালের মত রাজধানীর বাচ্চা নিয়ে কখনো লিয়োঁ কখনো ভিশময় ঘুরে বেড়াতে হয়।

কিন্তু বনে রাজধানী নির্মাণে আরেকটি মারাত্মক তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে গেল। বেলজিয়ম যে রকম প্রতিবার জর্মণীকে ঠেকাতে গিয়ে বোধক্ মার খেয়েছে, এবার জর্মণী রুশকে ঠেকাতে গিয়ে সেইরকম ধারাই মার খাবে। বার্লিন গেছে, ফ্রাঙ্কফুর্ট যাবে, বনও বাঁচবে না।

কিন্তু থাক এসব রসকষহীন রাজনীতি চর্চা। বরঞ্চ এসো সহৃদয় পাঠক, তোমাকে বনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

এপারে বন, ওপারে 'সিবেন গেবিগে' অর্থাৎ সপ্তশ্রীলাচল। মাঝখানে রাইন নদী। সে নদীর বদকে উপর দিয়ে জাহাজ চড়ার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক তামাম ইউরোপ আমেরিকা থেকে জড়ো হয়। নদীটি এঁকে বেঁকে গিয়েছে, দু'দিকে সমতল জমির উপর গম-যবের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ছবির মত ঝকঝকে তকতকে ছোট ছোট ঘরবাড়ি, সমতল জমির পিছনে দু'সারি পাহাড় নদীর সঙ্গে সঙ্গে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে—মেঘমাশিলিষ্টসানুং।

আর বন শহরের ভিতরটাও বড় মনোরম। বার্লিনের মত চওড়া রাস্তা নেই, পাঁচতলা বাড়িও নেই। মোটরের গাঁক-গাঁকও নেই। আছে কাশী আগ্রার মত ছোট ছোট গলিঘাঁচা, ছোট ছোট বাড়ি-ঘর-দোর, ঘুমন্ত কাফে, অর্ধ-জাগ্রত রেস্টোরাঁ। আর বিশাল বিরাটবিপুল কলেবর আখানা শহর জুড়ে ভুবন-বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই জর্মণীতে প্রথম সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হয়। হেরমান গ্রাকোবি এখানেই অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর শিষ্য কির্ফেল এখনো সেখানে সংস্কৃত পড়ান। পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর মোটা কেতাবখানার তর্জমা ইংরাজীতে এখনো হয় নি। কির্ফেলের সতীর্থ অধ্যাপক লশ উপনিষদ নিয়ে

বছর বিশেষ ধরে পড়ে আছেন। তাঁর সুস্বাদু রুবেনসের শরীর ঐষৎ ইহুদী রক্ত ছিল বলে তিনি জর্মণী ছাড়তে বাধ্য হন। উপস্থিত তিনি তুর্কীর আকারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ান। বহুকাল ধরে রামায়ণখানা কামড়ে ধরে পড়ে আছেন—প্রামাণিক পুস্তক লেখবার বাসনায়।*

আর রাইনের ওয়াইনের প্রশংসা করার দায় তো আমার উপর নয়। ফ্রান্সের বর্দো বাগের্গে'ডর সঙ্গে সে কাঁধ মিলিয়ে চলে।

আমি যখন প্রথম দিন আমার অধ্যাপকের সঙ্গে লেখাপড়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলুম, তখন তিনি ভূরি-ভূরি খাঁটি তত্ত্ব কথা বলার পর বললেন :

‘এখানে ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে, তরুণীরা সল্লিয়া এবং ওয়াইন সম্ভা। বন্ধুতে পারছেন, আজ পর্যন্ত আমার কোনো শিষ্যেরই বদনাম হয় নি যে নিছক পড়াশুনো করে সে স্বাস্থ্যভঙ্গ করেছে। আপনিই বা কেন করতে যাবেন?’

রাজধানী ঠিক মোকামেই থানা গাড়লো ॥

‘নেভা’র রাধা

অনেক প্রেমের কাহিনী পড়েছি, এমন সব দেশে বহু বৎসর কাটিয়েছি যেখানে প্রেমে না পড়াতেই ব্যত্যয়—তাই চোখের সামনে দেখেছি প্রেমের নিত্য নব পাটান—কিন্তু একটা গল্প আমি কিছুতেই ভুলতে পারি নে। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে গল্পটি বলেছেন ওস্তাদ তুর্গেনিয়েফ। এবং শুধু তাই নয়—ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছিল।

দস্তয়েফস্কি তলস্তয়ের সৃজনশীল তুর্গেনিয়েফের চেয়ে অনেক উঁচুদের, কিন্তু তুর্গেনিয়েফ যে স্বচ্ছসালিল ভঙ্গীতে গল্প বলতে পারতেন, সেরকম কৃতিত্ব বিশ্ব-সাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন অতি অল্প ওস্তাদই। তুর্গেনিয়েফের শৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে এক রুশ সমঝদার বলেছেন, ‘তাঁর শৈলী যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে—ইট ফ্রোজ্ লাইক্ অয়েল।’

তুর্গেনিয়েফ ছিলেন খানদানী ঘরের ছেলে—তলস্তয়েরই মত। ওরকম সুন্দর, সুশোভন নাকি মস্কা, পিটার্সবুর্গে কম জন্মেছেন। কৈশোরে তাঁর একবার শক্ত অসুখ হয়। সেসে ওঠবার পর ডাক্তার তাঁকে হুকুম দেন নেভা নদীর পারে কোনো জায়গায় গিয়ে কিছুদিন নির্জনে থাকতে। নেভার পারে এক জেলেদের গ্রামে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের জমিদারি ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে জমিদারের একখানি ছোট্ট বাড়লো—চাকর-বাকর নিয়ে ছোকরা তুর্গেনিয়েফ বাড়লোয় গিয়ে উঠলেন।

* হালে খবর পেয়েছি তিনি রুশদেশে গিয়ে সেখান থেকে রামায়ণের প্রামাণিক পাঠ প্রকাশ করেছেন।

সেই ছবিটি আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। জমিদারের ছেলে, চেহারাটি চমৎকার আর অসুখ থেকে উঠে সে চেহারাটি দেখাচ্ছে করুণ, উদাস-উদাস, বেদনাতুর। তার উপর তুর্গেনিয়েফ ছিলেন মৃৎচোরা এবং লাজুক, আচরণে অতিশয় ভদ্র এবং নম্র। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, গ্রামে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছে—জেল-মেয়েরা দূর থেকে আড়নমনে দেখছে তুর্গেনিয়েফ মাথা নিচু করে, দুহাত পিছনে একজোড় করে নদীর পারে পাইচারি করছেন। জরাজীর্ণ গ্রামে হঠাৎ যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।

মেয়েরা জানে এরকম খানদানী ঘরের ছেলে তাদের কারো দিকে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু তা হলে কি হয়, তরুণ হৃদয় অসম্ভব বলে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে না। সে রববারে জেল-তরুণীরা গিজার্স গেল দূরদূর বৃক নিয়ে—বড়দিনের ফ্রক-স্লাউজ পরে।

তরুণীদের হৃদয় ভুল বলে নি। অসম্ভব সম্ভব হল। তুর্গেনিয়েফ মেয়েদের দিকে তাকালেন। তাঁর মনও চঞ্চল হল।

তুর্গেনিয়েফ পট্টাপাণ্ডি বলেন নি, কিন্তু আমার মনে হয় মশ্কা পিটার্সবুর্গের রঙ-মাথানো গয়না-চাপানো লোক-দেখানো সুন্দরীদের নখরা-ককেট্রি তাঁর মত বিতুষার ভরে দিয়েছিল বলে তিনি জেলে-গ্রামের অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্যের সামনে মৃগ হইয়াছিলেন। আমার মনে হয়, তুর্গেনিয়েফের কবি-হৃদয় অতি সহজেই হীরার ফুল অনাদর করে বুনো ফুল আপন বৃকে গুঁজে নিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামের সুন্দরীদের পলায়নম্বরী কাউকে তিনি বেছে নিলেন না। এই উল্টোমুঠে যাকে তিনি হৃদয় দিলেন সে স্বপ্নেও আশা করতে পারে নি, এই প্রিয়দর্শন তরুণটি সুন্দরীদের অবহেলা করে তাকেই নেবে বেছে। সত্য বটে মেয়েটি কুণ্ঠিত ছিল না, এবং তার স্বাস্থ্যও ছিল ভালো; কিন্তু তাই দিয়ে তো আর প্রেমের প্রহেলিকার সমাধান হয় না।

মেয়েটির মনে যে কী আনন্দ, কী গর্ব হইয়াছিল সেটা কল্পনা করতে আমার বড় ভালো লাগে। তুর্গেনিয়েফ তার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন—নিজের জীবনে ঘটেছিল বলে হয়ত তিনি এ ঘটনাটিকে বিনা অলঙ্কারে বর্ণনা করেছেন। আমার কিন্তু ভাবি ইচ্ছে হয়, মেয়েটির লজ্জা-মেশানো গর্ব যদি আরো ভালো করে জানতে পারতুম—তুর্গেনিয়েফ যদি আরো একটুখানি ভালো করে তাঁর হৃদয়ের খবরটি আমাদের দিতেন।

শুধু এইটুকু জানি, মেয়েটি দেমাক করে নি। ইভানকে পেয়ে সে যে-লোকে উঠে গিয়েছিল সেখানে তো দেমাক দম্ভের কথাই উঠতে পারে না। আর তুর্গেনিয়েফ হিংসা, ঈর্ষা থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অন্য মেয়েদের সঙ্গে অতি ভদ্র মিশ্রিত আচরণ দিয়ে—কোনো জমিদারের ছেলে নাকি গুরুমথারা মাথা থেকে হ্যাট তুলে নিচু হয়ে জেলেনীদের কখনো নমস্কার করেনি।

কৈশোরের সেই অনাবিল প্রেম কিরূপে আশ্বে আশ্বে তার বিকাশ পেয়েছিল, তুর্গেনিয়েফ তার সবিজ্ঞার বর্ণনা দেন নি—তাই নিয়ে আমার শোকের অন্ত নেই।

দুজনে দেখা হত। হাতে হাত রেখে তারা নদীর ওপারের ঘনায়মান অশ্বকরের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাঁদ উঠত। সম্ম্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করলে তুর্গে'নিয়ফ তাঁর ওভারকোট দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে দিতেন। সে হয়ত মৃদু আপত্তি করত—কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ইভানের কোনো ইচ্ছায় সে বেশীক্ষণ বাধা দিতে পারত না।

তুর্গে'নিয়ফ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। বাড়ি থেকে হুকুম এসেছে প্যারিস যেতে।

বিদায়ের শেষ সম্ম্যা এল। কাজ সেরে মেয়েটি যখন ছুটে এল ইভানের কাছে থেকে বিদায় নিতে, তখন সম্ম্যা ঘনিষ্মে এসেছে।

অঝোরে নীরবে কেঁদেছিল শূধু মেয়েটি। তুর্গে'নিয়ফ বারে বারে সম্ম্যনা দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এরকম ধারা কাঁদছো কেন? আমি তো আবার ফিরে আসব—শিগগিরই। তোমার কান্না দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভাবছ, আমি আর কখনও ফিরে আসব না।'

কিন্তু হায়, এসব কথায় কি ভাঙা বুক সাম্বনা মানে? জানি, তুর্গে'নিয়ফের তখনো বিশ্বাস ছিল তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু যে ভালোবেসেছে সমস্ত সন্তা সর্বৈব অস্তিত্ব দিয়ে তাঁর হৃদয় তো তখন ভবিষ্যৎ দেখতে পায়—বিধাতা পুরুষেরই মত।

তুর্গে'নিয়ফ বললেন, 'তোমার জন্য প্যারিস থেকে কি নিশ্চয় আসব?'

কোনো উত্তর নেই।

'বল কি নিশ্চয় আসব?'

'কিছু না—শূধু তুমি ফিরে এসো।'

'কিছু না? সে কি কথা? আর সবাই তো এটা, ওটা, সেটা চেয়েছে। এই দেখো, আমি নোটবুকে সব কিছু টুকে নিয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে দামী জিনিস আনতে চাই। বলো কি আনব?'

'কিছু না।'

তুর্গে'নিয়ফকে অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল, মেয়েটির কাছ থেকে কোন একটা কিছু একটার ফরমাইশ বের করতে। শেষটায় সে বললে, 'তবে আমার জন্য সুগন্ধি সাবান নিয়ে এসো।'

তুর্গে'নিয়ফ তো অবাক। 'এই সামান্য জিনিস! কিন্তু কেন বলো তো, তোমার আজ সাবানে শখ গেল? কই তুমি তো কখনো পাউডার সাবানের জন্য এতটুকু মায়া দেখাও নি—তুমি তো সাজগোজ করতে পছন্দ কর না।'

নিরুত্তর।

'বলো।'

'তা হলে আনবার দরকার নেই।' তারপর ইভানের কোলে মাথা রেখে কেঁদে বলল, 'ওগো, শূধু তুমি ফিরে এসো।'

'আমি নিশ্চয়ই সাবান নিয়ে আসব। কিন্তু বল, তুমি কেন সুগন্ধি সাবান চাইলে?'

কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি বলল, 'তুমি আমার হাতে চুমো খেতে ভালো-বাসো আমি জানি। আর আমার হাতে লেগে থাকে সব সময় মাছের অশিটে গন্ধ। কিছতেই ছাড়াতে পারি নে। প্যারিসের সুগন্ধি সাবানে শুনোঁছি সব গন্ধ কেটে যায়। তখন চুমো খেতে তোমার গন্ধ লাগবে না।'

অদৃষ্ট ভুর্গেনিয়েফও সে গ্রামে ফেরবার অনুমতি দেন নি।

সে দ্বন্দ্ব তুর্গেনিয়েফও বৃড়ো বয়স পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি ॥

বর্বর জর্মন

ন্যুরন্বের্গের মকন্দমা এগিয়ে চলেছে, চতুর্দিকে আটঘাট বেঁধে তরিবত করে তামাম দুর্নিয়ায় ঢাকঢোল বাজিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওঃ, কী বাঁচনটাই না বেঁচে গেছে! এয়সা দুশমনের জাত যদি লড়াই জিতত, তা হলে তোমাদের দমটি পর্যন্ত ফেলতে দিত না। ভাগ্যিস আমরা ছিলাম, বাঁচিয়ে দিলাম।

বিলেতী কাগজগুলো যে দাপাদাপি করে, তাতে আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছু নেই। তারা মার খেয়েছে, এখন শুধু মার দিয়েই খুশী হবে না, হরেক রকমে দুশমনকে অপমান করবে, তাতে ডবল সুখ; সে-সব কথা সবাইকে ইনিয়ে-বিনিয়ে শোনাবে, তাতে তেহাই সুখ; তারপর দেশটার কলকন্ডা অর্থাৎ তার জিগর-কলিজা, নাড়িভূঁড়ি বিনা ক্লোরফর্মে টেনে টেনে বের করে তাকে আচ্ছা করে বর্ঝিয়ে দেবে, বেলজেন কাকে বলে।

কিন্তু এ দেশের ইংরেজী কাগজগুলো যখন ফেউ লাগে, তখন আর বরদাস্ত হয় না। ছিল তো বাবা যুদ্ধের বাজারে বেশ, না হয় শকচ না খেয়ে সোলান খেয়েছিঁস, না হয় এসপেরেগাস আরটিচোক খেতে পাস নি, না হয় তুলতুলে ফ্ল্যানেল আর নানা রকমের হ্যাট ও ক্যাপ পাস নি বলে সর্দি ও গর্মির ভয়ে একটুখানি পা সামলে চলেছিঁল, তাই বলে যা বর্ঝিস নে, মালুম নেই, তা নিয়ে এত চেঞ্জাচেঞ্জি করিস কেন? টু পাইস তো করেছিঁস, সে কথাটা ভুলে যাস কেন, তাই নিয়ে দেশে যা, দুর্দিন ফুটি' কর, যে জায়গা নাগাল পাস নে, সেখানে চুলকোতে যাস নি। কিন্তু শোনে কে! সেই জিগর—জর্মন বর্বর, 'বর্শ', 'হান'।

পরশুর্দিন জর্মন বর্বরতার প্রমাণ পেলুম, পূরনো বইয়ের দোকানে— একখানা কেতাব, আজকালকার জলের চেয়েও সস্তা দরে কিনলাম। তার নামধাম—

BENGALISCHE ERZAEHLER / DER SIEG DER SEELE / AUS DEM INDISCHEN / INS DEUTSCH UEBERTAGEN / VON / REINHARDT WAGNER /

অর্থাৎ 'বাঙালী কথক'। (Erzähler খাতুর অর্থ কাহিনী বলা) 'আত্মার জয়, ভারতীয় ভাষা হইতে জর্মনে রাইনহার্ট ভাগনার কর্তৃক অনূদিত।'

চমৎকার লাল মলাটের উপর সোনালী লাইনে একটি অজস্তা ঢঙের সুন্দরী

বাঁশ বাজাচ্ছে। ছবিখানি এঁকেছেন, কেউ-কেটা নয়, স্বয়ং অধ্যাপক এড্‌মন্ড শেফার।

কেতাবখানা যতদূর বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে না—এস্তেহার রয়েছে! ‘ব্যাশারফ্‌য়েন্ড’ সংঘের সভ্যরা কিনতে পাবেন। বর্বর জর্ম’ন বটতলা ছাপিয়ে, পেঙ্গুইন বেচে পয়সা করতে চায় না, তার বিশ্বাস—দেশে যথেষ্ট সত্যিকারের রসিক পাঠক আছে, তারা সংঘের সদস্য হয়ে বাছা বাছা বই কিনবে। আর যদি তেমনটা নাই হয়, হল না, চুকে গেল—বাংলা কথা।

‘বাংলা কথা’ ইচ্ছে করেই বললাম, কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভাগনার সাহেব খাসা বাংলা জানেন। প্রথম আলাপে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহাশয় কোন ভাষার অধ্যাপক?

বাংলার।

বাংলার? বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে?

আজ্ঞে।

ছাত্র কটি?

গেল পাঁচ বছরের হিসেব নিলে গড়পড়তা ৩/৫।

গবে আমার বুক ফুলে উঠল। আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, সেখানে ফ্রিশ্‌কোলে নিদেনপক্ষে দেড়শটা বাদর ঝামেলা লাগাত। আদর্শ ছিল—৩০০ আপন ওয়ান প্রফেসরের। বললাম, ৩/৫ একটু কম নয়?

ভাগনার বিরক্ত হয়ে বললেন, রবিবাবুর লেখা পড়েন নি—The rose which is single need not envy the thorns which are many?

উঠে গিয়ে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা রেকর্ডখানি লাগালেন। ভাব হয়ে গেল। কিন্তু মনে মনে বললাম, কুলে ৩/৫-এর জন্যে একটা আস্ত প্রফেসর। জর্ম’নার বর্বর।

অবতরণিকাটি ভাগনার সাহেব নিজেই লিখেছেন; আগাগোড়া তর্জমা করে দিলুম।

‘সংকলনটি আরম্ভ স্বর্গীয় শ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গদ্য রচনাগুলোকে বাংলার tschota galpa (ছোট গল্প) বলা হয়। ছোট গল্পগুলোকে এক রকমের ছোটখাটো উপন্যাস বলা যেতে পারে; শূদ্ধ নায়কনায়িকার সংখ্যা কম। গল্পগুলোর কাঠামো পশ্চিম থেকে নেওয়া হয়েছে, ভিতরকার প্রাণবস্ত কিন্তু খাঁটি ভারতীয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় সমস্ত গল্পটার আবহাওয়া একটিমাত্র মূল সূরের চতুর্দিকে গড়া। কতকগুলো আবার গীতিরসে ভেজানো। আবার এও দেখা যায়, ভারতবাসীর ধর্ম তার আচার-ব্যবহারের সঙ্গে এমনই বাঁধা যে গল্পের বিকাশ ও সমস্যা সমাধান এমন সব কারণের উপর নির্ভর করে, যেগুলো পশ্চিমে নভেলে থাকে না। আশা-নিরাশার দোলা-খাওয়া কাতর হৃদয় এই সব গল্পে কখনও বা ধর্মের কঠিন কঠোর আচারের সঙ্গে আঘাত খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, কখনও বা তার ছোট গণ্ডির ভিতর শান্তি খুঁজে পায়; সেই ধুকধুক হৃদয়ের কঠোর দুঃখ, চরম

শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। আশ্চর্য্যাস হলেসলারের সঙ্গে আমরা সুর মিলিয়ে বলতে পারি, “মানুষের আত্মার ভাঁজে ভাঁজে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি।”

ভারতীয়দের প্রেম বড় উদার, তাতে গণিকারও স্থান আছে। গণিকাদের কেউ কেউ আবার জন্মেছে বেশ্যার ঘরে, বদ খেলালে বেশ্যা হয় নি। গোয়ালের গণিকাকে ভগবান অবহেলা করেন নি, এঁদেরও হয়তো অবহেলা করবেন না।

‘সংকলনটি সুখে-দুঃখেই গল্পেই ভর্তি করা হয়েছে; হাস্যরসের গল্প নিত্যন্ত কম দেওয়া হয়েছে। তার কারণও আছে, দুঃখ-যন্ত্রণা সব দেশের সব মানুষেরই এক রকম, কিন্তু হাস্যরস প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। করুণ রসে মানুষ মানুষকে কাছে টানে, হাস্যরস আলাদা করে। তবু তিনটি হাস্যরসের গল্প দেওয়া হল; হয়তো পশ্চিম দেশবাসীরা সেগুলোতে আনন্দ পাবেন।

‘বিশ্বসাহিত্যের সেবা যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সব চেয়ে ভাল রচনা বাদ দেওয়া অনায়াস। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া চলে না। তাঁর ‘লিপিকা’ থেকে তাই কয়েকটি সব চেয়ে ভাল লিখন দেওয়া হল; এগুলোকে ছোট ছোট গল্প বলা ভুল হবে।’ লেখাগুলো সহজেই দুঃভাগে আলাদা করা যায়, কতকগুলো মহাকাব্যের কাঠামোয় গড়া বলে গভীর সত্যের রূপ প্রকাশ করে তোলে, আর কতকগুলো ছবির মত কিসের যেন প্রতীক, কেমন যেন অস্বচ্ছ অর্ধ-অবগুণ্ঠিত অনাদি অনন্তের আশ্বাদ দেয়, অথবা যেন নিগূঢ় আত্মার অন্ত-নিহিত কোমল নিশ্বাস আমাদের সর্বত্র স্পর্শ দিয়ে যায়।

‘সর্বশেষে যারা তাঁদের লেখার অনুবাদ করবার অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে যারা এই সংকলনের গোড়াপত্তন ও সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছেন। সদুপদেশ দিয়েছেন ও অনুবাদে যাতে ভুলত্রুটি না থাকে তার জন্য আমি নিম্নলিখিত মহাশয়দের কাছে কৃতজ্ঞ,—হের দ. প. রায়চৌধুরী, ডি. ফিল. (গোয়াটুঙেন); ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যাধী অ. ভাদুড়ী; য. চ. হুই, এম. এস-সি; য. ভ. বসু, ডি. ফিল. (বার্লিন) এবং ইঞ্জিনিয়ারীও ডিপ্লোমাধারী স. চ. ভট্টাচার্য।’ সুরসিক, বহু ভাষায় সুপরিচিত ল. ভ. রামস্বামী আইয়ার^১ এম. এ. বি. এল. বেশির ভাগ মূল লেখাগুলি পাঠিয়েছেন ও সংকলন আরম্ভ করার জন্য উৎসাহিত করে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য গৃহিণীকে ধন্যবাদ।’

অবতরণিকাটি নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করা যায়, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য

১। রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’ থাকতে ভাগনার কেন যে সেগুলো জাজে লাগালেন না, তা বোঝা গেল না।

২। D. P. Roy Chowdhury; A Bhadhuri; J. C. Huii; J. Bose; S. C. Bhattacharya.

৩। ইনি শব্দতান্ত্রিকদের সুপরিচিত।

পাঠক যেন নিজেই ভাগনার সাহেবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। আমার শব্দে একটি বস্তু যা অবতরণিকার ভাষ্যটি সরল, যারা মূল জর্মনে কানট হেগেল এমন কি টমাস মান্‌ও পড়েছেন তাঁরাই জানেন জর্মনে কি রকম আড়াইগজী সব বাক্য হয়। ভাগনারের জর্মন অনেকটা বাংলা ছন্দের—কিছুটা প্রমথ চৌধুরীর মত। বাক্যগুলো ছোট ছোট; সাদামাটা খাস জর্মন কথার ব্যবহার বেশি কিন্তু দরকারমত শক্ত লাতিন কথা লাগাতে সায়েব পিছপা হন নি। জর্মন গুরুত্বালালীর সম্বন্ধে বাংলার মত ভয়ঙ্কর সচেতন নয়। ভাগনার আবার সাধারণ জর্মনের চেয়েও অবচেতন।

পাঠকের সব চেয়ে জানার কৌতুহল হবে যে, কার কার লেখা ভাগনার সাহেব নিয়েছেন। তার ফিরিষ্টি দিচ্ছি :—

- ১। আমার দেশ (কবিতা) : শ্রীশ্রীস্বজেন্দ্রলাল রায়^৪
(Schridvidschendralal Raj)
- ২। সম্যাস : শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (বিবদল)
- ৩। অঙ্কিত ; গোলাপ ; চোর ; কুসুম ; শিউলি : শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
(সিঁদুর চূর্ণাঙ্কিত, মধুপক)
- ৪। দেবতার ক্রোধ ; রত্নপ্রদীপ : শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (আশ্রয় ও জলছবি)
- ৫। পদ্মফুল ; জন্ম মৃত্যু শৃংখল (আংশিক অনূদিত) : শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু (মায়াপুরী)
- ৬। একাকী ; প্রেমের প্রথম কলি : শ্রীনিলিনীকান্ত ভট্টশালী (হাসি ও অশ্রু)
- ৭। বউ চোর, রসময়ীর রসিকতা : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ষোড়শী, গঙ্গোপাধ্যায়)
- ৮। গলি ; পরীর পরিচয় ; নতুন পুতুল ; ছবি ; সুয়েোরানীর সাধ ; সমাপ্তি ; সমাধান ; লক্ষ্যের দিকে ; সুয্যাস্ত ও সুয্যোদয় ; পায়ে চলার পথ ; কণ্ঠস্বর ; প্রথম শোক ; একটি দিবস : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Schrirabindranath Thakur (লিপিকা)

৯। আধারে আলো : শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মেজদিদি)

১০। পাষণ্ড হৃদয় : শ্রীমতী সুনীতি দেবী (বঙ্গবাণী)

এখনই বলে দেওয়া ভাল যে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৬ সালে। তার মানে এই নয় যে, এই কজনই তখন নামজাদা লেখক ছিলেন। বরঞ্চ মনে হয়, ভাগনার ১৯১২-২০এর সময় বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন ও সে যুগে এঁদেরই

৪। জীবিত মৃত সকলের নামের পূর্বেই ভাগনার “শ্রী” ব্যবহার করেছেন। বাংলা “শ” বন্ধিতে হলে জর্মনে sch (ইংরাজীতে Schedule এর sch), ‘জ’ বন্ধিতে হলে ‘dsch’, ‘চ’ বন্ধিতে হলে ‘tsch’, ‘র’ বন্ধিতে হলে ‘J’ ব্যবহার করা হয়েছে।

যে খুব প্রতিপত্তি ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যে কেন বাদ পড়লেন ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচনটা ঠিক ভাগনারের হাতে ছিল না। এ দেশ থেকে যে সব বই পাঠানো হয়েছিল, তা থেকে ভাল হোক, মন্দ হোক তাঁকে বাছতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাম ভাগনার চলতি জার্মান কায়দায় 'টেগোর' লেখেন নি।

নানা টীকা-টিপ্পনীর করা যেত, কিন্তু সেটা পাঠকের কাছে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। জার্মান-মন এই গল্পগুলোতেই কেন সাড়া দিল, তার কারণ অনুসন্ধান তাঁরাই করুন।

সাধারণ জার্মানের পক্ষে দুর্বোধ কতকগুলো শব্দ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে ; যেমন—অগ্নি (দেবতা), অলকা, অন্নপূর্ণা, আরতি, আষাঢ়, B A., বেলপাতা, ভৈরবী রাগিণী, ভক্ত'হরি, ফুলশয্যা, চোরা বাগান, দোয়েল, জয়দেব যোগাসন, হাতের নোয়া, একতারা, হোলি, হুলুধ্বনি, কুন্তিবাস, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মেদিনীপুর, শালিগ্রাম, সমুদ্রমন্থন, পন্নসা, পানি কোঁড়ি, রজনীগন্ধা, রাসলীলা, সাহানা, শূভদৃষ্টি, রথযাত্রা, ব্রাহ্ম সমাজ, ইংরেজী, উড়িয়া বামন।

সবগুলোর মানে, সব কটাই অতি সংক্ষেপে ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে। মাত্র একটি ভুল—মেঘদূতকে Epos বা মহাকাব্য বলা হয়েছে। উড়ে বামনরা যে গঙ্গাস্নানের সময় ডলাই-মলাই ও ফোটা-তিলক কেটে দেন সে কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে রান্নার নামে কি বিষ খেতে দেন, সেটা বলতে ভাগনার ভুলে গিয়েছেন। B. A. উপাধি ভাগনার জার্মানদের বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং M. A. যে লাতিন Magister Artium সেটা বলতে ভোলেন নি। আশা করতে পারি আমাদের প্রতি জার্মানদের ভক্তি বেড়েছে।

আম-কাঠাল, শিউলি-বকুল বহু গল্পে বার বার এসেছে, কিন্তু ফুল আর ফলের ছয়লাপে ভাগনার ধাবড়ে গিয়ে সেগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। তবে তিনি রজনীগন্ধার প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতদৃষ্টি।

অনুবাদ কি রকম হয়েছে? অতি উৎকৃষ্ট, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শূদ্র এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পদে পদে ছদ্রে ছদ্রে এই কথাটি বার বার বোঝা যায় যে, দূর বালিনে বসে কি গভীর ভালবাসা দিয়ে ভাগনার অনুবাদ-গুলো করেছেন এবং সেই ভালবাসাই তাঁকে বাংলার ছোট গল্পের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে গিয়েছে।

ভৈরবী কোন সময় গাওয়া হয়, ফুলশয্যাতে কে শোয়, মেদিনীপুর কোন দিকে, হাতের নোয়া আর হুলুধ্বনি কাদের একচেটে, কুন্তিবাস কাশীরাম দাস কে এই সব বিস্তার বায়নাক্স বরদাশ্ত করে জার্মান ১৯২৮ সালে এই বই পড়েছে আর সুদূর বাংলার ছাদিরস আম্বাদন করবার চেষ্টা করেছে।

বব'র নয় তো কি !!

ফরাসী—জার্মান

গল্প শুনিয়েছি, এক পাগলা মার্কিন নাকি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ‘হস্তী’ সম্বন্ধে যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখবে তাহাকে এক লক্ষ পৌণ্ড পারিতোষিক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়টি যে বহুৎ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই; তাহা না হইলে মার্কিন বিশেষ করিয়া ঐ বিষয়টিই নির্বাচন করিবেন কেন?

সে যাহাই হউক, খবর শুনিবামাত্র ইংরাজ তৎক্ষণাৎ কুকের আপসে ছুট দিল। হরেক রকম সাজসরঞ্জাম যোগাড় করিয়া পক্ষাধিকাল যাইতে না যাইতেই সে আসামের বনে উপস্থিত হইল ও বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই কেতাব লিখিল ‘আসামের পার্বত্যাঞ্জে হস্তী শিকার’।

ফরাসী খবর শুনিয়া ধীরে সূদৃশ চিড়িয়াখানার দিকে রওয়ানা হইল। হাতিঘর বা পিলখানার সম্মুখে একখানা চৌকি ভাড়া লইয়া আশ্বে আশ্বে শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে লাগিল। আড়নয়নে হাতিগুলির দিকে তাকায় আর শাটের কফে নোট টুকে। তিন মাস পর চটি বই লিখিল ‘লামুর পারমি লেজেলেফা’ অর্থাৎ ‘হস্তীদের প্রেমরহস্য’।

জার্মান খবর পাইয়া না ছুটিল কুকের আপসে, না গেল চিড়িয়াখানায়। লাইব্রেরিতে ঢুকিয়া বিস্তর পুস্তক একত্র করিয়া সাত বৎসর পর সাত ভলুমে একখানা বিরাট কেতাব প্রকাশ করিল; নাম ‘আইনে কুৎসে আইনক্যুরুঙ ইন ডাস স্টাডিয়ম ডেস এলোফাণ্টেন’, অর্থাৎ ‘হস্তীবিদ্যার সংক্ষিপ্ত অবতরণিকা’।

গল্পটি প্রাক্-সিভিলাইজড যুগের। তখনকার দিনে রুশরা কিণ্ডং দার্শনিক ভাবালু গোছের ছিল। রুশ খবর পাইয়া না গেল হিন্দুস্থান, না ছুটিল চিড়িয়াখানায়, না ঢুকিল লাইব্রেরিতে। এক বোতল ভদকা (প্রায় ‘ধানেশ্বরী’ জাতীয়) ও গ্রিশ বান্ডিল বিড়ি লইয়া ঘরে থিল দিল। এক সপ্তাহ পরে পুস্তক বাহির হইল, ‘ভিয়েদিল লিলি ভি এলোফাণ্ট’? ‘তুমি কি কখনও হস্তী দেখিয়াছ’? অর্থাৎ রুশ যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিয়া ছাড়িল যে হস্তী সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা শোনা যায় তাহা এতই অবিশ্বাস্য যে তাহা হইতে এমন বিরাট পশুর কম্পনা পর্যন্ত করা যায় না। অর্থাৎ হস্তীর অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অসম্ভবীকার করিতে হয়।

আমেরিকান এই সব পন্থার একটিও যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সে বাজারে গিয়া অনেকগুলি হাতি কিনিল ও বক্রার্থে নয়, সত্য সত্যই ‘হাতি পুঁজিল’। কুড়ি বৎসর পরে তাহার পুস্তক বাহির হইল ‘বিগার এ্যান্ড বেটার এলোফাণ্টস—হাট টু থ্রো দেম?’ অর্থাৎ ‘আরো ভালো ও আরও বহুৎ হাতি কি করিয়া গজানো যায়।’ শুনিয়েছি আরো নানা জাতি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হস্তীর স্বদেশবাসী এক ভারতবাসীও নাকি ছিলেন। কিন্তু ‘নেটিভ’ ‘কালো আদমী’ বলিয়া তাহার পুঁজিকা বরখাস্ত-বাতিল-মকুব-নামজুর-ডিসমিস-অসিদ্ধ করা হয়। অবশ্য কাগজে-কলমে বলা হইল যে, যেহেতুক ভারতবাসী

হস্তীকে বাল্যাবস্থা হইতে চিনে তাই তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহাকে পক্ষপাতদুষ্ট করিতে পারে !

গল্পটি শুনিয়া হস্তী সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে না সত্য, কিন্তু ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও মার্কিন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ঘোলাটে ধারণা তবুও হয়। সব জাতির বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে, করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ প্রাচ্য জাতিসমূহের কথা ছাড়িয়া দিলে (আর ছাড়িতেই হইবে, কালা-খলা একাসনে বসিতে পারে শুধু দাবার ছকেই) সত্যই বিদগ্ধ বলিতে বোঝায় জর্মনি ও ফরাসীকে। বাদবাকি সকলেই ইহাদের অনুকরণ করে। তবে জর্মনির নতমস্তকে স্বীকার করে যে, কনসানট্রেশন ক্যাম্পের' অনুপ্রেরণা তাহারা ইংরাজের নিকট হইতে পাইয়াছিল। নিতান্ত তাহারা কোনো জিনিস অধঃপক্ষ রাখিতে চাহে না বলিয়াই এই প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণ বৈদগ্ধ্যো পৌঁছাইয়াছিল।

জর্মনি যদি কোনো ভারতবাসীকে পায় তবে ইতি-উতি করিয়া যে কোনো প্রকারে তাহার সঙ্গে আলাপ জুড়িবার চেষ্টা করিবেই। আলাপ হওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া আপনাকে এক গেলাস বিয়ার দিবে তারপর আপনার কালো চুলের প্রশংসা করিবে ও আপনার বাদামী (তা আপনি যত ফর্স'ই হউন না কেন) অথবা কালো রঙের প্রশংসা গাইবে। তারপর আপনাকে প্রশ্নবাণের শরশয্যায় শোয়াইয়া ছাড়িবে, 'আপনারা দেশে কি খান, কি পয়েন, সাপের বিষে মানুষ কতক্ষণে মরে, সাধুরা শূন্যে উড়িতে পারেন কি না, কাণ্ট বড় না শংকর, তাজমহল নির্মাণ করিতে কত খরচ হইয়াছিল, অজস্তার কলা মারা গেল কেন, কামশাস্ত্রের প্রামাণিক সংস্করণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, সপ'পূজা এখনও ভারতবর্ষে চলে কি না, সাধারণ ভারতবাসীর গড়পড়তা কয়টি স্ট্রী থাকে, হিন্দু মুসলমান ঝগড়া কেন ?'

'কিন্তু হাঁ,' বার তিনেক মাথা নাড়াইয়া বলিবে, হ্যাঁ, গান্ধী একটা লোক বটে। ওরকম লোক যীশুখ্রীষ্টের পরে আর হয় নাই (ইংরাজকে কী ব্যতিব্যস্তই না করিল। গোলটেবিল বৈঠকের পর তাহার কথা ছিল বাইমার শহরে আসিবার। কিন্তু আসিলেন না; আমরা বড়ই হতাশ হইয়াছিলাম। সত্যি কি গান্ধী গোয়েটেকে এত ভক্তি করেন যে তামাম ইউরোপে ঐ একমাত্র বাইমারই তাহার মন কাড়িল ?'

ভারতবাসীর প্রতি সাধারণ জর্মনের ভক্তি অসীম ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের অন্ত নেই ॥

‘এ তো মেয়ে মেয়ে নয়—’

সংবাদপত্রের পাঁজ্রে যারা পোড় খেয়ে বামা হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত আত্ম-জনের মৃত্যুতেও বিচলিত হন না। হবার উপায়ও নেই। কারণ, যদি সে আত্মজন প্রখ্যাভনামা পুরুষ হন, তবে সাংবাদিককে অশ্রু সংবরণ করে সে মহা-পুরুষ সম্বন্ধে রচনা লিখতে বসতে হয়। এ অধম পাজাতে ঢুকেছে বটে, পোড়ও

থেয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঝামা হয়ে যায় নি বলে তার চোখের জল মুছতে অনেক-খানি সময় কেটে গিয়েছে।

বহু সাহিত্যিক, বহু কবি, বহু ঔপন্যাসিকের সঙ্গে দেশবিদেশে আমার আলাপ হয়েছে কিন্তু সরোজিনী নাইডুর মত কলহাস্যামুখারিত, রঙ্গরসে পরিপূর্ণ অথচ জীবনের তথা দেশের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য সম্বন্ধে সচেতন শ্বিতীয় পুরুষ বা রমণী আমি দেখি নি। কতবার দেখেছি দেশের গভীরতম দৈন্য-দুর্দশা নিয়ে গম্ভীরভাবে, তেজীয়ান ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি রঙ্গরসে চলে গিয়েছেন। লক্ষ্য করে তখন দেখেছি যে, রসিকতার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু তখনও চোখের জল ছলছল করছে। আমার মনে হয়েছে, দুঃখ-বেদনার বেদনার কথা বলতে বলতে পাছে তিনি সকলের সামনে হঠাৎ কেঁদে ফেলেন, সেই ভয়ে কথার বাঁক ফিরিয়ে হাসি তামাসায় নেমে পড়েছেন।

চটুল রসিকতাই হোক আর গুরুগম্ভীর রাজনীতি নিয়েই কথা হোক, সরোজিনী যে-ভাষা যে শৈলী ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন কোন সাহিত্যিক বা কবির নাম মনে পড়ছে না। রবীন্দ্রনাথ গল্প বলতে অশ্বিতীয় ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সরোজিনীর মত কখনও শতধা উচ্ছ্বাসিত হতেন না। সরোজিনী আপন-ভোলা হয়ে দেশকালপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে যে গল্পগজব করে যেতেন, তাতে মজলিস জমত ঢের বেশি। রবীন্দ্রনাথ যেমন কখনও কাডাক খুব কাছে আসতে দিতেন না, সরোজিনীর মজলিসে কারো পক্ষে দূরে বসা ছিল অসম্ভব।

এরকম প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন অল্প লোক। অথচ সরোজিনীর চেয়ে অল্প প্রতিভা নিয়ে অনেকেই সরোজিনীর চেয়ে সফলতর সৃষ্টিকার্য করতে সক্ষম হয়েছেন। সরোজিনী ভাব গম্ভীর ছিল, ভাষা মিষ্ট ছিল। তৎসঙ্গেও তাঁর কাব্য-সৃষ্টি তাঁর ক্ষমতার পিছনে পড়ে রইল কেন?

আমার মনে হয়, সরোজিনীকে যাঁরা বক্তৃতা দিতে শুনেন, তাঁর মজলিসে আসন পাবার সৌভাগ্য যাঁদের রয়েছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন বিদেশী মায়া-মূগের স্থানে বেরিয়ে সরোজিনী স্থায়ী যশের সতী সীতাকে হারালেন। এতে অবশ্য সরোজিনীর দোষ নেই। অল্প বয়সে তিনি যে ভাষা শিখেছিলেন, পরিণত বয়সে সেই ভাষাতেই তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু মাতৃভূমি না থেয়ে তিনি হরলিকস্ খেয়েছিলেন বলে তাঁর কবিতা কখনও মাতুরসের স্নিগ্ধতা পেল না। আমি জানি, পৃথিবীতে আজ ইংরেজ ছাড়া কোনো বিদেশী সরোজিনীর মত ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতে পারবেন না! এ বড় কম কথা নয়, কিন্তু এ কৃতিত্বও আমাদের সন্তান দিতে পারে না। কারণ নিশ্চয় জানি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী শব্দের বাতাবরণে যদি সরোজিনী বাল্যকাল না কাটাতেন, বাংলা মায়ের কোলে বসে যদি তিনি শৃঙ্গু বাংলাই শুনতেন, তা হলে কৈশোরে বিদেশী ভাষা তাঁর কবিত্ব-প্রতিভাকে ভস্মাচ্ছাদিত করতে পারত না, —মাইকেলের প্রতিভা যে রকম বিদেশী ভস্মকে অনায়াসে সরিয়ে ফেলতে পেরেছিল।

তাই সরোজিনী আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন। সরোজিনী প্রমাণ করে দিলেন, বিদেশী ভাষায় কখনও স্থায়ী সৃষ্টি-কর্ম সম্ভবপর হয় না। আর কোনো ভারতবাসী ভবিষ্যতে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে কবিতা লিখবে না। পূর্ব-পাকিস্তান উদ্‌গ্ৰহণ না করে বিচক্ষণের কার্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গ যেন হিন্দী-মূগের সম্মানে না বেরোয়।

পাঠক যেন না ভাবেন, আমি সরোজিনীর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হই নি। আমি শুধু বলতে চাই, সরোজিনীর কবিতার চেয়ে তাঁর ব্যক্তি বহুগুণে বৃহত্তর ছিল। তিনি আর পাঁচজন কবির মত অবসর সময়ে কবিতা লিখে বাদবাকি সময় সাধারণ লোকের মতন কাটাতেন না। তাঁর কথা, তাঁর হাসি, তাঁর গালগল্প, তাঁর রাগ, তাঁর অসহিষ্ণুতা, তাঁর ধৈর্যচ্যুতি, তাঁর আহার বিহার ভ্রমণ বিলাস সব কিছুই ছিল কবিজনোচিত। রাজনৈতিক সরোজিনী, জনপদকল্যাণী সরোজিনী, বাকনিপুণী সরোজিনী—এই তিন এবং অন্য বহুরূপে যখন তিনি দেখা দিতেন, তখন সেসব রূপই তাঁর কবিরূপের নীচে চাপা পড়ে যেত। কবিতা রচয়িত্রী সরোজিনীর চেয়েও কবি সরোজিনী বহু বহু গুণে মহত্তর।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলার এক কবি লিখেছিলেন বাংলার কুঁড়েঘরে রবির উদয় হল, এ বিস্ময় আমাদের কখনও যাবে না। ঠিক তেমনি ভারত এমন কি পুণ্য করেছিল যে তার বৃকে ফুটে উঠল সরোজিনী?

স্বয়ংবর চক্র

ট্রামে বাসে মেয়েদের জন্য আসন ত্যাগ করা ভদ্রতা অথবা অপ্রয়োজনীয়, এ সম্বন্ধে সর্বত্র আলোচনা শোনা যায় এবং আলোচনা অনেক সময় অত্যধিক উদ্ভাবন মনকষাকষি সৃষ্টি করে। একদল বলেন, মা-জননীরা দুর্বল, তাহাদিগকে স্থান ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য; অন্য দল বলেন, মা-জননীরা যখন নিতান্তই বাহির হইয়াছেন, তখন বাহিরের কণ্ঠটা যত শীঘ্র সহ্য করিতে শেখেন ততই মঙ্গল।

মেয়েরা যদি শব্দার্থেই ট্রামে-বাসে বাহির হইতেন, তাহা হইলে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁহারা যে শীঘ্রই ব্যাপকার্থে আর্থিক নানা প্রকার চাকরি ব্যবসায় ছড়াইয়া পড়িবেন সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ অন্যান্য দেশে যাহা পঁচিশ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল এদেশে তাহার পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে। সব কিছু ঘটিবে, এমন কথাও বলিতেছি না।

১৯১৪-এর পূর্বে জার্মান পরিবার কত দূততার সঙ্গে বলিতে পারিতেন, পুত্রকে শিক্ষাদানের গ্যারান্টি দিতে আমি প্রস্তুত, কন্যাকে বর দানের। দেশের অবস্থা সম্মত ছিল; যুবকেরা অনায়াসে অর্থোপার্জন করিতে পারিত বলিয়াই যৌবনেই কিশোরীকে বিবাহ করিয়া সংসারাপ্রবেশ প্রবেশ করিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রবেশলাভ করিবার পূর্বেই কিশোরীদের বিবাহ হইয়া যাইত ; তাহারা বড় জোর আবিটুর বা ম্যাট্রিক পৰ্যন্ত পড়িবার সুযোগ পাইত ।

১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধে দেশের প্রায় সকল যুবককেই রণাঙ্গনে প্রবেশ করিতে হইল । মেয়েদের উপর ভার পড়িল খেত-খামার করিবার, কারখানা দোকান আপিস চালাইবার, ইন্সকুলে পড়াইবার, ষ্ট্রাম ট্রেন, চালু রাখিবার । জৰ্মানীর মত প্রগতিশীল দেশেও মেয়েরা স্বেচ্ছায় হেঁসেল ছাড়ে নাই, নাচিতে-কুঁদিতে বাহির হয় নাই । সামরিক ও অর্থনৈতিক বন্যা তাহাদের গৃহবাহি নির্বাপিত করিয়াছিল, হোটেলের আগুন শতগুণ আভাষ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ।

যুদ্ধের পর যুবকেরা ফিরিয়া দেখে, মেয়েরা তাহাদের আসনে বসিয়া আছে । বেশীর ভাগ মেয়েরা আসন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল, যদি উপার্জনক্ষম বর পাইয়া ঘরসংসার পাতিবার ভরসা তাহাদিগকে কেউ দিতে পারিত । কিন্তু সে ভরসা কোথায় ? জৰ্মানীতে তখন পুরুষের অভাব । তদুপরি ইংরাজ ফরাসী স্থির করিয়াছে জৰ্মানীকে কাঁচা মাল দেওয়া বন্ধ করিয়া তাহার কারবার রুদ্ধবাস করিবে ; জৰ্মানীর পুঁজির অভাব ছিল তো বটেই ।

তখন এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হইল ! মেয়েরা চাকরি ছাড়ে না, বর পাইবার আশা দূরাশা বলিয়া চাকরি ছাড়িলে খাইবে কি, পিতা স্ততসর্বস্ব ভ্রাতা যুদ্ধে নিহত অথবা বেকার । বহু যুবক বেকার, কারণ মেয়েরা তাহাদের আসন গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপার্জনক্ষমতা বন্ধ করিয়া দিয়াছে । বিবাহ করিতে অক্ষম । আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে সমস্যাটি জটিল নয় । যুবকেরা পত্নীর উপার্জনে সন্তুষ্ট হইলেই তো পারে । কিন্তু সেখানে পুরুষের দম্ভ যুবকের আত্মসম্মানকে আঘাত করে । পত্নীর উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষ জীবন যাপন করাকে কাপুরুষতা মনে করে । মেনীমুখো, ঘরজামাই হইতে সহজে কেহ রাজী হয় না ; বিদেশে না, এদেশেও না । ইংলণ্ডে তো আরো বিপদ । বিবাহ করা মাত্র যুবতীকে পদত্যাগ করিতে হইত—স্বামী উপার্জনক্ষম হউন আর নাই হউন । (রেমার্কের ‘ডের বেকৎস্‌ন্যক্’—দ্রষ্টব্য) ।

যত দিন যাইতে লাগিল গৃহকর্তারা ততই দোঁখিতে পাইলেন যে, ‘মেয়েকে বর দিব,—ভালোই হউক আর মন্দই হউক—এ গ্যারান্টি আর জোর করিয়া দেওয়া যায় না । কাজেই প্রশ্ন উঠিল. পিতার মৃত্যুর পর কন্যা করিবে কি ? সে তো ম্যাট্রিক পাস করিয়া বাড়িতে বসিয়া অলস মস্তিষ্ককে শয়তানের কারখানা করিয়া বসিল । এদিকে ওদিকে তাকাইতেও আরম্ভ করিয়াছে । না হয় তাহাকে কলেজেই পাঠাও ; একটা কিছু লইয়া থাকিবে ও শেষ পর্যন্ত যদি সেখানে কোনো ছোকরাকে পাকড়াও নাও করিতে পারে তবে তো লেখাপড়া শিখিবে, তাহারি জোরে চাকরি জুটাইয়া লহবে ।

আমি জোর করিয়া বলিতে পারি ১৯২৪-৩২-তে যে সব মেয়েরা কলেজে যাইত তাহাদের অল্পসংখ্যকই উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী হইয়া, কারণ, বারে বারে দেখিয়াছি ইহারা উপার্জনক্ষম বর পাওয়া মাত্রই ‘উচ্চশিক্ষাকে’ ভালো করিয়া নমস্কার না করিয়াই অর্থাৎ কলেজ-আপিসে রক্ষিত সার্টিফিকেট মেডেল না

লইয়াই—ছুটিত গির্জার দিকে। আরেকটি বস্তু লক্ষ্য করিবার মত ছিল— তাহা সভয় নিবেদন করিতেছি। ইহাদের অধিকাংশই দেখিতে উর্বশী মেনকার ন্যায় ছিলেন না। সুন্দরীদের বিবাহ ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাইত— তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আসিবে কোন্‌ দূরখে? কলেজে যে কয়টি সুন্দরী দেখা যাইত, তাহাদের অধিকাংশ অধ্যাপক-কন্যা।

অচ্ছেদ্য চক্র ঘুরিতে লাগিল আরও দ্রুত বেগে। কলেজের পাস করা মেয়ে আশ্চর্য্য পাইয়াছে বেশী। যে চাকুরিবাজারে সাধারণ মেয়ে প্রবেশ করিতে ভয় পাইত তাহারা সেই সব চাকুরির বাজারও ছাইয়া ফেলিল—চক্রের গতি দ্রুততর হইল। পার্থের সম্বন্ধ নাই—তিনি তখনো অজ্ঞাতবাসে—স্বয়ংবর চক্র ছিন্ন করিবে কে?

কিন্তু ইতোমধ্যে সেই নিয়ত ঘূর্ণ্যমান স্বয়ংবর চক্রের একটি স্ফুলিঙ্গ নৈতিক জগতে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

মেয়েরা অর্থোপার্জন করিতেছে। পিতা মৃত। পরিবার পোষণ করিতে হয় না। বিবাহের আশা নাই। অর্থ সংজ্ঞ করিবে কাহার জন্য? নিরানন্দ, উত্তেজনাহীন শূন্য জীবন কেনই বা সে যাপন করিতে যাইবে? অভিভাবকহীন যুবতী ও প্রোঢ়ারা তখন বিলাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দোষ দিয়া কি হইবে? পিতা বা ভ্রাতা না থাকিলে অরক্ষণীয়ার কি অবস্থা হয় তাহা বেদেই বর্ণিত হইয়াছে—যতদূর মনে পড়িতেছে কোন এক বরুণ মণ্ডেই—ঋষি সেখানে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন।

উপার্জনক্ষম যুবতীরা বিলাসের প্রশ্রয় দেওয়া মাঠই চক্র দ্রুততর হইল। যে সব যুবকেরা অন্যথা বিবাহ করিত, তাহারা এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সদুযোগ গ্রহণ করিল। মনুষ্য হটে দৃশ্য যখন অপরিপূর্ণ তখন বহু যুবক গাভী ক্রয় করা অবিস্ম্যকারিতার লক্ষণ বলিয়া স্থির করিল। বিবাহ-সংখ্যা আরো কমিয়া গেল—গির্জার বিবাহ-পুরোহিতদের দীর্ঘতর অবকাশ মিলিল। নাইট ক্লাবের সৃষ্টি তখনই ব্যাপকভাবে হইল, 'গণিক' জাতির জন্ম হইল—ইহাদেরই নাম ইউরোপীয় সর্বভাষায় জিগোলো। যে পুরুষ শ্রীর উপার্জনে জীবন ধারণ করিতে ঘৃণা বোধ করিত, সেই গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে এই ব্যবসারে লিপ্ত হইল (মাউরার জর্ম'নী পুটস দ ক্লক ব্যাক' দ্রষ্টব্য)।

তখন পুরুষ বলিল, 'শ্রীপুরুষে যখন আর কোনো পার্থক্যই রহিল না, তখন পুরুষ ট্রামে-বাসে শ্রীলোকদিগের জন্য আসন ত্যাগ করিবে কেন?' উঠিয়া দাঁড়াইলেও তখন বহু মেয়ে পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইত না। সব কিছুর তখন ৫০।৫০। আমার দৃঢ় অস্থি বিশ্বাস কলিকাতা কখনও ১৯৩২-এর বালি'নের আচরণ গ্রহণ করিবে না। বাঙালী দর্ভিক্ষের সময় না খাইতে পাইয়া মরিয়াছে; কঁকর বিড়াল খায় নাই। তবুও সমাজপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম—অর্থনৈতিক কারণে মানুষ্য কি করিয়া নৈতিক জগতে ধাপের পর ধাপ নামিতে বাধ্য হয়।

অনুসন্ধানসু প্রশ্ন করিবেন, জর্ম'নীর স্বয়ংবর চক্র কি কেহই ছিন্ন করিতে

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (১ম)—১২

সক্ষম হন নাই ? হইয়াছিলেন। সে বীর হিটলার। পার্থের ন্যায় তাঁহারও নানা দোষ ছিল, কিন্তু অজ্ঞাতবাসের পর তিনিই চক্রভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে ড্রেসডেন শহরে এক নির্দিষ্ট দিনে চারিশত যুবক-যুবতীকে সগর্বে গোভাষায়া করিয়া দল বাঁধিয়া বিবাহ করিতে যাইতে দেখিলাম। অন্য শহর-গাউলিও পশ্চাৎপদ রহিল না ; সর্বত্র সপ্তপদী সচল হইয়া উঠিল। ১৯৩৮ সালে গিয়া দেখি কলেজগাউলি বৌদ্ধ মঠের ন্যায় নারীবীজিত। হিটলার কি কৌশলে চক্রভেদ করিয়াছিলেন সে কথা আরেক দিন হইবে !!

ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন

দেশে বিদেশে বহুবার দেখিয়াছি যে, ইংরাজ ও ফরাসীর প্রশ্নে ভারতীয় সদুত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাহার প্রধান কারণ (১) ভারতীয়রা স্বীয় ঐতিহ্য ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সুপরিচিত নহেন—ইহার জন্য প্রধান আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী। (২) বিদেশী রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা—সে জ্ঞান থাকিলে ভারতীয় তৎক্ষণাৎ বিদেশীকে চক্ষে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখাইয়া দিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে তাহা অন্যরূপে বা অল্প কিস্মিন্দন পূর্বে বিদেশীরাও করিত। নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে ও আশা করি কোনো কোনো ভারতীয়ের উপকারও হইবে।

বিদেশী : তোমাকে সেদিন ফির্পোতে দাওয়াত করিয়াছিলাম। তুমি টালবাহানা দিয়ে পলাইলে। শুনলাম, শেষটায় নাকি আমজদীয়া হোটেল খাইতে গিয়াছিলে। ফির্পোর খানা রাঁধে গ্রিভুন-বিখ্যাত ফরাসী শেফ্ দ্য কুইজিন। সেই শেফ্কে উপেক্ষা করিয়া তুমি কোন্ জঙ্গলীর রান্না খাইতে গেলে !

ভারতীয় : তোমাদের রান্নার অন্য গুণাগুণ বিচারের পূর্বে একটি অত্যন্ত সাধারণ বস্তুর দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লক্ষ্য করিয়াছ কি না জানি না যে, তোমাদের রান্নায় তিক্ত টক ও ঝাল এই তিন রসের অভাব। অর্থাৎ ছয় রসের অর্ধেক নাই—ঝাল কিছু কিছু দাও বটে কিন্তু তাও বোতলে পুরিয়া টেবিলে রাখ, কারণ ঐ রসটির প্রতি তোমাদের সন্দেহ ও ভয় এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। কাজেই তোমাদের খানা না খাইয়াই বলা যায় যে, আর যে গুণই থাকুক, বৈচিত্র্য তোমাদের রান্নায় থাকিবে না। শুধু লবণ আর মিষ্ট এই সা, রে লইয়া তোমরা আর কি সুর ভাঁজবে ? দুই-তারা লইয়া বীণার সঙ্গে টক্কর দিতে চাও ? আমজদীয়ার ‘জঙ্গলী’ও তাই তোমার শেফ্কে অনায়াসে হারাইয়া দিবে। শ্বিতীয়ত, তোমাদের ডাইনিং টেবিলে ও রান্নাঘরে কোনো তফাত নাই। তোমরা ক্রুয়েট নামক ভাঙা-বোতল-শিশিওয়ালার একটা বর্ডি টেবিলের উপর রাখ। নিতান্ত রসকষনীয় সিম্ব অথবা অগ্নিপক্ক বস্তু যদি কেহ গলাধঃকরণ না করিতে পারে তবে তাহাকে ডাইনিং টেবিলে পাকা রাধুনী সাজিতে হয়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ সংযোগ করিতে গিয়া অলিভ ওয়েল ঢাল, উগ্রতা উৎপাদনের জন্য রাই সরিষার (মাস্টার্ড) প্রলেপ দাও, কটু করিবার জন্য গোলমরিচের গুঁড়া ছিটো,—বোতলটার আবার ছিদ্র রুদ্ধ বলিয়া তাহাকে লইয়া ধম্মাধম্ম করিতে

শুদ্ধদেশস্থ অস্থিচ্যুতি ও ধৈর্যচ্যুতি যদুগপৎ অতি অবশ্য ঘটে,—ভীতু পাচক বড় সাহেবের ভয়ে লবণও দিয়াছে কম,—লক্ষ্য করিয়াছ কি শতকরা আশীর্জন সুদৃশ্য মৃদুখে দিবার পূর্বেই নূন ছিটাইয়া লয়?—অতএব লবণ ঢালো। তৎসঙ্গেও যখন দেখিলে যে ভোজদ্রব্য পূর্ববৎ বিস্বাদই রহিয়া গিয়াছে তখন তাহাতে সস্ নামক কিশুভূতকিমাকার তরল দ্রব্য সিঞ্জন করো। তোমার গাত্রে যদি পাচক রক্ত থাকে অবশ্য তুমি তাবৎ প্রলেপসিঞ্জন অনুপান-সম্মত বা মেকদার-মায়িক করিতে পারো, কিন্তু আমি বাপু, ‘ভদ্রলোকের’ ছেলে, বাড়িতে মা-মাসীরা ঐ কর্মটি রান্নাঘরে রন্ধন করিবার সময় করিয়া থাকেন। খানার ঘর আর রান্নাঘরে কি তফাৎ নেই?

সায়ের : রুচিভেদ আছে বলিয়াই তো এত ব্যয়নাক্ষা।

ভারতীয় : ঐ সব জ্যেষ্ঠতাত্ত্ব আমার সঙ্গে করিও না। তাই যদি হইবে তবে খানাঘরেই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া মাংস সিদ্ধ করো না কেন, গ্রিল কবাব ঝলসাও না কেন? কেহ অর্ধপক্ক মাংস পছন্দ করে, কেহ পূর্ণপক্ক। সেখানেও তো রুচিভেদ; তবে পাচকের হাতে ঐ কর্মটি ছাড়িয়া দাও কেন? আসল কথা, এই রুচিভেদ স্বীকার করিয়াও পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্যপস্থা বাহির করিয়া লহে ও গুণগীরা সেইটি স্বীকার করিয়া অমৃতলোকে পৌঁছেন। রুচিভেদ থাকা সত্ত্বেও গুণগীরা সেক্সপীয়র কালিদাস পছন্দ করেন। কাঁব কখনো যমক, অনুপ্রাস, উপমা আখ্যানবস্তুর পৃথক পৃথক নিষ্পত্তি পৃথক পৃথক পুস্তকে দিয়া বলেন না রুচিমাফিক মেকদার-অনুপানযোগে কাব্যসুষ্ঠি করিয়া রসাস্বাদন করো।

সায়ের : সে কথা থাকুক। কিন্তু আমজদীয়ার খানা খাইলে তো হাত দিয়া; সেখানে তো ছুরি-কাঁটার বন্দোবস্ত নাই।

ভারতীয় : না, আছে। ভারতবর্ষ তোমাদের পাল্লায় পড়িয়া দিন দিন এমনি অসভ্য হইয়া পড়িতেছে যে, ভারতীয়রাও ছুরি-কাঁটা ধরিতে শিখিবার চেষ্টা করিতেছে। এ নোংরামি করিবার কি প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সায়ের : নোংরামি? সে কি কথা?

ভারতীয় : নিশ্চয়ই। ঐ তো রহিয়াছে তোমার ছুরি, কাঁটা, চামচ; ঐ তো ন্যাপকিন। ঘষো আর দেখো, কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যেটুকু বাহির হইবে না, তাহা খাদ্যরস সংযোগে অগোচরে পেটে যাইবে। আর আমি আমার আঙুল ঘষি, দেখো কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যদি আমার আঙুল ময়লা হয়ই, তবে আমি এখনই টয়লেট ঘরে গিয়ে আচ্ছা করিয়া হাত ধুইয়া লইব। তুমি যদি ছুরি-কাঁটা লইয়া ঐ দিকে ধাওয়া করো তবে ম্যানেজার পলিস ডাকিবে, ভাবিবে চৌর্যবৃত্তিতে তোমার হাতেখড়ি হইয়াছে মাত্র। আর শেষ কথাটিও শুনিয়া লও, আমারি আঙুল আমি আমারি মৃদুখে দিতেছি; তুমি যে কাঁটা-চামচ মৃদুখে দিতেছ সেগদূলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়াগ্রস্তের অধরোরোষ্ঠে এবং আসাগহরুরেও নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে তাহার সন্দেশ

চাখো কি ? চীনারা তোমাদের তুলনায় পরিষ্কার । খাইবার কাঠি সঙ্গে লইয়া হোটেল প্রবেশ করে ।

সায়ের : সে কথা থাকুক (ধূয়া) ।

ভারতীয় : হ্যাঁ আলোচনাটি আমার পক্ষেও মর্ম্ভাতী । আমারি এক বাঙালী ষ্টীশান বন্ধু কাটা দিয়া ইলিশ মাছ খাইতে যান—বেজায় সায়ের কিনা—ফলে ইলিশাস্থি তাঁহার গলাস্থ হয় এমনি বেকায়দা বেদুরভ্রমাবে যে, তাঁহার শরীরের অস্থিগুলি এখন গোরস্তানে চিরতরে বস্তু গাড়িয়াছে (অশ্রু বর্ষণ) ।

সায়ের : আহা ! তবে ইলিশ না খাইলেই হয় ।

ভারতীয় : ইংরাজ হইয়া বেকন-আণ্ডা না খাইলেই হয় ; ফরাসী হইয়া শ্যাম্পেন না খাইলেই হয় ; জার্মান হইয়া সসিজ না খাইলেই হয় ; বাঙালী হইয়া ইলিশ না খাইলেই হয়, অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেও হয় ; আত্মহত্যা করিলেও হয় । লজ্জা করে না বলিতে ? বাংলার বৃকের উপর বসিয়া হোম্ হইতে টিনস্থ বেকন না পাইলে ‘বিটিশ ট্রেডিশন ইন্ ডেঞ্জার’ বলিয়া কমিশন বসাইতে চাহো, আর আমি গঙ্গার পারে বসিয়া গঙ্গার ইলিশ খাইব না ? তাৎপৰ্য্য কথা ।

সায়ের : সে কথা থাকুক (ধূয়া) । কিন্তু ঐ বলিলে তোমাদের মেয়েরা রান্না করেন, তাঁহারা কি শৃঙ্খলাই রান্না করেন ? তাঁহারা এই নিমর্ম পদপ্রথা মানেন কেন ?

ভারতীয় : সে তাঁহারা মানেন ; তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও ।

সায়ের : তাঁহাদিগের সঙ্গে তো দেখাই হয় না ।

ভারতীয় : সে আমাদের পরম সৌভাগ্য ।

সায়ের : (চিন্তিত মনে) কথাটা কি একটু কড়া হইল না ? আমরা কি এতই খারাপ ?

ভারতীয় : খারাপ ভালোর কথা জানি না সাহেব । তবে ১৭৫৭ সালে তোমাদের সাথে পীরতিসায়েরে সিনান করিতে গিয়া শৃঙ্খল যে আমাদের সকলি গরল ভেল তাহা নয়, স্বরাজ্যগামছাখানা হারাইয়া ফেলিয়া দুইশত শীত বৎসর ধরিয়া আকণ্ঠ দৈন্য-দুর্দশা-পণ্ডে নিমগ্ন—ডাঙায় উঠিবার উপায় নাই । পুরুষদের তো এই অবস্থা তাই মেয়েরা অন্তরমহলে তোমাদিগকে quit করিয়া বসিয়া আছেন ।

সায়ের : এ সব তো বাইরের কথা ; তোমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য—

ভারতীয় : আরেকদিন হইবে । উপস্থিত আমাকে Quit India-গাহিতে রাস্তায় যাইতে হইবে ।

[ডিসেম্বর ১৯৪৫]

শিক্ষা-সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করা হইবে এই রকম একটি খবর শুনিতে পাইলাম ।

পশ্চিমেরা একদা হইয়া এই বিষয়ে নানা তর্ক নানা আলোচনা করিবেন ; সেই সব পশ্চিমের নামাবলীতে দেশবিদেশের নানা ডিগ্রী নানা উপাধির লাজ্জন অধিকত থাকিবে ; নানা ভাষায় নানা কণ্ঠে তাঁহারা জ্ঞানগর্ভ মতামত প্রকাশ করবেন । সেখানে আমাদের ক্ষীণ নেটিভ কণ্ঠ পৌঁছিবে এমন দুরাশা আমরা করি না । আমাদের প্রধান দোষ অবশ্য যে আমরা 'ওড ফুলজ' 'ধর্মপ্রাণ' ; আমাদের যুক্তিতর্ক ধর্মশাস্ত্র হইতে সঞ্চারিত, সেগুনলি এযুগে বরবাদ রহিল জগলা । কিন্তু আমরা নাচার । পরমহংসদেব বলিয়াছেন, যে মূলা খাইয়াছে তাহার ঢেকুরে মূলার গন্ধ থাকিবেই, আমরা 'মূলা' না খাইয়া থাকিলেও জানি যে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চার করিতে হইলে 'মূলের' অনুসন্ধান নিতান্ত প্রয়োজনীয় । শুনিতে পাই সায়েবরাও নাকি তাই করেন—নদীর মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া নাকি তাঁহারা বিস্তর পাহাড় পর্বত অতিক্রম করেন ।

দেশে যখন ধনদৌলত পর্যাপ্ত ছিল তখন বহু লোক তীর্থ করতে যাইতেন এবং বহু পশ্চিমের এই ধারণা যে তাবৎ উত্তর ভারতে রেলগাড়ি প্রচলিত হইবার পূর্বেও যে ভাঙা-ভাঙা হিন্দি দিয়া কাজ চালানো যাইত তাহার কারণ যাত্রীদের তীর্থ পরিক্রমা । দেবীর ব্রহ্মরশ্মি পীঠ বেলুচিস্থানের হিন্দুলা হইতে বামজম্বা পীঠ শ্রীহট্ট পর্যন্ত বহু বহু যাত্রী বহু যুগ ধরিয়া গমনাগমন করিয়াছেন, বহু ভাষার বহু শব্দের আদান-প্রদান সংমিশ্রণের ফলে পশ্চিমজ্ঞান নিন্দিত একটি 'চলতি' ভাষা যুগ যুগ ধরিয়া রূপ পরিবর্তন করিয়া অধুনা হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত । সে যাহাই হোক, এই অবদানের স্মরণে তীর্থযাত্রীদের প্রশংসা করিবার সদুদ্দেশ্য লইয়া বক্ষ্যমাণ আলোচনা নিবেদন করিতেছি না ।

তীর্থে পুণ্যসঞ্চার হইত কিনা সে তর্ক অধুনা নিষ্ফল, কিন্তু এ বিষয়ে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, জ্ঞান সঞ্চার হইত, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইত, সংকীর্ণতা হ্রাস পাইত এবং নানা বর্ণ, নানা জাতি, নানা আচার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়াও যাত্রী হৃদয়ঙ্গম করিত ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ । আবার বলি, নানা পার্থক্য নানা বৈষম্যের গন্ধধূপধূয়ের পশ্চাতে ভারতমাতার সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি প্রস্ফুটিত হইত । গ্রামের বৈচিত্র্যহীন সমাজে ফিরিয়া আসিয়াও তাহার হৃদয়ে অধিকতর থাকিত সেই সুস্পষ্ট আলোচ্য ।

শিক্ষার এক মূল অঙ্গ ছিল তীর্থভ্রমণ, দেশভ্রমণ বলিলে একই কথা বলা হয় ।

প্রশ্ন এই, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো অজস্র ডিগ্রি প্রাপ্ত বৎসর অকৃপণভাবে বর্ষণ করেন, কিন্তু কখনো তো বিদ্যার্থীকে বার্ষিক পরিক্রমার সময় জিজ্ঞাসা করেন না, 'তুমি দেশভ্রমণ করিয়াছ, ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ হৃদয়ে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছ ?'

বোধ হয় করা হয় না, তাই যখন সাধারণ বাঙালী গ্রাজুয়েট লিলুয়ার টিকিট কাটে তখন বলিয়া বেড়ায়, ‘ভাই, কি আর করি, হাওয়া বদলাইতেই হয়, পশ্চিম চলিলাম।’

অসহিষ্ণু পাঠক বলিবেন, ‘কী বিপদ ! বিশ্ববিদ্যালয় কি বৃকিং আপিস যে তুমি বাতাসনস্থ হইলেই তোমাকে সম্ভায় বিদেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন ?’

নাই বা দিলেন, কিন্তু এমন বন্দোবস্ত কি সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, বাঙালী ছেলে ছয় মাস এলাহাবাদে পড়িল, আরো ছয় মাস লাহোরে এবং সর্বশেষ তিন বৎসর কলিকাতায় ? নিম্নদিকে বলে যে, কলেজের ছেলেরা নাকি প্রায় দুই বৎসর গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ায়, শেষের চারি মাস, তিন মাস, অবস্থাভেদে দুই মাস নোট মুখস্থ করিয়া পাস দেয়। তবেই জিজ্ঞাসা, চারি বৎসরের এক বৎসর অথবা এম. এ. পাসের জন্য ছয় অথবা সাত বৎসরের দুই অথবা তিন বৎসর যদি কোনো ছেলে প্রদেশে প্রদেশে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়ার্থে (সে শতকরা এক শত নাই হউক) তীর্থভ্রমণ অর্থাৎ এই কলেজ সেই কলেজ করে, তবে কি পাপ হয় ?

এমন কি একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও নাই যেখানে তাবৎ ভারতের ছেলে অধ্যয়ন করিতে সমবেত হয়, একে অন্যকে চিনিতে পারে ? (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আলীগড়ে ঈষৎ হয়, কিন্তু নানা কারণে এখানে তাহার আলোচনা আজ আর করিব না) অথচ সংস্কৃত পড়িবার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব-প্রদেশের ছাত্র কাশীর চতুষ্পাঠীতে সমবেত হয়, মুসলমান ছাত্র দেওবন্দ যায়। (বিশ্বভারতীর কথা তুলিলাম না, কারণ সরকারী ছাপ লইতে হইলে সেখানকার ছাত্রকে এখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খিড়কি দরজা দিয়া ঢুকিতে হয়)।

অবিশ্বাসী পাঠক বলিবেন, “কথাটা মন্দ শুনাইতেছে না, তবে ঠিক সাহস পাইতেছি না। অন্য কোনো দেশে কি এ ব্যবস্থা আছে?” ‘হোমের অর্থাৎ সদাশয় সরকারের দেশের কথা বলিতে পারি না এবং তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, কারণ শূনিয়াছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি স্থিতি নাকি ইটন হ্যারোর ক্রীড়া-ভূমিতে। তাই যদি হয়, তবে দেব পতঞ্জলির ভাষায় বলি, “হেয়ং দূঃখ-মনাগতম্”। স্বরাজ পাইয়া বিদেশে অপ্রতিহতভাবে দৌড়প্ৰত্যাপে রাজত্ব করিবার কুমতি ভারতের যেন কদাচ না হয় ; তাহাতে পরিণামে যে দূঃখ পাইতে হইবে তাহা পূর্বে হইতেই বর্জনীয়।

কিন্তু ফ্রান্স আছে, জর্মণীতে আছে, সুইটজারল্যান্ডে আছে, অস্ট্রিয়ায় আছে, তাবৎ বলকানে আছে, অথবা ১৯৩৯ পর্যন্ত ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলকান রাজ্য হইতে প্রাতি বৎসর শত শত ছাত্র বার্লিন, ভিয়েনা, প্যারিস, জিনিভা যাইত, বৎসর দুই বৎসর নানা কলেজ নানা দেশ ঘুরিয়া পুনরায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গিয়া বাড়ির বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস দিত, বিদেশের ‘টাম’ স্বদেশে গোনাইত, আর দেশের অভ্যন্তরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তো কথাই নাই। এমন জর্মণ ছেলে কস্মিনকালেও খুঁজিয়া পাইবেন না যে ঝাড়া পাঁচ বৎসর

একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জন করিয়া পদবী লইয়াছে। হস্ত উত্তরাগণ কাটাইয়াছে রাইনল্যান্ড, কলোনে অথবা হাইডেলবের্গে—দক্ষিণায়ন কীল অথবা হমবুর্গে, তার পরের বৎসর ম্যুনিকে ও সর্বশেষ দুই বৎসর স্বপুর্ন ক্যোনিগসবের্গে। শৃঙ্খ তাহাই নহে। দেশের এক প্রান্তের ছাত্র যাহাতে অন্য প্রান্তে যায় তাহার জন্য রেল কোম্পানি তাহাকে সিকি ভাড়ায় লইয়া যাইতে বাধ্য। ছুটির সময় যখন বাড়ি যাইবে, ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্যও সিকি ভাড়া।

কিন্তু আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। কারণ, স্মরণ, আছে, শাস্তি-নিকেতনের নূন-কলেজেট হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাস করা একটি গুজরাতী ছেলের বাসনা হয় এম. এ. বোম্বাই হইতে দিবে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন নামঞ্জুর করিলেন, কারণ সে কলিকাতার নূন-কলেজেট। কর্তাদের বুঝাইবার বিস্তর প্রয়াস করিলাম যে কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের নূন-কলেজেট বহু কলেজেটের অপেক্ষা শ্রেয়, অন্তত বিশ্বভারতী কলেজ অনেক মার্কামারা সফরীপ্রোষ্ঠী কলেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী ধারণ করে, কিন্তু অরণ্যে রোদন।

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কি অপূর্ব বিশ্বপ্রেম, সহযোগিতা !

কোন গুণ নেই তার—

বেহারীভাইয়ারা (সদর্থ) বাংলা ভাষা এবং বাঙালীর উপর খজাহস্ত হয়েছেন শূনে বহু বাঙালী বিচলিত হয়েছেন। বাঙালীর প্রতি অন্যান্য প্রদেশের মনোভাব যদি বাঙালীরা সবিস্তর জানতে পান তবে আরো বিচলিত হবেন—কিন্তু সৌভাগ্য বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন, বাংলা দেশের লোক মারাঠী-গুজরাতী ভাষা নিয়ে অত্যধিক ঘাটাঘাটি করে না বলেই ও সব ভাষায় আমাদের সম্বন্ধে কি বলা হয় না হয় সে সম্বন্ধে কোনো খবর পায় না। তাবৎ মারাঠী-হিন্দী-গুজরাতী আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু উত্তর-ভারতবর্ষের সর্বত্রই যে ঈষৎ বাঙালী-বিশেষ বতর্মান আছে সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই।

কিন্তু বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে বাংলা ভাষা তথা বাঙালী বৈদ্য সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশ কেন যে ঈর্ষাপরায়ণ সে তত্ত্বের অনুসন্ধান করিলে আমরা তাদের অনেকখানি ক্ষমা করতে পারব। ক্ষমা মহতের লক্ষণ তো বটেই, তদুপরি আমরা যখন সর্বপ্রদেশের মধ্যে প্রীতি এবং সৌহার্দ্য কামনা করি, তখন এ বিষয়ে আমাদেরই সকলের চেয়ে বেশী সচেতন হওয়া উচিত। আপন প্রদেশ সম্বন্ধে আমারই যেমন সর্বপ্রথম গর্ব অনুভব করে ‘সপ্তকোটি কণ্ঠ’ উল্লাসধ্বনি করে উঠেছিলুম, ঠিক তেমনি আমারই সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা বর্জন করে পাক্কাব-সিদ্ধ-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গের ভিতর দিয়ে ভারতভাগ্যবিধাতার রূপ দেখতে চেয়েছিলুম। আজ না হয় বাংলাদেশ সর্বজনমান্য নেতার অভাবে

অনাদৃত, আজ না হয় কেন্দ্রে আমরা চক্ৰবর্তী নেই, তাই বলে বাংলা দেশ আরো বহুকাল যে এরকম ধারা সর্বযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে অনাদৃত থাকবে ও কথা বিশ্বাস করার চেয়ে আশ্চর্য্যত্যা বহুগুণে শ্লাঘনীয়। তাই প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা দূর করার কর্তব্য আমাদেরই ক্ষম্ভে।

অবাঙালীরা যে বাঙালীর দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকান তার প্রধান কারণ এই নয় যে বাঙালী যেখানে যায় সেখানকার হনুমানজী, রণছোড়জী, (আসলে ঋণ ছোড়জী অর্থাৎ যিনি মানুষকে সর্বপ্রকার ঋণমুক্ত করিতে সাহায্য করেন) বা অশ্বামাতার সেবা না করে কালীবাড়ি স্থাপনা করে কিংবা বিদ্যার্জন করবার জন্য গণপতিকে পূজা না করে সরস্বতীকে আহ্বান করে—কারণ সকলেই জানেন এ বাবদে তাবৎ ভারতবাসী একই গণ্ডালিকার তাবতে পড়েন। খুলে বলি।

বেদের ইন্দ্র, বরুণ, যম, প্রজাপতিকে দৈনন্দিন ধর্মজীবন থেকে বাদ দিয়ে শুধু বাঙালীই যে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে তা নয়, ভারতবর্ষের কোনখানেই এদের জন্য আজ আর কোনো মন্দির নির্মিত হয় না। শিব আর বিষ্ণু কি করে যে এঁদের জায়গা দখল করে নিলেন সে আলোচনা উপস্থিত নিম্নপ্রয়োজন—অথচ বেদে এদের অনুসন্ধান করতে হয় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে—এমন কি বাঙালী যেমন সামাজিক ধর্মচর্চায় মা কালীকে ডাকাডাকি করে, উত্তর-ভারতে তেমনি হনুমানজী, গুজরাতে রণছোড়জী, মহারাষ্ট্রে অশ্বামাতা।

বেদনাটা সেখানে নয়। বাঙালীর পয়লা নম্বরের 'দোষ' সে মাছ-মাংস খায়। কি উত্তর, কি দক্ষিণ—সর্বত্রই ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা মাছ-মাংস খান না এবং উভয় বস্তুর খাদককে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। মহারাষ্ট্রের সারস্বত ব্রাহ্মণগণ মাছ খান (এঁদের এক শাখার নাম গোড়ীয় সারস্বত ও কিস্বদন্তী এই যে, তাঁরা আসলে বাঙালী), তাই সেখানকার চিংপাবন, দেশস্থ এবং করাড় ব্রাহ্মণগণ সারস্বতদের অবজ্ঞার চোখে দেখেন—যেন মাছ খেয়ে সারস্বত ব্রাহ্মণরা হিন্দু-সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছেন! এই মাছ খওয়াটা দোষ না গুণ সে আলোচনা পাণ্ডিত এবং বৈদ্যরাজ করবেন; উপস্থিত আমার বক্তব্য এই যে, মাছ-মাংস খায় বলেই বাঙালী সনাতন হিন্দুধর্মের কাছাকাছি থাকতে পেরেছে। নিরামিষে আসক্তি জৈন ধর্মের লক্ষণ—কারণ বৌদ্ধ গৃহীরা পর্যন্ত মাছ-মাংস খান এবং নির্মশিত শ্রমণও উভয় বস্তু প্রত্যাখ্যান করেন না। জৈনদের প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত বিবেচ্য নেই ও 'হিন্ত্যনাং তাদ্যমানপি ন গচ্ছেং জৈন মন্দিরম্' উপদেশটি অবাঙালীই দিয়েছেন। রাজপুত্রা মাছ-মাংস খান, তাই বোধ করি মীরাবাদি গেয়েছেন—

ফলমূল খেয়ে

হরি যদি মেলে

তবে হরি হরিণের।

কাজেই মাছ-মাংস খাওয়ার জন্যে যদি বাঙালী অন্যান্য প্রদেশের বিরাগ-ভাজন হয় তাতে শোক করবার কিছুই নেই। তার অর্থ শুধু এই যে বাঙালী ভারত-ব্যাপী জৈন্য প্রভাবের ফলে সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় নি।

আমাদের দুই নম্বরের দোষ আমার পরীক্ষা, আত্ম ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত

কায়দায় পরীক্ষা আত্ম উচ্চারণ করি না। সংস্কৃত ভাষা পড়বার সময় এ সব শব্দ কি ভাবে উচ্চারণ করতে হবে সে আলোচনা পরে হবে, উপস্থিত দ্রষ্টব্য আমরা কেন বাঙলায় এ সব শব্দ বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করি।

এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয়, হিন্দী-গুজরাতি-মারাঠীরাও করেন। সাধারণ হিন্দী বলার সময় সবাই ক্রিয়াকে শ্রিয় বলেন, লক্ষ্মণঝোলাকে লছমনঝোলাই বলে থাকেন। অর্থাৎ যে ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে বাঙলা দেশ থেকে সংস্কৃত উচ্চারণ লোপ পায়, সেই ধ্বনিপরিবর্তন অন্যান্য প্রদেশেও ঘটেছিল—যার ফলে লক্ষ্মণ লছমন হয়ে যান। পরবর্তী যুগে দেশজ হিন্দী, বাঙলা, গুজরাতির উপর যখন সংস্কৃত তার আধিপত্য চালাতে গেল তখন আর সব প্রদেশ সে আধিপত্য মেনে নিল, কিন্তু বাঙলা স্বীকার করল না। বাঙালী তখন সেই ধ্বনিপরিবর্তনের আইন মেনে নিয়ে সংস্কৃত শব্দও বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করতে লাগল। এস্থলে বাঙালী পৃথিবীর আর সব জাত যা করেছে, তাই করল—ইংরেজ, ফরাসী অথবা জার্মান যখন তার ভাষাতে গ্রীক বা লাতিন শব্দ উচ্চারণ করে তখন সেগুলো আপন আপন ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন দিয়েই করে, এমন কি গোটা বাক্যও আপন কায়দায় উচ্চারণ করে (ইংরেজ এবং ভারতীয় আইনজেরা nisi শব্দকে লাতিন নিসি উচ্চারণ না করে নাইসাই করেন, a priorকে আ প্রিয়োরি না বলে এ প্রায়োরাই বলেন)। হিন্দী গুজরাতি মারাঠী ইত্যাদি ভাষা সাধারণ শব্দের ধ্বনিপরিবর্তন মেনে নিয়েছে (এমন কি মারাঠীরা জ্ঞানেশ্বরকে দানেশ্বর বলেন!) কিন্তু অপেক্ষাকৃত অচলিত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে।

অর্থাৎ আমরা consistent এবং অন্যান্য প্রদেশ এ নীতিটা মানেন না।

অবাঙালীরা তাই ভাবেন আমরা সংস্কৃত উচ্চারণ ‘বিকৃত’ করে তার উপর ‘অত্যাচার’ করেছি।

কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, বাংলা খুব তাড়াতাড়ি স্বাধীন হতে পেরেছে। আজ যে বাঙলা সাহিত্য হিন্দী, মারাঠী বা গুজরাতীকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পেরেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। একবার ভেবে দেখলেই হয় আমরা যদি আজও বিদ্যাসাগরী বাঙলা লিখতুম তাহলে ‘মেজদিদি’, ‘বিন্দু’, ‘জ্যাঠাইমা’ চরিত্র আঁকা অসম্ভবপর হত কি-না? ইংরেজের অত্যাচার-জর্জরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রশ্ন করলেন, ‘এই ভুতের খাজনা দেবো কিসে?’ উত্তরে বললেন, ‘শ্মশান থেকে মশান থেকে, বোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে, আরু দিয়ে, ইচ্ছা দিয়ে, ইমান দিয়ে, বৃকের রক্ত দিয়ে।’ এ উত্তর কি বিদ্যাসাগরী বাঙলায় কখনো রূপ পেত?

ভাষা এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে আমাদের স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা দম্ভপ্রসূত নয়, সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞাজনিত নয়। ধর্ম জানেন, ভট্টপন্নী, নবশ্বীপ তথা বাঙলা দেশে সংস্কৃত চর্চা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়, কিন্তু বাঙলা বাঙলা এবং সংস্কৃত সংস্কৃত। বাঙলা ভাষা যখন আপন নিজস্বতা

খুঁজিছিল তখন সে জানত না যে ইংরিজী ফরাসী জার্মান একদা লাতিনের দাস্যবৃত্তি থেকে মুক্তিলাভ করেই যশস্বিনী হয়েছে। বাঙলার এই প্রচেষ্টা ভগবানের দান এবং এই প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ জন্মেছিলেন বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এখনও বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন নি। প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন মহন্তর রবীন্দ্রনাথ, বিরাটতম বঙ্কিম পান; কিন্তু ততদিন যদি আমরা এঁদের নিয়ে গর্ব না করি তবে আমাদের নিমক-হারামির অন্ত থাকবে না।

*

*

*

অবাঙালীরা যখন বাঙালীর প্রাতি বিরক্ত হন তখন তাদের মুখে অনেক সময়ই শুনতে পাওয়া যায়, তোমরা বাঙালীরা আর কিছু পারো না পারো। একটা জিনিসে তোমরা যে গুস্তাদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তোমাদের কেউ যদি সামান্য একটুখানি কিছু করতে পারে, তবে তাই নিয়ে তোমরা এত লাফালাফি মাতামাতি, সোজা ইংরিজীতে তাকে এত ‘বুসট’ করো যে অবাঙালী পর্যন্ত সেই প্রোপাগান্ডার ঠ্যালায় শেষটায় মেনে নেয় যে, যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে সে লোকটা সত্যি জন্মের কিছু একটা করেছে বটে। এই যেমন তোমাদের রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালী মাথ্রেই এরকম ধারা কথা শুনলে পণ্ডাশ গোনবার উপদেশটা যে নিতান্ত অবচীনের ফতোয়া সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে অবাঙালীকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেয় এবং আমিও স্বীকার করি যে শোনাবার হক তার তখন আলবত আছে।

আমি শোনাই না, কারণ আমি জানি অবাঙালী বেচারী পড়েছে মাত্র গীতাজলি, গার্ডেনার এবং চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ। হয়তো আরও দু'একখানা পড়েছে কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যে, ইংরেজী যার মাতৃভাষা নয় তার পক্ষে বুদ্ধে ওঠা কঠিন যে এগুনের মধ্যে এমন কি কবিব্ব, এমন কি তত্ত্ব আছে, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি খেতাব দিয়ে উম্বাহু হয়ে নৃত্য করা যায়। ইয়েট্‌স্ সাহেব যখন গীতাজলিকে প্রশংসা করে সপ্তম স্বর্গে তোলেন তখন তার একটা অর্থ করা যায় :—রবীন্দ্রনাথের ইংরিজীতে হয়তো এমন কোনো অদ্ভুত গীতিরস লুকোনো আছে যার স্বাদ পেয়ে ইংরিজীভাষী ইয়েট্‌স্ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন কিন্তু আমার মত বাঙালী অতটা উচ্চাঙ্গ ইংরিজী জানে না এবং আর পাঁচজন অবাঙালী যদি আমারই মত হয় তাতে আমার রাগ করার কি আছে?

সাধারণ বাঙালী যখন অবাঙালীর এই ‘নীচ’ আক্রমণে মার মার করে তেড়ে যায় তখন সে ধরে নিয়েছে যে অবাঙালী রবীন্দ্রনাথের উত্তম উত্তম কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হলেও নিছক টিটেমি করে বাঙালীর নিন্দে করছে। কাজেই ঝগড়াটা শুরু হয় ভুল-বোঝা নিয়ে। কিন্তু একবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেলে কাদামাটি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'চারটে পাথরও ছোঁড়া হয়, তখন মানুষ জানা অজানাতে অন্যান্য কথাও বলে ফেলে। তর্কের ঝোঁকে তখন অবাঙালী আমাদের অন্যান্য

মহাপুরুষও যে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের জোরেই খ্যাতিনামা হয়েছেন সে কথা বলতেও কসর করে না।

আমি বাঙালী কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তাই কি করে বন্ধ ঠুকে বলি বলুন যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষের বিজ্ঞাপন দেবার প্রয়োজন আমরা কখনো অনুভব করি নি। এঁরা বাঙালীর ধর্মজগতের গুরুর আসন গ্রহণ করে বাঙালী জাতটাকে গড়ে তুলেছেন। এ সত্যটা জানি এবং হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, উর্দু নিয়ে চর্চা করছি বলে এ তথ্যটাও জানি যে ভগবান বোধ হয় বাঙালীকে নিতান্ত নিষ্কর্মা জেনেই দয়া করে একমাত্র তাকেই অকুপণ হস্তে এতগুণি ধর্মগুরু দিয়ে ফেলার পর হুঁশিয়ার হয়ে অন্য প্রদেশগুলোর উপর কঞ্জুসি চালিয়েছেন।

আজকাল অবশ্য ধর্ম রায়বাহাদুর খেতাব নিয়ে কি বাঙলা, কি বোম্বাই, কি দিল্লী সবত্রই পেনশন টানছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য বিবেকানন্দ এবং দূর শিষ্য সুভাষচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য রবীন্দ্রনাথ এই বাঙালীর জাতীয়তাবোধ কতখানি জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন, সে কথা আঘরাই এখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারি নি—বিজ্ঞাপন দেবে কে, বসুস্ট্ আপ করবার গরজ কার? হা ধর্ম!

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন আমাদের অচলায়তনের অশ্ব প্রাচীরে অনেকগুলো জানলা তৈরী করে দিয়েছেন—তারি ভিতর দিয়ে আমরা পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্মান পেলুম। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জনগণের সঙ্গে সে ঐতিহ্যের যোগসূত্র সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেলেন। তাই এক দিক দিয়ে আমরা যেমন বাইরের জিনিস নিতে শিখলুম অন্য দিক দিয়ে ঠিক তেমনি আপন জিনিসকে অবহেলা না করে আপন সংস্কৃতি সভ্যতা গড়ে তুললুম।

সব চেয়ে স্বপ্রকাশ হয়েছে এই তত্ত্বটি আমাদের সাহিত্যে। মাইকেল ষ্টীটান, নজরুল মুসলমান এবং প্রমথ চৌধুরীকে ফরাসী বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হয় না। অথচ তিনজনই বাঙালী এবং তাঁরা যে সাহিত্য গড়ে তুলেছেন সেটি বাংলা সাহিত্য। কিন্তু এঁরাই শুধু নন, আর যে পাঁচজন বাঙালী সাহিত্য গড়ে তুলেছেন তাঁদের সকলেই জানা অজানাতে আমাদের ধর্মগুরুদের উপদেশ সাহিত্যক্ষেত্রে মেনে নিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের দরদী ঘরোয়া সাহিত্যের পশ্চাতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সরলতা, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রাতিভার পিছনে রয়েছে রামমোহনের বিদগ্ধ মনোবৃত্তি।

বহু আকস্মিক ঘটনা, বহু যোগাযোগের ফলে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ইংরিজী তথা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্যকলার চর্চা প্রধানত হয়েছিল কলকাতা এবং মাদ্রাজে। কিন্তু তামিল-ভাষাভাষীদের মধ্যে যারা এসব দিকে আকৃষ্ট হলেন তাঁরা মাতৃভাষার সেবা করলেন না। ফলে তাঁরা বাঙালীর চেয়ে ভালো ইংরিজী শিখলেন বটে—যদিও সে ইংরিজী সাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত হল না—কিন্তু তামিল ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারল না। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের

লোকমান্য টিলক (কথাতা তিলক নয়) এবং স্বামী দয়ানন্দ জম্মালেন বটে কিন্তু সে সব প্রদেশে ইউরোপীয় সাহিত্য প্রচেষ্টার যথেষ্ট প্রসার হল না বলে মারাঠী, গুজরাতী সাহিত্য আজও বাঙলার অনেক পিছনে ।

অবজ্ঞাপ্রসূত প্রাদেশিক বিশেষ তাহলে ঘুচবে কবে ? যেদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অন্য প্রদেশের ভাষা শেখবার ব্যাপক ব্যবস্থা হবে সেদিন থেকে । ইংরেজ এ ব্যবস্থা করবার কোনো প্রয়োজন বোধ করে নি—তার কারণটাও অনায়াসে বোঝা যায়—কিন্তু আমাদের বেশ ভালো করে মেনে নেওয়া উচিত, সব প্রদেশের সব প্রচেষ্টার সঙ্গে যদি আমাদের বহু ছাত্রছাত্রী বহু প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে সংযুক্ত না হয়, তবে অবজ্ঞাপ্রসূত এ সব বিশেষ কাল্পনিককালেও যাবে না, এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা শিখলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না ।

প্রত্যেক ছাত্রই যে বারোটা প্রাদেশিক ভাষা শিখবে এ প্রস্তাব কেউ করবে না, মানবেও না । ব্যবস্থাটা হবে এই যে, বহু ছাত্র মারাঠী, বহু ছাত্র গুজরাতী, অন্যেরা তামিল অথবা কানাড়া অথবা অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষা শিখবে, তারা ঐসব ভাষা থেকে উত্তম উত্তম পুস্তক বাঙলায় অনুবাদ করবে, ঠিক সেইরকম বাঙলা বইও নানা ভাষায় অনূদিত হবে । ফলে এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের সাহিত্য চিনতে শিখবে এবং তারপরেও যদি বিশেষ থেকে যায় তবে তার জন্য অন্ততঃ আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিকে দোষ দেওয়া যাবে না ।

কালো মেয়ে

কত করুণ দৃশ্য, কত হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখি প্রতিদিন—সত্য বলতে কি, তাই রাস্তায় বেরুতে ইচ্ছে করে না—কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন, সব চেয়ে মর্মন্তুদ আমার কাছে কি লেগেছে, তবে বলব, আমাদের পাড়ার কালো মেয়েটি ।

সকালবেলা কখন বেরিয়ে যায় জানি নে । সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরে—আমি তখন রকে বসে চা খাচ্ছি । মাথা নিচু করে, ক্রান্ত শ্লথগতিতে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায় । আজ পর্যন্ত আমাদের রকের দিকে একবারও ঘাড় তুলে তাকায় নি—আমার মনে হয়, এ জীবনে কোনোদিনই সে কোনো দিকে তাকিয়ে দেখে নি ।

দেবতা ওকে দয়া করেন নি । রঙ কালো এবং সে কালোতে কোনো জৌলুস নেই—কেমন যেন ছাতা-ধরা-মসনে-পড়া ছাবড়া-ছাবড়া । গলার হাড় দুটি বেরিয়ে গিয়ে গভীর দুটো গর্ত করেছে, গায়ের কোথাও যেন একরঙা মাংস নেই, গাল ভাঙা, হাত দুখানা শরের কাঠি, পায়ে ছেঁড়া চম্পল, চুলে কতদিন হল তেল পড়ে নি কে জানে । আর সমস্ত মুখে যে কী বিষাদ আর ক্রান্তি তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা আমার নেই । শুধু জানি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—দিনের পর দিন তার মুখের বিষাদ আর ক্রান্তি বেড়েই চলেছে । আরো জানি, একদিন তাকে আর দেখতে পাবো না । শুনবো, যক্ষ্মা কিংবা

অন্য কোনো শব্দ ব্যামোষ পড়েছে, কিংবা মরে গিয়েছে।

শুনলুম, মাস্টারনীর্গরি করে বিধবা মা আর ছোট ভাইকে পোষে। তার নারিক পয়সাওলা এক দাদাও আছে—সে থাকে অন্যত্র বউ নিয়ে, এদের দিকে তাকায় না।

বাপ দাদা করেছিলেন তাই আমিও ভগবানে বিশ্বাস করি গতানুগতিকভাবে, কিন্তু যদি এ মেয়ের কোনদিন বর জোটে তবেই ভগবানে আমার সত্যাকার বিশ্বাস হবে।

জানি, জানি, জানি, এর চেয়েও অনেক বেশি নিদারুণ জিনিস সংসারে আছে, কলকাতাতেই আছে। কিন্তু আমি পাড়ারগেয়ে ছেলে, মেয়েছেলে নিষ্ঠুর সংসারে লড়াই করে অপমান-আঘাত সহ্য করে টাকা রোজগার করে, এ জিনিস দেখা আমার অভ্যাস নেই, কখনো হবে না। গাঁয়ের মেয়েও খাটে—আমার মাও কম খাটতেন না—কিন্তু তার খাটুনি তো বাড়ির ভিতরে। সেখানেও মান-অপমান দুঃখ-কষ্ট আছে স্বীকার করি,—কিন্তু এই যে পাড়ার কালো মেয়েটি যে সকাল হতে না হতেই নাকে-মুখে দুটি গুঁজে, এর কনুই, ওর হাঁটুর ধাক্কা খেয়ে ট্রামে-বাসে উঠছে, দুপদুর বেলা কিছুর খাবার জুটবে না, জুটবে হয়তো হেড মিসট্রেসের নির্মম ব্যবহার, ছাত্রীদের অবজ্ঞা অবহেলা—হয়তো তার শ্রীহীনতা নিয়ে দু-একটা হৃদয়হীন মন্তব্যও তাকে শুনতে হয়। ক্লাস শেষ হলে সে খাতা দেখতে আরম্ভ করবে, সন্ধ্যার আবছায়ায় যখন ক্ষুদ্রে লেখা পড়বার চেষ্টায় গতে-দোকা চোখ দুটো ফেটে পড়বার উপক্রম করবে তখন উঠবে বাড়ি ফেরার জন্য। আজ হয়তো বাসের পয়সা নেই, বাড়ি ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে। ক মাইলের ধাক্কা আমি জানি নে।

কিন্তু জানি, আমি যে গ্রামে জন্মেছি, সেখানে এককালে সব মেয়েরই বর জুটত। ভালো হোক, মন্দ হোক, জুটত এবং ছোট হোক, বড় হোক কোনো না কোনো সংসারে গিয়ে সে আশ্রয় পেত।

আজ আর সেদিন নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের কটি ছেলে আজ পয়সা কামাতে পারে যে বিয়ে করবে? এককালে গ্রামে সকলেরই দুমুঠো অন্ন জুটত—তা সে গতর খাটিয়ে, চাকরি করেই হোক, আর না করেই হোক—তাই শেষ পর্যন্ত শ্রীহীনা মেয়েরও বর জুটত। আজ যে দু-চারটি ছেলে পয়সা কামাবার সুযোগ পায়, তার কনের বাজারে ঢুকে বেছে নেয় ডানাকাটা পরীদের। সাধারণ মেয়েরাও হয়ত বর পায়, শুধু শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকে আমাদের পাড়ার মাস্টারনী আর তারই মত মলিনারা।

এ সমস্যা যে শুধু আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে তা নয়। বেকার-সমস্যা যেখানে থাকবে সেখানেই ছেলেরা বিয়ে করতে নারাজ। মেয়েরাও বৃদ্ধিতে পারে, বর পাবার সম্ভাবনা তাদের জীবনে কম, তাই তারাও কাজের জন্য তৈরী হয়—বাপ-মা তো একদিন মারা যাবেন, দাদারা তাকে পুষতে যাবে কেন? এই একান্ত পরিবারের দেশেই দাদারা ক্রমশ সরে পড়ছে, যে দেশ কখনো একান্ত পরিবার ছিল না সেখানে অরক্ষণীয়াকে পুষবে কে? কিন্তু আর আর

দেশ আমাদের মত মারাত্মক গরিব নয় বলে টাইপিষ্ট মেয়েটির পেট-ভরা অন্ন জোটে, মাস্টারনী যখন বাড়ি ফেরে তখন তার মুখে ক্লান্তি থাকলেও মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটার যাবার মত পরস্যা সে কামায়ও বটে। বর জুটবে না, মা হতে পারবে না, সে দুঃখ তার আছে, কিন্তু ইয়োরোপের মেয়ের অনেকখানি স্বাধীনতা আছে বলে প্রেমের স্বাদ সে কিছুটা পায়। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয় : এ দেশের মেয়েরা পরিণয়বন্ধনের বাইরে প্রেমের স্থানে ফিরুক, এ কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই, পশ্চিমের অরক্ষণীয় তবু কোনো গতিকে বেঁচে থাকার আনন্দের কিছুটা অংশ পায়—আমাদের পাড়ার মেয়েটি যে এ জীবনে কোনো প্রকার আনন্দের স্থান পাবে সে দুরাশা আমি স্বপ্নেও করতে পারি নে।

এ মেয়ের দূরবস্থার জন্য দাস্তী কে ?

আমি সোজাসুজি বলবো, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক কর্তারা। পাঠক জানেন, এ অধম সপ্তাহের পর সপ্তাহ লিখে যাচ্ছে, কিন্তু কারো নিন্দে সে কখনো করতে যায় নি। সে চেষ্টা করেছে আপনাদের আনন্দ দিতে—তারই ফাঁকে ফাঁকে যে সপ্তাহে সে তষ বা তথ্য পরিবেশন করবার সুযোগ পেয়েছে, সেদিন তার আনন্দের অবধি থাকে নি ; এর গলদ, এর দুটি নিয়ে সে আলোচনা বা গালাগালি করে কোনো সম্ভা রুচিকে সে টক ঝাল দিয়ে খুশী করতে চায় নি। কিন্তু এখন যদি না বলি যে, আমাদের কর্তারা আজ পর্যন্ত দেশের অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করতে পারেন নি, কোনো পরিকল্পনা পর্যন্ত করতে পারেন নি, তা হলে অধর্মচার হবে।

বেকার সমস্যা ঘোচাতে পারুন আর নাই পারুন, মধ্যবিত্তকে অন্ন দিতে পারুন আর নাই পারুন, অন্তত তাঁরা যেন তরুণ-তরুণীদের মনে একটুখানি আশার সঞ্চার করে দিতে পারেন। ভালো করে ভাত না জুটলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, যদি তার মনে আশা উদ্দীপ্ত করে দেওয়া যায়।

আমাদের কালো মেয়ের কোনো ভবিষ্যৎ নেই—এ কথা ভাবতে গেলে মন বিকল হয়ে যায়—কিন্তু এদের সংখ্যা বেড়েই চলবে, এ কথা ভাবলে কর্তাদের বিরুদ্ধে সর্বদেহমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আশাটুকুরও সঞ্চার যদি কর্তারা না করতে পারেন, তবে তাঁরা আসন ত্যাগ করে সরে পড়েন না কেন ? হায়, অরক্ষণীয়ার অভিসম্পাতকেও এঁরা আর ভয় করেন না !!

ঋতালী

ইসমাইলি খোজা সম্প্রদায়ের গুরুপুত্র প্রিন্স আলী খানের সঙ্গে শ্রীমতী ঋতা (স্পেনিশ ভাষায় যখন t অক্ষরের উচ্চারণ বাংলা 'ত'য়ের মত হয় তখন r টাকে 'ঋ' বানাতে কারো বড় বেশী আপত্তি করা উচিত নয়) হেণ্ডার্থের শাদী হয়েছে আর বিয়ের দাওয়াতে নাকি হাজার দেড়েক বোতল শ্যাম্পেন খাওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের যে অঞ্চলে শাদীটা হয়েছে সেখানে শ্যাম্পেন মাগগী নয়। তবে যে বেশ কিছু পয়সা খরচা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই ; কারণ জার্মানরা নাকি ফ্রান্সত্যাগ করার পূর্বে প্রাণ ভরে শ্যাম্পেন খেয়ে ফ্রান্সের তাবৎ শ্যাম্পেনের গুদোম উজাড় করে দিয়ে যায়। বছর সাতেক না যাওয়া পর্যন্ত ১৯৪৫ এর শ্যাম্পেন খাওয়ার মত ‘পরিপক্ব’ হবে না।—কাজেই আলী খান নিশ্চয়ই ৪৫এর আগেকার লুকোনো মাল গোঁরীসেন পয়সা দিয়ে কিনেছেন। তা কিনুন, তাঁর পয়সার অভাব নেই। কিন্তু প্রশ্ন, মুসলমান ধর্মে যখন মদ বারণ তখন ধর্মগুরুর বড় ব্যাটা (পরে ইনিই গুরু হবেন) এ খবরটা ছাপতে দিলেন কোন্ সাহসে ?

বোম্বায়ে যখন বাস করতুম তখন আলী খানের খোজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। তখন কিছুদিন তাঁদের ইতিহাস, শাস্ত্র, আচার-ব্যবহার নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম। সেগুলি সত্যিই বহু রহস্যে ভরা।

খোজাদের বিশ্বাস, আদমকে সৃষ্টি করার সময় আল্লা তাঁর জ্যোতির খানিকটা তাঁর শরীরে ঢেলে দেন। সে জ্যোতি আদম থেকে বংশানুক্রমে মহাপুরুষ মোসেজ (মূসা), নোয়া (নূহ), ইব্রাহাম (ইব্রাহিম), সলমান (সুলেমান), ডেভিড (দাউদ) হয়ে হয়ে শেষটায় মহাপুরুষ মুহম্মদের পিতামহে পৌঁছায়। তারই এক অংশ তখন বর্তে মহম্মদে, অন্য অংশ তাঁর খুড়োর ছেলে আলীতে। আলী মুহম্মদের মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর ছেলে হুসেনের শরীরে আবার সেই স্বর্বাংশ জ্যোতি সংযুক্ত হয়। তারপর সেই জ্যোতি বংশানুক্রমে চলে এসেছে প্রিন্স আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে। তিনি মারা গেলে আলী খান সেই জ্যোতি পাবেন।

কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের খোজারা আরেকটা বিশ্বাস জুড়ে দিয়েছেন। সে মত অনুসারে খোজারা বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু নয়বার মৎস্য কূর্ম ইত্যাদি রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং দশমবারে কল্করূপে যে অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে, সেও খাঁটি ; কিন্তু হিন্দুরা জানে না যে কল্ক বহুদিন হল অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছেন আলীরূপে মক্কা শহরে। এবং শুধু তাই নয়, সেই কল্ক অবতারের জ্যোতি তাঁর ছেলে হুসেনে বর্তে ক্রমে ক্রমে বংশপরম্পরায় নেমে এসে উপস্থিত বিরাজ করছে আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে।

তাই হজরত আলী হলেন কল্ক অবতার এবং সেই কল্কের জ্যোতি আগা খানের শরীরে আছে বলে তিনিও কল্ক অবতার। তাই খোজা ধর্মগ্রন্থে আগা খানের সম্পূর্ণ নাম লেখা হয় ‘দশবা নকলংকী অবতার আগা সুলতান মুহম্মদ শাহ’।

কিন্তু প্রশ্ন, খোজারা এই অশ্রুত সংমিশ্রণ করল কি প্রকারে ? অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, দশম-একাদশ শতাব্দীতে ইরানের ইসমাইলি সম্প্রদায় আপন দল বাড়াবার জন্য চতুর্দিকে মিশনারি পাঠান। (আরো নানা সম্প্রদায় তখনকার দিনে ইরানের বন্দর-আবাস থেকে জাহাজে করে সমুদ্রতীরবর্তী ‘সিন্ধু

প্রদেশ আর কাঠিয়াওয়াড়ে এসে আপন আপন মতবাদ প্রচার করতেন)। এই মিশনারীদের উপর কড়া হুকুম ছিল, দল বাড়াবার জন্য কারো ধর্মমত যদি খানিকটা গ্রহণ করতে হয় তাতে কোনো আপত্তি নেই—মোন্দা কথা হচ্ছে, সংখ্যাবৃদ্ধি যে করেই হোক করতে হবে।

এই মিশনারীদের একজন এসে কাজ আরম্ভ করেন কাঠিয়াওয়াড় এবং কচ্ছের লোহানা রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁরা ছিলেন বৈষ্ণব—কিন্তু পাণ্ডুরাম মতবাদের। এঁরা ইসমাইলি মতবাদের দিকে কেন আকৃষ্ট হলেন তার খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা যে এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করার সময় বিষ্ণুর অবতারবাদটা সঙ্গে এনেছিলেন, সে কথাটা আজও খোজাদের ‘জামাতখানা’তে (খোজারা অন্যান্য মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁদের আপন মসজিদের নাম ‘জামাতখানা’ বা সম্মেলনালয়) প্রকাশ পায় তাঁদের উপাসনার সময়। সর্বপ্রথম বিষ্ণুর নয় অবতারের নাম স্মরণ করা হয় বসে বসে এবং দশম অবতার আলী এবং হিজ হাইনেস দি আগা খানের নাম আরম্ভ হতেই সবাই উঠে দাঁড়ান।

গোড়া খোজারা বিশ্বাস করেন, স্বর্গে ঈশ্বর নেই। তিনি শরীর ধারণ করে আছেন আগা খানরূপে।

চন্দ্র, সূর্য তাঁর আদেশে চলে, তিনিই ইচ্ছে করলে এক মৃহুতে সর্ব সৃষ্টি ধ্বংস করতে পারেন, নতুন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টি করতে পারেন।

এরকম বিশ্বাস যে বিংশ শতাব্দী—বা অন্য যে কোনো শতাব্দীতে—কেউ করতে পারে সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল, কিন্তু যখন স্বকর্ণে শুনলুম, তখন আর অবিশ্বাস করি কি প্রকারে?

ভারতবর্ষে সুন্নি সম্প্রদায় খোজাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু ইরানের সুন্নিরা অনেক কিছু জানেন বলে খোজা এবং তাঁদের জনক সম্প্রদায় ইসমাইলি মতবাদকে বিধর্মী বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কোরানে যখন বিষ্ণু এবং নয় অবতারের উল্লেখ নেই, এবং যেহেতু কোরান অবতারদের বিরুদ্ধে আপন বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে তখন সুন্নি মতবাদ যে খোজা সম্প্রদায়কে বিধর্মী বলবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? খোজারা অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামান না, কারণ খোজারা যদিও কোরানকে ‘ভালো কেতাব’ রূপে স্বীকার করেন, তবু কর্মক্ষেত্রে তাঁরা মানেন কচ্ছী এবং গুজরাতী ভাষায় লিখিত নিজস্ব ‘গিনান’ গ্রন্থাবলীকে। ‘গিনান’ শব্দ সংস্কৃত ‘জ্ঞান’ শব্দ থেকে বেরিয়েছে এবং এ সব গিনান লিখেছেন খোজা ধর্মগুরুরা।

খোজারা তিনবার নামাজ পড়েন, এবং রোজার মাসে মাত্র একদিন উপোস করেন। তাও বেলা বারোটা পর্যন্ত।

কিন্তু সব চেয়ে বড় তত্ত্বকথা, আগা খান এত টাকা পেলেন কোথায়? তাঁর ঠাকুদা তো ইরান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন গত শতকের মাঝামাঝি। এইখানেই খোজা ধর্মের গৃহ্যতত্ত্ব লুক্কায়িত।

প্রতি জামাতখানাতে একটা করে প্রকাণ্ড লোহার সিঁদুক থাকে। প্রতি

অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রত্যেক খোজা এই সিদ্ধকে আপন মুনাসা (কোনো কোনো স্থলে আমদানির) থেকে অষ্টমাংশ ফেলে দেয় এবং এই সব টাকা যায় আগা খানের তহবিলে। তা ছাড়া পালা-পরবে দান বলতে যা কিছু বোঝায় সবই ফেলা হয় এই সিদ্ধকে এবং বহু খোজা মরার আগে তার তাবৎ ধনসম্পত্তি গুরু আগা খানের নামে উইল করে দিয়ে যায়। খোজা সম্প্রদায়ের কারবার ব্যবসা জগৎ জোড়া—শাক্সাই থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত। কাজেই আগা খানের মাসিক আয় কত তার হিসাব নাকি স্বয়ং আগা খান ছাড়া কেউ জানে না।

তা জেনে আমাদের দরকারও নেই। এবং আমি জানি, এত সব তথ্যখণ্ড শোনার পরও পাঠক শূন্যাবেন, কিন্তু যে শ্যাম্পেন নিয়ে আরম্ভ করেছিল তার তো কোনো হিলো হল না। মদ যখন বারণ তখন আলী খান শ্যাম্পেন খান কি প্রকারে? তবে কি শ্যাম্পেন মদ নয়?

বিলক্ষণ! শ্যাম্পেনে আছে শতকরা প্রায় পনেরো অংশ মাদকদ্রব্য বা এলকহল। এবং যেহেতুক শ্যাম্পেন খুললেই সোডার মত বুজবুজ করে, তাই তাতে আছে ছোট ছোট বুদবুদ। সেগুলো পেটে গিয়ে খোঁচা দেয় বলে নেশা হয় চট করে এবং স্টীল ওয়াইন বা শান্ত মদের তুলনায় অনেক বেশী। তবে?

খোজারা বলেন, 'আলী খান একদিন স্বয়ং কটক অবতারের জ্যোতি; পাবেন বলে তিনি এখন থেকেই পুতপবিত্র। কোনো বস্তু তাঁকে অপবিত্র করতে পারে না। তাই অপবিত্র মদ তাঁর হস্তস্পর্শ লাভ করা মাত্রই পবিত্র হয়ে যায়।'

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম, সেগুলো দলিল দস্তাবেজ অর্থাৎ খোজাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু এবারে যেটি বলব সেটি আমার শোনা গল্প—এক নাস্তিক খোজার কাছ থেকে।

একদিন নাকি খানা খেতে খেতে পঞ্চম জর্জ আগা খানকে জিজ্ঞেস করেন, 'এ কথা কি সত্য, ইয়োর হাইনেস, যে, আপনার চেলারা আপনাকে পূজো করে?'

আগা খান নাকি উত্তরে বলেছিলেন, 'তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে, ইয়োর মার্জাস্ট? মানুষ কি গোরুকেও পূজো করে না?'

উত্তরটার দর আমি আর যাচাই করলুম না ॥

রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ইয়োরোপীয় সুরধার।

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে পাওয়া যায়, ইয়োরোপ রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনতে পেরেছিল, আর আজ যে ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের নাম কেউ বড় একটা করে না তার কারণ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সে প্রশ্ন স্বগত—আমরা, অর্থাৎ বাঙালীরাই রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনি? রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা, নাট্যনির্মণক্ষমতা, দার্শনিক চিন্তাশক্তি, সার্বভৌমিক ধর্মানুভূতি, ঔপন্যাসিক অতদুর্ভূতি, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, ঐতিহ্যগত শিক্ষাদান প্রচেষ্টা, বৈষ্ণব-

করণিক অনুসন্ধিৎসা—সব কিছ্ মিলিয়ে তাঁর অথ'ডরূপ হৃদয়মনে আঁকার কথা দূরে থাক, যেখানে তিনি ভারতের তথা পৃথিবীর সব কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তারই সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়েছেন কজন বাঙালী ?

কবিতার কথাই ধরা যাক। সেখানে দেখি কেউ কেউ 'কল্পনা' ছাড়িয়ে কবির সঙ্গে কল্পলোকে 'হংসবলাকা'র পাখা মেলতে নারাজ, কেউবা মহুয়া'তে পৌঁছে ব'ধুকে 'মহুয়া' নাম ধরে ডেকেই সন্তুষ্ট, আর 'রোগশয্যা' কবিকে সজ্জ দিতে রাজী অতি অল্প দুঃসাহসী রসজ্ঞ। কাউকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় ; আমি নিজে গুরুদেবের গদ্যকবিতার রস পাই না। কাজেই আমরা সকলেই পরমানন্দে অন্ধের হস্তীদর্শন করছি—কিন্তু আমাদের চরম সান্ধ্যনা, এ সংসারের অধিকাংশ অশ্ব আপন আপন ঘাঁট ত্যাগ করে বৃহত্তর লোকের ক্ষীণতম আভাস পাওয়ার জন্য অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ উদ্গ্রীব নয়।

একথাও বলা বৃথা যে রবীন্দ্র-কাব্যের সম্পূর্ণ রস পাই আর না-ই পাই, তার কাব্যজগতের মূল সুরটি আমরা ধরতে পেরেছি। মনে পড়ছে বিশ্বভারতীর সাহিত্যসভায় এক তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের কাব্যে প্রধান দুটি মিল দেখিয়ে একথানা সরেস প্রবন্ধ পড়েছিলেন—বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস উভয়েই বর্ষার ও প্রেমের কবি। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে সভাপতি রূপে কবিগুরু লেখাটির প্রচুর প্রশংসা করে বলেন যে, 'যদিও মিল দুটি স্বীকার্য তৎসঙ্গেও প্রশ্ন, এই দুই বস্তু বাদ দিয়ে ভারতীয় কোন কবি কি লিখতে পারতেন ? রবীন্দ্রনাথ সালঙ্কার আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন,—এতদিন পরে স্মৃতিশক্তির উপয় নির্ভর করে তার প্রতিবেদন দেওয়া আমার পক্ষে 'সাহিত্যিক' সাধুতার পরিচায়ক হবে না, তবে ভাবখানা অনেকটা এই ছিল যে রাফায়েল মাদোন্না এঁকেছেন, অজ্ঞতা কারও মাতাপুত্র এঁকেছেন কিন্তু দুজনের ভিতর সত্যিকার মিল কতদূর ?

অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর যদি এই শ্রেণীরই হয় তবে তার কোনো মূল্য নেই।

(এস্থলে অবান্তর হলেও একটি কথা না বললে হয়তো প্রবন্ধলেখকের প্রতি) অন্যান্য করা হবে। যদিও রবীন্দ্রনাথের মতে প্রবন্ধটি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সপ্রমাণ করে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছিল তবু সভাস্থ আর পাঁচজন সে মত পোষণ করেন নি, এবং বিশ্বভারতীর যে কোনো ছাত্র এ রকম প্রবন্ধ লিখতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার মহত্তম এবং মধুরতম বিকাশ তাঁর গানে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলতেন যে তিনি তাঁর গানে প্রকৃতিকেও হারাতে পেরেছেন এবং সে গর্বটুকু একটি গানে অতি অল্প কথায় প্রকাশ করেছেন :

আজ এনে দিলে, হয়ত দিবে না কাল—

রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।

এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে

তব বিস্মৃতি স্রোতের শ্রাবণে

ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী

বহি তব সম্মান ॥

শুধু কদম ফুল । প্রকৃতির কত নগণ্য সৌন্দর্যবস্তু, মানুষের মত উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্র দুঃখদৈন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত স্পর্শমণির স্পর্শে হেমকান্ত সম্মল পরিপূর্ণতায় অজরামর হয়ে গিয়েছে, এবং ভবিষ্যতে,—ক্যাথলিকদের ভাষায় বলি,—ক্যাননাইজ্‌ড হয়ে যুগ যুগ ধরে বাঙালীর স্পর্শকাতর হৃদয়ের শ্রদ্ধাজ্বলি আকর্ষণ করবে ।

অথচ আজকের দিনে একথাও সত্য সে অস্প বাঙালীই রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজার গানের আড়াইশ গান শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন ।

তবে কি আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বে প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাই নি ? সেকথাও সত্য নয় । আমরা এতক্ষণ বাঙালী যুধিষ্ঠিরকে শুধু তাঁর নরক দর্শন করাচ্ছিলুম এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলুম যে বাঙালীর পক্ষেও যদি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণরূপে চেনা এত কঠিন হয় তবে অবাঙালীর পক্ষে, বিশেষতঃ সাহেবের পক্ষে—তা তিনি ইংরেজই হোন আর জর্মনিই হোন—সম্পূর্ণ অসম্ভব ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ যান তখন তিনি বিশেষ করে জর্মনিতে রাজাধিরাজের সম্মান পান । সে সম্মানের কাহিনী বিশ্বভারতী লাইব্রেরিতে নানা ভাষায় সমস্তে রক্ষিত আছে ।

তারপর রবীন্দ্রনাথ আবার জর্মনি যান ১৯৩০ সালে । মারবুর্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রশস্ততম গৃহে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের কি এক জয়ন্তী উপলক্ষে সমস্ত জর্মনির বিশ্বব্রজ্ঞ তখন মারবুর্গে সমবেত ; তাঁরা সকলেই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে ধর্ম সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠ করেন । অধ্যাপক অটো সে বক্তৃতার জর্মনি অনুবাদ করেন । শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রচনা পাঠ শুনছিল এবং পাঠ শেষ হলে যে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসাধ্বনি উঠেছিল, তার তুলনা দেবার মত ভাষা আমার নেই ।

সেদিন বিকেলবেলা মারবুর্গের পুস্তকবিক্রেতাদের দোকানে গিয়ে অনুসন্ধান করলুম, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন পুস্তকের জর্মনি অনুবাদ পাওয়া যায় । নির্ঘণ্ট শূনে আশ্চর্য হলুম—গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার, চিত্রা, ডাকঘর, সাধনা এবং নেশানালিজম ! মাত্র এই কখানি বই নিয়ে আর ইংরেজি ভাষায় একটি বক্তৃতা শূনে জর্মনিরা এত মুগ্ধ । আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং এখনো আছে যে ইংরিজি বা জর্মনে এই কখানা বই পড়ে রবীন্দ্রনাথের আসল মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব ।

তখনই আমার বিশ্বাস হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জর্মনির এই উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হবে না । গীতাঞ্জলির ধর্মসঙ্গীত জর্মনি মনকে চমক লাগাতে পারে, গার্ডেনারের প্রেমের কবিতাও জাদু বানাতে পারে, সাধনার রচনাও বিদূষিশিখার মত ঝলকাতে পারে কিন্তু এসব দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতর এবং শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির অনুবাদ অপরিহার্য ।

কিন্তু কোনো ব্যাপক অনুবাদকার্য কেউ হাতে তুলে নেন নি। তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে অনেক গবেষণার প্রয়োজন। উপস্থিত শব্দ সব চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত নিবেদন করি।

রবীন্দ্রনাথের গানের মত হুবহু গান জার্মানে আছে এবং সেগুলি জার্মানদের বড় প্রিয়। এগুলোকে ‘লীডার’ বলা হয় এবং শব্দ লীডার গাইবার জন্য বহু জার্মান গায়ক প্রতি বৎসর প্যারিস, লন্ডন যায়। এসব লীডারের কোনো কোনো গানের কথা দিয়েছেন গ্যোটে’র মত কবি, আর সুর দিয়েছেন বেটোফেনের মত সঙ্গীতকার।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গানে গ্যোটে বেটোফেনের সম্ভব। একাধারে এই দুই সৃজন পৃথার সম্মেলন হয়েছিল বলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত জার্মান লীডারের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অনুভূতির সূক্ষ্মতা, কল্পনার প্রসার, এবং বিশেষ করে সুর ও কথার অঙ্গঙ্গী বিজড়িত অর্থনারীশ্বর পৃথিবীর কোনো গান বা ‘লীডার’ জাতীয় সৃষ্টিতে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হন নি—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে রকম হয়েছে।

বাঙালীকে বাদ দিলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃত মূল্য একমাত্র জার্মানিই ঠিক বুঝতে পারবে।

কোনো ব্যাপক অনুবাদ তো হ’লই না, এমনকি রবীন্দ্রনাথের গানও জার্মান কণ্ঠে গীত হ’ল না।

কাজেই ‘সাত দিনের ভানুমতি’ আট দিনের দিন কেটে গেল। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেদিন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মত অনুবাদক কবি ইয়োরোপে জন্মাবেন সেদিন ইয়োরোপ,

‘চিনে নেবে চিনে নেবে তারে।’

শ্রমণ রিস্কোকোয়ান

বাস্তুবাদি আমূল ভস্মীভূত হওয়ার পরমহুতেই ক্ষতির পরিমাণটা ঠিক কতদূর হয়েছে অনুমান করা যায় না। যেমন যেমন দিন যায়, এটা ওটা সেটার প্রয়োজন হয় তখন গৃহস্থ আক্ষে আক্ষে বুঝতে পারে তার ক্ষতিটা কত দিক দিয়ে তাকে পঙ্গু করে দিয়ে গিয়েছে।

ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে। আগুন নিবেছে বলে উপস্থিত আমরা সকলেই ভারী খুঁশি কিন্তু ক্ষতির খতিয়ান নেবার সময়ও আসন্ন। যত শীঘ্র আমরা এ-কাজটা আরম্ভ করি ততই মঙ্গল।

ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অহরহ সচেতন হচ্ছি কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি বৈদ্যখালোকে আমাদের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন এখনো আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি নি। অথচ নতুন করে সব কিছু গড়তে হলে যে আত্মবিশ্বাস, আত্মাভিমানের প্রয়োজন হয় তার মূল উৎস সংস্কৃতি এবং বৈদ্যখালোকে।

হটেনটটদের মত রাষ্ট্রস্থাপনা করাই যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কোন প্রকার অনুসন্ধান করার বিমুদ্রা প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি আর পাঁচটা সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার বাসনা আমাদের মনে থাকে তবে সে প্রচেষ্টা 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'।

আত্মাভিমান জাগ্রত করার অন্যতম প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সে-ও একদিন উত্তরণ ছিল, ব্যাপক অর্থে সে-ও মহাজন রূপে বহু দেশে সুপরিচিত ছিল।

কোন দেশ কার কাছে কতটা ঋণী, সে তথ্যানুসন্ধান বড় বড় জাল পেতে আরম্ভ হয় গত শতাব্দীতে। ভৌগোলিক অন্তরায় যেমন যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে লঙ্ঘন করা সহজ হতে লাগল, অন্যের ইতিহাস পড়বার সুযোগও তেমনি বাড়তে লাগল। কিন্তু সে-সময়ে আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, ইংরেজের সম্মোহনমগ্নের অচেতন্য অবস্থায় তখন সে যা বলেছে আমরা তাই বলছি, সে যা করতে বলেছে তাই করেছি।

আমাদের কাছে কে কে ঋণী সে-কথা বলার প্রয়োজন ইংরেজ অনুভব করে নি, আমরা যে তার কাছে কত দিক দিয়ে ঋণী সে কথাটাই আমাদের কানের কাছে অহরহ ট্যাটরা পিটিয়ে শুনিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ ছাড়া আরো দু-চারটে জাত পৃথিবীতে আছে, এবং ইংরেজই পৃথিবীর সর্বাঙ্গপেক্ষা ভূবনবরেণ্য মহাজন জাতি একথা স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়, এমন কি ইংরেজ যার উপর রাজত্ব করেছে সে যে একদিন বহু দিক দিয়ে ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী সত্য ছিল সে-কথাটা প্রচার করতেও তাদের বাধে না। বিশেষ করে ফরাসী এবং জার্মান এই কর্মটি পরমানন্দে করে থাকে। কোনো নিরপেক্ষ ইংরেজ পণ্ডিত কখনো জন্মান নি, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে দরদ দিয়ে ভারতবাসীকে 'তোমারা ছোট জাত নও' একথাটি বলতে ইংরেজের চিরকালই বেধেছে।

তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা খবর পেলুম যে চীন ও জাপানের বহুলোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্ম চীন ও জাপানের আত্মবিকাশে বহু দিক দিয়ে যুগ-যুগ ধরে সাহায্য করেছে, তবু সেই জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আমরা এঁদের সঙ্গে নতুন কোনো যোগসূত্র স্থাপনা করতে পারলুম না। এমন সময় এসেছে, চীন ও জাপান যেরকম এ-দেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধান অধিকতর সংখ্যায় আসবে ঠিক তেমনি আমাদেরও খবর নিতে হবে চীন এবং জাপানের উর্বর ভূমিতে আমাদের বোধিবৃক্ষ পাপী-তাপীকে কি পরিমাণ ছায়া দান করেছে।

এবং একথাও ভুললে চলবে না যে প্রাচ্যলোকে যে তিনটি ভূখণ্ড কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে যশ অর্জন করেছে তারা চীন ভারতবর্ষ ও আরবভূমি। এবং শুনুন যে ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ আরব ও চীন ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানে তা নয়, সংস্কৃতি সভ্যতার দিক থেকেও আমরা এই দুই ভূখণ্ডের সঙ্গমস্থলে আছি। এক দিকে মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতা এ-দেশে এসে আমাদের গিল্প-

কলাকে সম্মুখ করেছে, আবার আমাদের বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে আমরা চীন-জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই ভারতবাসীর পক্ষে আশংকা হইবেও এক দিকে যেমন সেমিতি (আরব) জগতের সঙ্গে তার ভাবের আদান প্রদান চলে, তেমনি চীন-জাপানের (মঙ্গোল) শিল্পকলা চিন্তাধারার সঙ্গেও সে যুক্ত হতে পারে। অথচ চীন আরব একে অন্যকে চেনে না।

তাই পূর্ব-ভূখণ্ডে যে নবজীবন সঞ্চারের সূচনা দেখা যাচ্ছে, তার কেন্দ্রস্থল গ্রহণ করবে ভারতবর্ষ। (ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টি বিন্দু থেকে আমাদের লক্ষ্য-পতীরা এ তথ্যটি বেশ কিছুদিন হল হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন—জাপান হাট থেকে সরে যেতেই অহমদাবাদ ডাইনে, পারস্য-আরব বায়ে জাভা-সুমাত্রাতে কাপড় পাঠাতে আরম্ভ করেছে।) ভৌগোলিক ও কৃষিজাত উভয় সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যদি আপন আসন গ্রহণ না করে তবে দোষ ভগবানের নয়।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মৌলভী-মৌলানারা আরবী-ফারসী জানেন। এঁরা এত দিন সুযোগ পান নি—এখন আশা করতে পারি, আমাদের ইতিহাস-লিখনের সময় তাঁরা ‘আরবকে ভারতের দান’ অধ্যায়টি লিখে দেবেন ও যে-স্থপতিকলা মোগল নামে পরিচিত তার মধ্যে ভারতীয় ও ইরান-তুর্কী কীরূপে মিশ্রিত হয়েছে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা চীন এবং জাপানের ভাষা জানি নে। [বিশ্বভারতীর ‘চীনা-ভবন’র শ্বার ভালো করে খুলতে হবে, এবং এই চীনা-ভবনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে চীন সভ্যতার অধ্যয়ন আলোচনা আরম্ভ করতে হবে।]

জাপান সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এতই কম যে জাপানে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। [তাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বীরভদ্র রাও চিত্র যখন তাঁর ‘শিল্পী’ কাগজে জাপানে সংগৃহীত ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন প্রকাশ করেন তখন অল্প পাঠকই সেগুলো পড়েন। বিশ্বভারতীর আরেক প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান হরিহরণ সাত বৎসর জাপানে থেকে উৎসাহের অন্ত নেই—তাঁর স্ত্রীও জাপানী মহিলা—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিদ্যার্থী তাঁর কাছে উপস্থিত হয় নি।]

ব্যক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ-লেখক জাপানী ভাষা জানে না। কিন্তু তার বিশ্বাস, জাপান সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল জাগাবার জন্য ইংরিজী এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা বই দিয়ে যতটা সম্ভবপর ততটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। জাপানী ছাড়া অন্য ভাষা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধে ভুল থাকার সম্ভাবনা প্রচুর, তাই প্রবন্ধ-লেখক গোড়ার থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় যে-সংস্কৃত চীন এবং জাপানে প্রসারলাভ করেছে সে-সংস্কৃতি প্রধানত বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষীয় তথা চৈনিক বৌদ্ধধর্ম ও জাপানী বৌদ্ধধর্ম এক জিনিস নয়—তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের এক প্রধান নীতি এই যে, প্রত্যেক ধর্মই প্রসার এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে

নূতন নূতন বাতাবরণের ভিতর নূতন নূতন রূপ ধারণ করে। জেরুজালেমের ঐঐঐঐ ও প্যারিসের ঐঐঐঐ এক জিনিস নয়, মিশরী মসলিমে ও বাঙালী মসলিমে প্রচুর পার্থক্য।

জাপানে যে-বৌদ্ধধর্ম বিন্দুটি লাভ করেছে সে-ধর্মও দুই দিক থেকে চর্চা করতে হবে। প্রথমত, জাপানীতে অনূদিত ও লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ,—এ কর্ম করবেন পণ্ডিতেরা, এবং এদের কাজ প্রধান গবেষণামূলক হবে বলে এর ভিতর সাহিত্য-রস থাকার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, জাপানী শ্রমণ-সাধু-সন্তদের জীবনী-পাঠ। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত লেখকের হাতে পড়লে সে-সব জীবনী নিয়ে বাঙলায় উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।

অধ্যাপক যাকব ফিশারের লেখা বৌদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ানের জীবনী পড়ে আমার এ-বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। অধ্যাপক ফিশার জাতে জার্মান, রিয়োকোয়ান জাপানী ছিলেন,—কিন্তু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বইখানি লেখা হয়েছে বলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে। পুস্তকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার সামান্য কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এ-দেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করতে পারে নি। বইখানি ইংরিজিতে লেখা, নাম Dew drops on a Lotus Leaf। আর কিছু না হোক নামটি আমাদের কাছে অচেনা নয় ‘নলিনীদলগতজলমতিতরলং’ বাক্যটি আমাদের মোহাবস্থায়ও আমরা ভুলতে পারি নি। শঙ্করাচার্য যখন ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ’ আখ্যায় নিন্দিত হয়েছেন তখন হয়তো জীবনকে পশ্চপটে জলবিন্দুর ন্যায় দেখার উপমাটাও তিনি বৌদ্ধধর্ম থেকে নিয়েছেন।

বহু মানবের হিয়ার পরশ পেয়ে
বহু মানবের মাঝখানে বেঁধে ঘর
—খাটে, ছেলে যারা মধুর স্বপ্ন দেখে—
থাকিতে আমার নেই তো অরুচি কোনো।
তবুও এ-কথা স্বীকার করিব আমি,
উপত্যকার নিজঁনতার মাঝে
—শীতল শান্তি অসীম ছন্দে ভরা—
সেইখানে মম জীবন আনন্দঘন ॥

শ্রমণ রিয়োকোয়ানের এই ক্ষুদ্র কবিতাটি দিয়ে অধ্যাপক ফিশার তাঁর রিয়োকোয়ান-চরিত্রের অবতারণিকা আরম্ভ করেছেন।

ফিশার বলেন : রিয়োকোয়ানের আমলের বড় জাগীরদার মার্কিনো তাঁর চরিত্রের খ্যাতি শুনে অত্যন্ত মন্থ হয়ে শ্রমণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তাঁর বাসনা হয়েছিল, শ্রমণের কাছ থেকে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করবেন।

মার্কিনোর দূত রিয়োকোয়ানের কুঁড়েঘরে পৌঁছাবার পূর্বেই গ্রামের লোক খবর পেয়ে গিয়েছিল যে স্বয়ং মার্কিনো রিয়োকোয়ানের কাছে দূত পাঠাচ্ছেন। খবর শুনে সবাই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কুটীরের চারদিকের জমি বাগান সব কিছু পরিষ্কার করে দিল।

রিয়োকোয়ান ভিনগায়ের গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন কুঁড়েঘরের চতুর্দিক সম্পূর্ণ সাফ। মাকিনোর দূত তখনো এসে পৌঁছয় নি। রিয়োকোয়ানের দুই চোখ জলে ভরে গেল, বললেন, “হায় হায়, এরা সব কি কাণ্ডটাই না করেছে। আমার সব চেয়ে আত্মীয় বন্ধু ছিল ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল। এই নির্জনতায় তারাই আমাকে গান শোনাত। তাদের বাসা ভেঙে ফেলা হয়েছে, হায়, তাদের মিষ্টি গান আমি আবার শুনব কবে, কে জানে?”

রিয়োকোয়ান বিলাপ করছেন, এমন সময় দূত এসে নিমন্ত্রণপত্র নিবেদন করল। শোকাভূত শ্রমণ উত্তর না দিয়ে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখে দূতকে দিলেন,

আমার ক্ষুদ্র কুটীরের চারি পাশে,
বেঁধেছিল বাসা ঝরা পাতা দলে দলে—
নৃত্যচটুল, নিত্য দিনের আমার নর্ম-সখা
কোথা গেল সব? আমার আতুর হিয়া
সান্ত্বনা নাইহি মানে।
হায় বলো মোর কি হবে উপায় এবি
জ্বলে গিয়ে তারা করিত যে মোর সেবা,
এখন করিবে কেবা?

ফিশার বলেন, দূত বুদ্ধিতে পারল নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

আমরা বলি, তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? আমাদের কবি, জাপানের কবি এবং ঝরা পাতার স্থান তো জাগীরদারের প্রাসাদকাননে হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন :

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে।^১

ফিশার বলেন, এই জাপানী শ্রমণ, কবি, দার্শনিক এবং ঋদ্ধশংকো^২, তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান।

রিয়োকোয়ান বহু বৎসর ধরে জাপানের কাব্যরসিক এবং তত্ত্বাত্মবিশীর্ণের মধ্যে সুপরিচিত, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়ায় মাত্র বৎসর ত্রিশ পূর্বে। যে-প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রজ্যার্ভূমিতে তিনি কিংবদন্তীর রাজবৈদ্য তাৎসুকিচি ইরিসওয়া বলেন, “আমার পিতামহী মারা যান ১৮৮৭ সনে। তিনি যৌবনে রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আমাকে বলেছেন।”

রিয়োকোয়ানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯১১ সনে প্রকাশিত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। স্বয়ং হকুসাই সে পুস্তকের জন্য ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। তার প্রায় পঁচিশ বৎসর পর রিয়োকোয়ানের প্রিয় শিষ্যা ভিক্ষুণী তাইশিন রিয়ো-

১ শেলার ‘What if my leaves are falling’ ভিন্ন অনুভূতিতে, ঐক্য দম্ভপ্রসূত।

২ Calligrapher=সুদর্শন লিপিকর।

কোয়ানোর কবিতা থেকে ‘পশ্চপত্রে শিশিরবিন্দু’ নাম দিয়ে একটি চর্যনিকা প্রকাশ করেন। রিয়োকোয়ানকে কবি হিসাবে বিখ্যাত করার জন্য ভিক্টরগী তাইশিন এ চর্যনিকা প্রকাশ করেন নি। তিনিই তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশি—আর যে পাঁচজন তাঁকে চিনতেন, তাঁদের খারণা ছিল তিনি কেমন যেন একটু বেখাপা, খামখেয়ালী ধরণের লোক, যদিও শ্রমণ হিসাবে তিনি অনিন্দনীয়। এমন কি রিয়োকোয়ানোর বিশিষ্ট ভক্তেরাও তাঁকে ঠিক চিনতে পারেন নি। তাঁদের কাছে তিনি অশ্রের, অমর্ত্য সাধক হয়ে চিরকাল প্রহেলিকা রূপ নিয়ে দেখা দিতেন। একমাত্র ভিক্টরগী তাইশিনই রিয়োকোয়ানোর হৃদয়ের সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন, চর্যনিকা প্রকাশ করার সময় তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সর্বসাধারণ যেন তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর মহানুভব হৃদয়ের পরিচয় পায়।

এ-মানুষটিকে চেনা কারো পক্ষেই খুব সহজ ছিল না। তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছিলেন কবিতা লিখে, ফুল কুড়িয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের রাস্তার উপর খেলাধুলো করে। তাতেই নাকি পেতেন তিনি সব চেয়ে বেশি আনন্দ। খেলার সাথী না পেলে তিনি মাঠে, বনের ভিতর আপন মনে খেলে যেতেন। ছোট ছোট পাখি তখন তাঁর শরীরের উপর এসে বসলে তিনি ভারী খুশি হয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তেন, মদ পেলে খেতে কসর করতেন না, আর নাচের দলের সঙ্গে দেখা হলে সমস্ত বিকেল-সন্ধ্যা তাদের সঙ্গে ফর্তি করে কাটিয়ে দিতেন।

বসন্ত-প্রান্তে বাহিরিন্দু ঘর হতে
ভিক্টর লাগি চলেছি ভাঙ ধরে—
হেরি মাঠ-ভরা নাচে ফুলদল
নাচে পথ-ঘাট ভরে।
দাঁড়াইনু আমি এক লহমার তরে
কথা কিছু ক’ব বলে
ও মা, এ কি দেখি! সমস্ত দিন
কি করে যে গেছে চলে!

এই আপন-ভোলা লোকটির সঙ্গে যখন আর আর সংসার-বিমুখ শ্রমণদের তুলনা করা যায় তখনই ধরা পড়ে শ্রমণ-নিষিদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে এর কবিজন-সুন্দর গভীর আত্মীয়তা-বোধ। এই ‘সর্বং শূন্যং সর্বং ক্ষণিকং’ জগতের প্রবহমান ঘটনাবলীকে তিনি আর পাঁচ জন শ্রমণের মত বৈরাগ্য ও বিরক্তির সঙ্গে অবহেলা করছেন না, আবার সৌন্দর্য-বিলাসী কবিদের মত চাঁদের আলো আর মেঘের মারাকেও আঁকড়ে ধরতে অথবা শোকাভূত হচ্ছেন না। বেদনা-বোধ যে রিয়োকোয়ানোর ছিল না তা নয়—তাঁর কবিতার প্রতি ছন্দে ধরা পড়ে তাঁর স্পর্শ-কাতর হৃদয় কত অশ্রুতেই সাড়া দিচ্ছে—কিন্তু সমস্ত কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর এমন একটি সংহত ধ্যানদৃষ্টি দেখতে পাই যার মূল নিশ্চয়ই বৌদ্ধ-ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের অন্তঃস্থল থেকে আপন প্রাণশক্তি সঙ্গ করছে।

অথচ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলে গিয়েছেন, তিনি কখনো কাউকে আপন ধর্ম দীক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করেন নি, অন্যান্য শ্রমণের মত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন নি।

তাই এই লোকটিকে বুঝতে জাপানেরও সময় লেগেছে। ফিশার বলেন, ১৯১৮ সনে শ্রীযুক্ত সোমা গায়েফু কতৃক 'তাইগু রিয়োকোয়ান' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র জাপানে এই শ্রমণের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

আজ তাঁর খ্যাতি শুধু আপন প্রদেশে, আপন প্রজ্যাভূমিতে সীমাবদ্ধ নয়। জাপানের সর্বত্রই তাঁর জীবন, ধর্মমত, কাব্য এবং চিন্তাধারা জানবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

সেই উত্তেজনা, সেই আগ্রহ বিদেশী শিক্ষক গায়ক ফিশারকেও স্পর্শ করেছে। দীর্ঘ আড়াই বৎসর একগ্র তপস্যার ফলে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার কল্যাণে আমরাও রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। উপরে উল্লিখিত রিয়োকোয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত সোমা গায়েফু ফিশারের গ্রন্থকে সপ্রেম আশীর্বাদ করেছেন, এবং এ-কথাও বলেছেন যে ফিশারই একমাত্র ইউরোপীয় যিনি শ্রমণ রিয়োকোয়ানের মর্মস্থলে পৌঁছতে পেরেছেন।

জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপারের এক গ্রামে ১৭৫৮ সালে রিয়োকোয়ানের জন্ম হয়। রিয়োকোয়ান-বংশ সে অঞ্চলে আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির জন্য সুপরিচিত ছিল। রিয়োকোয়ানের পিতা গ্রামের প্রধান বা অগ্রণীরূপে প্রচুর সম্মান পেতেন।

রিয়োকোয়ানকে বুঝতে হল তাঁর পিতার জীবনের কিছুটা জানতে হয়। তিনিও কবি ছিলেন এবং তাঁর কবিতাতেও এমন একটি স্বন্দর সব সময়ই প্রকাশ পায় যে স্বন্দর অবসান কোন কবিই এ জীবনে পান নি। সাধারণ কাঁব এ-রকম অবস্থায় কাব্য-জীবন ও ব্যবহারিক জীবনকে পৃথক করে নিয়ে পাঁচ জনের সঙ্গে যত দূর সম্ভব মিলে-মিশে চলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রিয়োকোয়ানের পিতার স্বন্দ-মুক্তি প্রয়াস এতই নিরঙ্কুশ ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল যে তিনি শেষ পর্যন্ত কোনো সমাধান না পেয়ে আত্মহত্যা করেন।

রিয়োকোয়ানের অন্যান্য ভাই-বোনরাও কবিতা রচনা করে জাপানে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনও সমাজের আর পাঁচ জনের জীবনের মত গতানুগতিক ধারায় চলতে পারে নি। রিয়োকোয়ানের ছোট দুই ভাই ও এক বোন প্রজ্যা গ্রহণ করেন।

ধন-সম্পত্তি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সব কিছুই ছিল, রাজধানীতে রিয়োকোয়ানের পিতা সুপরিচিত ছিলেন, বসন্ত-গ্রামের অধিবাসীরা রিয়োকোয়ান-পরিবারকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত, তৎসঙ্গেও কেন পরিবারের পিতা আত্মহত্যা করলেন, তিন পুত্র এক কন্যা চীরবস্থ গ্রহণ করলেন এ রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা রিয়োকোয়ান-জীবনীকার অধ্যাপক যাকব ফিশার করেন নি। তবে কি জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সে-যুগে এমন কোন পক্ষের বিরুদ্ধে

হয়ে উঠেছিল যে স্পর্শকাতর পরিবার মাগকেই হয় মৃত্যু অথবা প্রজ্ঞার আশ্রয় গ্রহণ করে সর্ব সমস্যার সমাধান করতে হত? ফিশার সে-রকম কোন ইঙ্গিতও করেন নি।

ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ান শিশু বয়স থেকেই অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির পরিচয় দেন। আর সব ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধুলায় মত্ত থাকত তখন বালক রিয়োকোয়ান তন্ময় হয়ে কন-ফুৎসিয়ের তঞ্চ-গম্ভীর রচনায় প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিতেন। তাঁর এই আচরণে যে তাঁর পিতা-মাতা ঈষৎ উদ্ভিগ্ন হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত ফিশার দিয়েছেন।

রিয়োকোয়ানের সব জীবনী-লেখকই দুটি কথা বার বার জোর দিয়ে বলেছেন। রিয়োকোয়ান বালক-বয়সেও কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি এবং যে যা বলত তিনি সরল চিন্তে তাই বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে ফিশার রিয়োকোয়ানের বাল্য-জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁর পিতা তাঁরই সামনে একটি দাসীকে অত্যন্ত কঠিন বাক্য বলেন। দাসীর দৃষ্টিতে রিয়োকোয়ান বড়ই ব্যর্থ হন ও ক্রুদ্ধ-মনে পিতার দিকে তাকান। পিতা তাঁর আচরণ লক্ষ্য করে বলেন, “এ রকম চোখ করে বাপ-মায়ের দিকে তাকালে তুমি আর মানুষ থাকবে না, ঐ চোখ নিয়ে মাছ হয়ে যাবে।” তাই শূন্যে বালক রিয়োকোয়ান বাড়ি ছেড়ে অন্তর্ধান করলেন। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। উদ্ভিগ্ন পিতা-মাতা চতুর্দিকে সংবাদ পাঠালেন। অবশেষে এক জেলে খবর পাঠাল, সে রিয়োকোয়ানকে সমুদ্রপারের পাষণ-স্তূপের কাছে দেখতে পেয়েছে। পিতা-মাতা ছুটে গিয়ে দেখেন, তিনি পাষণ-স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর সমুদ্রের ঢেউ তাঁর গায়ে এসে লাগছে। কোলে করে বাড়ি এনে বাপ-মা জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি ওখানে নিজনে সমস্ত দিন কি করছিলে?” রিয়োকোয়ান বড় বড় চোখ মেলে বলেন, “তবে কি আমি এখনো মাছ হয়ে যাই নি, আমি না দৃষ্টু ছেলের মত তোমাদের অবাধা হয়েছিলুম?”

রিয়োকোয়ান কেন যে সমস্ত দিন সমুদ্রপারে জলের কাছে কাটিয়েছিলেন তখন বোঝা গেল। মাছই যখন হয়ে যাবেন তখন জলের কাছে গিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকাই তো প্রশস্ততম পন্থা।

সংসার ত্যাগ করেও রিয়োকোয়ান পিতা-মাতা সম্বন্ধে কখনো উদাসীন হতে পারেন নি। মায়ের স্মরণে বৃন্দ্র শ্রমণ রিয়োকোয়ান যে কবিতাটি রচনা করেন সেটি মায়েরই ভালোবাসার মত এমনি সরল সহজ যে অনুবাদে তার সব মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায় :—

সকাল বেলায় কখনো গভীর রাতে

আঁখি মোর ধায় দূর ‘সাদো’^১ স্বপ্নে পানে

১ রিয়োকোয়ানের মাতা ‘সাদো’ স্বপ্নে জন্মেছিলেন।

শান্ত-মধুর কত না স্নেহের বাণী
মা আমার যেন পাঠায় আমার কানে ।

প্রব্রজ্যা

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন সত্তেরো তখন তাঁর পিতা রাজধানীতে চলে যাওয়ার তিনি গ্রামের প্রধান নির্বাচিত হলেন । তার দুই বৎসর পরে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করে সঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করেন ।

ধনজন সুখ-সমৃদ্ধি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই কেন যে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করলেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফিশার প্রচলিত কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করেছেন । কারো মতে রিয়োকোয়ানের কবিজন-সুলভ অথচ তত্ত্বান্বেষী মন জনপদপ্রমুখের দৈনন্দিন কূটনৈতিক কার্যকলাপে এতই ব্যাধিত হত যে তিনি তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সঙ্ঘের শরণ নেন ; কারো মতে ভোগ-বিলাসের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন ।

রিয়োকোয়ান নাকি এক সম্ভ্রাম তাঁর প্রণয়িনী এক গাইশা^১ তরুণীর বাড়িতে যান । এমনিতেই তিনি গাইশাদের কাছে থেকে প্রচুর খ্যাতির-স্বস্তি পেতেন, তার উপর তখন তিনি গ্রামের প্রধান । গাইশা-তরুণীরা রিয়োকোয়ানকে খুশি করার জন্যে নাচল, গাইল—প্রচুর মদও খাওয়া হল । কিন্তু রিয়োকোয়ান কেন যে চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন তার কোন কারণ বোঝা গেল না । তাঁর প্রিয় গাইশা-তরুণী বার বার তাঁর কাছে এসে তাঁকে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হল না । তিনি মাথা নিচু করে আপন ভাবনায় মগ্ন রইলেন ।

প্রায় চারশ টাকা খরচ করে সে রাতে রিয়োকোয়ান বাড়ি ফিরলেন ।

পরদিন সকাল বেলা রিয়োকোয়ান বাড়ির পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে বসলেন না । তখন সকলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখে, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুলে আছেন । কি হয়েছে বোঝবার জন্য যখন কম্বল সরানো হল তখন বেরিয়ে এল রিয়োকোয়ানের মুড়িডত-মস্তক আর দেখা গেল তার সর্বস্ব জাপানী শ্রমণের কালো জেঁবায় ঢাকা ।

আত্মীয়-স্বজনের বিস্ময় দূর করার জন্য রিয়োকোয়ান বিশেষ কিছু বললেন না, শুধু একটুখানি হাসলেন । তার পর বাড়ি ছেড়ে পাশের কহুশুজী সঙ্ঘের (মন্দির) দিকে রওয়ানা হলেন । পথে তাঁর বস্ত্রভা গাইশার বাড়ি পড়ে । সে দেখে অবাক, রিয়োকোয়ান শ্রমণের কুসুম্বাস পরে চলে যাচ্ছেন । ছুটে গিয়ে সে তাঁর জামা ধরে কেঁদে, অনুনয়-বিনয় করে বলল, “প্রিয়, তুমি এ কি করছে !

১ ‘গাইশা’ ঠিক বেশ্যা বা গণিকা নহে ; মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা অথবা প্রাচীন গ্রীসের ‘হেটেরে’ প্রণয়িনী ।

তোমার গারে এ বেশ কেন ?”

রিয়োকোয়ানেরও চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু তবু দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি সম্মুখ দিকে এগিয়ে গেলেন।

হায়, অনন্তের আহ্বান যখন পৌঁছয় তখন সে ঝঞ্ঝার সামনে গাইশা-প্রজাপতি ডানা মেলে কি বলভকে ঠেকাতে পারে ?

ফিশার বলেন, এ-সব কিংবদন্তী তাঁর মনঃপুত হয় না। তাঁর মতে এগুলো থেকে রিয়োকোয়ানের বৈরাগ্যের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

ফিশারের ধারণা, রিয়োকোয়ান প্রকৃতির স্বন্দ থেকে সম্যাসের অনুপ্রেরণা পান। তিনি যে-জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন সে-জায়গায় প্রকৃতি গ্রীষ্ম বসন্তে যে-রকম মধুর শান্তভাব ধারণ করে ঠিক তেমনি শীতকালে ঝড়-ঝঞ্ঝার রুদ্ধ রূপ নিয়ে আঘাত আবেগ দিয়ে জনপদবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফিশারের ধারণা-রিয়োকোয়ানের প্রকৃতিতে এই দুই প্রবৃত্তিই ছিল; এক দিকে ঝঞ্ঝা শান্ত পাইন-বনের মন্দ-মধুর গুঞ্জরণ, অন্য দিকে হিম ঝতুর ঝঞ্ঝা-মথিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছ্বাস।

প্রকৃতিতে এ স্বন্দের শেষ নেই—রিয়োকোয়ান তাঁর জীবনের স্বন্দ সমাধান-রূপে সম্যাস গ্রহণ করেন। ফিশার দৃঢ়কণ্ঠে এ কথা বলেন নি—এই তাঁর ধারণা।

মানুষ কেন যে সম্যাস নেয় তাঁর সমুদ্রের তো কেউ কখনো খুঁজে পায় নি। সম্যাসী-চক্রবর্তী তথাগত জরা-মৃত্যু দর্শনে ন্যাক সম্যাস গ্রহণ করেছিলেন; আরো তো লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন জরা-মৃত্যু চোখের সামনে দেখে, কিন্তু কই, তারা তো সম্যাস নেয় না? বার্থক্যের ভয়ে তারা অর্থসঞ্চয় করে আরো বেশি, মৃত্যুর ভয়ে তারা বৈদ্যরাজের শরণ নেয় প্রাণপণে—ত্রিশরণের শরণ নেবার প্রয়োজন তো তারা অনুভব করে না। যে জরা-মৃত্যু বৃন্দদেবকে সম্যাস এবং মৃত্তি এনে দিল সেই জরা-মৃত্যুই সাধারণ জনকে অর্থের দাস এবং বৈদ্যের দাস করে তোলে।

গাইশা-তরুণীর প্রেমের নিষ্ফলতা আর ক্ষণিকতা হৃদয়ঙ্গম করে রিয়োকোয়ান সম্যাস গ্রহণ করেন? তাই বা কি করে হয়? প্রেমে হতাশ হলেই তো সাধারণ মানুষ বৈরাগ্য বরণ করে,—রিয়োকোয়ানের বেলা তো দেখতে পাই গাইশা-প্রণয়িনী তাঁকে করুণ কণ্ঠে প্রেম-নিবেদন করে সম্যাস-মার্গ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।

এবং অতি সামান্য কারণেও তো মানুষ সম্যাস নেয়। কন-ফুৎসিন কেন সম্যাস গ্রহণ করেন তার কারণ ছন্দে বেঁধে দিয়েছেন :

মসৃণ দেহ উচপৃষ্ঠ উন্মত বলীয়ান

বৃষ চলিয়াছে ভয়ে তার কাছে কেহ নহে আগ্রহান

সে করিল এক খেনুর কামনা অর্মানি শৃঙ্খলাঘাত

আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র; সংসারে প্রণিপাত ! (—সত্যেন দত্ত)

এবং এ সব কারণের চেয়েও ক্ষুদ্রতর কারণে মানুষ যে সম্যাস নেয় তার উদাহরণ তো আমরা বাঙালী জানি। ‘ওরে বেলা যে পড়ে এল’—অত্যন্ত

সরল দৈনন্দিন অর্থে এক চাষা আর এক চাষাকে এই খবরটি যখন দিচ্ছিল তখন হঠাৎ কি করে এক জমিদারের কানে এই মামুলী কথা কয়টি গিয়ে পৌঁছিল। শুনেনি, সে জমিদার নাকি অত্যাচারীও ছিলেন এবং এককয়টি কথা যে পূর্বে কখনো তিনি শোনেন নি সে-ও তো সম্ভবপর নয়। তবে কেন তিনি সেই মূহূর্তেই পালকি থেকে বেরিয়ে এক বস্ত্রে সংসার ত্যাগ করলেন?

সমুদ্রবক্ষে বারিবর্ষণ তো অহরহ হচ্ছে, শৃঙ্খিতও অভাব নেই। কোটি কোটি বৃষ্টিবিন্দুর ভিতর কোনটি মৃত্যুর পরিণত হবে কেউ তো বলতে পারে না, হয়ে যাওয়ার পরেও তো কেউ বলতে পারে না কোন শৃঙ্খিত কোন মৃত্যুর মৃত্যু পেল।

রাজার ডাকঘর অমলের জানালার সামনেই বসল কেন? অমলই বা রাজার চিঠি পেল কেন?

শুধু পতঞ্জলি বলেছেন, 'তীর সংবেগানামাসন্নঃ' (১, ২৯)। অর্থাৎ যাদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল তাঁরাই চিন্তাবৃত্তি নিরোধ করে মোক্ষ পান। কিন্তু কাদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল হয় আর কেনই বা প্রবল হয় তার সন্ধান পতঞ্জলি তো দেন নি।

তাই বোধ হয় শাস্ত্রকাররা এই রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'সন্ন্যাসের সময়-অসময় নেই। যে মূহূর্তে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়, সেই মূহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।'

রিয়োকোয়ান উনিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এ-প্রসঙ্গে ফিশার বলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাস গ্রহণ স্বার্থপরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার থেকে তাঁকে স্বার্থপর বলা চলে না।'

এই সামান্য কথাটিতেই ফিশার ধরা দিয়েছেন যে তিনি ইয়োরোপীয়। সন্ন্যাস গ্রহণ কোনো অবস্থাতেই স্বার্থপরতার চিহ্ন নয়। অন্তত ভারতবর্ষে নয়।

সর্বস্ব ত্যাগ করে শান্তির সন্ধানে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের সম্মুখে কি কি বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হতে পারে, তার বর্ণনা ভারতবর্ষের সাধকেরা দিয়ে গিয়েছেন। সংসার ত্যাগের প্রথম উত্তেজনার মানুষ যে তখন সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে সীমারেখা টানতে পারে না, সে সাবধান-বাণী ভারতীয় গুরু বার বার সাধনার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এবং সব চেয়ে বেশি সাবধান করে দিয়ে গিয়েছেন উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনের বিরুদ্ধে।

ভারতবর্ষ নানা দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে এই সব চরম সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছে বলেই পরবর্তী যুগের ভারতীয় সাধকের ধ্যান-মার্গ অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চীন জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধভূমি ভারতবর্ষের এ ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত নয়। তারা নিয়েছে আমাদের সাধনার ফল—আমাদের পৃথক যে কত পতন-অভ্যুদয় স্ফারা বিক্ষুব্ধ, তার সন্ধান ভারতবর্ষের বাইরে কম সাধকই পেয়েছেন। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভবের প্রত্যাশা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে বহু নবীন সাধক সাধনার দৃঢ় ভূমি থেকে বিচ্যুত হন।

রিয়োকোয়ানের জীবনী-লেখক অধ্যাপক ফিশারের বর্ণনা হতে তাই দেখতে পাই, তিনি সশ্রম প্রবেশ করে কি অহেতুক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়ে নির্বাণের সম্মানে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বয়ং বৃদ্ধদেব যে সব আত্মনিপীড়ন বর্জনীয় বলে বার বার সাধককে সাবধান করে দিয়েছেন, বহু জাপানীসশ্রম সেই আত্মনিপীড়নকেই নির্বাণ লাভের প্রশস্ততম পন্থা বলে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল।

ফিশার বলেন, 'সশ্রম চৈত্যগৃহে কুশাসনের উপর পশ্চিমাসনে বসে দেওয়ালের দিকে মুখ করে নবীন সাধককে প্রহরের পর প্রহর আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করতে হত। একমাত্র আহারের সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়েই দেয়াল ছাড়া অন্য দিকে চোখ ফেরাবার অনুমতি তাদের ছিল না। একটানা কুড়ি ঘণ্টা ধরে কখনো কখনো তাদের ধ্যানে নির্মগ্নিত থাকতে হত এবং সেই ধ্যানে সামান্যতম বিচ্যুতি হলে পিছন থেকে হঠাৎ স্কন্ধাপরি গুরুদ্বারা নির্মম লগুড়াঘাত।'

ধ্যানে নির্মগ্নিত হবার চেষ্টা যারাই করেছেন, তাঁরাই জানেন, প্রথম অবস্থায় নবীন সাধক ক্লাস্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। একেই বলে জড়-সাধনা এবং পতঞ্জলি তাই যে উপদেশ দিয়েছেন, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, অল্প সময়ে ফললাভের আশা করা সাধনার প্রতিকূল। অত্যধিক মানসিক কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে কত সাধক যে বশ্ব উন্মাদ হয়ে যান, সে কথা ভারতীয় গুরু জানেন বলেই শিষ্যকে অতি সন্তপণে শারীরিক ও মানসিক উভয় সাধনাতে নিযুক্ত করে ধীরে ধীরে অগ্রগামী হতে উপদেশ দেন।

আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, রিয়োকোয়ান সশ্রম উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনায় ভেঙে পড়েন নি। নয় বৎসর ধ্যান-ধারণার পর তাঁর গুরুদ্বারা মৃত্যু হয়। রিয়োকোয়ান তখন সশ্রম ত্যাগ করে পর্যটকরূপে বাহির হয়ে যান। রিয়োকোয়ানের পরবর্তী জীবনযাপনের পদ্ধতি দেখলে স্পষ্ট অনুমান করা যায়, তিনি অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধনের নিষ্ফলতা ধরতে পেরেছিলেন বলেই সশ্রম ত্যাগ করে পর্যটনে বাহির হয়ে যান।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসর রিয়োকোয়ান ধ্যান-ধারণা ও পর্যটনে অতিবাহিত করেন। তাঁকে তখন কোন্ সব স্বন্দেবর ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল, তার সম্বন্ধ আমরা কিছুটা পাই তাঁর কবিতা থেকে; কিন্তু সেগুনালি থেকে রিয়োকোয়ানের সাধনার ইতিহাস কালানুক্রমিক ভাবে লেখবার উপায় নেই।

কিন্তু একটি সত্য আমরা সহজেই তাঁর কবিতা থেকে আবিষ্কার করতে পারি। স্বন্দেব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি রিয়োকোয়ান কখনো পান নি। মাঝে মাঝে দু'একটি কবিতাতে অবশ্য রিয়োকোয়ানকে বলতে শুনি, তিনি, শান্তির সম্বন্ধ পেয়েছেন, কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ভিন্ন কবিতায় তিনি হয় নব বসন্তের আগমনে উল্লসিত, নয় বৃষ্টি-বাদলের মাঝখানে দরিদ্র চাষার প্রাণান্ত পরিশ্রম দেখে বেদনানুভূতিতে অবসন্ন। আমার মনে হয়, রিয়োকোয়ান যে চরম শান্তি পান নি, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য। নিম্নবন্দ জীবনের সম্বন্ধ যারা পেয়েছেন, তাঁদের তো কবিতা রচনা করবার কোনো আবেগ থাকার কথা নয়। শান্ত

রস এক প্রকারের রস হতেও পারে, কিন্তু সে রস থেকে কবিতা সৃজন হয় কি না তা তো জানিনে এবং হলেও সে রস আশ্বাদন করবার মত স্পর্শকাতরতা আমাদের কোথায়? দাক্ষিণাত্যের আলংকারিকেরা তাই শঙ্করাবরণমুকে সম্যাস রাগ বলে সঙ্গীতে উচ্চ স্থান দিতে সম্মত হন না। তাঁদের বক্তব্য সম্যাসীর কোন অনুভূতি থাকতে পারে না, আর অনুভূতি না থাকলে রসসৃষ্টিও হতে পারে না।

রিয়োকোয়ানের কবিতা শঙ্করাবরণমু বা সম্যাসী রাগে রচিত হয় নি। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর সাধনা ও পর্যটনের পর যখন তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর পিতা জাপানের রাজনৈতিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার জন্য আত্মহত্যা করেছেন তখন এক মনোহরতাই তাঁর সমস্ত সাধনা-ধন তাঁকে বর্জন করল।

শ্রীষ্ট বলেছেন, “The foxes have holes and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.” অর্থাৎ মনুষ্য পুরুষের জন্মভূমি নেই, আবাসভূমিও নেই। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে রিয়োকোয়ান বিচলিত হয়ে হঠাৎ যেন বাল্যজীবনে ফিরে গেলেন।

হেথায় হোথায় যেখানে যখন আমি
তন্দ্রামগন,—সুপ্তির কোলে আপনারে দিই ছাড়া
সেই পুরাতন নিত্য নবীন স্বপ্নের মায়া এসে
গুঞ্জরে কানে, চিত্ত আমার সেই ডাকে দেয় সাড়া।
এ স্বপ্ন নয়, ক্ষণেকের খেদ, উড়ে-যাওয়া আবছায়া
এ স্বপ্ন হানে আমার বক্ষে অহরহ একই ব্যথা
ছেলেবেলাকার স্নেহ ভালোবাসা, আমার বাড়ির কথা।

এ কি শ্রমণের রাণী, এ কি সম্যাসের নিরাবলম্বতা!

ফিশার বলেন, ‘মাতৃভূমির আহ্বান রিয়োকোয়ানকে এতই বিচলিত করে ফেলল যে তিনি স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে সান্ধ্বনা দেবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।’

অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সান্ধ্বনা দেবার চেয়ে হয়ত সান্ধ্বনা পাওয়ার জন্যই তাঁর হৃদয় তুষাতুর হয়েছিল বেশি। আত্মজনের সঙ্গসুখ শ্রমণ রিয়োকোয়ান কখনো ভুলতে পারেন নি; সে-সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া ‘ক্ষণেকের খেদ’ নয়, চিন্তাকাশে ‘উড়ে-যাওয়া আবছায়া’ নয়, সে বেদনা অবচেতন মনে বাসা বেঁধে ক্ষণে ক্ষণে নির্বাণ অব্ধেষণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্যের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে কবি রিয়োকোয়ান শ্রমণ রিয়োকোয়ান হতে পারতেন না। কবি ও শ্রমণের মাঝখানে যে অক্ষর সেতু রিয়োকোয়ান নির্মাণ করে গিয়েছেন, যে-সেতু আমাদের কাছে চিরবিষ্ময়ের বস্তু, সেই সেতুর বিশ্বকর্মা তিনি কখনই হতে পারতেন না।

ফিশার বলেন, কিন্তু বাড়ির কাছে পৌঁছে রিয়োকোয়ান থমকে দাঁড়ালেন,

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (১ম)—১৪

প্রেম নাই প্রিয় লাভ আশা করি মনে

হাফিজের মত শ্রান্ত কে ভব-ভবনে !

এ শ্বশ্বেদর তুলনা দিয়েছেন সব কবিই আপন হৃদয় দিয়ে । পূর্ববঙ্গের কবি হাসান রাজা চিঁড়ে-ভানার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছেন,—

হাসনজানের রূপটা দেখি ফাল্দি ফাল্দি উঠে

চিঁড়া-বারা হাসন রাজার বৃকের মাঝে কুটে ।

রিয়োকোয়ান কান পেতে বৃকের ধুকধুকে শুনতে পেয়েছেন, ‘ভুল, ঠিক’, ‘ভুল, ঠিক’, ‘ভুল, ঠিক’ !

এ তো গেল রিয়োকোয়ানের মনের শ্বশ্বেদর কথা, কিন্তু বাইরের দিকে রিয়োকোয়ানের জীবন অত্যন্ত সহজ গতিতেই চলেছিল । আহাশ শয়ন বাসস্থান সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন বলে সন্ন্যাস-আশ্রমের অভাব অনটন তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি । তাঁর ভ্রাম্যমান জীবন সম্বন্ধে জাপানে বহু গম্প প্রচলিত আছে এবং সে গম্পগুলির ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়, শ্রমণ রিয়োকোয়ান আর কিছু না হোক, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, বিলাসবাসনের মোহ সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । কিন্তু এই গম্পগুলির কয়েকটি অনুবাদ করার পূর্বে বলে নেওয়া ভালো যে, বৃদ্ধ বয়সে রিয়োকোয়ান শ্বশ্রামের দিকে ফিরে আসেন, আর পাশের পাহাড়ের এক পরিতাপ্ত আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন । সেই জরাজীর্ণ গৃহে বহুকাল ধরে কেউ বসবাস করে নি, তার অর্ধেক ধনসে গিয়েছে, বাকিটুকু লতা-পাতার নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু ফিশার বলেন, বহু বৎসরের পরিস্রমণে শ্রান্ত-ক্লান্ত শ্রমণের কাছে এই ধ্বংসস্তূপই শান্তিনীড় বলে মনে হল ।

এই প্রত্যাবর্তন নিয়ে ফিশার দীর্ঘ আলোচনা করেন নি । আমাদেরও মনে হয়, করার কোনো প্রয়োজন নেই । গৃহী হোন আর সন্ন্যাসীই হোন, বার্ধক্যে আশ্রয়ের প্রয়োজন । রিয়োকোয়ানের বেলা শৃঙ্খল এইটুকু দেখা যায় যে, সর্ব-সংঘের শ্বার তাঁর সামনে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি শ্রমণমণ্ডলীর প্রধান তো হতে চানই নি, এমন কি কারো সেবা পরিত্যাগ গ্রহণ করতে পরাম্ভুখা ছিলেন ।

রিয়োকোয়ানের প্রত্যাবর্তন-সংবাদ পেয়ে তাঁর ভাই-বোনেরা তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি ।

বৃদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে ফিরেছিলেন বটে, কিন্তু রাজপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন নি ।

এই সময়ের লেখা একটি কবিতাতে রিয়োকোয়ানের শান্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় :—

১ জাতকের গম্প আছে এক বৃদ্ধ শ্রমণ কোন সংঘে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইলে সেই সংঘের প্রধান শ্রমণ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন । হয়তো জাতকের এই গম্পটি রিয়োকোয়ানের অজানা ছিল না, কারণ ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ান বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং জাতক বৌদ্ধধর্মের কতখানি স্থান অধিকার করেছে, সে কথা অমরাবতী, সাচীর ভাস্কর্যস্থাপত্য দেখলে আজও চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে ।

এই তো পেরেছি শান্তিনিলয়, খরতাপ হেথা নাই
জীবন-সাঁঝের শেষ ক'টি দিন কাটাব হেথায় আমি
স্বপ্নের মোহে, কল্পনা বন্ধে । গাছেতে ছায়াতে হেথা
আমারে রাখবে সোহাগে ঘিরিরা—কাটাব দিবস-স্বামী ।

কিংবদন্তীচয়ন

লুকোচুরি খেলা

রিয়োকোয়ান প্রকৃতি আর ছেলোপিলেদের নিয়েই বেশির ভাগ জীবন কাটিয়েছেন । ফিশার বলেন, তিনি কোনো জায়গাতেই কিছু দিন থাকলেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে চিনে নিত । ফিশার বলেন নি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃতিও তাঁকে চিনে নিত এবং রবীন্দ্রনাথের 'হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহে নি কথা' কবিতাটি আমার মতের সায় দেবে ।

রিয়োকোয়ান গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন । রাস্তায় ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলছিল । রিয়োকোয়ানকে দেখে তাদের উৎসাহ আর আনন্দের সীমা নেই । বেশি ঝুলোঝুলি করতে হল না । রিয়োকোয়ান তো নাচিয়ে বুড়ি, তার উপর পেয়েছেন মৃদঙ্গের তাল । তন্দুদেই খেলাতে যোগ দিলেন । খেলাটা বনের ভিতর ভালো করে জমবে বলে সবাই গ্রাম ছেড়ে সেখানে উপস্থিত । সবাই হেথায় হোথায় লুকোলো । রিয়োকোয়ান এ খেলাতে বহু দিনের অভ্যাসের ফলে পাকাপোক্ত—তিনি লুকোলেন এক কাঠুরের কুঁড়েঘরে । ঘরের এক কোণে কাঠ গাদা করা ছিল, তিনি তার উপরে বসে ঝোলা-ঝোলা আশ্চিন দিয়ে মৃদু ঢেকে ভাবলেন, ওখানে তাঁকে কেউ কক্‌খনো খুঁজে পাবে না, আর পেলেই বা কি, তাঁর তো মৃদু ঢাকা, চিনবে কি করে ?

খেলা চলল । সবাইকে খুঁজে পাওয়া গেল । রিয়োকোয়ান যে কুঁড়েঘরে লুকিয়েছিলেন, সে-কথা কারো অজানা ছিল না, কিন্তু ছেলেরা বলল, 'দেখি, আমরা সবাই চুপ-চাপ বাড়ি চলে গেলে কি হয় ?'

রিয়োকোয়ান সেই কাঠের গাদার উপর বসে সমস্ত বিকেল বেলাটা কাটালেন—পরদিন সকাল বেলা কাঠুরের বড় ঘরে ঢুকে চমকে উঠে বলল, 'ওখানে কে ঘুমুচ্ছে হে ?' তার পর চিনতে পেরে 'থ' হয়ে বলল, 'সে কি, সম্যাসী ঠাকুর যে ! আপনি এখানে কি করছেন ?'

রিয়োকোয়ান আশ্চিন-ফাশ্চিন নাড়িয়ে মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে চুপ, চুপ, চুপ । ওরা জেনে যাবে যে । বন্ধতে পারো না !'

'চলো' খেলা

রিয়োকোয়ানকে যে ছেলেমেয়েরা হামেশাই বোকা বানাতে পারত, সে-কথা সবাই জানে, আর পাঁচ জনও তাঁকে আকসার ঠকাবার চেষ্টা করত । কিন্তু প্রশ্ন, রিয়োকোয়ানের কাছে এমন কি সম্পদ ছিল যে মানুষ তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা করবে ?

ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা ছবির চেয়েও বেশি কদর পেত এবং সেই হাতের লেখায় তাঁর কবিতার মূল্য অনেক লোকই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু রিয়োকোয়ান চট করে যাকে তাকে কবিতা দিতে রাজী হতেন না, বিশেষ করে যারা তাঁর কবিতা বিক্রি করে পরস্যা মারার তাগে থাকত, তাদের ফন্দী-ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা সব সময়ই করতেন। গল্পগুলো থেকে জানা যায়, তিনি ফাঁদে ধরা পড়েছেনই বেশি, এড়াতে পেরেছেন মাত্র দু-এক বার।

আপানে ‘চলো’ খেলার খুবই চলতি, আর রিয়োকোয়ানকে তো কোন খেলাতেই নামাবার জন্য অত্যধিক সাধাসাধি করতে হত না।

রিয়োকোয়ান বন্ধু মনসুকের সঙ্গে এক দিন দেখা করতে গিয়েছিলেন। মনসুকে বললেন, ‘এসো, “চলো” খেলা খেলবে?’ রিয়োকোয়ান তো তৎক্ষণাৎ রাজী। মনসুকে খেলা আরম্ভ করার সময় বললেন, ‘কিছু একটা বাজি ধরে খেললে হয় না? তাহলে খেলাটা জমবে ভালো।’

রিয়োকোয়ান বলেন, ‘তা তো বটেই। যদি আমি জিতি তাহলে তুমি আমাকে কিছু কাপড়-জামা দেবে—শীতটা তো বেড়েই চলেছে।’

মনসুকে বললেন, ‘বেশ, কিন্তু যদি আমি জিতি?’

রিয়োকোয়ান তো মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন। তাঁর কাছে আছেই বা কি, দেবেনই বা কি? বললেন, ‘আমার তো, ভাই, কিছুই নেই।’

মনসুকে অতি কষ্টে তাঁর ফুতি^১ চেপে বললেন, ‘তোমার চীনা হাতের লেখা যদি দাও তাহলেই আমি খুশি হব।’ রিয়োকোয়ান অনিচ্ছায় রাজী হলেন। খেলা আরম্ভ হল। রিয়োকোয়ান হেরে গেলেন। আবার খেলা শুরুর, আবার রিয়োকোয়ানের হার হল। করে করে সবসুদ্ধ আট বার খেলা হল, রিয়োকোয়ান আট বারই হারলেন। আর চীনা হাতের লেখা না দিয়ে এড়াবার ঘো নেই।

রিয়োকোয়ান হস্তলিপি দিলেন। দেখা গেল, আটখানা লিপিতেই তিনি একই কথা আট বার লিখেছেন :

‘চিনি মিণ্টি

ওষুধ তেতো।’^১

মনসুকে যখন আপত্তি জানিয়ে বললেন, আট বার একই কথা লেখা উচিত হয় নি তখন রিয়োকোয়ান হেসে উত্তর দিলেন, ‘কিন্তু “চলো” খেলা কি সব বারই একই রকমের হয় না? তাই একই কথা আট বার লিখে দিয়েছি।’

কুড়িয়ে-পাওয়া

রিয়োকোয়ানকে কে যেন এক বার বলেছিল রাস্তায় পরস্যা কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী আনন্দ। একদিন আশ্রমে ফেরার পথে তিনি মনে মনে সেই কথা নিয়ে চিন্তা করতে করতে বললেন, ‘এক বার দেখাই যাক না, কুড়িয়ে পাওয়াতে কি আনন্দ লুকনো আছে।’ রিয়োকোয়ান ভিক্ষা করে কয়েকটি পরস্যা পেয়েছিলেন।

১ খুব সম্ভব কবিতাটির গুচ্ছার্থ, ‘রাজী জেতাতে বড় আনন্দ, আর রাজী হারাতে বড় দুঃখ।’

সেগুলো তিনি একটা একটা করে রাস্তায় ছাড়িয়ে ফের ভুলে নিলেন। অনেক বার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন রকম আনন্দই পেলেন না। তখন মাথা চুলকে আপন মনে বললেন, ‘এটা কি রকম হল? আমার সবাই বললে, কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী ফুর্তি’, কিন্তু আমার তো কোন ফুর্তি হচ্ছে না। তারাও তো ঠাকবার লোক নয়।’ আরো বহু বার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন সুখই পেলেন না। এই রকম করতে করতে শেষটাই বেথেয়ালে সব ক’টি পল্লসাই ঘাসের ভিতর হারিয়ে গেল।

তখন তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে পল্লসাগুলো খুঁজতে হল। যখন পেলেন তখন মহা ফুর্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, ‘এইরারে বন্ধুতে পেরেছি। কুড়িয়ে পাওয়াতে আনন্দ আছে বৈকি।’

ধূর্ত নাপিত

রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা এতই সুন্দর ছিল আর তাঁর কবিতাতে এমনি অপূর্ব রসসন্নিবিষ্ট হত যে তাঁর হাতের লেখা কবিতা কেউ যোগাড় করতে পারলে বিক্রি করে বেশ দুঃপয়সা কামাতে পারত। রিয়োকোয়ান নিজে শ্রমণ; কাজেই তিনি এসব লেখা বিক্রি করতেন না—গরিব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু কেউ ধাপ্পা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করার চেষ্টা করলে তিনি ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা করতেন।

শ্রমণকে মাথা নেড়া করতে হয়। তাই রিয়োকোয়ান প্রায়ই এক নাপিতের কাছে যেতেন। নাপিতটি আমাদের দেশের নাপিতের মতই ধূর্ত ছিল এবং রিয়োকোয়ানের কাছ থেকে অনবরত কিছু লেখা আদায় করার চেষ্টা করত। তাঁকে তাই নিয়ে বড় বেশি জ্বালাতন করলে তিনিও ‘দেব’ ‘দিদিছ’ করে কোন গাতিকে এ অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করতেন।

শেষটায় ধূর্ত নাপিত একদিন তাঁর মাথা অর্ধেক কামিয়ে বলল, ‘ঠাকুর, হাতের লেখা ভালোয় ভালোয় এই বেলা দিয়ে দাও। না হলে বাকী অর্ধেক আর কামাবো না।’ এরকম শয়তানির সঙ্গে রিয়োকোয়ানের এই প্রথম পরিচয়। কি আর করেন? হাতের লেখা দিয়ে মাথাটি মর্দিয়ে—উভয়থেকে—আশ্রমে ফিরলেন। নাপিতও সগর্বে সদম্ভে লেখাটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে দোকানের মাঝখানে টাঙালো—ভাবখানা এই, সে এমনি গুণী যে রিয়োকোয়ানের মত শ্রমণ তাকে হাতের লেখা দিয়ে সম্মান অনুভব করেন।

কিন্তু খন্দেরদের ভিতর দু’চারজন প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তাঁরা নাপিতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, লেখাতে একটা শব্দ সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গিয়েছে। নাপিত ছুটে গিয়ে রিয়োকোয়ানের ভুল দেখিয়ে শব্দ করে দেবার জন্যে বলল। তিনি বললেন, ‘ওটা ভুল নয়। আমি ইচ্ছে করেই ও রকম ধারা করেছি। তুমি আমার অর্ধেক কামিয়ে দিয়েছিলে। আমিও তাই লেখাটি শেষ করে নিই নি। আর ঐ যে বর্দা আমাকে সিম বিক্রি করে সে সর্বদাই

আমাকে কিছুটা ফাউ দেয়। তোমার লেখা লেখা যেটুকু বাদ পড়েছে সেটুকু বড়িকে লেখা দেবার সময় ফাউ করে জুড়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখে এসো।’

তার পর রিয়োকোয়ান অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুর্লিয়ে হাসলেন।

রিয়োকোয়ান ও মোড়ল তোমিতোরি

শ্রমণদের দিন কাটে নানা ধরনের লোকের আতিথ্য নিয়ে। রিয়োকোয়ান একবার অতিথি হলেন মোড়ল তোমিতোরির। জাপানে তখন ‘চলো’ খেলার খুব চলতি এবং রিয়োকোয়ান সর্বদাই এ-খেলাতে হারেন বলে সকলকেই তাঁর সঙ্গে খেলতে চায়।

তাই খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু রিয়োকোয়ানের অদৃষ্ট সেদিন ভালো ছিল। বাজীর পর বাজী তিনি জিতে চললেন। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ভারী খুশি—রিয়োকোয়ানও আনন্দে আত্মহারা। তোমিতোরি রিয়োকোয়ানকে বিলক্ষণ চিনতেন, তাই রগড় দেখবার জন্য হঠাৎ যেন ভয়ংকর চটে গিয়ে বললেন, ‘তুমি তো আচ্ছা লোক হে! অতিথি হয়ে এসেছ আমার বাড়িতে আর জিতে জিতে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিতে তোমার একটুকু লজ্জা হচ্ছে না? এ-রকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভদ্র কি করে বজায় রাখা যায় আমি তো ভেবেই পাচ্ছি নে।’

রিয়োকোয়ান রসিকতা না বুঝতে পেরে ভারী লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি কোনো গতিকে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন বন্ধু কেরার বাড়িতে। কেরা বন্ধুর চেহারা দেখেই বুঝলেন, কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলে, ‘কি করেছে, খুলে বলো।’ রিয়োকোয়ান বললেন, ‘ভারী বিপদগ্রস্ত হয়েছি। তোমিতোরির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কি যে করব ভেবেই পাচ্ছি নে। তুমি কিছু বুদ্ধি বাংলাতে পারো? তোমিতোরিকে যে করেই হোক খুশি করতে হবে।’

কেরা ব্যাপারটা শুনে তখনই বুঝতে পারলেন যে রিয়োকোয়ান রসিকতা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তিনিও চেপে গিয়ে দরদ দেখিয়ে বললেন, ‘তাই তো! তা আচ্ছা, কাল তোমাকে তোমিতোরির কাছে নিয়ে গিয়ে মাপ চাইব।’

রিয়োকোয়ান অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

পরদিন ভোরবেলা দুজনা মোড়লের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। রিয়োকোয়ান দোরের বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেরা ভিতরে গিয়ে যেন ভয়ংকর কিছু একটা হয়েছে, এ-রকম ভাবে গম্ভীর গলায় রিয়োকোয়ানের হয়ে তোমিতোরির কাছে মাপ চাইলেন। রিয়োকোয়ান উৎসবগে কাতর হয়ে কান খাড়া করে শুনতে পেলেন তোমিতোরি তাঁকে মাপ করতে রাজী আছেন। তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিচ্যুত কেটে গেল আর মহা খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ তোমিতোরির সামনে গিয়ে হাজির। তোমিতোরি প্রচুর খাতিরবন্ধ করে রিয়োকোয়ানকে বসালেন। রিয়োকোয়ানকে আর তখন পায় কে! খুশিতে সব কিছু বোঝা

ভুলে গিয়ে এক লহমার ভিতরেই বললেন, 'এসো, "চলো" খেলা আরম্ভ করা যাক ।'

রিয়োকোয়ান এমনই সরল মনে প্রস্তাবটা করলেন যে সবাই হেসে উঠলেন । খেলা আরম্ভ হল ।

এবারও রিয়োকোয়ান জিতলেন ।

কী বিপদ

রিয়োকোয়ান ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা-ধুলো করতে ভালোবাসতেন । তারা মাঝে মাঝে তাঁকে বড় বিপদগ্রস্ত করত ।

কথা নেই বার্তা নেই একদিন হঠাৎ একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল, 'ঠাকুর, আমায় একটা রায়ো দাও (রায়ো মুন্যার দাম প্রায় চার টাকার মত) ।' রিয়োকোয়ান তো অবাক । এক রায়ো ? বলে কি ? তাঁর কাছে দু'গুণ্ডা পয়সা হয় কি না হয় ।'

ছেলেরা ছাড়ে না । আরেক জন বলল, 'আমাকে দুটো রায়ো দাও ।' কেউ বলে তিনটে, কেউ বলে চারটে । নিলামের মত দাম বেড়েই চলল আর রিয়োকোয়ান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাত দুখানা মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে ভাবছেন অত টাকা তিনি পাবেন কোথায় ?

যখন নিলাম দশ রায়ো পেরিয়ে গেল তখন তিনি হঠাৎ দড়াম করে লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন ।

ছেলেরা তো এতক্ষণ নিলামের ফুর্তিতে মশগূল হয়ে ছিল । রিয়োকোয়ানকে হঠাৎ এরকম ধারা মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ভয়ে-ভয়ে কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, 'ও ঠাকুর, ওঠো । এরকম করছ কেন ?' কোনো সাড়াশব্দ নেই । আরো কাছে এগিয়ে এসে দেখে তাঁর চোখ বন্ধ, সমস্ত শরীরে নড়া-চড়া নেই ।

ভয় পেয়ে সবাই কানের কাছে এসে চেঁচাতে লাগল, 'ও ঠাকুর, ওঠো । ও-রকম ধারা করছ কেন ?' তখন কেউ কেউ বলল, 'ঠাকুর মারা গিয়েছেন ।' দু-চারজন তো হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলল ।

যখন হট্টগোলটা ভালো করে জমে উঠেছে তখন রিয়োকোয়ান আশ্চে আশ্চে চোখ মেললেন । ছেলেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল । যাক, ঠাকুর তাহলে মারা যান নি । সবাই তখন তাঁর আশ্চিন ধরে ঝুলোঝুলি করে চেঁচাতে লাগল, 'ঠাকুর মরে যান নি, ঠাকুর বেঁচে আছেন ।'

রায়োর কথা সবাই তখন ভুলে গিয়েছে । কানামাছি খেলা আরম্ভ হয়েছে । ঠাকুর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ।

*

*

*

ফিশার আরও বহু কিংবদন্তী উদ্ধৃত করে তাঁর পুঁজিকাথানি সর্বোৎসাহের সঙ্গে তুলেছেন । সেগুনুলো থেকে দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিয়োকোয়ান বয়স্ক লোকের সংসর্গ ত্যাগ করে ক্রমেই ছেলে-মেয়ে, প্রকৃতি আর প্রাণিজগৎ নিয়ে

দিন যাপন করেছেন। কিংবদন্তীর চেয়ে রিয়োকোয়ানের কবিতাতে তাঁর এই পরিবর্তন চোখে পড়ে বেশি।

বস্তুত, রিয়োকোয়ানের জীবনী আলোচনার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় তাঁর কবিতা পাঠ। কিন্তু তিনি তাঁর কবিতা লিখেছেন এমনি হালকা তুলি দিয়ে যে তার অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কোনো প্রকৃত সমঝদার যদি এই গদ্যরূপ গ্রহণ করেন তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখা সার্থক হবে।

মহাপরিনির্বাণ

ভিক্ষুণী তেইশা (তাইশিন) রিয়োকোয়ানের শিষ্যা ছিলেন সে-কথা এ জীবনীর প্রথম ভাগেই বলা হয়েছে। রিয়োকোয়ানের শরীর যখন তেহান্তুর বৎসর বয়সে জরাজীর্ণ তখন তিনি খবর পেলেন শ্রমণের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। সংবাদ পেয়ে তেইশা গদ্যরূপ পদপ্রাপ্তে এসে উপস্থিত হলেন।

সেই অবসন্ন শরীর নিয়ে শ্রমণ যে মধুর কবিতাটি রচনা করেছেন তার থেকে আমরা তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয়ের খানিকটা পরিচয় পাই,—

নয়ন আমার যার লাগি ছিল তুষাতর এত দিন

ভুবন ভরিয়া আজ তার আগমন

তারই লাগি মোর কঠোর বিরহ মধুর বেদনা ভরা

তারই লাগি মোর দিন গেল অগণন।

এত দিন পরে মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে আজ

শান্তি বিরাজে ঝঙ্কা-মথিত ক্ষুধা হৃদয়-মাঝ।

শেষ দিন পর্যন্ত তেইশা রিয়োকোয়ানের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। গদ্যরূপ মন প্রসন্ন রাখার জন্য তেইশা সব সময়ই হাসিমুখে থাকতেন, কিন্তু আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভিক্ষুণী কতটা কাতর হয়ে পড়েছিলেন ফিগার তাঁর পঙ্ক্তকে সে বেদনার কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন।

শেষ মূহুর্ত যখন প্রায় এসে উপস্থিত তখনো রিয়োকোয়ান তাঁর হৃদয়াবেগ কবিতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন—

নলিনীর দলে শিশিরের মত মোদের জীবন, হাস—

শূন্যগর্ভ বাতাহত হয়ে চলিছে সুমুখ পানে।

আমার জীবন তেমনি কাটিল, এবার হয়েছে শেষ

কাঁপন লেগেছে আমার শিশিরে—চলে যাবে কোন্‌খানে।

রিয়োকোয়ান শান্ত ভাবে শেষ মূহুর্তের প্রতীক্ষা করে ছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুণী তেইশার নারী-হৃদয় যে কতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল, সে-কথা তেইশাই ঐ সময়ের লেখা কবিতাটি থেকে বোঝা যায় :—

গভীর দুঃখে হৃদয় আমার সাস্থ্য নাহি মানে

এ মহাপ্রমাণ দুর্দমনীর বেদনা বক্ষে হানে।

সাধনার জানি, জীবন মৃত্যু প্রভেদ কিছই নেই

তবুও কাতর বিদায়ের ক্ষণ সমুখে আসিল যেই ।

এ কবিতা পড়ে আমাদের মত গৃহী একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ে । সর্বস্ব ত্যাগ করে, আজীবন শান্তির সন্ধান করার পরও যদি ভিক্ষুণীরা এ-রকম কথা বলেন তবে আমরা যাব কোথায় ? আমরা তো আশা করেছিলুম, দুঃখের আঘাত সয়ে সয়ে কোনো গতিকে শেষ পর্যন্ত হয়ত আত্মজনের চিরবিচ্ছেদ সহ্য করার মত খানিকটা শক্তি পাব, কিন্তু তার আর ভরসা রইল কোথায় ? ঋষি বলেছেন, 'একমাত্র বৈরাগ্যেই অভয়' ; কিন্তু তেইশার কবিতা পড়ে মানুষের শেষ আশ্রয় বৈরাগ্য সম্বন্ধেও নিরাশ হতে হল ।

জানি, এ কবিতা পড়ে রিয়োকোয়ান উত্তরে লিখেছিলেন—

রক্তপশ্মপত্রের মত মানব জীবন ধরে,

একে একে সব খসে পড়ে ভূমি 'পরে

ঝরার সময় লাগে তার গায়ে যে ক্ষুদ্র কম্পন

সেই তো জীবন ।

কিন্তু রিয়োকোয়ান তো ও-পারের যাত্রী—তার দুঃখ কিসের ? বিরহবেদনা তো তাদের তরেই, যারা পিছনে পড়ে রইল ।

“—কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়

অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,

কোথায় সাস্থনা ?” (রবীন্দ্রনাথ)

তাই ফিশার বলেন, 'শত শত লোক শ্রমণের শব-যাত্রার সঙ্গে গিয়েছিল । আর যে সব অগণিত ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তিনি খেলা-ধুলো করেছিলেন, তারাই যেন শ্রমণের শোকসন্তপ্ত বিরাট পরিবার ।'

ফিশার তাঁর পুস্তিকা শেষ করেছেন রিয়োকোয়ানের সর্বশেষ কবিতাটি উদ্ধৃত করে,—

চলে যাবো যবে চিরতরে হেথা হতে

স্মৃতির লাগিয়া কী সৌধ আমি গড়ে যাবো কোন্ পথে ?

কিন্তু যখন আসিবে হেথায় ফিরে ফিরে মধু ঋতু

পেলব-কুসুম মৃদু-লিত মঞ্জরি

নিদাঘের দিন স্বর্ণ-রৌদ্রে ভরা

কোকিল কুহরে, শরৎ-পবন গান গায় গুঞ্জরি

রক্তপত্র সর্ব অঙ্গে মেপল লইবে পরে

এরাই আমার স্মৃতিটি রাখিবে ধরে ।

এরাই তখন কহিবে আমার কথা

ফুলকুসুম মধুর কোকিল যথা

রক্তবসনা দীপ্তা মেপল শাখা

প্রতিবিস্তৃত আমার আত্মা—এদেরই হিয়ায় আঁকা ॥

ফুটবল

‘পরশুরামে’র কেদার চাটুজ্যে মশাই দূর থেকে বিশ্বর মেমসাহেব দেখেছিলেন ; আমিও দূর থেকে বিশ্বর সিনেমা স্টার, পলিটিশিয়ান আর ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছি। দেখে ওঁদের প্রতি ভক্তি হয়েছে এবং গদগদ হয়ে মনে মনে ওঁদের পেছাম জানিয়েছি।

তাই কি করে যে ‘ইস্টবেঙ্গল’ ক্লাবের কয়েকজন খেলোয়াড় এবং ম্যানেজার মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল তার সঠিক ব্যাখ্যা আমি এখনো সমঝে উঠতে পারি নি। তবে শুনছি আমরা যে-রকম খাঁচার ভিতর সিংহ দেখে খুঁশি হই, সিংহটাও নাকি আমাদের দিকে কৌতূহলের সঙ্গে তাকায় তার বিশ্বাস মানুষকে নাকি জড়ো করা হয় নিছক তাকে আনন্দ দেবার জন্য, যেদিন লোকের সংখ্যা কম হয় সেদিন নাকি সিংহ রীতিমত মন-মরা হয়ে যায়। (আরো শুনছি, একটা খাঁচার গোটাকয়েক শিক ভেঙে যাওয়াতে গরিলা নাকি দম্ভুরমত ভয় পেয়ে গিয়ে পেছন-ফিরে দাঁড়িয়েছিল—তার বিশ্বাস ছিল খাঁচাটার উদ্দেশ্য তাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য।)

তাই যখন ‘ইস্টবেঙ্গলে’র গুটিকয়েক রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমার দিকে তাকালেন তখন আমি খুঁশি হলুম বইকি। তারপর তাঁদের মাধ্যমে আর সন্মেলের সঙ্গেও মোলাকাত হয়ে গেল। সব ক’টি চমৎকার ভদ্রসন্তান, বিনয়ী এবং নম্র। আমি বরষ সদস্তে তাদের শুনিয়ে দিলুম ছেলেবেলার ‘বী’ টীমের খেলাতে কি রকম কায়দাসে একথানা গোল লাগিয়ে দিয়েছিলুম, অবশ্য সেটা সুইসাইড্‌ গোল ছিল।

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁদের খেলা দেখতে যাবো কি না ? বললুম, ফাইনালের দিন নিশ্চয়ই দেখতে যাবো। ম্যানেজার বললেন, তা হলে তো যে-করেই হোক ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে হবে—বিবেচনা করুন, একমাত্র নিতান্ত আমাকে খুঁশি করার জন্যই তাঁদের কি বিপদুল আগ্রহ !

ফাইনালের দিন ম্যানেজার আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

*

*

*

দিল্লীতে ফুটবলের কদর কম। খেলা আরম্ভ হওয়ার পনেরো মিনিট পূর্বে গিয়েও দিবা সীট পাওয়া গেল। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার এক চালাকে—শিটিফিট দেওয়ার জন্য। পরে দেখলুম, ও ওসব পারে না, সে জন্মেছে পশ্চিমে। বললুম, আরে বাপু, মুখে আঙুল পুরে যদি হুইসিলই না দিতে পারিস তবে ফুটবল খেলা দেখতে এসেছিস কেন ? রবিঠাকদরের ‘ডাকঘর’ দেখতে গেলেই পারিস।’

খেলা দেখতে এসেছে বাঙালী—তাদের অধিকাংশ আবার পশ্চিম-পাশের—আর মিলিটারি ; এই দুই সম্প্রদায়। মিলিটারী এসেছে গোখাঁ টীমকে সাহস দেবার জন্য, আর আমরা কি করতে গিয়েছি সে-কথা তো আর খুলে বলতে হবে না। অবশ্য আমাদের ভিতর যে ‘মোহনবাগান’ কিংবা ‘কালীঘাট’

ফ্যান ছিলেন না, সেকথা বলব না, তবে কলকাতা থেকে এত দূরে বিদেশে তাঁরা তো আর গোখাঁদের পক্ষ নিতে পারেন না। ‘দোস্ত নীস্ত, লেকিন দূশমন ই-দূশমন হস্ত’ অর্থাৎ ‘মিত্র নয়’ তবে শত্রুর শত্রু’ এই ফার্সী প্রবাদ সর্বত্র খাটে না।

পিছনে দুই সর্দারজী বস্তু ভ্যাচর ভ্যাচর করতে লাগল। ইন্টবেঙ্গল নাকি ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছে নিতান্ত লাক্সে কপাল জোরে, ওরা নাকি বস্তু রাফ খেলে (সবটু গোখাঁর সঙ্গে রাফ খেলবে ইন্টবেঙ্গল !) আর পদে পদে নাকি অফ-সাইড্। ইচ্ছে হাছিল লোকটাকে দু’ঘা বসিয়ে দি কিন্তু তার বপুটা দেখে সাহস হল না।

*

*

*

খেলার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হল ইন্টবেঙ্গল নিশ্চয় জিতবে। দশ মিনিটের ভিতর গোখাঁরা গোটা চারেক ফাউল করলে আর ইন্টবেঙ্গল গোটা তিনেক গোল দেবার মোকা নিম্নমভাবে মিস করলে। একবার তো বলটা গোল-বারের ভিতরে লেগে দুম করে পড়ে গেল গোল লাইনের উপর। গোালি সেটা তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেললে। আমি দু’হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে বললুম, হে মা কালী, বাবা মোলা আলী, তোমাদের জোড়া পাঠা দেব, কিন্তু এরকম আশ্চর্য্য দিয়ে মস্কোরা কোরো না, মাইরি।’ বলেই মনে পড়ল ‘মাইরি’ কথাটা এসেছে ‘মেরি’ থেকে। থুড়ি থুড়ি বলে ‘দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা-নাশিনী’কে স্মরণ করলুম।

হাফ-টাইম হতে চলল গোল আর হয়না—এ কী গববন্তনা রে, বাবা। ওদিকে অবশ্য ফাউলের সংখ্যা কমে গিয়েছে—রেফারি দেখলুম বেজায় দড় লোক। কেউ ফাউল করলে তার কাছে ছুটে গিয়ে বেশ দু’কথা শুনিয়েও দেয়। জীতা রহো বেটা। ফাউলগুলো সামলাও, তারপর ইন্টবেঙ্গলকে ঠাকাবে কেডা।

নাঃ, হাফ-টাইম হয়ে গেল। খেল তখনো আটকুড়ী—গোল হয় নি।

ওহে চানাচুর-বাদামা-ভাজা, এদিকে এসো তো, বাবা। না, থাক, শরবতই খাই। চেঁচাতে চেঁচাতে গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। চালাই পয়সাটা দিলে; তা দেবে না? যখন হুইসল দিতে জানে না। রেফারি আর কবার হুইসল বাজালে? সমস্তক্ষণ তো বাজালুম আমিই।

*

*

*

হাফ-টাইমের পর খেলাটা যদি দেখতেন! গপাগপ আরম্ভ হল পোলো দিয়ে রুই ধরার মত গোল মারা।

আমি তো খেলার রিপোর্টার নই, তাই কে যে কাকে পাস করলে, কে কতখানি প্যাটন উইভ করলে, কে কজন দূশমনকে নাচালে লক্ষ্য করি নি, তবে এটা স্পষ্ট দেখলুম, বলটাই যেন মনাস্থির করে ফেলেছে, সবাইকে এড়িয়ে গোখাঁর গোলে ঢুকবেই ঢুকবে। একে পাশ কাটিয়ে, ওর মাথার উপর দিয়ে, কখনো বা

তিন কদম পেঁছিয়ে গিয়ে, কখনো বা কারো দূ'পালের মধ্যস্থানের ফাঁক দিয়ে বলটা হঠাৎ দেখি বলটা ধাই করে হাওয়ায় চড়ে গোরা গোলের সামনে! সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বপ্নপিণ্ডটা এক লম্ফ দিয়ে টনিসলে এসে আটকে গিয়েছে—বিকৃতস্বরে বেরল 'গো—অ—অ—ল!' ('রূপদশী' দ্রষ্টব্য)।

ফুটবল ভাষায় একটি তীব্র 'সট'-এর ('Sot'—Shot নয়) ফলে গোলটি হল।

পিছনের সর্দারজী বললেন, 'ইয়ে গোল বচানা মদুশকিল নহী থা।'

আমি মনে মনে বললুম, 'সাহিত্যে একে আমরা বলি, "মদুখবন্দ"। এরপর আরো গোটা দুই হলে তোমার মদুখ বন্দ হবে। লোকটা জোরোলো না হলে—'

*

*

*

এ সব ভাবাভাবির পূর্বেই আরেকখানা সরেস গোল হয়ে গিয়েছে। কেউ দেখল, কেউ না। একদম বেমালুম। তারই ধকল কাটাতে কাটাতে আরেকখানা, তিসরা অতিশয় মান-মনোহর গোল! সেটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ও গোল কেউ বাঁচাতে পারত না। দশটা গোল লাগিয়ে দিলেও না।

এবার ম্যানেজারকে অভিনন্দন জানানো যেতে পারে। উঠে গিয়ে তাকে জোর শ্যাকহ্যান্ড করলুম। ভারী খুশি। আমায় বললে, 'প্রত্যেক গোলে আপনার রি-একশন লক্ষ্য করছিলাম। আমরা আমাদের কথা রেখেছি (অর্থাৎ ফাইনালে উঠেছি) আর আপনিও আপনার কথা রেখেছেন (আমি কথা দিয়েছিলাম ওরা ফাইনাল জিতবেই)।' তার সঙ্গী তো আমার হাতখানা কপালে ঠেকালে।

মোরগ যে রকম গটগট করে গোবরের ঢাঁবেতে ওঠে আমি তেমনি আমার চেয়ারে ফিরে এলুম। ভাবখানা, তিনটে গোলই যেন নিতান্ত আমিই দিয়েছি।

তারপর শী করে আরো একখানা।

দশ-বারো মিনিটের ভিতর ধনাধন চারখানা আদি ও অকৃগ্রিম, খাঁটি, নির্ভেজাল গোল।

পিছনের সর্দারজী চুপ।

চ্যালাকে বললুম, 'চলো বাড়ি যাই। খেলা কি করে জিততে হয়, হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলুম তো!'

রায়ে সব খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাতে গেলুম। গিয়ে দেখি এক টাউস ট্রাফ। সঙ্গে আরেকটা বাচ্চা। বললুম, 'বাচ্চাটাই ভালো। বড়টা রাখা শক্ত (উভয়ার্থে)।'

ওদেরই বিজয় নাইন-নাইন্টি পুঁড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম।

বেমকা

বন্ধুবর

গুলাম কুদ্দুসকে—

লোকসঙ্গীত ও বিদগ্ধ সঙ্গীতে যে পার্থক্য সেটা সহজেই আমাদের কানে ধরা পড়ে, তেমনি লোকসাহিত্য ও বিদগ্ধ সাহিত্যের পার্থক্য সম্বন্ধেও আমরা বিলক্ষণ সচেতন। আর্টের যে-কোনো বিভাগেই—নাট্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য—তা সে যাই হোক না কেন, এই বিদগ্ধ এবং লোকায়ত রসসৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যটা আমরা বহুকাল ধরে করে আসছি।

তাই বলে লোকসঙ্গীত কিম্বা গণ-সাহিত্য নিশ্চিন্দনীয় একথা কোনো আলংকারিকই কখনো বলেন নি। বাউল ভাটিয়াল বর্বরতার লক্ষণ কিম্বা বারমাসী যাত্রাগান রসসৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না, একথা বললে আপন রসবোধের অভাব ঢাক পিটিয়ে বলা হয় মাত্র।

কিন্তু যখন এই লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্য শহরের মাঝখানে স্টেজের উপর সাজিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাড়ম্বরে শোনানো এবং দেখানো হয়, তখনই আমাদেরব আপত্তি। যখনই বলা হয় এই সাঁওতাল নাচের সামনে ভরতনৃত্যম হার মানে কিম্বা বলা হয় এই ‘রাবণবধ’ পালা ‘ডাকঘরে’র উপর ছক্কা-পাঞ্জা মেরেছে—তোমরা অতিশয় বেরসিক বর্বর বুদ্ধদুয়া বলে এ তথ্যটা বুদ্ধিতে পারছো না, তখন নিরীহ বুদ্ধদুয়া হওয়া সত্ত্বেও আপত্তি না করে থাকতে পারি নে।

কথাটা খুলে বলি। লোকসঙ্গীত (এবং বিশেষত গণ-নৃত্য) ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পার্থক্য অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু একটা পার্থক্য এস্থলে বলে নিলে আমার প্রতিবাদের মূল তথ্যটা পাঠক সহজেই ধরে নিতে পারবেন। এই ধরুন, সাঁওতাল কিংবা গুজরাতের গরবা নাচ। এগুলো গণ-নৃত্য এবং এর সবচেয়ে বড় জিনিস এই যে, এ নাচে সমাজ বা শ্রেণীর সকলেই হিস্যাদার। চাঁদের আলোতে, না-ঠাণ্ডা না-গরম আবহাওয়াতে জনপদবাসী যখন দৃশ্যভূমিতে ফুটিয়া উঠে, তখন তারা সকলেই নাচতে শুরু করে। যাদের হাড় বন্ড বেশী বড়িয়ে গিয়েছে তারা ঘরে শুয়ে থাকে, কিন্তু যারা আসে তাদের কেউই নাচ থেকে বাদ যায় না। হয় নাচে, না হলে তোল বাজায়—বাচ্চা কোলে নিয়ে আধ-বয়সী মাদেরও নাচের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। তাই বলা যেতে পারে সাঁওতাল কিম্বা গরবা নাচ—অর্থাৎ তাবৎ গণ-নৃত্যই—নাচা হয় আপন আনন্দের জন্য, লোককে দেখানোর জন্য, কিম্বা ‘লোক দেখানো’র জন্য নয়। অর্থাৎ লোকনৃত্যে দর্শক থাকে না।

কিন্তু যখন উদয়শঙ্কর নাচেন তখন আমরা সবাই খেই খেই করে নেচে উঠি নে, কিম্বা যখন খানসানের চোখ বন্ধ করে জয়জয়ন্তী ধরেন তখন আমরা আর সবাই চেঁচাচেঁচি করে উঠি নে। ইচ্ছে যে একদম হয় না সে-কথা বলতে পারি নে, তবু যে করি নে তার একমাত্র কারণ উদয়শঙ্করের সঙ্গে পা মিলিয়ে কিম্বা খানসাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রসসৃষ্টি আমরা এক মূহুর্তের ভরেও করতে পারি

নে। (যদি পারতুম তবে উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্য, খানসাহেবের গান শোনবার জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করতুম না—কিন্ধা বলতে পারেন, সিংগীর গলায় আপন মাথা ঢোকাতে পারলে সাক্ষীসে যেতুম না)।

তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কিংবা নৃত্যের জন্য প্রোতা এবং দর্শকের প্রয়োজন।

লোকনৃত্যে যখন সবাই হিস্যা নিতে পারে আপন পা চালিয়েই, তখন এ কথা আশা করি সকলেই মেনে নেবেন যে, সে নৃত্য খুব সরল হওয়াই স্বাভাবিক। তাতে সূক্ষ্ম পায়ের কাজ থাকার কথা নয়, ভাবভঙ্গী প্রকাশের জন্য দুর্বোধ্য মূদ্রা সেখানে থাকতেই পারে না এবং তাই বলা যেতে পারে, সে নৃত্যে আর যা থাকে থাকুক, বৈচিত্র্য থাকতে পারে না!

তাই গণ-নৃত্য মাত্রই একধেয়ে।

কমর্নিষ্ট ভায়ারা (কমরেডরা) মনস্থির করেছেন গণ-কলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কলা এবং সেই গণ-নৃত্য শহরে বুদ্ধ-স্বাদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। তাই মেহমত, ততোধিক তকলিফ বরদাশ্ত করে তাঁরা শহরে স্টেজ খাটান, পর্দা বোলান, রঙ-বেরঙের আলোর ব্যবস্থা করেন আর তারপর চালান হৈদ্রাবাদী কিন্ধা কুয়াশ্বতুরেরও হতে পারে,—জানি নে, ধোপার নাচ। কিন্ধা গুজরাতী গরবা! বলেন, ‘পশ্যা, পশ্যা’—থুড়ি, ‘দ্যাখ, দ্যাখ, এরেই কয় লাচ।’

পূর্বেই নিবেদন করেছি গণ-নৃত্য নিশ্চন্দনীয় নয়, কিন্তু যে গণ-নৃত্য একধেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন হতে বাধ্য, সেই নাচ দেখতে হবে ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে? ঘন ঘন হাততালি দিয়ে বলতে হবে ‘মরি, মরি’? দু-চার মিনিটের তরে যে এ নাচ দেখা যায় না, সে কথা বলছি নে।

আলো-অন্ধকারে ভিন্ গাঁয়ে যাচ্ছেন, দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন, চাঁদ উঠি উঠি করেও উঠছেন না—এমন সময় দেখতে পেলেন গাঁয়ের মন্দিরের আঙিনায় একপাল মেয়ে মাথায় ছাঁদা-গুলা কলসীতে পিদিম রেখে চকর বানিয়ে ধীরে ধীরে মন্দ মন্দুর পা ফেলে নাচছে। জানটা তর হয়ে গেল। দু মিনিট দাঁড়িয়ে আলোর নাচ আর মেয়েদের গান, ‘সোনার দেওর, আমার হাত রাঙাবার জন্য মেহেদী এনেছ কি?’ দেখে নিলেন। কিন্তু তারপর? যে নাচ আশ্চে আশ্চে বিকাশের দিকে এগিয়ে যায় না, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, পর্দাবিন্যাসের ভিতর দিয়ে যে নাচ পরিসমাপ্তিতে পৌঁছয় না, সে নাচ দেখবেন কতক্ষণ ধরে? এ-নাচের পরিসমাপ্তি কোনো রসসৃষ্টির আভ্যন্তরীণ কারণে হয় না, এর পরি-সমাপ্তি হয় নর্তকীরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখনই।

আলো-অন্ধকার, চাঁদ উঠি-উঠি, শ্যাওলামাথা ভাঙা দেউলের পরিবেশ থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে-নিয়ে-আসা নৃত্য শহরের স্টেজে মূর্ছা তো যায় বটেই, তার উপর মাইক্রোফোনযোগে চিংকার করে তারস্বরে আপনাকে বলা হয় ‘এ নাচ বড় উমদা নাচ—’। এ নাচ আপনাকে দেখতে হয় আধঘণ্টা ধরে! আধঘণ্টা ধরে দেখতে হয় সেই নাচ, যার সর্ব পর্দাবিন্যাস মূর্খস্থ হয়ে যায় আড়াই মিনিটেই।

পনরো টাকার সীটে বসে (টাকাটা দিয়েছিলেন আমার এক গোলাপী

অর্থাৎ নিম্ন-কমুনিষ্ট কমরেড) আমি আর থাকতে না পেরে মদুখে আঙুল পুরে শিটি দিয়েছিলুম প্রাণপণ। হৈ হৈ রৈ রৈ। মার মার কাট কাট। এ কী বর্বরতা ?

আমি বললুম, 'কেন বাওয়া, আপিস্তি জানবার এই তো প্রলেটারিয়েট অব দি প্রলেটারিয়েট কারদা।'

আমরা হাসি কেন ?

প্রায় দ্বিশ বৎসর পূর্বে কবিগুরু বিশ্বভারতী সাহিত্য-সভায় এক খ্যাতনামা লেখকের সদ্য-প্রকাশিত একটা রচনা পাঠ করেন। রচনার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল, 'আমরা হাসি কেন' ?

এতদিন বাদে আজ আর সব কথা মনে নেই, তবে এইটুকু স্পষ্ট স্মরণে পড়ছে যে, বেগ'সন হাসির কারণ অনুসন্ধান করে যে সব তথ্যকথা আবিষ্কার করেছিলেন, প্রবন্ধটি মোটের উপর তারই উপর খাড়া ছিল।

প্রবন্ধ পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ আপন বক্তব্য বলেন।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য গুণীরাও তখন নানারকম মতামত দেন এবং সবাই মিলে প্রাণপণ অনুসন্ধান করেন, 'আমরা হাসি কেন' ? যতদূর মনে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত সব জনগ্রাহ্য কোনো পাকাপাকি কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরদিন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'হাসির কারণ বের করতে গিয়ে সকলের চোখের জল বেরিয়ে গিয়েছিল।' (ঠিক কি ভাষায় তিনি জিনিসটে রসিয়ে বলেছিলেন আজ আর আমার সম্পূর্ণ মনে নেই— আশা করি আচার্য অপরাধ নেবেন না)।

*

*

*

দিব্লী ফরাসিস ক্লাবের ('সেক'ল ফ্রাসে' অর্থাৎ 'ফরাসী-চক্র') এক বিশেষ সভায় মসিয়ে মাতের নামক এক ফরাসী গুণী গত বৃদ্ধবার দিন ঐ একই বিষয় নিয়ে অর্থাৎ 'আমরা হাসি কেন ?' একখানি প্রামাণিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ফরাসী রাজদূত এবং আরো মেলা ফরাসী-জাননেওয়ালা ফরাসী অফরাসী ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফরাসী কামিনীগণ সবদাই অত্যন্ত সুগন্ধ ব্যবহার করেন বলে ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল আমি বৃষ্টি প্যারিসে বসে আছি।

(এ কিছু নতুন কথা নয়—এক পূর্ববঙ্গবাসী শিয়ালদা স্টেশনে নেমেও গেরেছিলেন,—

ল্যামা ইসটিশানে গাড়ির থনে

মনে মনে আমেজ করি

আইলাম বৃষ্টি আলী-মিলার রঙমহলে

ঢাহা জেলায় বশ্যাল ছাড়ি।)

শুধু প্যারিস নয় আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন 'কোতি,' 'উবিগার' খুশবায়ের দোকানে বসে আছি।

ডাঃ কেসকর উত্তম ফরাসী বলতে পারেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে প্রাজল ফরাসীতে বক্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বেগ'সন আর সেই চিরন্তন কারানুসন্ধান, 'হাসি কেন'? আমি তো নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেলুম—দ্বিশ বৎসর পূর্বে যে রকমধারা হয়েছিলুম—কিন্তু তবু কোনো হৃদিস মিলল না।

কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই দিল্লী শহর যে ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক মহানগরী হতে চলল সেইটেই বড় আনন্দের কথা।

এতদিন ধরে আমরা ইয়োরোপকে চিনতে শিখলুম ইংরেজের মাধ্যমে এবং তাতে করে মাঝে মাঝে আমরা যে মারাত্মক মার খেয়েছি, তার হিসেব-নিকেশ এখনো আরম্ভ হয় নি। একটা সামান্য উদাহরণ নিন।

ইংরেজের আইরিশ স্টু, মার্টন রোস্ট আর প্লাম পুডিং খেয়ে খেয়ে আমরা ভেবেছি ইয়োরোপবাসীরা মাত্রই বুদ্ধি আহারাতি বাবতে একদম হট্টেনটট। তারপর যেদিন উত্তম ফরাসী রান্না খেলুম, তখন বুঝতে পারলুম, ক্লোয়াসী রুটি কি রকম উপাদেয়, একটি মামুলী অমলেট বানাতে ফরাসী কতই না কেরদানি-কেরামতি দেখাতে পারে, পাকা টমাটো, কাঁচা শসা আর সামান্য লেটিসের পাতাকে একটুখানি মালমশলা লাগিয়ে কী অপূর্ব স্যালাড্ নির্মাণ করতে পারে। মাস্টার্ড, উস্টারসস আর বিস্কর গোলমরিচ না মাখিয়েও যে ইয়োরোপীয় রান্না গলাধঃকরণ করা যায় সেইটি হৃদয়ঙ্গম হল ফরাসী রান্না খেয়ে।

তাই আমার আনন্দ যে, ধীরে ধীরে একদিন ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত এ-দেশে বসেই হবে।

সেক'ল ফ্রান্সে' দিল্লীবাসীকে তার জন্য তৈরী করে আনছেন।

*

*

*

প্রবন্ধ পাঠের পর মসিয়ো মার্তে' কয়েকটি রসালো গল্প বলেন। তিনি যে অনবদ্য ভাষায় এবং তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী সঙ্গালনে গল্পগুলো পেশ করেছিলেন সে জিনিস তো আর কালি-কলমে ওতরাবে না—তাই গল্পটি পছন্দ না হলে মসিয়োর নিন্দা না করে দোষটা আমারই ঘাড়ে চাপাবেন।

এক রমণী গিয়েছেন এক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। তিনি ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার তাঁকে কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই আশঘাটো ধরে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। অতি কষ্টে সুযোগ পাওয়ার পর রমণী বললেন, 'ডাক্তার, আমাকে অতশত বোঝাচ্ছেন কেন? আমি এসেছি আমার স্বামীর চিকিৎসা করতে।'

ডাক্তার বললেন, 'ও! তাঁর কি হয়েছে?'

রমণী বললেন, 'ঠিক ঠিক বলতে পারব না তবে এইটুকু জানি, তাঁর বিশ্বাস তিনি সীল মাছ।'

'বলেন কি? তা, তিনি এখন কোথায়?'

'তিনি বারান্দায় বসে আছেন।'

‘তাকে নিয়ে আসুন তো, দেখি, ব্যাপারটা কি।’

ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সীল মাছ।

গাইড

দিল্লীতে একটি সরকারী টুরিস্ট বুরো বসেছে। তার প্রধান কর্ম টুরিস্টদের সদৃশপদেশ দেওয়া, এটা সেটা করে দেওয়া এবং বিচক্ষণ গাইডের তদারকিতে শহরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দেখানো।

এই সম্পর্কে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে চিঠি লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন, দিল্লীতে বিচক্ষণ গাইডের বিলক্ষণ অভাব। আমি পত্রলেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

‘পাণ্ডা’ এবং ‘গাইড’ হরদেরে একই মাল। তীর্থস্থলের গাইডকে পাণ্ডা বলা হয়—তাই গয়াতে আপনি পাণ্ডা ধরেন, কিংবা বলুন, পাণ্ডা আপনাকে ধরে—আর ঐতিহাসিক ভূমি এবং তীর্থক্ষেত্রের যাদু সম্ভব ঘটতে তবে সেখানে পাণ্ডা এবং গাইডের সম্ভব হয়। যেমন জেরুজালেম। তিন মহা ধর্ম—ক্রীস্টান, ইহুদী এবং মুসলমান—এখানে এসে সম্মিলিত হয়েছে। তার উপর জেরুজালেমের অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। ফলে পৃথিবীর হেন দেশ হেন জাত নেই যেখান থেকে তীর্থযাত্রী (পাণ্ডার বলির পাঠা) এবং টুরিস্ট (গাইডের কুরবানীর বকরী) জেরুজালেমে না আসে।

দিল্লী অনেকটা জেরুজালেমের মত। এর ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, তীর্থের দিক দিয়ে এ জায়গা কম নয়। চিশতী সম্প্রদায়ের যে পাঁচ গুরু এদেশে মোক্ষলাভ করেছেন তাঁদের তিনজনের কবর দিল্লীতে। কুতুব-মিনারের কাছে কুৎব উদ্দীন খতিয়ানের কাকীর (ইনি ইলতুৎমিশ-অলতমশের গুরু) কবর, হুমায়ূনের কবরের কাছে নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার কবর (ইনি বাদশা আলা উদ্দীন খিলজী এবং মুহম্মদ তুগলকের গুরু) আর দিল্লীর বাইরে শেষ গুরু নাসির উদ্দীন চিরাগ-দিল্লীর কবর। আর কালকাজী, যোগমায়া তো আছেনই।

এ সব জায়গায় পাণ্ডারা যা গাঁজাগুল ছাড়ে সে একেবারেই অবর্ণনীয়। এদিকে বলবে এটা হচ্ছে আকবরের দুধ-ভাইয়ের কবর, ওদিকে বলবে, তিন হাজার বছরের পুরনো এই কবরের উপরকার এমারত!

বেঙ্গল কমিকেলের আমার এক স্নহৃদ গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। পাণ্ডা দেখালে এক দোলনা—ভক্তিতে বললে, এ দোলায় দোল খেতেন রাধাকৃষ্ণ পাশাপাশি বসে। বম্ধুটি নাস্তিক নন, সন্দেহপিপাসাচ। বললেন, ‘যে কড়ির সঙ্গে দোলনা ঝোলানো রয়েছে, তাতে তো লেখা রয়েছে, টাটা কোম্পানির নাম; আমি তো জানতুম না, টাটা এত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।’

পরদিন বৃন্দাবন থেকে সজল নয়নে বিদায় নেবার বেলা বম্ধু সে জায়গায় গিয়ে দেখেন, কড়িতে প্রাণপণ পলস্তারার পর পলস্তারা রঙ লাগানো হচ্ছে।

*

*

*

দিব্লীতে ভালো গাইডের সতাই অভাব। সখা এবং শিষ্য শ্রীমান বিবেক ভট্টাচার্য কপালী লোক। তিনি কখনো কখনো ভালো গাইড পেয়ে যান—সে বিষয়ে তিনি ‘দেশে’ মনোরম প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু সচরাচর আপনার কপালে এখানে যা গাইড জুটবে তারা না জানে ইতিহাস এবং না পারে ছড়াতে গাজা-গুল।

ভালো গাইড মানে কথকঠাকুর, আর্টিস্ট। তাঁর কর্ম হচ্ছে, ইতিহাস আর কিস্বদন্তী মিলিয়ে মিশিয়ে আপনাকে গল্পের পর গল্প বলে যাওয়া, আর সে সব গল্প শুনে আপনি এত খুশী যে দিনের শেষে তাঁকে পাঁচ টাকা দিতে আপনার বুক কচকচ করে না।

একদা ভিয়েনা শহরে আমি এই রকম একটি গাইড পেয়েছিলুম। শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাতে দেখাতে বললে, ‘এই দেখুন শ্যোনব্রুন প্রাসাদ। রাজাধিরাজ ফ্রান্ৎস্‌স্লোসেফ এখানে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখতেন পল্টনের কুচকাওয়াজ। দেশ-বিদেশের গেরেমভারী রাজকর্মচারী রাজদূতেরা হুজুরের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে দেখতেন আমাদের শৌর্য বীর্য আমাদের ঐশ্বর্য। তারপর হুজুরে বেরতেন সোনারপাত মোড়া গাড়িতে, বীবীসাহেবা বেরতেন রূপোর গাড়িতে। আহা, কোথায় গেল সে সব দিন!’

খানিকক্ষণ পর বাড়ি ফেরার পথে গাইড বলল, ‘দেখুন দেখুন, এই ছোট বাড়িখানা, ফ্রান্ৎস্‌স্লোসেফ যে রকম রাজার রাজা ছিলেন, ঠিক তেমনি সঙ্গীতে রাজার রাজা বেটোফেন দৈন্য-ক্রেমে কাতর হয়ে এই লজঝড় বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর শেষ কটি সিমফনি—সেই ত্রিলোকবিখ্যাত স্বর্গীয় সঙ্গীতসুধা কে না পান করেছে বলুন—তিনি এইখানেই রচেনিচলেন।’

আমি করজোড়ে সে বাড়িকে নমস্কার করলুম দেখে গাইডের হৃদয়ে বিষাদে হরিষ দেখা দিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে, ‘একটুখানি চক্কর মেরে বেটোফেন যে বাড়ীতে দেহ-ত্যাগ করেছিলেন সেইটে দেখিয়ে দাও।’

সে বাড়ির সামনে আমরা দুজনাই নিম্মবধ ! এই জীর্ণ শীর্ণ দরিদ্র গৃহে রাজাধিরাজ বেটোফেন দেহত্যাগ করলেন।

*

*

*

আমরা বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ গাইড ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেন, ‘একটু তাড়াতাড়ি চালাও বাছা, ঐ পাশের বাড়িতে আমার শাশুড়ি থাকেন, খান্ডার রমণী, পাছে না দেখে ফেলে।’

আচার্য তুচ্চি

দিব্লীর ইন্ডিয়ান কালচারেল এসোসিয়েশন গত শুক্রবার দিন ইতালির খ্যাতনামা অধ্যাপক জিয়োসেপে তুচ্চিকে এক সভায় নিমন্ত্রণ করে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সভামূলে ইতালির রাজদূত ও শ্রীষুভা তুচ্চিও উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-তিব্বত-চীনের ইতিহাস এবং বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ এবং দেশদেশান্তরে তার প্রসার সম্বন্ধে আজকের দিনে অধ্যাপক তুচ্চির যে

জ্ঞান আছে তার সঙ্গে বোধ হয় আর কারোর তুলনা করা যায় না। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে সব শাস্ত্র সংস্কৃতে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তিব্বতী এবং চীনা অনুবাদে এখানে পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে অধ্যাপক তুচ্চ নানাপ্রকারের তথ্য ও তথ্য সংগ্রহ করে বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস নির্মাণ করে যাচ্ছেন, সে ইতিহাস ভারতের গৌরব বর্ধন করে চলেছে। ঠিক বলতে পারব না কিন্তু অনুমান করি, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি এই কর্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁর স্বাস্থ্য এখনো অটুট; তাই আশা করা যেতে পারে তিনি আরো বহু বৎসর ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যার সেবা করতে পারবেন।

*

*

*

ইতালির ইস্কুলে থাকতেই তুচ্চ সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন। কলেজে ঢোকান পূর্বেই তাঁর মহাভারত, রামায়ণ ও কালিদাসের প্রায় সব কিছুই পড়া হয়ে গিয়েছিল—টোলে না পড়ে এতখানি সংস্কৃত চর্চা এই ভারতেরই কটি ছেলে করতে পেরেছে? কলেজে তুচ্চ সংস্কৃতির বিখ্যাত অধ্যাপক ফরমিকির সংস্রবে আসেন। অধ্যাপক ফরমিকির নাম এদেশে সুপরিচিত নয়, কিন্তু ইতালির পণ্ডিত মাঠই জানেন, সে দেশে সংস্কৃত-চর্চার পত্তন ও প্রসারের জন্য তিনি কতখানি দায়ী। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল অবিচল অনুরাগ এবং গভীর নিষ্ঠা। অধ্যাপক তুচ্চ তাঁর অন্যতম সার্থক শিষ্য।

*

*

*

অধ্যাপক সিলভা লেভি, উইনটারনিংস ও লেসনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে স্বদেশে চলে যাওয়ার পর এদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ করেন অধ্যাপক ফরমিকি এবং তুচ্চকে। ১৯২৫এ এঁরা দুজন ভারতবর্ষে আসেন।

অধ্যাপক ফরমিকি শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত পড়াবার সুযোগ পেয়ে বড় আনন্দিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, ‘জানো’, সমস্ত জীবনটা কাটল ছাত্রদের সংস্কৃত ধাতুরূপ আর শব্দরূপ শিখিয়ে। রসিয়ে রসিয়ে কাব্যনাট্য পড়ানো আরম্ভ করার পূর্বেই তাদের কোর্স শেষ হয়ে যায়—তারা তখন স্বাধীনভাবে সংস্কৃত-চর্চা আরম্ভ করে দেয়। জীবনে এই প্রথম শান্তিনিকেতনে সুযোগ পেলুম পরিণত-জ্ঞান ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাব্যনাট্য পড়ার। ব্যাকরণ পড়াতে হচ্ছে না, এটা কি কম আরামের কথা।’

এবং আশ্চর্য, আমার মত মুর্থদেরও তিনি অবহেলা করতেন না। এবং ততোধিক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর—কঠিন জিনিস সরল করে বোঝাবার। সাংখ্য বেদান্ত তখনো জানতুম না, এখনো জানি নে, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে বসুমতী বেহনের বাড়ির বারান্দায় মোড়াতে বসে সাংখ্য এবং বেদান্তের প্রধান পার্থক্য তিনি কি অশ্রুত সহজ ভাষায় বঝিয়ে বলেছিলেন। তিতিক্ষু পাঠক অপরাধ নেবেন না, যদি আজ এই নিয়ে গর্ব করি যে, অধ্যাপক ফরমিকি আমাকে একটুখানি স্নেহের চোখে দেখতেন। রাস্তায় দেখা হলেই, সাংখ্য বেদান্তের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বাজিয়ে নিতেন, যা শিখিয়েছেন আমার ঠিক ঠিক মনে আছে কি না।

হেমলেট চরিত্রের সাইকো-এনালিসিস ইয়োরোপে তিনিই করেন প্রথম। হেমলেট যে কেন প্রতিবারে তার কাকাকে খুন করতে গিয়ে পিছু-পা হত সে কথা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

*

*

*

গদরু পড়াতে সংস্কৃত আর শিষ্য পড়াতে ইতালিয়ান। অধ্যাপক তুচ্চির অন্যতম মহৎ গুণ, তিনি ছাত্রের মনস্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে অধ্যাপনা করেন। আমরা একটুখানি ইতালিয়ান শিখে নিয়ে বললুম, এইবারে আমরা দানুন্দজিরো পড়ব।

তুচ্চি বললেন, ‘উপস্থিত মাদর্জিনি পড়ো।’

তারপর বদুয়িয়ে বললেন, ‘তোমরা এখন স্বাধীনতার জন্য লড়াছো। তোমাদের চিন্তাজগতে এখন স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতা-সংগ্রাম কাকে বলে এই নিয়ে তোলপাড় চলছে। আর এসব বিশ্লেষণ মাদর্জিনি যে রকম করে গিয়েছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে তিনি যে রকম উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন এ রকম আর কেউ কখনো পারেন নি। তোমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এগুলো মিলে যাবে, ভাষা-শেখাটাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে।’

হলও তাই। অধ্যাপক তুচ্চি শাস্ত্রসমাহিত গম্ভীর প্রকৃতির পণ্ডিত নন—তঁার খাঁচ অনেকটা ফরাসিস। অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে যান আর মাদর্জিনির ভুবন-বিখ্যাত বক্তৃতাগুলোতে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রচুরতম খোরাক রয়েছে তা যাঁরা মাদর্জিনি পড়েছেন তাঁরাই জানেন—এমন কি এই গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ও চার্চিল মাদর্জিনির বক্তৃতা আপন বক্তৃতায় কাজে লাগিয়েছেন। তুচ্চি পড়াতে পড়াতে উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠতেন আর দিক্চক্রবালের দিকে হাত বাড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে মাদর্জিনির ভাষায় বলতেন,

“আভান্টি, আভান্টি ও ফ্রাতেল্লি।”

“অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, হে ভ্রাতৃবৃন্দ—”

‘আসবে সে দিন আসবে, যেদিন নবজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে তোমরা পিছন পানে তাকাবে—পিছনের সব কিছুর তখন এক দৃষ্টিতেই ধরা পড়বে, তার কোনো রহস্যই তোমাদের কাছে তখন আর গোপন রইবে না ; যেসব দুঃখবেদনা তোমরা একসঙ্গে সয়েছ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তোমরা তখন আনন্দের হাসি হাসবে।’

এসব সাহসের বাণী সর্বমানবের সুপরিচিত। আমরা যে উৎসাহিত হয়েছিলাম তাতে আর বিচির কি ?

*

*

*

তারপর দীর্ঘ সাতাশ বৎসর কেটে গিয়েছে। এর ভিতর অধ্যাপক তুচ্চি পাণ্ডুলিপির সম্মানে ভরত-তিস্বত বহুবীর ঘুরে গিয়েছেন এবং তাঁর পরিশ্রমের ফল ভারতীয় জ্ঞানভান্ডার এবং ইতালীর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ইতালির প্রাচ্যবিদ্যামন্দির আচার্য তুচ্চির নিজের হাতে গড়া বললে অভ্যুত্তীর্ণ করা হয় না। শুধু যে সেখানে সংস্কৃত, পালির চর্চা হয় তাই নয়,

বাঙলা, হিন্দী শেখাবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে, এবং চীনা, জাপানী, তিব্বতী ভাষার অনুসন্ধান করে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেখানে লেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তুচ্চি নিজে যে সব প্রাচীন পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যে সব সারগর্ভ পুস্তক রচনা করেছেন, তার সম্পূর্ণ তালিকা দিতে গেলেই এ গ্রন্থের আরো দু'পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে।

*

*

*

সম্বর্ধনা-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আচার্য তুচ্চি বলেন, 'বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারত-ইতালীতে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগসূত্র স্থাপিত ছিল সে কথা আপনারা সকলেই জানেন (দক্ষিণ-ভারতে আজও প্রতি বৎসর বহু রোমান মূদ্রা আবিষ্কৃত হয়), কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়। ভারত-ইতালির আত্মায় আত্মায় যে ভাব বিনিময় হয়েছিল সেইটেই সবচেয়ে মহান তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বানুসন্ধান করে নতুন করে আমাদের ভাবের লেনদেন, আদানপ্রদান করতে হবে।

'আমি ইতালিতে যে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছি সেটিকে সফল করবার জন্য আপনারদের সহযোগিতা কামনা করি।'

*

*

*

আমরা একবাক্যে বলি ভগবান আচার্য তুচ্চিকে জয়যুক্ত করুন ॥

নিশীথদা

কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, নিঃস্বার্থ দেশসেবক শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এদেশের বহু গুণী জ্ঞানী, বহু প্রখ্যাত কর্মী তাঁর সংস্রবে এসেছিলেন—এমন কি, একথা বললে ভুল বলা হবে না যে, দেশসেবা করেছেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত নিশীথ সেনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি, এরকম লোক বাঙলা দেশ দেখে নি। তাই নির্ভয়ে বলতে পারি, কৃতী নিশীথ সেনের কর্মজীবনের প্রশংসা কীর্তন করার লোকের অভাব হবে না।

আমি কিন্তু নিশীথদাকে সেভাবে চিনি নি। আমি তাঁকে পেয়েছিলুম বন্ধুরূপে, তাঁর জীবন-অপরাহ্নে। তিনি তখন কলকাতার ভিতর-বাইরে এতই সুপরিচিত যে প্রথম আলাপের দিন কেউ আমাকে বুঝিয়ে বলল না, নিশীথ সেন বলতে কি বোঝায়। তারপর নানা রকম গাল-গল্পের মাঝখানে কে যেন আমাকে বলল, 'আনন্দবাজারে যে ইংরেজকে কটু-কাটব্য আরম্ভ করেছে (আমি তখন 'সত্যপীর' নাম নিয়ে ঐ কাগজে কলমে ধার দিচ্ছি) তার আগে খবর নিয়েছ কি, "সিঁড়িশন", "ডিফেশন", মহারাণীর বিরুদ্ধে লড়াই", এসব জিনিসের অর্থ কি?' আমি কোনো কিছুর বলবার আগেই নিশীথ সেন বললেন, 'আমরাই জানি নে, উনি জানবেন কি করে? আপনি তো দর্শনে ডক্টর, না?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'আপ্তে হ্যাঁ।' নিশীথ সেন আমার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ইংরেজ তার সমালোচককে জেলে ঠেলাবার জন্য যেসব আইন-কানুন

বার্নিয়েছে, সেগুলো কোন স্থলে প্রযোজ্য, কাকে সেই ডাঙা দিয়ে ঠ্যাঙানো যায়, তার টীকাটিপননী, নজীর-দলিল ইংরেজ আপন হাতেই রেখেছে। সুবিধেমত কখনো সেটা টেনে টেনে রবারের মত লম্বা করে, কখনো ফাঁদ টিলে করে পাঁথকে উড়ে যেতেও দেয়। এই দেখুন না, লোকমান্য টিলককে যে আইনের জোরে জেলে পুরল, সে আইন গুরুত্বধারা কাজে লাগানো যায়, সে কথা একেবারে আনাড়ি উকিলও মানবে না। তবু টিলককে তো জেলে যেতে হল। তাই সিডিশন কিসে হয় আর কিসে হয় না, সে কথা স্বান্ উকিলরা পর্যন্ত আগেভাগে বলতে পারে না। ইংরেজ যদি মনস্থির করে আপনাকে আলিপূর পাঠাবে তবে সে তখন আপনার বিরুদ্ধে অনেক নতুন-পুরাতন আইন বের করবে। আমরা—অর্থাৎ উকিল ব্যারিস্টাররা—তখন তার বিরুদ্ধে লড়ি, সব সময়ে যে হারি, তাও বলতে পারি নে।’ তারপর একটু ভেবে নিজে বললেন, ‘আমার ফোন নম্বরটা জানেন তো? কোনো অসুবিধে হলে ফোন করবেন। আমি যা পারি করে দেব।’

প্যারীদা কান পেতে শুনছিল, লক্ষ্য করি নি। তক্ষুনি বললে, ‘নম্বরটা টুকে নাও, ওহে আলী। কাজে লাগবে।’

পরে খবর নিয়ে জানতে পারলুম, নিশীথদা কত বড় ডাকসাইটে ব্যারিস্টার এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেই আলিপূরের আমল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচজনের জ্ঞানাজ্ঞানাতে কত অসংখ্যবার ফাঁজ না নিয়ে বিপ্লবীদের জন্য লড়েছেন। লোকটির প্রতি শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা মন ভরে উঠলো।

কিন্তু থাক এসব কথা। পূর্বে নিবেদন করেছি, এসব কথা গুঁছিয়ে বলবার জন্য লোকের অভাব হবে না।

নিশীথদা প্রায় আমার বাপের বয়সী ছিলেন, কিন্তু কি করে তিনি যে একদিন দাদা হয়ে গেলেন এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, তাঁকে ‘তুমি’ বলতে আরম্ভ করে দিয়েছি সে শুধু যারা নিশীথদাকে চিনতেন তাঁরাই বলতে পারবেন।

একই স্টেনে শিলং গেলুম, সেখানে প্যারীদার বাড়ীতে উঠলুম। সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে আমার ঘরে ঢুকে খাটের একপাশে বসে বললেন, ‘কবি (বিশ্ব সাক্ষী, আমি কবি নই), চমৎকার ওয়েদার, বাইরে এসো।’ বাইরে মুখোমুখি হয়ে বসলুম, তিনি নানা রকমের প্রাচীন কাহিনী বলে যেতে লাগলেন; অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন বাঁড়ুঘো, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ মুখুজ্যে, আব্দুর রসুল এঁদের সম্বন্ধে এমন সব কথা বললেন, যার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, কতখানি পাণ্ডিত্য, কত গভীর অস্তদৃষ্টি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকলে পরে মানুষ এত সহজে বাঙলা দেশের পণ্ডাশ বংশরের ইতিহাস এবং তার কৃতী সন্তানদের জীবনী একবার মাত্র না ভেবে অনর্গল বলে যেতে পারে। আজ আমার দুঃখের অবধি নেই, কেন সেসব কথা তখন টুকে রাখলুম না।

আমি দুঃখের মত মাঝে মাঝে আপত্তি উত্থাপন করেছি এবং খাজা গবেষকের

মত আইন নিয়েও। নিশীথদার চোখ তখন কৌতুক আর মৃদু হাস্যে জ্বলজ্বল করে উঠত। চূপ করে বাধা না দিয়ে শুনতেন। তারপর মাত্র একদিন চোখা যুক্তি দিয়ে আমাকে দৃষ্টিকরো করে কেটে ফেলতেন। আমার তাতে বিস্ময়মাত্র উত্তাপ বোধ হয় নি। তাই শেষের দিকে যখন যে সব জিনিস নিয়ে আমি মনে মনে দম্ভ পোষণ করি, এই লোকটির সংস্রবে আসতে পেরেছি বলে।

কী অমায়িক অজাতশত্রু পুরুষ! আর কী একথানা স্নেহকাতর হৃদয় নিয়ে জর্মেছিলেন তিনি! আইন আদালতের খররৌদ্র তাঁর সে শ্যামমনোহর হৃদয়ে সামান্যতম বাণ হানতে পারে নি।

তাঁর বয়স তখন সত্তর। সেই শিলঙে একদিন সকাল বেলা দেখি, ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত পুরে বারান্দায় ঘন ঘন পাইচারি করছেন, মুখে সিগার নেই। কথা কয়ে ভালো করে উত্তর পাইনে। কি হয়েছে, ব্যাপার কি নিশীথদা?

তিনি দিন ধরে স্থায়ী চিঠি পান নি।

সে কি নিশীথদা, সত্তর বছর বয়সে এতখানি?

সেই জ্বলজ্বলে চোখ—সে চোখ দুটি কেউ কখনো ভুলতে পারে—দিয়ে বললেন, ‘কবি, সব জানো, সব বোঝো, কিন্তু বিয়ে তো করো নি, তাহলে এটাও বুদ্ধিতে।’

নিশীথদা বউদিকে বস্তু ভালোবাসতেন। আমি জানি নিশীথদা আরো কিছুদিন কেন এ সংসার থাকলেন না।

ফেব্রুয়ারি মাসে অখণ্ডসৌভাগ্যবতী শ্রীমতী শোভনা ইহলোক ত্যাগ করেন।

সঙ্গে সঙ্গে নিশীথদার জীবনের জ্যোতি যেন নিভে গিয়েছিল।

আজ বোধ হয় নিশীথদার আর কোন দৃংখ নেই—আমাদেরও দৃংখের অন্ত নেই।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি ॥

পরিমল রায়

পরিমল রায়ের অকালমৃত্যুতে কেউ সখা, কেউ গুরু, কেউ সহকর্মী, কেউ প্রতিবেশী এবং দিল্লী শহর একটি উৎকৃষ্ট নাগরিক থেকে বঞ্চিত হল।^১ মৃত্যুকালে পরিমল রায় নিউইয়র্কে ছিলেন কিন্তু এ আশা সকলেই মনে মনে পোষণ করতেন যে আমেরিকায় বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি আবার দিল্লীতেই ফিরে আসবেন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব, তাঁর শিষ্যমণ্ডলী তথা বাংলা সাহিত্যমোদীজন তাঁর সে অভিজ্ঞতার ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন।

পরিমল রায় সত্যি নানা গুণের আধার ছিলেন।

একদা “মৌলানা খাফী খান” আমাকে একটি ক্ষুদ্র বিতর্ক-সভাতে নিয়ে যান। সে সভাতে পরিমল রায় ভারতবর্ষে কি প্রকারে কলকল্লা কারখানা

১ স্বর্ণীয় পরিমল রায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সহানুভূতি জানাই।

ফ্যাক্টরী তৈরী করার জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরকম আলোচনা আমি জীবনে কমই শুনছি। পরিমল রায় জানতেন, তাঁর প্রোতারা অর্থনীতি ব্যবদে এক একটি আশ্রম 'বিদ্যাসাগর'; তাই তিনি এমন সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় মূল ব্যক্ত্যটি বলে গেলেন যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সে পাণ্ডিত্যকে অজ্ঞজনের সামনে নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ দৈনন্দিন সত্যরূপে প্রকাশ করার অলৌকিক পদ্ধতি দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। তাঁর ভাষণ শেষ হলে আমি দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি বাধা পাণ্ডিত্যের মত খেঁকিয়ে উঠলেন না। অতিশয় সবিনয়ে তিনি আমার দ্বিধা-গুলোকে এক লহমায় সরিয়ে দিলেন। আমার আর প্রশ্ন আর অস্ত রইল না। পাণ্ডিত্যজনের বিনয় মুখের চিত্তজয় করতে সদাই সক্ষম।

সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপচারি হয় নি। তার কয়েকদিন পরে আরেক সভাতে তাঁর সঙ্গে দেখা। শুধালেন, 'চিনতে পারছেন কি?'

আমি বললাম, 'বিলক্ষণ'। আর সঙ্গে সঙ্গে গড় গড় করে তাঁর ভাষণের আটটি পয়েন্ট একটার পর একটা আউড়ে গেলুম। এ আমার স্মৃতিশক্তির বাহাদুরি নয়। এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ পরিমল রায়ের। পূর্বেই নিবেদন করেছি, পরিমল রায় তাঁর বক্তব্য এমন চমৎকার গুঁছিয়ে বলতে পারতেন যে, একবার শুনলে সেটি ভুলে যাওয়ার উপায় ছিল না। আজ যে বিশেষ করে পরিমল রায়ের শিষ্যেরাই সবচেয়ে বেশি শোকাভূর হয়েছেন, সেটা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কিন্তু এসব কথা থাক। অর্থনীতিতে পরিমল রায়ের পাণ্ডিত্য যাচাই করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।

নিছক সাহিত্যিকের চেয়ে যারা আর পাঁচটা কাজে জড়িত থেকেও সাহিত্য চর্চা করেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আমি বড়ই উল্লাসিত হই। পেটের ধান্দার একটা হেস্তনেস্ত কোনোগতিকে করে নেওয়ার পর যে লোক তখনো বাণীকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি পেশাদারী সাহিত্যসেবীর চেয়েও শ্রদ্ধার পাত্র। পরিমল রায়ের কর্তব্যবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল বলে তাঁর বেশী সময় কাটত অধ্যাপন অধ্যয়নে। তারপর যেটুকু সময় বাঁচত তাই দিয়ে তিনি বাণীর সেবা করতেন।

এবং সকলেই জানেন সাহিত্যিকদের দুটি মহৎ গুণ তাঁর ছিল। তাঁর পর্ণেশ্বর রসের সম্বন্ধে অহরহ সচেতন থাকত এবং তিনি সে রস বড় প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরে দিতে পারতেন। পরিমল রায়ের চোখে পড়ত দুনিয়ার যত সব উদ্ভট ঘটনা, আর সে সব উদ্ভট ঘটনাকে অতিশয় সাদামাটা পদ্ধতিতে বর্ণনা করার অসাধারণ ক্ষমতা তিনি পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছিলেন।

এদেশের লোকের একটা অদ্ভুত ভুল ধারণা আছে যে, রসিক লোক ভাড়ের শামিল। এ ভুল ধারণা ভাঙবার জন্যই যেন পরিমল রায় বাঙলা দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। সকলেই জানেন, তিনি কথা বলতেন কম, আর তাঁর প্রকৃতি ছিল গম্ভীর—একটুখানি রাশভারি বললেও হস্ততো বলা ছল হয় না।

চপলতা না করেও যে মানুষ সুরাসিক হতে পারে পরিমল রায় ছিলেন তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ ; আমাদের নমস্যা 'পরশুরাম' এস্থলে পরিমল রায়ের অগ্রজ ।

আর যে গুণের জন্য পরিমল রায়কে আমি মনে মনে ধন্য বলতুম সেটা তাঁর লেখনী সংযম । এ গুণটি বাংলা দেশে বিরল । ভ্যাজর ভ্যাজর করে পাতার পর পাতা ভর্তি না করে আমরা সামান্যতম বক্তব্য নিবেদন করতে পারি নে । সংক্ষেপে বলার কায়দা রপ্ত করা যে কি কঠিন কর্ম সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা প'ডশ্রম । এ গুণ অয়ত্ত্ব করার জন্য বহু বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় । তিন লাইনে যে নন্দলাল এখানানা হাসিমুখ এঁকে দিতে পারেন কিম্বা একটি মাত্র 'মা' দিয়ে আরম্ভ করেই যে ওস্তাদ শ্রোতাকে রসালু করতে পারেন তার পশ্চাতে যে কত বৎসরের মেহমত আর হররানি আছে সে কি দর্শক, শ্রোতা বুঝতে পারে ?

তাই আমার শোকের অন্ত নেই যে, বহুদিনের তপস্যার ফলে যখন পরিমল রায়ের আপন সংক্ষিপ্ত নিরলঙ্কার ভাষাটি শান দেওয়া তলওয়ারের মত তৈরী হল, যখন আমরা সবাই এক গলায় বললুম, 'ওস্তাদ, এইবারে খেল দেখাও' ঠিক তখন তিনি তলওয়ারখানা ফেলে দিয়ে অস্তধানি করলেন ।

এই তো সেদিনকার লেখা । একটি মোটা লোক রায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ ঘোঁত ঘোঁত করে বেড়াতে বেরোন । আরেকটি রোগাপটকা পনপন করে সেই সময় বেড়াতে বেরোয় । একজনের আশা ঘোঁতঘোঁতিয়ে রোগা হবে, আরেকজনের বাসনা পনপনিয়ে সে মোটা হবে । ফলং ? যথা পূর্বম্ তথা পরম্ ।

এ জিনিস চোখের সামনে নিত্য নিত্য হচ্ছে । কিন্তু কই, আমরা তো লক্ষ্য করি নি । পরিমল রায় এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করে এমনি কায়দায় সামনে তুলে ধরলেন যে, এখন রোগা মোটা যে কোন লোককে যখন ঘোঁত ঘোঁত কিম্বা পনপন করতে দেখি তখন আর হাসি সামলাতে পারি নে ।

আমার বড় আশা ছিল পরিমল রায় দেশে ফিরে এসে মার্কিনদের নিয়ে হাসির হররা, মজার বাজার গরম করে তুলবেন । শ্বিজেন্দ্রলাল, সুকুমার রায়, পরশুরাম এঁরা কেউ মার্কিন মুল্লুক যান নি । আশা ছিল পরিমল রায়ের মার্কিন-বাস রসের বাজারে আসার জমাবে ।

একটি আড়াই ছত্রের টেলিগ্রামে সব আশা চুরমার হল । কাকে সান্ত্বনা দিই ? আমিই সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি নে ॥

মপাঙ্গী

বাঙালান্ন বলি, 'গে'য়ো যোগী ভিখ পায় না,' পদ্মার ওপারে বলি,—

'পীর মানে না দেশে-থেকে,

পীর মানে না ঘরের বউয়ে,'

আর পশ্চিমারা বলেন, 'ঘরকী মৃগী' দাল বরাবর' অর্থাৎ পরে পোষা মৃগী

মানুষ এমনি তাক্ষিলা করে খায়, যেন নিত্যকার ডাল-ভাত খাচ্ছে।

কিন্তু একবার গায়ের কদর পাওয়ার পর আবার যে মানুষ গেঁসো যোগী হতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রবাদ আমার জানা নেই। কিন্তু তাই হয়েছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মপাসারি বেলায়।

মাস তিনেক পূর্বে মপাসারি কয়েকখানা চিঠি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সমালোচনা করতে গিয়ে ফরাসী একাডেমির সদস্য—অর্থাৎ তিনি অতিশয় কেট-বিষ্ট জন—মিস্যো আঁদ্রে বিইঙ্গ (Billy) মপাসারি সম্বন্ধে মিঠে-কড়া দু-চারটি কথা বলেছেন।

এক ফরাসী সাহিত্য-প্রচারক নাকি বিইঙ্গকে বললেন, ‘কেম্ব্রিজের ছেলে-মেয়েরা আজকাল যে মপাসারি পড়ে, সে শুধু অস্বাস্থ্যকর কৌতুহল নিয়ে।’ (অর্থাৎ মপাসারি যৌন গল্পগুলোই তারা পড়ে বেশি)। উত্তরে বিইঙ্গ বললেন, ‘বিদেশীরা, বিশেষত কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের লোক আজকাল আর মপাসারি পড়ে না, তারা পড়ে প্রুস্ত, ভালেরি, মালার্মে, র্যাবো। মপাসারি কদর এখনো আছে জর্মনি এবং রাশায়। খুদ ফ্রান্সে ছোকরাব দল তো মপাসারিকে একদম পাঁচের বাদ দিয়ে বসে আছে। ভুল করেছে না ঠিক করেছে? কিছটা ভুল কিছটা ঠিক—কারণ মপাসারি একদিক দিয়ে যেমন অত্যাশ্চর্য কলাসৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে আবার অত্যন্ত যাচ্ছেতাইও লিখেছেন।’

এ সম্পর্কে মপাসারি চিঠি প্রকাশ করতে গিয়ে সম্পাদক মেনিয়াল বলছেন, ‘আমেরিকার লোকে মপাসারি পড়ে উঁচুদের ক্লাসিক হিসেবে। মপাসারি সর্বাঙ্গসুন্দর ভাষাকে সেখানকার ফরাসী পড়ুয়া মাদ্রই আদর্শরূপে মেনে নেয়। তাঁর ভাষার স্বচ্ছতার জন্যই (সে স্বচ্ছতার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন আনতোল ফ্রাঁসের মত গুণী) আমেরিকাতে মপাসারি লেখা উদ্ধৃত করে অস্তত কুড়িখানা পাঠ্য বই বেরিয়েছে।’

উত্তরে বিইঙ্গ সাহেব অবিশ্বাসের সুরে বলেছেন, ‘জানতে ইচ্ছে করে, এখনো কি মার্কিন পাঠক মপাসারিকে এতটা কদর করে? আর ইংলন্ডের অবস্থা কি? মেনিয়াল তো কিছ বললেন না; আমার মনে হয়, মপাসারি লেখাতে যেটুকু খাঁটি ফরাসী ইংরেজ সেটা এড়িয়ে চলে।’

চলতে পাবে, নাও চলতে পারে। সে কথা উপস্থিত থাক। এর পর কিন্তু বিইঙ্গ সাহেব যেটা বলেছেন সেটা মারাত্মক। সকলেই জানেন, মপাসারি ছিলেন ফ্লবেরের অতি প্রিয় শিষ্য—ফ্লবের তাঁকে হাতে ধরে লিখতে শিখিয়ে-ছিলেন। বিইঙ্গ বলছেন, ‘ফ্লবের তাঁর প্রিয় শিষ্যের কোনো দোষই দেখতে পেতেন না, কিন্তু তিনি পর্যন্ত বেঁচে থাকলে মপাসারি অত্যধিক (Surabondant = Superabundant) লেখার নিন্দা করতেন।’

এ কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, তবে এ সম্পর্কে হিটলারের একটা মন্তব্য মনে পড়ল। হিটলার বলতেন, ‘আজকালকার ছোকরারা বহু

বৌশি বই পড়ে আর তার শতকরা নব্বই ভাগ ভুলে যায়। তার চেয়ে যদি দশখানা বই পড়ে ন'খানা মনে রাখতে পারে, তবে সেই হয় ভালো।' মাস্টার হিসেবে আমার জানা আছে, দশখানা বই পড়লে ছেলেরা ভুলে মেরে দেয় ন'খানা। কিম্বা বলতে পারেন পাঁচ দু'গুণে দশের শূন্য নেমে হাতে রইবে পেন্সিল!

মপাসাঁ যদি তাঁর লেখার দ্বিশ ভাগ কমিয়ে দিতেন, তবে সে দ্বিশ ভাগে কি শূন্য তাঁর খারাপ লেখাগুলিই—বিইঙ্গির বিচারে—পড়ত? কাটা পড়ত দুইই। তাহলে অস্তত শতকরা কুড়িটি উত্তম গল্প আমরা পেতুমই না। ইংরেজিতে বলে 'টবের নোংরা জল ফেলার সময় বাচ্চাকেও ফেলে দিওনা না।' ফেলা যায় বলেই এ সতর্কবাণী!

ভাল লেখা বার বার পড়ি। খারাপ লেখা একবার পড়ে না পড়লেই হল। কিন্তু মোন্দা কথায় আসা যাক।

ইংরেজি, জার্মান, রাশান, ফ্রেন্শ, এমন কি আরবী, ফারসী বাঙলা, উর্দু নিন এমন কোন সাহিত্য আছে যে মপাসাঁর কাছে ঋণী নয়? ছোট গল্প লেখা আমরা শিখলুম কার কাছ থেকে? উপন্যাসের বেলা বলা শক্ত কে কার কাছ থেকে শিখল, কিন্তু ছোট গল্প লেখা সবাই শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। কিম্বা দেখবেন রাম যদি শ্যামের কাছ থেকে শিখে থাকেন, তবে শ্যাম শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মপাসাঁর কাছে ঋণী—যদিও জানি অসাধারণ প্রতিভা আর অভূতপূর্ব সৃষ্টিশক্তি ধারণ করতেন বলে রবীন্দ্রনাথ বহুতর গল্পে মপাসাঁকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছেন। গীতিরস ছিল রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে—মপাসাঁর যেখানে ছিল কিশোর অনটন—তাই ছোট গল্পে গীতিরস সঞ্চার করে তিনি এক নতুন রসবস্তু গড়ে তুললেন, কবিতাতে সুর দিয়ে যে রকম ঐন্দ্রজালিক গান সৃষ্টি করেছিলেন।

শেষ কথা, কার ভান্ডার থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি চুরি করেছে? যে কোনো একখানা হেঁজিপেঁজি মাসিক হাতে তুলে নিন। দেখবেন ভালো গল্পটি মপাসাঁর লোপাট চুরি—দেশকালপাত্র বদলে দিয়ে। আর আশ্চর্য মপাসাঁর বেলাই এ জিনিসটা করা যায় সব চেয়ে বেশি কারণ তাঁর অধিকাংশ গল্পই সব কিছুই সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

এত চুরির পরও যাঁর ভান্ডার অফুরন্ত তিনি প্রাচ্যস্মরণীয় ॥

রামমোহন রায়

ভারত এবং আরব ভূখণ্ডের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অদান-প্রদান কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, তার সম্যক আলোচনা এখনো হয় নি। গোড়ার দিকে যেসব সংস্কৃত বইয়ের আরবী তর্জমা হয়, সেগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অনুবাদকদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান খুব গভীর ছিল না। পরবর্তী যুগে দেখা দিলেন এক পণ্ডিত, যাঁর সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন পণ্ডিত পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন।

সেই দশম-একাদশ শতাব্দীতে যখন 'মস্লেহ'র পক্ষে সংস্কৃত শেখার কোন

পন্থাই উন্মুক্ত ছিল না, তখন গজনীর মামুদ বাদশার সভাপাণ্ডিত আল-বীরুনী অতি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত শিখে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গসুন্দর চর্চা করে আরবী ভাষাতে একখানা অতি উপাদেয় প্রামাণিক গ্রন্থ লেখেন। বইখানি সে-যুগের হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের একখানা ছোটখাট বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে।

পাঠান যুগে আরবী-ফার্সীতে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত চর্চা হয়, কিন্তু আসল চর্চা আরম্ভ হয় আকবরের সময় এবং আল-বীরুনীর পর যদি সত্য পাণ্ডিতের অনুসন্ধান কেউ করে তবে যেতে হয় আকবরের পৌত্রের যুগে, শাহজাহানের পুত্র দারা-শীকুহ'র কাছে। আরবী-ফার্সী-সংস্কৃত এ তিন ভাষাতেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং ভক্তিমার্গে—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—হেন সুস্কৃতত্ত্ব নেই, যা তাঁর পাণ্ডিত্যের চৌহদ্দীর বাইরে পড়ে।

তারপর ভারতবর্ষের যে অবিশ্বাস্য অধঃপতন আরম্ভ হয়, তার ইতিহাস সকলেই জানেন। টোল-চতুষ্পাঠী, মন্তব্য-মাদ্রাসার, সংস্কৃত এবং আরবী-ফার্সী কোন গাতিকে বেঁচে রইল মাত্র—এর বেশি জোর করে কিছু বলা যায় না।

তারপর এই হতভাগ্য ভারতবর্ষেই এই আমাদের পরম শ্লাঘার সম্পদ এই বাংলা দেশেই জন্মালেন এক বাষাপাণ্ডিত, এক 'জবরদস্ত মোলবী'—যিনি কি আল-বীরুনী, কি দারা-শীকুহ যে কারো সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

শুধু তাই নয়, নানা শব্দ নানা সংঘাতের উদ্ভেদে যে সত্যশিবসুন্দর আছেন, যার অস্তিত্ব স্বীকার করলে পরস্পরবিরোধী সংঘাত মাত্রই লোপ পায়, সেই সত্যশিবসুন্দরকে তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, মনোজগতে স্পষ্টরূপে ধারণা করতে পেরেছিলেন বহুবিধ ঐতিহ্যের সম্মিলিত সাধনার ভিতর দিয়ে। বাল্যকালে তিনি শিখেছিলেন আরবী-ফার্সী, পরবর্তীকালে সংস্কৃত এবং সর্বশেষে হীন্দু, গ্রীক, লাতিন। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্ট—এই চার ধর্মজগতে তিনি অনায়াসে অতি স্বচ্ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, অন্তরের খাদ্য অব্বেষণ করে যে শক্তি সঞ্চার করতে পেরেছিলেন, সে-শক্তি যে শুধু সে-যুগের মূঢ়তা-জড়তাকে জয় করতে পেরেছিল, তাই নয়, সে-শক্তির প্রসাদাৎ পরবর্তী বাঙলা দেশ এবং ভারতবর্ষ যে নব নব অভিযানের পথে বেরিয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ কল্পনা আমরা আজ করতে পারি আমাদের অদ্যকার জীবন্মৃত অবস্থা থেকে।

রামমোহন বলতে কি বোঝায়, তার সর্বাঙ্গসুন্দর ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল, রজেন্দ্রনাথ শীলের ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সম্যক চর্চা এখনো হয় নি। 'দেশের এক পৃষ্ঠা সে কর্মের জন্য প্রশস্ত নয় এবং এ অধম সে-শাস্ত্রাধিকার থেকে বঞ্চিত।

নিপাণ্ডিত হলেই সে ব্যক্তি মহাজন, একথা বলা চলে না, কিন্তু মহাজন মাত্রই নিপাণ্ডিত হন, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। রাজার ভাগ্যে

সে নিপীড়িত এসেছিল, চাষীদের কাছ থেকে নয়—সেটা বৃদ্ধিতে অসুবিধা হয় না—তীর বিরুদ্ধে দাড়াইলেন সবধর্মের পণ্ডিতগণ।

আরবী ভূমিকা (মুসলমান) সম্বলিত তিনি যে ফার্সি কেতাব রচনা করেন, তার নাম ‘তুহফাতুল মুওল্লাহ্‌হিন্দীন’ (একেশ্বরবাদীর উদ্দেশ্যে উপঢৌকন) এবং সে-গ্রন্থে তিনি আল্লার সত্যরূপের যে-বর্ণনা মুসলমান ধর্মশাস্ত্র তন্ন তন্ন করে বয়ান করলেন, সে-রূপ সে-বর্ণনা ক্রিয়াকাণ্ডে নিমজ্জিত তৎকালীন মুসলমান পণ্ডিতজনকে বিস্ময়মাত্র উল্লসিত করে নি। পরবর্তী যুগে মৌলবী-মৌলানা, আলি-উলামা তাঁকে জবরদস্ত মৌলবীরূপে স্বীকার করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে ‘মুতাজ্জিলা’ (স্বাধীনচেতা)—গোড়ারা যেরকম ভদ্র ব্রাহ্মকে ‘বেঙ্গব্রাহ্মণ’ নামে দিয়ে তাচ্ছিল্য করেন—নাম দিয়ে তাঁর সং ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার কবেছিলেন।

হুবহু সেই বিরুদ্ধাচরণই তো তিনি পেয়েছিলেন ‘স্বধর্মীদের কাছ থেকে। অষ্টোত্তর অনুসন্ধানকে উনিবিংশ শতাব্দী প্রায় স্লেচ্ছাচারের মত বর্জনীয় বলে মনে করেছিলেন—এ-ইতিহাস সকলেই জানেন।

আবার হুবহু তৃতীয় দফায় তিনি বিরুদ্ধাচরণ পেলেন খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাজ থেকে। যে খ্রীষ্টধর্ম তখন বাঙলা দেশে প্রচারিত হচ্ছিল, সে-ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু বা মুসলমান যে কোন ধর্মের চেয়ে কোন দিক দিয়ে আধ্যাত্মিকতায় উৎকৃষ্ট ছিল না। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মে রামমোহন যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সেই আগের অনুসন্धानে তিনি বাইবেলে যে খ্রীষ্টকে আবিষ্কার করলেন, যে-খ্রীষ্ট ‘কেরামতি’ করেন না, অর্থাৎ তিনি জলকে মদ বানাবার ভৌতিকবাজি দেখান না, সাতখানা রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে পরিভূক্ত করার চেষ্টাও করেন না।

যে-খ্রীষ্টান মিশনারীরা এককাল ধরে রামমোহনের কুসংস্কারবর্জিত স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির প্রশংসা করেছিলেন, তাঁরাই হলেন সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে সর্বত্র ঘোষণা করলেন, ‘রামমোহন মূর্খ’, রামমোহন যীশুকে চিনতে পারে নি, অলৌকিক কর্ম (কেরামতি) বাদ দিলে যে যীশু দাঁড়ান, তিনি প্রকৃত যীশু নন।

হিন্দু-মুসলমান সে-যুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাঁদের বিরুদ্ধ-ব্যবহার রামমোহনকে বিস্মিত কিংবা বিচলিত করে নি। কিন্তু খ্রীষ্টানদের এ ব্যবহারে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—আজ ডীন ইনগ্‌ সেটা বৃদ্ধিতে পারবেন।

তিনি ধর্মের গলা-মেলানো একই প্রতিবাদে রামমোহন বিচলিত কিংবা পথভ্রষ্ট হন নি—সে আমাদের পরম সৌভাগ্য ॥

বিশ্বভারতী

কবি, শিল্পী—স্রষ্টামাত্রই স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন। এবং সেই কারণেই আর পাঁচজনের তুলনায় এ জীবনে তাঁরা এমন সব বেদনা পান যার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়ী হতে হলে গণ্ডারের চামড়ার প্রয়োজন—গণ্ডারের চামড়া নিলে কোনো কবি আজ পর্যন্ত সার্থক

সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি।

জীবনের বহুক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বহু অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছিলেন। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গকমচন্দ্রের আশীর্বাদ পান; তৎসঙ্গেও বাঙলাদেশ বহুদিন ধরে তাঁকে কবি বলে স্বীকার করতে চায় নি। শৃঙ্খল তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে বহু গণ্যমান্য লোক এমন সব অন্যায্য আক্রমণ এবং আন্দোলন চালান যে রবীন্দ্রনাথকে হয়তো অল্প বয়সে কীটসের মতো ভগ্নহৃদয় নিয়ে ইহলোক পরিত্যাগ করতে হত। রবীন্দ্রনাথ যে বহু বেদনা পেয়েও কীটসের মতো ভেঙে পড়েন নি তার অন্যতম প্রধান কারণ, ধর্মে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ছিল এবং 'বিতীর্ণিট মহর্ষি' স্বহস্তে রবীন্দ্রনাথের নৈতিক মেরুদণ্ডটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

এ জীবনে রবীন্দ্রনাথ বহু বেদনা পেয়েছেন এবং তার খবর বাঙালীমাত্রই কিছু না কিছু রাখেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, বিশ্বভারতীর নবপ্রতিষ্ঠান উপলক্ষ্যে তারই একটি নিবেদন করি।

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতীর' প্রতিষ্ঠা করেন কিংবা বলতে পারি যে ইন্সকুটি ('পূর্ব বিভাগ') প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে বাঙলা বা বাঙলার বাইরে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল তার সঙ্গে একটি কলেজ ('উত্তর বিভাগ') যোগ দিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নানাপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা করারও ব্যবস্থা হল।

তাই গুরুদেবের বাসনা ছিল, পূর্ব-পশ্চিমের গুণীজ্ঞানীরা যেন শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সহযোগিতায় বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সাধনায় নিযুক্ত হন।

সেই মর্মে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানানেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভা লেভিকে। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ববিষয়ে লেভির অসাধারণ পার্ণিত্য ছিল তো বটেই; তদুপরি বৌদ্ধধর্মে বোধ করি তখনকার দিনে পশ্চিমে এমন কেউ ছিলেন না যিনি তাঁর সামনে সাহস করে দাঁড়াতে পারতেন।

শান্তিনিকেতনে তখন বহুতর পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, শ্রীযুত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় এন্ড্রুজ এবং পিয়ান্সন, শ্রীযুত নিতাইবিনোদ গোস্বামী, অধ্যাপক কলিন্স্ বগদানফ বেনওয়া, ক্রামারিশ, শ্রীযুত মিশ্রজী, শ্রীযুত হির্ডিজভাই মরিস, শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও আরো বহু খ্যাতনামা লোক তখন শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন।

সঙ্গীতে ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের ভিতর ছিলেন শ্রীযুত অমিয় চক্রবর্তী, শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী।^১

এবং আশ্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত না হয়েও এক ঋষি আশ্রমটিকে

১ সিংহলের ভ্রমণ পণ্ডিতস্বরূপ এবং আরও কয়েকজনের নাম ভুলে যাওয়ার জন্য তাঁদের কাছে লজ্জিত আছি।

আপন আশীর্বাদ দিয়ে পুণ্যভূমি করে রেখেছিলেন। বাঙলাদেশ তাঁকে প্রায় ভুলে গিয়েছে। ইনি রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় শ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তীকালে লেডি এঁর পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে তখন পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের কিছুমাত্র অনটন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর সর্বশেষ কপর্দক দিয়ে—এবং এম্বুলে ভক্তির একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে এই সব বড় বড় পণ্ডিতেরা যে দক্ষিণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন সে দক্ষিণা আজকের দিনে দিতে গেলে অনেক অপণ্ডিতও অপমান বোধ করবেন।

কিন্তু ছাত্র ছিল না। বিশ্বভারতী তখন পরীক্ষা নিত না, উপাধিও দিত না।

এখনো আমাব স্পষ্ট মনে আছে, তখনকার দিনে বিশ্বভারতীর অন্যতম প্রধান নীতি ছিল : “দি সিস্টেম অব এগজামিনেশন উইল হ্যাভ নো প্লেস্ ইন বিশ্বভারতী, নর উইল দ্যার বী এনি কন্ফারিং অব ডিগ্রীজ।”

এ অবস্থায় বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করতে আসবে কে ?

তবে এই যে এত অর্থব্যয় করে বিদেশ থেকে পৃথিবীবরেণ্য পণ্ডিত লেডিকে আনানো হচ্ছে ইনি বক্তৃতা দেবেন কার সামনে, ইনি গড়ে তুলবেন কোন্ ছাত্রকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের তখন কোনো যোগ-সূত্র ছিল না। তবু রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করলেন যাতে করে কলকাতার ছাত্ররা শান্তিনিকেতনে এসে সমগ্র অস্ত্র একটি বক্তৃতা শুনতে যেতে পারে। শান্তিনিকেতনে রবিবার অনধ্যায় নয় কাজেই শনিবার বিকেল কিংবা রবির সকালের ট্রেন ধরে যে কোনো ছাত্র কলকাতা থেকে এসে লেডির বক্তৃতা শোনার সুযোগ পেল।

যেদিন প্রথম বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার কথা সেদিন রবীন্দ্রনাথ খবর নিয়ে জানতে পারলেন কলকাতা থেকে এসেছেন মাত্র দুটি ছাত্র ! তারও একজন রসায়নের ছাত্র—আর পাঁচজন যে রকম ‘বোলপুর দেখতে’ আসে এই সুযোগে সেও সেই রকম এসেছে !

বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তখন বারো জনও হবে না। তার মধ্যে সংস্কৃত পড়তেন জোর চারজন।

এই ছটি ছাত্রের সামনে (অবশ্য পণ্ডিতরাও উপস্থিত থাকবেন) বক্তৃতা দেবেন সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত লেডি ! রবীন্দ্রনাথ বড় মর্মাহত হয়েছিলেন।

তাই প্রথম বক্তৃতায় ক্রাসের পুরোভাগে খাতাকলম নিয়ে বসলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

লেডির আর কোনো খেদ না থাকারই কথা ॥

নাগা

০১শে আগস্ট সংসদে প্রস্তোত্তরকালে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহর^১ লাল নেহরু বলেন যে, গত ২৪শে মে একদল নাগা ভারতীয় নাগা-অঞ্চলে হানা দেয় ও ৯০টি মৃত্যু কেটে নিয়ে চলে যায়।

আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দফলা, কুকী, গারো, লুসাই, খাসী, নাগা ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে। এদের ভিতর খাসী, লুসাই, গারোরা এবং আরো কয়েকটি জাতি বড়ই ঠান্ডা মেজাজের, এবং সবচেয়ে মারাত্মক নাগারা। এরা এখনো পরমানন্দে নরমাংস ভক্ষণ করে এবং কে কতটা শোষণশালী তার বিচার হয় কে কটা মৃত্যু কাটতে পেরেছে তাই দিয়ে।

নাগা পাহাড়ের যে অংশটুকু ইংরেজ দখল করে সেখানে ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বর মিশনারি যায় এবং ফলে অনেক নাগা খ্রীষ্টান হয়ে যায়। মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ও ইংরেজের আইনকানূনের ভয়ে ব্রিটিশ নাগারা বড় অনিচ্ছায় মানুষ কেটে কেটে খাওয়া বন্ধ করে; কিন্তু স্বাধীন ও বর্মী নাগারা এসব ‘মেলচ্-সংস্কারের’ কিছুমাত্র তোয়াক্কা না কবে সুযোগ পেলেই ব্রিটিশ নাগা অঞ্চলে হানা দিয়ে মৃত্যু কেটে নিয়ে যেতে থাকে।

বিশেষ করে ব্রিটিশ (বর্তমান ভারতীয়) অঞ্চলেই এরা হানা দেয় কেন?

তার একমাত্র কারণ ব্রিটিশ আইন করে—এবং সে আইন ভারতীয়রাও চালু রেখেছেন—ব্রিটিশ নাগাদের ভিতর এক গ্রাম অন্য গ্রামকে হানা দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করে দেয়। অবশ্য এ আইন নাগারা চাঁদপানা মূল্য কর সয়ে নেয় নি—বিশ্বর মার খাওয়ার পর অতি অনিচ্ছায় তারা হানাহানি বন্ধ করে। ফলে তারা নিবীৰ্য ও শান্তিপ্রিয় হয়ে পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে হানাহানির জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন সেগুলো লোপ পেতে থাকে।

ওদিকে স্বাধীন নাগারা দেখল এ বড় উত্তম ব্যবস্থা। আপসে তারা মাঝে মাঝে হানাহানি করে বটে, কিন্তু সেখানে যেমন অন্যের মৃত্যু কাটবার সম্ভাবনা আছে ঠিক তেমনি নিজের মৃত্যু কাটা যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনাও আছে, কারণ উভয় পক্ষই উদয়ান্ত লড়াইয়ের পরিতারা কষে, তীর চোখা রাখে, ধনুকের ছিলা বদলায়। অপিচ ব্রিটিশ নাগারা লড়াই করতে ভুলে গিয়েছে, তীরধনুক যা আছে তা দিয়ে হানাহানি করা যায় না। এদের হানা দিলে প্রাণ যাবার ভয় নেই, গোলায় মজুদ ধান লুট করা যায় আর শুল্লার ছাগল ত নিতান্তই ফাউ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, একগাদা মৃত্যু

১ বাঙলাতে সাধারণতঃ ‘জওহর’ লেখা হয় এবং এ ভুল সংশোধন করা উচিত। ‘জওহর’ কথাটি ফারসীতে একবচন এবং অর্থ ‘বাঙলাতে যা তাই। ‘জওয়াহর’ কিংবা ‘জওয়াহির’ শব্দটি ‘জওহর’ শব্দের আরবী ব্যাকরণসম্মত বহুবচন। পণ্ডিতজী তাঁর নাম বহুবচনে ব্যবহার করেন এবং আমাদেরও তাই করা উচিত। এস্থলে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফারসীতে আসলে শব্দটি ‘গওহর’; কিন্তু আরবী বর্ণমালায় ‘গ’ নেই বলে আরবরা ‘জওহর’ লেখেন পরবর্তী যুগে ‘গওহর’ও প্রচলিত হয়। তাই মুসলমানী নাম ‘গৌহর’ ও জওহর একই।

কপাকপ কেটে নিষে নির্বিঘ্নে বাড়ি চলে যাওয়া যায়। অন্ততপক্ষে একটা মৃশ্ণু না দেখাতে পারলে স্বাধীন নাগা অঞ্চলে বউ জোটে না ; কাজেই নাগা সম্বরগণদের গতান্তর কোথায় ?

ভারতীয় নাগারা ফারিসাদ করে আমাদের বলে, 'হানাহানি বন্ধ করে দিয়ে তোমরা আমাদের নির্বাহী করে ফেলেছ। তাই সই। কিন্তু তার ঝড়কিটা কি তোমাদেরই নেওয়া উচিত নয় ? স্বাধীন নাগারা যখন আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে তখন আমরা আত্মরক্ষা করতে অক্ষম। তোমাদের কি তখন কর্তব্য নয় পুলিশ সেপাই রেখে আমাদের বাঁচানো ?'

অতি হক কথা। কিন্তু প্রশ্ন, এ কর্মটি সূচারূপে সম্পন্ন করা যায় কি প্রকারে ? আমাদের সেপাইরা যে নাগাদের ডরায় তা নয়, কারণ নাগাদের হাতে বন্দুক থাকে না। গোটা দুইশ মেশিনগান দিয়েই এক পাল নাগাকে কাবু করা যায়, কিন্তু বেদনাটা তখন সেখানে নয়। মৃশকিল হচ্ছে এই, স্বাধীন নাগারা হানা দেবার পূর্বে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়ে শূভাগমন করে না এবং আমাদের পক্ষেও প্রতি পাহাড়ের চূড়ায় সেপাই মোতায়েন করা সম্ভব নয়।

নাগারা দল বেঁধে গাঁ বানিয়ে সমতলভূমিতে বসবাস করে না। তারা থাকে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় এবং সে চূড়াগুলোর উচ্চতা তিন থেকে ছ হাজার ফুট। কাজেই এক পাহাড়ের চূড়া থেকে যদি দেখাও যায় যে অন্য চূড়া আক্রান্ত হয়েছে তবু সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতেই সব কেছা খতম হয়ে যায়।

তবে কি নাগাদের আপন হাতে কিছু কিছু বন্দুক-টন্দুক দেওয়া যায় না ? সেখানে মৃশকিল হচ্ছে, নাগাদের ঠিক অতটা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ বন্দুক পেলে তারা সোজাসে অবিচারে অন্য নাগাদের আক্রমণ করবে। তা হলে সে একই কথায় গিয়ে দাঁড়ালো।

নাগারা এই ব্যবস্থাটাই চায়। তারা বলে, তোমরা যখন আমাদের বাঁচাতে পারছ না তখন আমরাই আপন প্রাণ বাঁচাই। এটাতেও আমাদের মন সাড়া দেয় না।

আচ্ছা, তবে কি আমাদের সৈন্যরা স্বাধীন নাগা অঞ্চল আক্রমণ করে তাদের বেশ কিছু ডান্ডা বুলিয়ে দিতে পারে না ?

পারে। তবে তাতেও ঝামেলা বিস্তর ॥

হিন্দু-মুসলমান-কোড বিল

শাস্ত্রে সব পাওয়া যায়—কোনো কিছুই অনটন নেই। সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে চান, না বিলিয়ে দিতে চান ; পূজো করতে চান, না করতে চান—একথানা কিংবা বিশথানা ; পূজো-পাজা করতে চান কিংবা ব্যোম ভোলানাথ বলে বন্দ হয়ে থাকতে চান, এমন কি মরার পর পরশুরামী স্বর্গে গিয়ে অসুরাদের সঙ্গে দুন্দু রসলাপ করতে চান কিংবা রবি ঠাকুরী 'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই' হয়ে গিয়ে নিগুণ নির্বাণানন্দ লাভ

করতে চান, তাবৎ মালই পাবেন।

তা না হলে সতীদাহ বন্ধ করার সময় উভয় পক্ষই শাস্ত্র কপচালেন কেন? বিধবা-বিবাহ আইন পাস করার সময়, শারদা বিলের হাঙ্গামহুজ্জুতের সময় উভয় পক্ষই তো শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছিলেন, একথা তো আর কেউ ভুলে যায় নি।

শুধু হিন্দুশাস্ত্র না, ইহুদি খ্রীষ্টান মুসলিম সব শাস্ত্রেরই ঐ গতি। শুধু হিন্দুশাস্ত্র এঁদের তুলনায় অনেক বেশি বনেদী বলে এঁর বাড়িতে দালানকোঠার গোলকধাঁধা ওঁদের তুলনায় অনেক বেশি, পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা পদে পদে। তাতে অবশ্য বিচলিত হওয়ার মত কিছুই নেই, কারণ স্বয়ং শীশুখ্রীষ্ট নাকি বলেছেন, যেহোতাঃ আপন বাড়িতে দালান-কোঠা বিস্তর।

তাই শাস্ত্রের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তাতে ফয়দাও এস্তার। মুসলিম শাস্ত্রের কিঞ্চে চর্চা করেছি বলেই মোল্লা-মৌলবীকে আমি বড় বেশি ভরাই নে। কুঁড়েমি করে জুম্মার নমাজে যাই নি, মোল্লাজী রাগত হয়ে প্রশ্ন শুধালেন, যাই নি কেন? চট করে শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করলুম, আমি যে জাঙ্গলয় আছি সেটাকে ঠিক শহর (মিস্‌র) বলা চলে না অতএব জুম্মার নমাজ অসম্ভব। ব্যস, হয়ে গেল। ঠিক তেমনি বিয়ে যখন করতে চাই নি, তখন আমি শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছি আবার ওজীর সাহেব ফজলু ভায়া যখন পরিপক্ব বৃদ্ধ বয়সে তরুণী গ্রহণ করলেন, তখন তিনিও হদীস (স্মৃতি) কপচালেন।

গ্রামাঞ্জে থাকতে হলে কুইনিদের মতো শাস্ত্র নিত্য সেবা।

সে কথা থাক।

হিন্দু-রমণী তালুক (লগ্নচ্ছেদ) দিয়ে নবীন পতি বরণ করতে পারবেন কি না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে। আমার শিরঃপীড়া, আমার গৃহিণী বঁকে গিয়ে কিছু একটা করে ফেলবেন না তো! এ প্রশ্ন মনে উঠত না, কিন্তু হিন্দু কোড বিল আসার গরম করে তোলাতে মুসলমান ভায়াদের টনক নড়েছে। খুলে কই।

ইটাং এক গুণী খবরের কাগজে পত্রাঘাত করলেন,—তিনি হিন্দু না মুসলমান মনে নেই—হিন্দু রমণী যদি লগ্নচ্ছেদ করবার অধিকার পায়, তবে মুসলমান রমণীতেও সে অধিকার বর্তাবে না কেন? ঠিকই তো। কিন্তু উত্তরে আর পাঁচজন মুসলমান বললেন,—কেউ খেঁকিয়ে, কেউ মূর্খবীর চালে, কেউ বা হিন্দু ভায়াদের পিঠে আদরের থাবড়া দিয়ে—মুসলমান শাস্ত্র নতুন কোড দিয়ে রদ-বদল করার কোনো প্রয়োজন নেই। মুসলমান রমণীর যে অধিকার আছে তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট—ওসব মালের প্রয়োজন হিন্দুদের।

লক্ষ্য করলুম, কোনো মুসলমান রমণী খবরের কাগজে এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

তাই প্রশ্ন, লগ্নচ্ছেদ করার জন্য মুসলমান পুরুষ রমণীর কতটুকু অধিকার? এ আলোচনায় মুসলমানদের কিছুটা লাভ হবে, হিন্দুদের কোনো ক্ষতি হবে না।

মৌলা বখ্শ্ মিঞা যে-কোনো মুহূর্তে বেগম মৌলাকে তিনবার 'তালাক, তালাক, তালাক' বললেই তালাক হয়ে গেল—স্বয়ং শিবেরও সাধ্য নেই তিনি তখন সে তালাক ঠেকান, এস্থলে 'শিব' বলতে অবশ্য মোল্লা-মৌলবী বোঝায়।

বেগম মৌলা সতীসাধবী। আজীবন স্বামীর সেবা করেছেন। তাঁর তিনটি পুত্রকন্যা, সবচেয়ে ছোটটির বয়স দশ কিংবা বারো। তাঁর বাপের বাড়িতে কেউ নেই। তিনি বিগতযৌবনা—বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তিনি পুনরায় বিয়ে করতে চাইলেও নতুন বর পাবেন না।

বেগম মৌলাকে তদ্দণ্ডই পতিগৃহ ত্যাগ করতে হবে। কাচ্চাবাচ্চাদের উপরও তাঁর কোনো অধিকার নেই—নিতান্ত দৃশ্যপোষ্য হলে অবশ্য আলাদা কথা।

'তালাক, তালাক, তালাক' বলার জন্য মৌলা সাহেবকে কোনো কারণ দর্শাতে হবে না, কেন তিনি গৃহিণীকে বর্জন করছেন; তাঁর কোন অপরাধ আছে কি না, তিনি অসতী কিংবা চিররুগ্না, কিংবা বঞ্চ উন্মাদ—এর কোনো কারণই দেখাবার জন্য কেউ তাকে বাধ্য করতে পারে না। এস্থলে নিরঙ্কুশ, চৌকশ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'।

(জানি, মৌলা সাহেব হেড আপিসের বড়বাবুর মতো বড় শাস্ত স্বভাব ধরেন। হঠাৎ তিনি ক্ষেপে গিয়ে এরকম ধারা কিছুর একটা করবেন না, কিন্তু সেকথা অবান্তর। এখানে প্রশ্ন, মৌলার হুক কতটুকু, বেগম মৌলারই বা কতটুকু? তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ভদ্র হিন্দু সচরাচর বিনা কুসুরে একমাত্র পুত্রকে তাজ্যাপুত্র করে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু কিস্মিনকালেও করেন না একথা বললে সত্যের অপলাপ হয়।)

যাঁরা তালাক আইনের কোনো পরিবর্তন চান না, তাঁরা উত্তরে বলবেন, আরে বাপু, তালাক দেওয়া কি এতই সোজা কর্ম? 'মহরে'র কথাটি কি বেবাক ভুলে গেলে? মৌলার মাইনে তিন শ টাকা। 'মহরে'র টাকা পাঁচ হাজার। অত টাকা পাবে কোথার মৌলা সাহেব?

হিন্দু পাঠককে এই বেলা 'মহর' জিনিসটি কি সেটি বুঝিয়ে বলতে হয়। 'মহর' অর্থ মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে স্ত্রীধন। বিয়ের সময় মৌলাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়, তাঁর বেগমকে তিনি কতটা স্ত্রীধন দেবেন। মৌলা বলেছিলেন, পাঁচ হাজার (অবস্থাভেদে পঞ্চাশ, একশ, এক হাজার বা পাঁচ লক্ষও হতে পারে) এবং এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন, বেগম সাহেবা যে-কোনো মুহূর্তে স্ত্রীধন তলব করলে তিনি তদ্দণ্ডই নগদা-নগদি আড়াই হাজার ঢেলে দেবেন এবং বাকী আড়াই হাজার কিস্তিবিন্দিতে শোধ দেবেন।

এসব শুধু মূখের কথা নয়। এ সমস্ত জিনিস বিয়ের রাতে দলিল লিখে তৈরী করা হয় ও পরে 'মেরেজ রেজিস্ট্রারে'র আপিসে পাকাপোক্ত রেজিস্ট্র করা হয়। মৌলা এ টাকাটা ফাঁকি দিতে পারবেন না, সে কথা সুনিশ্চিত।

উত্তরে নিবেদন :

মৌলার গাঠে পাঁচ হাজার টাকা থাক আর নাই থাক, তিনি যে স্ত্রীকে

তালাক দিলেন, সেটা কিন্তু অসিদ্ধ নয়। টাকা না দিতে পারার জন্য শেষ তক্ মৌলার সিভিল জেল হতে পারে, কিন্তু তালাক তালাকই থেকে গেল। অর্থাৎ একথা কেউ মৌলাকে বলতে পারবে না, তোমার যখন পাঁচ হাজার টাকা রেষ্ট নেই, তাই তালাক বাতিল, বেগম মৌলা তোমার স্ত্রী এবং স্ত্রীর অধিকার তিনি উপভোগ করবেন।

মোম্বা কথা, তালাক হয়ে গেল, টাকা থাক আর নাই থাক।

*

*

*

পুনরায় নিবেদন করি, শাস্ত্র কি বলেন সে-কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। কুরানশরীফ যা বলেছেন, তার যেসব টীকা-টিপ্পনী লেখা হয়েছে, তার উপর যে বিরাট শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে দেশাচার-লোকাচার মিলে গিয়ে উপস্থিত যে পরিস্থিতি বিদ্যমান তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা। সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে একে অন্যের উপর কতখানি অধিকার, বিশেষ করে একে অন্যকে বর্জন করার অধিকার কার কতটুকু সেই নিয়ে আলোচনা।

পূর্বেই নিবেদন করেছি স্বামী যে-কোনো মূহুর্তে স্ত্রীকে বর্জন করতে পারেন। তাঁকে তখন কোনো কারণ কিংবা অজুহাত দর্শাতে হয় না। তবে তিনি যে 'মহর' বা স্ত্রীধন দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে অর্থ তাঁকে দিতে হবে। অবশ্য না দিতে পারলে যে তালাক মকুব হবে তাও নয়। স্ত্রী তাঁর ভূতপূর্ব স্বামীর মাইনে 'অ্যাটাচ' করতে পারেন, আদালতের ডিগ্রি নিয়ে সম্পত্তি ক্রোক করতে পারেন; এক কথায় উত্তমর্ণ অধমর্ণকে যতখানি নাস্তানাবুদ করতে পারেন ততখানি তিনিও করতে পারেন।

উত্তম প্রস্তাব। এখন প্রশ্ন স্ত্রী যদি স্বামীকে বর্জন করতে চান তবে তিনি পারেন কি না? যদি মনে করুন, স্ত্রী বলেন, 'এই রইল তোমার স্ত্রীধন, আমাকে খালাস দাও' কিংবা যদি বলেন, 'তুমি আমাকে যে স্ত্রীধন দেবে বলেছিলেন সে স্ত্রীধনে আমার প্রয়োজন নেই, আমি তোমাকে বর্জন করতে চাই, তবে স্বামী সাফ 'না' বলতে পারেন। অবশ্য স্ত্রী স্বামীকে জ্বালাতন করার জন্য তাঁর স্ত্রীধন তদুদ্দেশ্যেই চাইতে পারেন—কারণ স্ত্রীধন তলব করার হক স্ত্রীর সব সময়ই আছে, স্বামী তালাক দিতে চাওয়া না-চাওয়ার উপর সেটা নির্ভর করে না। স্বামী যদি সে ধন দিতে অক্ষম হন তা হলেও স্ত্রী তালাক পেলেন না। অর্থাৎ তিনি যদি পতিগৃহ ত্যাগ করে ভিন্ন বিবাহ করতে চান তবে সে বিবাহ অসিদ্ধ; শূদ্ধ তাই নয়, পুর্লিঙ্গ স্ত্রী এবং নবীন স্বামী দ্বজনের বিরুদ্ধে 'বিগেমি'র মোকদ্দমা করতে পারবে।

পক্ষান্তরে আবার কোনো স্ত্রী যদি স্ত্রীধনটি ভ্যানিটি-ব্যাগস্থ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকেন তবে স্বামীও তাঁকে জোর করে আপন বাড়িতে নিয়ে আসতে পারেন না। আইন স্বামীকে সে অধিকার দেয়, কিন্তু আনবার জন্য পুর্লিঙ্গের সাহায্য দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। আপনি যদি জোর করে আনতে যান তবে শালী-শালাজের হস্তে উত্তমমধ্যমের সমূহ সম্ভাবনা।

তখন আপনি আর কি করতে পারেন? তাঁকে তালাক দিয়ে হৃদয় থেকে

মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে পারেন আর আপনি যদি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হন তবে আপনি তালুক না দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন। তাতে করে আর কিছু না হোক স্ত্রী অত্যন্ত আরেকটা লোককে বিয়ে করতে পারবেন না।

খুব বেশি না হলেও কোনো কোনো সময় এরকম হয়ে থাকে। পরিস্থিতিটা দু'রকমের হয়।

হয় স্বামী বদরাগী, কিংবা দুষ্টচরিত্র। স্ত্রীকে খেতে পরতে দেয় না, মারধোর করে। সহ্য না করতে পেরে স্ত্রী বাপ কিংবা ভাইয়ের বাড়িতে পালাল (বাপ বেঁচে না থাকলে ভাইও আগ্রহ দিতে বাধ্য হয়, কারণ ভাই যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে তাতে বোনেরও অংশ আছে)। সেখান থেকে সে স্ত্রীধনের তলব করে মোকদ্দমা লাগাল। স্বামীর কণ্ঠস্বাস— অত টাকা যোগাড় করবে কোথা থেকে?

তখন সাধারণত মরুৎকণ্ঠীরা মধ্যখানে পড়েন—বিশেষত সেই সব মরুৎকণ্ঠীরা যারা বিয়েটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁরা পতিকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, ‘তোমাতে ওতে যখন মনের মিল হয় নি তখন কেন বাপু মেয়েটাকে ভোগাচ্ছ। তালুক দিয়ে ওকে নিষ্কৃতি দাও, বেচারী অন্য কোথাও বিয়ে করুক।’

বেয়াদা বদমায়েশ স্বামী হলে বলে, ‘না, মরুৎকণ্ঠে বেটি। আমি ওকে তালুক দেব না।’

মরুৎকণ্ঠীরা বলেন, ‘তবে ঢালো “মহরে”র ঢাকা। না হলে বসতবাড়ি বিক্রি হবে, কিংবা মাইনে অ্যাটাচড্ হবে। তখন বুঝবে ঠালাটা।’

বিশ্বাস করবেন না, এরকম দৃশ্যমন ধরনের স্বামীও আছে যে বাড়ি বিক্রয় করে মহরের শেষ কপর্দক দেয় কিন্তু তালুক দিতে রাজী হয় না।

কিংবা সে শেষ পর্যন্ত রাজী হয় যে বিবি তাঁর স্ত্রীধন তলব করবেন না। আর সেও তাকে তালুক দিয়ে দেবে।

কিন্তু এটা হল আপোসে ফৈসাল। আইনের হুক স্ত্রীলোকের নেই যে সে পতিকে বর্জন করতে পারে। তবু এস্থলে পুনরায় বলে রাখা ভালো, “মহরে”র টাকা দেবার ভয়ে অনেক স্বামী স্ত্রীর উপর চোট-পাট করা থেকে নিরস্ত থাকেন।

এখন প্রশ্ন, স্বামীর যদি গলিত কুষ্ঠ হয়, কিংবা সে যদি বম্ব উম্মাদ বর্তাল্ল যদি তার যাবৎজীবন কারাদণ্ড হয়, যদি সে বার বার কুর্গিসত রোগ আহরণ করে স্ত্রীতে সংক্রামিত করে, যদি সে লম্পট বৈশ্যাসক্ত হয় তবে কি স্ত্রী তাকে আইনত তালুক দিতে পারেন না।

শূন্যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে ‘তুমি আমার মায়ের মতো’ অর্থাৎ এই উক্তি দ্বারা সে প্রতিজ্ঞা করে যে স্ত্রীকে সে তার ন্যায্য যৌনাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে তবে নাকি সে স্ত্রী মোকদ্দমা করে আদালতের পক্ষ থেকে তালুক পেতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইস্কুলে পড়ি ; ষোল বছর বয়স । বিশ্বাস হয়, বিশ্ববিখ্যাত অবনীন্দ্রনাথ তাকে প্রথম দর্শনেই পূর্ণ দৃষ্টি ধরে ভারতীয় কলার নবজাগরণের ইতিহাস শোনালেন ?

সত্যিই তাই হয়েছিল। আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তিন মিনিট যেতে না যেতেই তিনি হঠাৎ সোৎসাহে এক ঝটকায় হেলান ছেড়ে খাড়া হয়ে বসে আমাকে সেই প্রাচীন যুগের কথা—কি করে তিনি ছবি আঁকা শিখতে আরম্ভ করলেন, সে ছবি দেখে শ্বজেন্দ্রনাথ কি বললেন, হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, টাইকানের সঙ্গে তাঁর সহযোগ, ওরিয়েন্টাল সোসাইটির গোড়াপত্তন, নন্দলাল অসিতকুমারের শিষ্যত্ব, আরো কত কী যে বলে গেলেন তার অর্ধেক লিখে রাখলেও আজ একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর কলা-ইতিহাস হয়ে যেত।

আর কী ভাষা, কী রঙ। আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন মনে মনে দেখি, সেদিন অবনীন্দ্রনাথ কথা বলেন নি, সেদিন যেন তিনি আমার সামনে ছবি এঁকেছিলেন। রঙের পর রঙ চাপাচ্ছেন; আকাশে আকাশে মেঘে মেঘে সূর্যাস্ত সূর্যোদয়ের যত রঙ থাকে তার থেকে তুলে নিয়ে ছবির এখানে লাগাচ্ছেন, ওখানে লাগাচ্ছেন আর যতই ভাবি এর পর আর নতুন নতুন রঙ বানিয়ে ছবির উপর চাপাচ্ছেন।

আর কী উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর স্নেহদ্রুত, তাঁর পতন-অভ্যুদয়ের অনুভূতি অজানা অচেনা এক আড়াই ফোটা ছোকরার মনের ভিতর সঞ্চার করার প্রচেষ্টা। বুদ্ধলব্ধ, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ভালোবেসেছেন ভারতীয় কলাশিল্পকে আর ‘আপন বুদ্ধের পাজির জ্বালিয়ে নিয়ে’ প্রদীপ্ত করে দিয়েছেন আমাদের দেশের নিবর্নিপিত কলাপ্রচেষ্টার অশ্ব-প্রদীপ।

*

*

*

তারপর একদিন তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানেও আমি কেউ নই। রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল এবং নন্দলালের কৃতী শিষ্যগণ তাঁর চতুর্দিকে। স্নেহ রবীন্দ্রনাথ আত্মকুঞ্জে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, বিশ্বকবিরূপে, শান্তিনিকেতনের আচার্যরূপে। আর সেদিন রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আসন নিতে অনুরোধ করলেন সে রকম ভাষা আমি রবীন্দ্রনাথের মুখে তার পূর্বে কিংবা পরে কখনো শুনিনি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেন গদ্য গান গেরোছিলেন, আমার মনে হয়, সেই দিনই তিনি প্রথম গদ্য কবিতা লেখা আরম্ভ করলেন। দেশেবিদেশে বহু সাহিত্যিককে বক্তৃতা দিতে শুনোঁছি, কিন্তু এরকম ভাষা আমি কোথাও শুনিনি—আমার মনে হয়, দেবদুতরা স্বর্গে এই ভাষায় কথা বলেন—সেদিন যেন ইন্দ্রপুরীর একখানা বাতায়ন খুলে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উর্বশীর বীণা গুঞ্জরণ করে উঠেছিল।

*

*

*

অশ্বকার হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তরায়ণের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি—
অবনীন্দ্রনাথ সদলবলে আসছেন। আমাকে চিনতে পারলেন বলে মনে বড়
আনন্দ হল।

তখন আমাদের সবাইকে বললেন, ‘জানো, বৈজ্ঞানিকরা বড় ভীষণ লোক—
আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙে দেয়। এই দেখো না, আজ সন্ধ্যায় আমি দক্ষিণের
দিকে তাকিয়ে দেখি কালো কালো মেঘ এসে বাসা বাঁধছে ভুবনডাঙার ওপারে
ডাক-বাঙলোর পিছনে। মেঘগুলোর সর্বাঙ্গে কেমন যেন ক্রান্তির ভাব আর
বাসা বাঁধতে পেরে তারা একে অন্যকে আনন্দে আলিঙ্গন করছে।

রথী শুনলে বলেন, ‘মেঘ কোথায়? এ তো ধানকলের ধোঁয়া!’

এক লহমায় আমার সব রঙীন স্বপ্ন বরবাদ হয়ে গেল। তাই বলছিলাম
বৈজ্ঞানিকগুলো ভীষণ লোক হয়।’

সে যাত্রায় যে কদিন ছিলেন তান যে কত গল্প বলেছিলেন, তরুণ শিল্পীদের
কত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তার ইতিহাস, আশা করি, একদিন সেই শিল্পীদের
একজন লিখে দিয়ে আমাদের প্রশংসাজনক হবেন।

*

*

*

আবার সেই প্রথম দিনের পরিচয়ে ফিরে যাই।

আমি তখন আটোগ্রাফ শিকারে মত্ত। প্রথম গগনেন্দ্রনাথকে অনুরোধ
করলাম আমার অটোগ্রাফে কিছ্‌র একে দিতে। তাঁর কাছে রঙ তুলি তৈরী
ছিল। চট করে পাঁচ মিনিটের ভিতর আকাশে ঘন মেঘ আর তার ফাঁকে
ফাঁকে গুটি কয়েক পাখি একে দিলেন।

এর কয়েক দিন পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা কলকাতায় এসে
‘বর্ষামঙ্গল’ করে গিয়েছে। গগনেন্দ্রনাথ ছবি একে দিয়ে বললেন, ‘পাখিরা
বর্ষামঙ্গল করছে।’

অবনীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে তিনি বললেন, ‘তুমি নিজে ছবি আঁকো
না কেন?’

আমি সবিনয়ে বললাম, ‘আমি ছবি দেখতে ভালোবাসি।’

বললেন, ‘দাও তোমার অটোগ্রাফ। তোমাকে কিছ্‌র একটা লিখে দিচ্ছি
আর যেদিন তুমি তোমার প্রথম আঁকা ছবি এনে দেখাবে সেদিন তোমার
বইয়ে ছবি একে দেব।’

বলে লিখলেন, ‘ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে স্থলে
প্রতি মূহুর্তে’ এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে
দিনগুলো।

‘আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ করো এক জায়গায়,
দিতে থাকো রঙের টান, তুলির পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয় স্রষ্টার
আনন্দ’ ॥১

‘জিদ-ওয়াইল্ড্’

আমি জিদের বই এবং বিশেষ করে তাঁর ‘জুর্নাল’গুলো (ডায়েরী) বিশ্ববিখ্যাত । আর পাঁচজনের মতো আমিও সেগুলো পড়েছি, তাঁর পরলোকগমনের পর ফ্রান্স-দেশে তাঁর সম্বন্ধে যেসব লেখা বেরিয়েছে তারও কিছু কিছু নেড়েচেড়ে দেখেছি, কিন্তু তবু মনে নিতেই হল যে, ঠিক ঠিক হৃদস্রাব পেলুম না—জিদকে ফেলি কোন্ পর্ষায়ে, কপালে টিকিট সাঁটি কোন্ রঙের ? অথচ গুরুত্বপূর্ণ আদেশ জিদ সম্বন্ধে লিখতে হবে—উপায় কি ?

একটা উপায় আছে, সেটি হচ্ছে জিদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আলোচনা করা । এই ধরুন না, অস্কার ওয়াইল্ড্ । জিদ তাঁকে বিলক্ষণ চিনতেন এবং ওয়াইল্ড্‌ও তাঁকে স্নেহ করতেন । ওয়াইল্ড্‌ তখন খ্যাতনামা পুস্তক, প্যারিসে এলে তাঁর পিছনে ফেউ লেগে যেত : তার উপর ওয়াইল্ড্‌ বলতে পারতেন খাসা ফরাসী । জিদই তাঁর চিঠি বই ‘অস্কার ওয়াইল্ড্‌’র স্মরণে লিখেছেন ‘ওয়াইল্ড্‌’ অত্যন্ত ফরাসী জানতেন তবু মাঝে মাঝে ভান করতেন যেন জুতসই শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না—অবশ্য তখন তাঁর মতলব হত ঐ কথাগুলোর উপর বিশেষ করে জোর দেবার । উচ্চারণে তাঁর প্রায় কোনো ভুলই ছিল না—শুধু ইচ্ছে করে দুটো একটা শব্দ এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যাতে করে সেগুলো ভারি নতুন ধরনের চমক দিয়ে দিত । প্রথম যে সম্মান তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সেদিন তিনি একটানা আমাদের গল্প শুনিয়েছিলেন কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া খাপছাড়া, আর সে সম্মান গল্পগুলো তাঁর সবচেয়ে ভালো গল্প বলেও ধরে নেওয়া যায় না । হয়তো ওয়াইল্ড্‌ আমাদের চিনতেন না বলে আমাদের গ্রহণ করার ক্ষমতা পরখ করে নিচ্ছিলেন । ঐ ছিল তাঁর স্বভাব—তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকায় হোক—যে-লোক যে জিনিসের রস বুঝতে পারবে না তাকে তিনি সে জিনিস কখনো পরিবেশন করতেন না । যার যে রকম রুচি তাকে ঠিক সেই রকমেরই মাল দিতেন তিনি । যারা তাঁর কাছ থেকে কোনো জিনিসের প্রত্যাশা করত না তারা পেতও না কিছু—কিংবা হয়ত পেত সামান্য একটুখানি গাঁজলা । আর সবচেয়ে তিনি পছন্দ করতেন খুশগল্প বলে পাঁচজনকে খুশ্ করে রাখতে, তাই অনেকেই যারা ভেবে নিয়েছেন যে, তাঁরা ওয়াইল্ড্‌কে চিনতে পেরেছেন, তাঁরা শুধু তাঁকে চিনেছেন খুশি দেনওয়ালা হিসেবে (amuseur = amuser) ।’

জিদ এখানে একটুখানি ইঙ্গিত করেছেন যে, বেশীর ভাগ লোকই ওয়াইল্ড্‌কে চিনেছে কেমন যেন একটু ‘ভাঁড়’ ‘ভাঁড়’ রূপে এবং সেইটাই তাঁর আসল রূপ ছিল না ।

মনে হচ্ছে এর থেকে জিদ কিঞ্চিৎ শিখে নিয়েছিলেন । কারণ, পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, ‘ঐ ছিল তাঁর স্বভাব—তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকায় হোক—সবাইকে আপন রুচি অনুযায়ী পরিবেশন করার ।’ তাই বোধ করি ; জিদ সেই প্রথম যৌবনেই মনোস্থির করে ফেলেছিলেন যে, ওটা বোকায় হোক, আর তিনি অন্য কারোর রুচির বিলকুল তোয়াক্কা না করে

টক-টক হক কথা বলে যাবেন।

সে না হয় বুঝলুম। অপরকে টক কথা শুনিয়ে দেওয়া খুব কঠিন কর্ম নয়—আমরা সবাই জানা-অজানাতে হরদম কয়ে থাকি—কিন্তু প্রশ্ন, নিজের সম্বন্ধে টক কথা পাঁচজনকে শুনিয়ে বলতে পারে কটা লোক? জিদ পারতেন কি না?

ওয়াইল্ড্ কোন্ অপরাধে জেলে গিয়েছিলেন সে-কথা সকলেই জানেন। জেল থেকে বেরিয়ে ওয়াইল্ড্ দেখেন লন্ডন-সমাজ তার তাবৎ দরজা দড়াম করে তাঁর মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি তখন গেলেন ফ্রান্স। প্যারিসেও গোড়ার দিকে ঐ একই অবস্থা হতে পারে ভেবে তিনি গেলেন একটি ছোট নির্জন শহরে! খবর পেয়ে জিদ তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে গিয়ে জখমী ওয়াইল্ড্‌য়ের বিস্তর তত্ত্বাবাশ করলেন। জিদ তাঁর অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন উপযুক্ত চিঠি বইয়ে। পাঁচজনে কি বলবে না বলবে তার তোয়াক্কা জিদ তখন করেন নি; সে কথাটা তিনি না বললেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

তারপর ওয়াইল্ড্ ফিরে এলেন প্যারিসে। জিদের সঙ্গে তাঁর দু'চার বার দেখা সাক্ষাৎ হল। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, প্যারিসে যে শূন্য ওয়াইল্ড্‌য়ের হৃৎকো-ন্যাপিতই বন্ধ করেছে তা নয়, তাঁর বন্ধুবান্ধবের অনেকেও তাঁকে কুষ্ঠরোগীর মতো বর্জন করতে আরম্ভ করেছেন। জিদ লিখেছেন 'ওয়াইল্ড্ যখন দেখতে পেলেন দু'চারখানা দরজা তাঁর জন্য বন্ধ তখন তিনি আর কোনো দরজাতেই কড়া নাড়লেন না—ছন্মের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এমন সময় একদিন জিদ দেখতে পেলেন, ওয়াইল্ড্ এক ক্যাফে বারান্দায় বসে আছেন। স্বীকার করি, ও রকম জায়গায় হঠাৎ মোলাকাত হয়ে যাওয়াতে আমি একটু খানি অস্বস্তি অনুভব করলুম—চতুর্দিকে ভিড়। বন্ধু 'জি—' ও আমার জন্য ওয়াইল্ড্ দুটো ককটেল অর্ডার দিলেন। আমি তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসতে যাচ্ছিলুম যাতে করে লোকজনের দিকে পিঠ ফিরানো থাকে কিন্তু ওয়াইল্ড্ ভাবলেন, আমি পাশে বসতে বোকামির মতো নিরর্থক লজ্জা পাচ্ছি (হায়, ওয়াইল্ড্ সম্পূর্ণ ভুল করেন নি) তাই পাশের চৌকি দেখিয়ে বললেন, 'আঃ, আমার পাশে এসে বসো না; আমি আজকাল বড্ড একলা পড়ে গিয়েছি।'

তারপর দু'জনাতে কি কথাবার্তা হল সে কথা আরেক দিন হবে। উপস্থিত লক্ষ্য করার বস্তু যে, জিদও জনমতের ঠেলায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন। এবং যে ব্যবহার করলেন তাকে স্নেহ, ক্যাডের আচরণ বলা যেতে পারে। বাঙলা কথায় একদম ছোটলোকোমি করলেন।

একদিন জিদ নির্ভয়ে যেচে গিয়ে ওয়াইল্ড্‌য়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন লোকনিন্দার পরোয়া না করে, এবং আশ্চর্য তাই নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র গর্ব করেন নি এবং আরো যখন অন্যায় আচরণ করলেন তখনও সেটা লুকোলে না। শূন্য তাই নয়, পাঠক যাতে অতি নির্মমভাবেই তাঁর মাথায় ঘোল ঢালতে পারে তাই কোনো প্রকারের অজুহাত বা আত্মনিন্দাও পেশ করলেন না।

কি উপন্যাস, কি ছোট গল্প, কি জুর্নাল, সবটাই জিদ এই আশ্চর্য সাধুতা দেখিয়েছেন ॥^১

এশান্ত পরমাগতি

প্রাচ্যভূমি থেকে শ্বেতের প্রাধান্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নব নব আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতির ভূমিতেও নতুন নতুন চাষ-আবাদ আরম্ভ হয়েছে। চীনদেশ থেকে আরম্ভ করে ইন্দোনেশিয়া, ভারত-পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তান, ইরান, আরব ভূমি পেরিয়ে এক দিকে মরক্কো পর্যন্ত এবং অন্য দিকে তুর্কী ইষ্টক। সবগুলোর খবর রাখা অসম্ভব—এতগুলো ভাষা শেখার শক্তি এবং সময় আছে কার?—তবু মোটামুটিভাবে তার খানিকটা জরিপ করা যায়।

তিনটে বড় বড় বিভাগ করে প্রাথমিক জরিপ করা যায়। চীন, ভারত, পাকিস্তান এবং আরব ভূমি। ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং তুর্কীকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু উপস্থিত সেগুলোকে হিসেবে নিলে আলোচনাটা একদম কন্জার বাইরে চলে যাবে।

এ তিন ভূখণ্ডই দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতির বাজারে দিশী-বিদেশী দুই মালই চলছে। দর্শন, বিজ্ঞানের তুলনায় সাহিত্যই উপস্থিত এ তিন ভূখণ্ডে সংস্কৃতির প্রধান বাহন—এবং সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি যে বস্তু লেখা এবং পড়া হচ্ছে সে হল উপন্যাস এবং ছোট গল্প। এ দুই জিনিসই প্রাচ্যদেশীয় নিজস্ব ঐতিহ্যগত সম্পদ নয়; ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজের কাছ থেকে শেখা। চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের বেলাও তাই—সেজান, রেনওয়ার্ড, রদাঁ এপস্টাইনের প্রভাব কি কাইরো কি কলিকাতা সবটাই দেখা যায়। ইয়োরোপীয় দর্শন এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে ভারত—কিছুটা কাইরো, তেলেভিভ এবং বাইরুত। একমাত্র গুস্তাদী সঙ্গীতের বেলা বলা যেতে পারে যে, ইয়োরোপীয় প্রভাব এর উপর কোন চাপই দিতে পারে নি।

কিন্তু এরকম পদ গুনে গুনে ফিরিষ্টি বানাতে গেলে একখানা ছোটখাটো বিশ্বকোষ লিখতে হয়। সেটা এড়াতে হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি নির্মিত হয় বিশেষ মনোবৃত্তি হৃদয়াবেগ দ্বারা। তার কিছুটা হৃদিস পেলে মোটামুটি ভাবে বলতে পারা যায়, বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি চলছে কোন পথে।

শ্বেতের প্রভাব কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে আন্দোলন এ তিন ভূখণ্ডে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে ‘ছুঁৎবাই’, ‘বিশুদ্ধীকরণ’ বা ‘সত্যযুগে প্রত্যাবর্তন’ নাম দেওয়া যেতে পারে। এর প্রধান ধর্ম, বৈদেশিক সর্বপ্রকার প্রভাব বর্জন করে বিশেষ কোন প্রাচীন ঐতিহ্যকে নতুন করে চান্স করে

^১ Andre Gide : Oscar Wilde, In memoriam, Paris, Mercure de France.

তোলা। এই ভারতবর্ষেই কেউ চায় বৈদিক যুগে যিরে যেতে (ত্রিগাণ্ডে-
যাদের ভক্তি অত্যধিক), কেউ চায় উপনিষদের যুগ জাগাতে (দার্শনিক
মনোবৃত্তিওয়ালারা), কেউ বা গুপ্ত যুগ (সাহিত্য-কলায় যাদের মোহ), কেউ
বা ভক্তি যুগে (বৈষ্ণবজন) ডুব মারতে চান। কেউ বলেন, রবরের জুতো
পরে কাঁচা শাকসমিষ্টি খাও, কেউ বলেন, ছেলেমেয়েরা বড় বেশি মেশামিশি
করছে, তাদের সিনেমা যেতে বারণ করে দাও। পাকিস্তানে এ আন্দোলন 'ইসলামী
রাষ্ট্র'র নামে শক্তি সঞ্চয় করতে চায়। কাইরোর আজহর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কটর
মৌলানারা এ-দলেরই শামিল। ইন্দোনেশিয়ায় এদেরই নাম দার-উল-ইসলাম
সম্প্রদায়। ইবন-ই-সউদ গোষ্ঠীর ওয়াহাবী আন্দোলন এই মনোবৃত্তি নিয়েই
আরম্ভ হয়। এ-দলের মান্দারিনরা চীনে কিন্তু বিশেষ পাক্তা পাচ্ছেন না।

প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এ আন্দোলন শেষ
পর্যন্ত বানচাল হবে। তার প্রধান কারণ, কোন দেশেরই যুবক সম্প্রদায় এ
আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী হচ্ছে না।

স্বিতীয় আন্দোলন ঠিক এর উল্টো। এর চাইরা বলেন, 'প্রাচ্য প্রাচ্য করে
তো ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজের হাতে মার খেলে বিস্তর। প্রাচ্য ঐতিহ্য সর্ব-
প্রকার প্রগতির "এনিমি নাম্বার ওয়ান"। আমাদের সর্বপ্রকার বৈদেশ্য-সংস্কৃতি
প্রচেষ্টা যদি আধুনিকতম, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে বিজড়িত
না হয়, তবে তার কোন প্রকারেরই ভবিষ্যৎ নেই।' এ আন্দোলনের বড়-
কর্তাদের অধিকাংশই কম্যুনিস্ট ভায়ারা। এঁদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি-বৈদেশ্যের
রঙেও সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিস্তোৎপাদন এবং ধন-বস্তু পদ্ধতির উপর এবং
যেহেতু প্রাচ্যভূমিও একদিন মার্কসের অলম্ব্য নিয়মানুযায়ী প্রলোভিতারাজে
পরিণত হবে, সেই হেতু প্রাচ্যেরও সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণ-নৃত্য, গণনাট্য,
গণ-সাহিত্যের উপর। তাই ঐতিহ্যগত সর্বপ্রকার বৈদেশ্য-সংস্কৃতি 'বৃজ্জ-ম্মা'
—সুতরাং বর্জনীয়।

ভারত-পাকিস্তানে এ আন্দোলন সুবিধে করে উঠতে পারছে না, কিন্তু বিশেষ
করে তুর্কীতে এবং কিছুটা কাইরো বাইরুতে এর প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।
কম্যুনিস্ট ছাড়াও বহু যুবকযুবতী এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তার অন্যতম
কারণ অবশ্য এই যে প্রথম আন্দোলনে যোগ দিতে হলে ক্র্যাসিক্‌স্ পড়তে হয়,
সঙ্গীতের শখ থাকলে দশ বছর সা রে গা মা করতে হয়, কুরানহাদিস কঠিন করতে
হয়—তাতে বায়ানাক্তা বিস্তর। এতো হাঙ্গামা পোয়ায় কে? তাই স্বিতীয়টাই সই।

এ দুই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ঠিক করবেন ষ্ট্রুমান স্তালিন। আমাদের মাথা
ঘামাতে হবে না।

তৃতীয় আন্দোলন প্রাচ্যভূমিতে আরম্ভ করেন রাজা রামমোহন। তাঁর
প্রচেষ্টা বাঙালী পাঠককে নতুন করে বলতে হবে না। প্রাচ্যভূমির ঐতিহ্যের
সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ মিলিয়ে নিয়ে তিনি নব নব সৃষ্টির
স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ তাঁদের স্বপ্নকে বৈদেশ্যের বহু ক্ষেত্রে
মূর্তমান করেছেন। কাইরোর তাহা হোসেন, বাইরুতের খলীল গিবরানী,

ঢাকার বাঙালী সাহিত্যিক সম্প্রদায়, লাহোরে ইকবালের শিষ্যমণ্ডলী এবং ইন্দোনেশিয়ার সুতান শহরীর এ সম্প্রদায়ভূক্ত।

বিশেষ করে সুতান শহরীর নাম ভিত্তিতে স্মরণ করতে হয়। জাভা সুমাত্রা বালীর অনাড়ম্বর জীবন যাপন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সদানন্দ কৃষ্ণমতাবিবর্জিত সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়ার এতদিন ধরে গড়ে উঠেছে, ওলন্দাজ বর্বরতা যাকে বিনষ্ট করতে পারে নি, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে শহরীর চান উত্তম উত্তম ইয়োরোপীয় চিন্তাবৃত্তি, অনুভবসম্পদ যোগ দিয়ে নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। এবং সে চাওয়ার পিছনে রয়েছে শহরীর নিরঙ্কুশ আত্মত্যাগ আর কঠোরতম সাধনা। বিশ্বসংসারের সব আন্দোলন সব প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি নিজেকে অহরহ সংযুক্ত রেখে সেই পন্থার অনুসন্ধান করছেন, যে পন্থা শুধু যে ইন্দোনেশিয়ার চিন্তাবিকাশ কলাপ্রকাশ মূর্তমান করবে তাই নয়, তাবৎ প্রাচ্যভূমি তার থেকে অনুপ্রেরণা আহরণ করতে পারবে।

এ পন্থা অশ্বেষণে নিজেকে অহরহ সজাগ রাখতে হয়—গীতার সংযমী, যিনি সদাজাগ্রত তিনিই এ মার্গের অধিকারী। শহরীর এ মার্গের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

এশ্য পরমাগতি ॥

দিস্ ইয়োরোপ !

গিরিজা মুখুন্ডে দেশে থাকতে বার দুই জেলে যান—সে কিছ্ না, নিস্য। (কেন বলছি, ব্যাকটুকু পড়লেই বুঝতে পারবেন) তারপর ছিটকে গিয়ে লন্ডন, সেখান থেকে প্যারিস। দিব্যি আছেন, সর্ব্বান্ যান, ফরাসী গুণীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, দু পয়সা কামানও বটে। এমন সময় দেখা গেল, জার্মানরা প্যারিসের ঘাড়ে এসে পড়ল বলে। মুখুন্ডে গুলটিকয়েক ফরাসী আত্মজনের সঙ্গে আরো সব লক্ষ লক্ষ ফরাসীদের মতো দক্ষিণের পথ ধরলেন। পায়ে হেঁটে, মালবোঝাই বাইসিকেল কিংবা হাত-গাড়ি ঠেলে ঠেলে যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে ভিরমি যাবার উপক্রম (ওদিকে মনে মনে ভাবছেন, জার্মানদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন), তখন হঠাৎ মালুম হল, জার্মান বাহিনী তাঁকে পিছনে ফেলে রাতারাতি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তখন সামনে পিছনে সবই সমান ; ফিরে এলেন প্যারিস।

মুখুন্ডে ভারতীয়, কাজেই ইংরেজের দৃশ্যমন। কিন্তু তাহলে কি হয়—পাসপোর্টে যে পাকাপোক্ত ইন্সটাম্পে মারা রয়েছে, মুখুন্ডে ব্রিটিশ প্রজা, অর্থাৎ তিনি জার্মানির শত্রু। কাজেই যদিও পাদমেকং ন গচ্ছামি করে আপন কুঠুরিতে শুধু-শাম ঘাপটি মেরে বসে থাকতেন, তবু।

একদা কেমনে জানি ভারতীয় মহাশয়

পাড়িলেন ধরা, আহা, দূরদৃষ্ট অতিশয়।^১

জার্মান পুলিশের তদারকিতে ফরাসী জেলখানায় মুখুন্ডে তখন ইন্ট-

দেবতার নাম জপ করতে লাগলেন। সে-জেল ইংরেজের শত্রু-মিত্র বিশ্বের 'ব্রিটিশ' প্রজার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। তার বর্ণনাটি মনোরম।

কিছুদিন পর জেল থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

তখন নাসিরার তাঁকে বললেন, তাঁর সঙ্গে বার্লিন যেতে। সেখানে গিয়ে দেখেন, সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য হরেক রকম তরিকত-তত্ত্বাবাণ আরম্ভ করে দিয়েছেন। মনুখুজেকে 'আজাদ হিন্দ' বেতারে বেঁধে দেওয়া হল নানা প্রকারের ব্রডকাস্টের জন্যে। সুভাষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগ হল। গ্র্যান্ড মুরফতির সঙ্গেও বিশ্বের দরদর মহরম হল।

সুভাষ সম্বন্ধে মনুখুজেকে অনেক কিছু লিখেছেন। উপদেশ।

তারপর সুভাষ দেখলেন, বার্লিনে থেকে কাজ হবে না। ওদিকে ইংরেজ সিঙ্গাপুরে শিঙে ফুঁকেছে। জাপানীরা বর্মায় ঢুকছে। সুভাষ চলে গেলেন জাপান। এদিকে 'আজাদ হিন্দ' বেতার দড়কচা মেয়ে গেল। মনুখুজেরা কিন্তু কান্দে দেন নি।

তারপর জার্মানির পতন আরম্ভ হল। বোমার ঠেলায় বার্লিনে কাজ করা দায়। তাবৎ ভারতীয়কে সরানো হল হল্যাণ্ডে; সেখান থেকে আজাদ হিন্দের বেতারকর্ম চালু থাকল বটে, কিন্তু মনুখুজেরা বুঝলেন, সময় ঘনিয়ে এসেছে। তারপর প্রায় সবাই একে একে ফিরে এলেন বার্লিন। সেখান থেকে মনুখুজেকে গেলেন দক্ষিণ-জার্মানিতে। ইতিমধ্যে রাশানরা ঢুকল বার্লিনে।

এবারে তিনি আইনত রাশার শত্রু। কারণ রাশার মিত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি বিশ্বের ঝেতার বক্তৃতা ঝেড়ে বসে আছেন। আইনত তিনি অ্যামেরি, হো হো'র সমগোত্র। কাজেই পালাতে হল 'নিরপেক্ষ' সুইটজারল্যাণ্ডে। এক দরদী জার্মান সীমান্ত পুলিশই তাঁকে বাতলে দিলে কি করে নিষ্পত্তি রাতে রাইন নদী সীতরে ওপারে যাওয়া যায়।

আমরা ভাবি সুইসরা বড়ই নিরপেক্ষ মোলায়েম জাত। মনুখুজেকে সেখানে যে বেইজার্জি আর লাঙ্কনার ভিতর দিয়ে গেলেন, তার বর্ণনা আমি আর এখানে দিলুম না।

সুইসরা মনুখুজেকে আশ্চর্য্যতার দরজায় পেঁছিয়ে হঠাৎ একদিন প্রায় 'কানে ধরে' ধাক্কা মেয়ে ঢুকিয়ে দিল জার্মানিতে। জার্মানির যে অঙ্গুলে তাঁকে ফেরত-ডাকে পাঠানো হল, সেটি ফরাসীর তাঁবেতে। কাজেই তাঁকে পত্রপাঠ প্রেস্তার করা হল। কিন্তু মনুখুজেকে যখন কমান্ডাণ্টকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি জার্মানিতে যা কিছু করেছেন সে শুধু 'পার্ট্র'র (দেশের) জন্য, তখন ফরাসীরা—আর এ শুধু ফরাসীরাই পারে—মনুখুজের বিগত জীবনটা যেন বেবাক ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, খেতে পরতে দিল। বলল, 'তুমি যখন দিব্য ফরাসী-জার্মান জানো, তখন আমাদের সঙ্গে থেকে কাজ করো না কেন?' তাই সই। ব্যবস্থাটা স্থানীয় জার্মানদেরও মনঃপূত হল—অবিশ্য বিজয়ী ফরাসীরা তখন তার থোড়াই পরোয়া করত—কারণ মনুখুজেকে তাদের সামনে 'দম্ভী বীর'ের মূর্তিতে দেখা দেন নি।

তারপর সেই ফরাসী রেজিমেন্ট দেশে চলে গেল। মনুখুজের আবার জেল।

ইংরেজ তখন অ্যামেরি হো হো'র মতো মৃখুন্ডেকে পেলে তাঁকেও ঝোলায় ।

কিন্তু ঝোলাবার সুযোগ পায় নি । ফরাসীরা মৃখুন্ডেকে ইংরেজের হাতে তুলে দেয় নি ।

তারপর স্বরাজ হয়ে গেল । দেশের ছেলে দেশে ফিরে এল ।

* * *

কিন্তু বইখানা মৃখুন্ডের আত্মজীবনী নয় । বইটিতে মৃখুন্ডেজ ইয়োরোপ দেখেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা পটপরিবর্তনের সামনে, পয়লা সারিতে বসে । উত্তম বই ।^২

শমীম

আমার বন্ধু শমীম মারা গিয়েছে । শমীম এ-সংসারে কোনো কীর্তি রেখে যেতে পারে নি, যার জন্যে লোকে সভাস্থলে কিংবা কাগজে শোক প্রকাশ করবে । তার আত্মজন এবং নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তাকে কেউ বেশিদিন স্মরণ করবে না ।

তার কথা আপনাদের জোর করে শোনাবার অধিকার আমার নেই, কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, শমীম কোন কীর্তি রেখে যেতে পারে নি । তবু যে কেন তার সম্বন্ধে লিখছি, তার কারণ সে আমার বন্ধু, আর তাই আশা, আমার বহু সন্তদয় পাঠক সেই সূত্রে তাকে স্নেহের চোখে দেখবেন, এবং বহু দেশ দেখবার পর বলছি, ওরকম সচরিত্র ছেলে আমি কোথাও দেখি নি ।

শমীম আমার ছেলের বয়সী । তার জন্মের প্রায় প্রথম দিন থেকেই আমি তাকে চিনি । আর এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে সে জন্মাল, আর সে সৌন্দর্য দিন দিন এমনি বাড়তে লাগল যে, বাড়িতে যে আসত, সে-ই ছেলেটির দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারত না । বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল, কী বিনয়নম্র ভঙ্গিসংযত ব্যবহার এবং পরদুঃখকাতর হৃদয় ভগবান তাকে দিয়েছেন । আমি নিশ্চয়ই জানি বাড়ির ভিতরে বাইরে এমন কেউ ছিল না যে শমীমের উপর বিরক্ত হয়েছে কিংবা রাগ করেছে ।

কিন্তু তবু বলব, শমীম মন্দ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিল ।

ধরা পড়ল সে সন্ন্যাস রোগে ভুগছে । সন্ন্যাসের চিকিৎসা আছে কি না জানি নে, কিন্তু একথা জানি, তার পিতা (আমার অগ্রজ-প্রতিম) চিকিৎসক হিসেবে আর আমরা পাঁচজনে বন্ধুবান্ধব হিসেবে তার চিকিৎসার কোন দ্রুতি করি নি । আর মায়ের সেবা সে কতখানি পেয়েছিল, সে কথা কি বলব ? সর্ব-কনিষ্ঠ চিররুণ কোন ছেলেকে তার মা হৃদয় উজাড় করে সেবা-শুশ্রূষা করে না ?

ভগবান এতেও সন্তুষ্ট হলেন না,—তাকে দিলেন মারাত্মক টাইফয়েড জ্বর । আমি দেশে ছিলুম না, ফিরে এসে দেখি জ্বর বাবার সময় শমীমের একটি চোখ নিয়ে গিয়েছে । আমি অনেক দুঃখকষ্ট অবিচার-অত্যাচার দেখেছি সহজে কাতর হই নে, কিন্তু শমীমের মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে আমি

যে আঘাত পেয়েছিলুম সে আঘাত যেন আমার চেয়ে দুর্বল লোককে ভগবান না দেন ।

শমীমের বাপ খুড়ো ঠাকুরা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির—শমীমও ছেলেবেলা থেকে শান্তস্বভাব ধরত, এখন সে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর হতে লাগল । পড়াশোনা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কখনো যে করতে পারবে সে ভরসা ক্রমেই ক্ষীণ হতে লাগল । হয়তো তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করত—আশ্চর্য কি, যে ছেলে অল্পবয়সে লেখাপড়ায় সকলের সেরা ছিল তার সব লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো মর্মশূদ্র ব্যাপার কি হতে পারে ?

বিশ্বাস করবেন না, ঐ গাম্ভীর্যের পিছনে কিন্তু তার ছিল প্রচুর রসবোধ । আমাকে খুঁশি করবার জন্য সে আমাদের বাড়ি—নং পাল' রোড সম্বন্ধে একটি রচনা লেখে । তাতে আমাদের সকলের রসময় (অনেকটা আইরিশ ধরনের হিউমার) বর্ণনার পর ছিল উপরের তলায় তার দাদামশায়ের বর্ণনার ফিনিশিং টাচ । দাদামশায় আসলে কুষ্টিয়ার লোক, 'এটা' 'সেটা' না বলে বলেন 'ইডা', 'সিডা', আর বড়োমানুষ বলে সমস্ত দিন বাড়ির ঘর ঘর করে বেড়ান । তার বর্ণনা শমীম দিল এক লাইনে—'আর দাদামশাই তো সমস্ত দিন "ইডা" "সিডা" নিয়ে আছেন ।

শমীমের বড় ভাই শহীদ তখন প্রেমে পড়েছে । মেয়েটির নাম হারিস । খানার টেবিলে একদিন জল্পনাকল্পনা হচ্ছে, একটা চড়ুই-ভাত করলে হয় না ? শহীদ গম্ভীর হয়ে বসে আছে—আমি শূধালুম, 'তুমি আসছো তো ?' শহীদ বলল, 'না ।'

শমীম বলল, 'ও আসবে কেন ? আমরা তো "হারিস" না ।'

অর্থাৎ তার ডার্লিং 'হারিস' তো আমাদের সঙ্গে চড়ুই-ভাতে আসবে না এবং আহা, শহীদ কতই-না jolly chap—আমরাই শূধু গম্ভীর ।

কিন্তু আমাকে সবচেয়ে মন্থ করত তার পরোপকার করার প্রচেষ্টা । ৪৭-এর দাঙ্গার সময় আমাদের বাড়িতে প্রায় সত্তর জন হিন্দু নরনারী আশ্রয় নেন—আমি তখন দক্ষিণে—ফিরে এসে শূনি গুডারা বাড়ি আক্রমণ করেছিল, শমীম নিভর্যে এদের সেবা করেছে ; আমি আশ্চর্য হই নি ।

তার পর ৫০ সনে হোলির কয়েকদিন আগে যখন সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে বিশ্বর মুসলমান নরনারী এসে আমাদের পাড়ায় আশ্রয় নিল তখন শমীম তার মা, বাবা, বোনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তাদের সেবা করল, তার বাবার ডিসপেনসারিতে বসে রুগীদের জন্য ঔষধ তৈরী করাত, ইনজেকশন-ভেকসিনেশন দেওয়াতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করলে । পৃথিবীর সবাই শমীমকে ভুলে যাবে কিন্তু দু-একটি আত্মা হয়তো এই স্মৃতি, স্মৃতি, প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে মনের কোণে একটুখানি ঠাই দেবে ।

সেই সময়ে দিল্লীর এক হিন্দু ভদ্রলোক আমাদের এবং পাড়ার মুসলমানদের অনেক সাহায্য করেন । আমরা স্থির করলুম, দিল্লীর লোক, একে নিমন্ত্রণ করে কোর্মা-পোলাও খাওয়াতে হবে । সব ঠিক, এমন সময় শমীম তার মাকে গিয়ে বললে, 'এই দুর্দিনে লোকে খেতে পাচ্ছে না, আর তোমরা দাওয়াত করে খাওয়াচ্ছ

কোর্মাপোলাও ! আমি তা হলে খাব না। যদি নিতান্তই খাওয়াতে হয়, তবে খাওয়াও আমরা যা রোজ খাই।’

আমরা মামুলী খানাই পরিবেশন করেছিলুম।

*

*

*

খবর পেলেম, শামীম টেনের সামনে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি কিছুই ভাবতে পারছি নে। এত সহদয়, পরোপকারী ছেলে বন্ধুতে পারল না যে তার মা, বাপ, খুড়ো, ভাই, বোন, আমাকে, তার বন্ধু শুকুরকে এতে কতখানি আঘাত দেবে ?

দিনেন্দ্রনাথ

‘দেশের’ ৪১শ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত স্বর্ণীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে দিনেন্দ্রভক্ত, দিনেন্দ্র-সখাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গুপ্ত মহাশয় দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী মাথেরই অবশ্য স্জাতব্য তত্ত্ব এবং তথ্য, দিনেন্দ্রনাথের মধুর, সহদয়, বন্ধুবৎসল হৃদয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমার মনে দিনেন্দ্রনাথের যে ছবি আছে সেটি হুবহু মিলে গেল। একাধিকবার ভেবেছি, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত অল্প লোকই লিখেছেন যে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার যেটুকু জানা আছে তাই লিখে ফেলি, কিন্তু প্রতিবারেই মনে হয়েছে, দিনেন্দ্র-জীবন আলোচনা করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই। গুপ্ত মহাশয় এখন আমার কর্তব্যটি সরল করে দিলেন। আমার বক্তব্যের কোনো কথা যদি গুপ্ত মহাশয়ের কাজে লেগে যায়, তবে আমি শ্রম-সামর্থ্যের আনন্দ পাব।

স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথ শান্তিকেতন-মন্দিরে যে বক্তৃতা দিতেন, তা অতুলনীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি, যেদিনকার উপাসনা দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত দিয়ে আরম্ভ হত, সেদিন সে সঙ্গীত যেন আমাদের মনকে রবীন্দ্রনাথের উপাসনার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত এবং উন্মুখ করে তুলত। দিনেন্দ্রনাথের বিশাল গম্ভীর কণ্ঠ আমাদের হৃদয়মন ভরে দিত, তার পর সমস্ত মন্দির ছাপিয়ে দিয়ে ভাঙা-খোয়াই পেরিয়ে যেন কোথা থেকে কোথা চলে যেত। তাই আমার সব সময় মনে হয়েছে দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠ একজনকে শোনার জন্য, এমন কি একটা সম্পূর্ণ আসরকেও শোনার জন্য নয়, তাঁর কণ্ঠ যেন ভগবান বিশেষ করে নির্মাণ করেছিলেন সমস্ত দেশের জনগণকে শোনার জন্য। তাই বোধ হয় তাঁর কণ্ঠে যে রকম ‘জনগনমন অধিনায়ক’ গান শুনছি আজ পর্যন্ত কারো কণ্ঠে সেরকম ধারা শুনলাম না।

এরকম গলা এ দেশে হয় না—এ গলার ভলুম পেলে ইতালির শ্রেষ্ঠতম অপেরা-গাইয়ে জীবন ধন্য মনে করেন।

হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, মন্দিরে দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত যেন অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠতর ধর্মব্যাখ্যানে অমুপ্রাণিত করেছে।

একথা সবাই জানেন, দিনেশ্বনাথ যে শূদ্ধ গায়কই ছিলেন তাই নয়, তিনি অতিশয় উচ্চদরের সঙ্গীতরসজ্ঞও ছিলেন। কি উত্তর কি দক্ষিণ, কি ইয়োরোপীয় সর্বসঙ্গীতে সর্ববাদ্যের খবর তিনি তো রাখতেনই—তার উপর তিনি জানতেন কি করে গায়ক এবং শ্রোতাকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য টেনে বের করে আনতে হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর হয়ে গিয়েছে, তাই আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় সে গুণীর নাম ছিল সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী, পিঠাপদ্রম্ মহারাজের বীণকার—তিনি এসেছেন রবীন্দ্রনাথকে বীণা শোনাতে। রবীন্দ্রনাথ আর দিনেশ্বনাথ উদ্গ্রীব হয়ে বসেছেন; তার পর আরম্ভ হল বীণাবাদন।

আমার সন্দেহ হয়েছিল দক্ষিণের গুণীর মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল, উত্তর ভারতের শাস্তিনিকেতন তাঁর সঙ্গীত সম্যক্ স্বয়ংস্ব করতে পারবে কি না। দশ মিনিট যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথ আর দিনেশ্বনাথ যেমন যেমন তাঁদের সুস্কন্ন রসানুভূতি ঘাড় নেড়ে, মৃদু হাস্য করে বা বাহবা বলে প্রকাশ করতে লাগলেন সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গমেশ্বর বদ্ব্যতে পারলেন তিনি যে সম্বাদার শ্রোতার সামনেই বাজাচ্ছেন তাই নয়, এ রকম শ্রোতা তিনি জীবনে পেয়েছেন কমই। সে রাতে কটা অবধি মজলিস্ চলেছিল আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে শাস্তিনিকেতনের ‘খাবার ঘণ্টা’র অনেক পর অবধি—বারটা হতে পারে, দুটোও হতে পারে।

সে যুগে ইয়োরোপ থেকেও বহু কলাবিৎ আসতেন রবীন্দ্রনাথকে গান কিংবা বাজনা শোনাতে। দৃজনকে স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু নাম ভুলে গেছি। এককন ডাচ মহিলা গাইয়ে (বিনায়ক রাও এঁর নাম স্মরণ করতে পারবেন) এবং অন্যজন বেলজিয়ান বেহালা-বাজিয়ে। ডাচ মহিলাটি খুব বেশি দিন আশ্রমে থাকেন নি, কিন্তু বেলজিয়ানটি দিনেশ্বনাথের সঙ্গে একদম জমে যান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বাজিয়ে যেতেন—ভদ্রলোক দিনে অন্তত বারো ঘণ্টা আপন মনে, একা একা, বেহালা বাজাতেন—আর দিনেশ্বনাথ তাঁর সুস্কৃত্তম কারুকার্যের সমগ্র মাথা নেড়ে নেড়ে রসবোধের পরিচয় দিয়ে তাঁর উৎসাহ বাড়াতেন।

বেলজিয়ানটি দিনেশ্বনাথের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখেছিলেন—তার অন্যতম, সিগার বর্জন করে গড়গড়া পান। আশ্রম ছাড়ার দিন ভদ্রলোক দুঃখ করে আমাকে বলেছিলেন, ‘দেশে যেতে মন চাইছে না, সেখানে তামাক পাব কোথায়?’ যদিচ্যাপে পেয়ে যান সেই আশায় ভদ্রলোক তাঁর আলবোলাটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দিনেশ্বনাথ সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ সম্বাদার ছিলেন। প্রাপ্তবয়সে তিনি ফরাসীও শিখেছিলেন এবং স্বচ্ছন্দে ফরাসী উপন্যাস পড়তে পারতেন। ওঁদিকে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রেম। তাই কি লেভি, কি উইনটারনিংস্ সকলের সঙ্গে ছিল তাঁর হৃদয়তা। বিদেশীকে কি করে খানা খাইয়ে, আড্ডা জমিয়ে, সঙ্গীতের চর্চা করে, সৌজন্য ভদ্রতা দেখিয়ে—আমি একমাত্র দিনেশ্বনাথকেই চিনি যিনি পৃথিবীর সকল জাতের লোকেরই ম্যানারস এটিকেট জানতেন—তার দেশের কথা ভুলিয়ে দেওয়া যায় এ কৌশল তাঁর বা রপ্ত ছিল এর

সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। তাই তাঁর বাড়ি ছিল বিদেশীদের কাশীবন্দাবন।

দিনেন্দ্রনাথ গাইতে পারতেন, বাজাতে পারতেন, অন্যের গানবাজনার রস চাখতে পারতেন এ-কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি ; তদুপরি তিনি ছিলেন সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ। এ বড় অশুভূত সম্ভব নয়। শাস্ত্রজ্ঞের রসবোধ কম, আবার রসিকজন শাস্ত্রের অবহেলা করে—দিনেন্দ্রনাথ এ নীতির ব্যত্যয়—শাস্ত্রের কচকচানি তিনি ভাল-বাসতেন না। কিন্তু সঙ্গীতের বিজ্ঞানসম্মত চর্চার জন্য যেখানেই শাস্ত্রের প্রয়োজন হত, তিনি সেখানেই সত্য শাস্ত্র আহরণ করে ছাত্রের সঙ্গীতচর্চা সহজ-সরল করে দিতে জানতেন।

আমাদের ঐতিহ্যগত রাগপ্রধান সঙ্গীতচর্চার জন্য প্রাচীন অর্বাচীন বহু শাস্ত্র আছে, রবীন্দ্রনাথ এ যুগে সঙ্গীতের যে নতুন ভুবন সৃষ্টি করে দিলেন, তার রহস্য ভেদ করার জন্য কোনো প্রামাণিক শাস্ত্র নেই। এ-শাস্ত্র নির্মাণ করার অধিকার একমাত্র দিনেন্দ্রনাথেরই ছিল। বহু অনুন্ময়-আবেদন করার পর তিনি সে শাস্ত্র রচনা করতে সম্মত হলেন।

কয়েকটি অধ্যায় তিনি লিখেছিলেন। সেগদূলি অপূর্ব। শুধু যে সেগদূলিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত 'দর্শন'ের সম্ভান মেলে তাই নয়, সেগদূলিতে ছিল ভাষার অতুলনীয় সৌন্দর্য অমিত ঝংকার—সে ভাষার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি একমাত্র 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র ভাষা।

এ শাস্ত্র তিনি কখনো সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন কিনা জানি নে। হয়তো আমার ভুল, কিন্তু প্রথম অধ্যায়গুলো শুনেই আমার মনে হয়েছিল এ ছন্দ শৈষরক্ষা করা সহজ কর্ম নয়। এর জন্য যতখানি পরিশ্রমের প্রয়োজন, দিনেন্দ্রনাথের হয়তো ততখানি নেই।

আমি দিনেন্দ্রনাথের নিষেধ করছি নে। কিন্তু আমি জানি তিনি গান গাইতে, বাজনা বাজাতে, গানবাজনা শুনতে, সাহিত্যরস উপভোগ করতে, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে, আড্ডা জমাতে, বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াতে, বিদেশীদের আদর-আপ্যায়ন করাতে এত আনন্দ পেতেন যে কোনো প্রকারের কীর্তি নির্মাণ করতে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ পরাভ্রম্য, নিরঙ্কুশ বীতরাগ।

নাই বা হল সে শাস্ত্র সে কীর্তি গড়া! আজ যদি দিনেন্দ্র-শিষ্যেরা আপন আপন নৈবেদ্য তুলে ধরেন, তবে তার থেকেই নতুন শাস্ত্র গড়া যাবে ॥

ভারতীয় নৃত্য

নৃত্য জীবনীশক্তির চরম বিকাশ। যে-সব কলা দ্বারা মানুষ তাহার সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশ করে, তাহাদের গভীরতম মূল নৃত্যরস হইতে প্রাণ-সঞ্চার করে। অন্যান্য কলা সৃষ্টি হইবার বহু পূর্বে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত, আড়ম্বরহীন নৃত্য দ্বারা তাহার অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছে - অপরের হৃদয়ে সেই রস সঞ্চারিত করিবার জন্য এই সরল কলাই তখন তাহার একমাত্র আশ্রয় ছিল। আদিম মানবের বাদ্যযন্ত্র ছিল না, ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে সে তখনও শিখে নাই, প্রতিমা নির্মাণের যন্ত্রপাতি

তাহার ছিল না, চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম তাহার কাছে তখনও অজানা। অনুভূতি প্রকাশ করিবার একমাত্র পন্থা ছিল তাহার নিজের দেহ; সেই দেহ সে সাবলীল ছন্দে তালে তালে আন্দোলিত করিয়া তাহার সুখ-দুঃখ, ভয়-শুশ্রূষা প্রকাশ করিত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনুভূতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল—নৃত্যও তাহার সঙ্গে যোগ রাখিয়া সুকুমার কলায় পরিণত হইল; মানুষ নৃত্য দ্বারা তাহার সূক্ষ্মতম ও গভীরতম অনুভূতিকে রূপ দিতে শিখিল।

সলীল ছন্দে, তালমানযোগে দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আন্দোলন দ্বারা মানুষ যখন তাহার জীবনীশক্তির চরম সত্তাকে প্রকাশ করিয়া তুলে তখনই তাহা নৃত্যের রূপ ধারণ করে। নৃত্য তখন মানুষের নব নব সৌন্দর্য্যানুভূতি, সত্যের সঙ্গে তাহার অন্তরতম পরিচয় নব নব রূপে উন্মোচন করিয়া প্রকাশ করে। তাই শূন্য, অকৃত্রিম নৃত্য সম্পূর্ণ বাধাবদ্ধহীন। দেশ ও কালের ক্ষুদ্র গাভীর ভিতরে তাহাকে রুদ্ধ করা, কুসংস্কার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করার অর্থ আর কিছুই নয়—তাহার অফুরন্ত জীবন-উৎসকে রুদ্ধ করা, তাহার স্বাধীনতাকে পঙ্গু করা। আমাদের দেশের হৃদয় একদিন স্বতঃস্ফূর্ত, বাধাবদ্ধহীন আনন্দের নৃত্যছন্দে আন্দোলিত হইয়াছিল, আজ সেই ধারা বন্ধ হইয়া ব্যবসায়ী নটনটীদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বকূপের সৃষ্টি করিয়াছে। রোগজীর্ণ, বিষাক্ত, বিলাসবাসনীদের উত্তেজনা দানেই আজ আহাির চরম আনন্দ, পরম লাভ। ক্ষুদ্র হৃদয়ের অবসর বিনোদন ও ক্ষণস্থায়ী চিত্তচাঞ্চল্যের প্রকাশ করাকেই এখন নৃত্যের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের সুস্ববুদ্ধি পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে; নৃত্যের বিকৃত বিকলাঙ্গ দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্জীবিত হইতেছে। ভারতীয় নৃত্যের নবজীবন সশিক্ষণের তাৎপর্য বদ্বিধিতে হইলে ভারতের উচ্চাঙ্গ ও জনপদ নৃত্যের বিভিন্ন ধারার সহিত পরিচিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অনুন্নত জাতির ভিতরে যে-সব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে রহিয়াছে ফসল কাটা, নবান্নের আনন্দ অথবা বৃষ্টিপাত, ঝঞ্ঝাবাত, ভূতপ্রেতের লীলাখেলা। বসুন্ধরার আদিম সন্তান নৃত্যযোগে প্রয়োজনমত কখনো প্রকৃতির রুদ্র মূর্তিকে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছে, কখনো তাহার দক্ষিণ মূখের কামনা করিয়াছে। ডমরু গেলের বৈচিত্র্যহীন তালের সঙ্গে সে তখন তাহার দেহের ছন্দ মিলাইয়া নাচিয়াছে। সে নৃত্য অমার্জিত, কিন্তু তবু কখনও কখনও তাহাতে হিল্লোলের স্থান পাওয়া যায়। অর্ধবৃত্তাকারে তাহারা নাচে, গান গায় ও মধ্যস্থলে দুইজন পুরুষ মাদল বাজাইয়া তীক্ষ্ণ চাঁৎকার ও উন্মত্ত নৃত্যে স্ত্রীলোকদিগকে দ্রুততর নৃত্যে উত্তেজিত করে। পুরুষেরাও কখনো মূল নর্তকরূপে অপ্রসন্ন দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য অথবা দর্শকের মনে বিচিত্র ভাব সঞ্চারের জন্য নৃত্য করিয়া থাকে। অসভ্য সমাজে ইহাদের প্রতিপত্তিও অসীম; সমাজ তাহাদিগকে ভক্তিভরে পূজা করে।

আমাদের দেশের জনপদনৃত্য বলিতে প্রধানত গুজরাতের গরবা, মালাবারের কৈকটকালি, উত্তর-ভারতের কাজরী ও মণিপূরের রাসলীলাই বৃহত্তম। ইহাদের মূলে খর্মের অনুপ্রেরণা, অঙ্গভাষিতে ইহার স্ফূর্তিত ও আঙ্গিকের দিক দিয়া যে ইহাদের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নৃত্যগুলি পুনরাবৃত্তিবহুল বলিয়া দর্শকের মন সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎসঙ্গেও ইহাদের মাধুর্য ও প্রাণশক্তি অস্বীকার করা যায় না। গুজরাতের গরবাতে যথেষ্ট লালিত্য ও প্রাণশক্তি আছে, কিন্তু পদভঙ্গির অভাব; মালাবারের কৈকটকালিতে সবল অঙ্গ সঞ্চালন ও বিচিত্র পদভঙ্গির প্রাচুর্য আছে, কিন্তু মাধুর্যের অভাব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, একমাত্র গুজরাতের জনপদ নৃত্যেই শ্রী-পুরুষেরা যেমন পৃথক পৃথক মণ্ডলীতে নৃত্য করিয়া থাকে, সেইরূপ উভয়ে সম্মিলিত হইয়াও নৃত্য করিবার রীতি প্রচলিত আছে। নর্তকীরা বহু ছিদ্রবিশিষ্ট মৃৎপাশ্রে জ্বলন্ত প্রদীপ রাখিয়া অথবা মস্তকে সুগঠিত পিঙ্গল কলসী ধারণ করিয়া মনোরম অঙ্গভাষিতে চক্ৰাকারে নৃত্য করে; সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও রাসগীতি গায়, করতাল দিয়া তাল লয় রক্ষা করে। কখনও কখনও দুইটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নাচিবার সময় তাল বজায়; অজ্ঞতা ও অন্যান্য প্রাচীন চিত্রে ঐ কাষ্ঠখণ্ডের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সঙ্গীত সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; তখন কেবলমাত্র মাদলের তালে শূন্য স্বাধীন নৃত্য আরম্ভ হয়; অঙ্গভাষি তখন সবল হইয়া ওঠে ও পদসঞ্চালন দ্রুততর গতিতে হইতে থাকে।

জনপদনৃত্যের মধ্যে মণিপূরী রাসলীলাতেই সর্বাধিক সাধনা ও শিক্ষার প্রয়োজন হয়; আঙ্গিকের দিক দিয়াও উন্নত বলিয়া রাসলীলাকে উচ্চাঙ্গ নৃত্যরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। মণিপূরের রাসলীলা ভক্তিরসে পরিপূর্ণ—গোপ ও গোপীগণের আবেষ্টনীতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী বর্ণনা করাই এই নৃত্যের উদ্দেশ্য। রাজবাড়িতে রাসলীলার নাচ শিখানো হয়, ও দেশের জনসাধারণ রসের দিক দিয়া ইহার বিচার করিয়া ইহার প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। রাসলীলায় তরুণীরা ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীতে গোপীরূপে নৃত্য করে ও রাখার ভূমিকায় বালককে নামানো হয়। তরুণীদের নৃত্য অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সরল; তরুণ ও বয়স্কদের নৃত্য সবল ও ছন্দ-বৈচিত্র্য-বহুল। নাচের তাল রক্ষা হয় মৃদঙ্গের জ্ঞাতি, খোল সংযোগে।

উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে প্রধান—উত্তর-ভারতে, কথক, দাক্ষিণ-ভারতের ভরত নাট্যম্ ও মালাবারের কথাকালি ও মোহিনী আটম্। পরিতাপের বিষয় এই সব কয়টি নৃত্যই ব্যবসাদার নটনটীর কবলগ্রস্ত হইয়া উচ্ছৃংখল বিনোদীদের ঘৃণ্য লালসার উদ্দেশ্য ও চরিতার্থ করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। যে দৃষ্ট পরিবেষ্টনীর মধ্যে এইসব নৃত্যের চর্চা আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে এই মহৎ কলার প্রাণবন্ত সৌন্দর্য ও পূর্ণাবয়ব আঙ্গিকের সম্মান পাওয়া অসম্ভব। মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে উত্তর-ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্য কঠিন ও জটিল তাল-লয়ের সৃষ্টি করে, সে-তাল প্রকাশ করিলে তবলার

বোল পদধ্বনিত শোনা যায়। শব্দ তাই নয়, হাবভাব, নীতি ও কটিকটাল, কটাকটাল, ক্ষমাশোভন, এক কথায় সর্ব অঙ্গের চালনা ও ভাবপ্রকাশ শব্দমাত্র দর্শকের হৃদয়ে পাশবিক আনন্দদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এইসব নৃত্যে বিকাশপ্রাপ্ত আঙ্গিকের সম্মান মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু বেশির ভাগই হীন ও অশলীল।

দক্ষিণে প্রচলিত ভারত নাট্য শব্দ হিন্দুকলা। ভারত নাট্যে যে-সব 'মুদ্রা' দ্বারা দেবদেবী, পশুপক্ষী ও বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ করা হয় সেইগুলি এই নৃত্যের মুখ্য বস্তু। অতীত করা হয় না। উত্তরের কথক নৃত্যের তুলনায় ভারত নৃত্যে পদসম্মাননের কার্যকর্য্য নাই এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গসম্মাননও অপেক্ষাকৃত ক্রটি ও সংযত। মালাবারের মোহিনী আটম্ অনেকটা ভারত নাট্যের ন্যায়, কিন্তু দৃষ্টির বিষয় এই নৃত্য মরণোন্মুখ—সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণের সব কয়টি উচ্চাঙ্গ নৃত্যই কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরাই নাচিয়া থাকে—অতি অল্প বয়সেই বালিকারা পুরুষ পেশাদারের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করে ও বহুবৎসরব্যাপী কঠিন নিয়ম রীতিমত পালন করিয়া নৃত্যকলায় পারদর্শিনী হয়। কিন্তু দৃষ্টির বিষয় এই সব নৃত্যে আজকাল কেবলমাত্র শব্দক আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়, শব্দ কলার চিত্রমাত্র নাই। যে-নৃত্য সৃষ্টি করে না, কেবলমাত্র পূর্বা-নুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, তাহার যে এই গতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি !

আজকাল কথাকলি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও এ-সম্বন্ধে প্রচুর বাক্যবিন্যাস করা হইয়াছে বলিয়া এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন। এদেশের সর্বত্রই নর্তক-নর্তকী, গায়ক-গায়িকা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান অভিনয় করিয়া থাকে ; বিভিন্ন প্রদেশে ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। মালাবারে ইহারা কথাকলি নামে পরিচিত—‘কথা’ অর্থ ‘গল্প’ ও ‘কলি’ অর্থ ‘নাট্য’। কথাকলির অভিনেতারা অন্যান্য প্রদেশের নট-নটীর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করে না ; তাহারা মূক অভিনয় করে, তবলা ও মাদ্রিরা সহযোগে নাচে ও তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুইজন গায়ক গল্পগুণি গান গাহিয়া শুনায়। মূক আকাশের নীচে অভিনয় হয় ও সূর্যোদয় পর্যন্ত আনন্দোৎসব চলে। অভিনেতারা বৃহৎ চুনটদার জামাকাপড় পরে ও বিচিত্র প্রসাধনের দ্বারা একপ্রকার অভিনব মুখোশ নির্মাণ করে। কথাকলি নৃত্যের কটাক, মুখের মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণ, নানাপ্রকার ‘মুদ্রা’র ব্যবহার ও বিশেষত পদসম্মানের সম্প্র-সারণ দ্বারা নৃত্যকে প্রাণদান প্রভৃতি আঙ্গিক অত্যন্ত দুরূহ ও বহুবৎসরব্যাপী কঠিন সাধনা ব্যতীত এই কলায় দক্ষতা লাভ অসম্ভব। নয় দশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই বালিকাকে নৃত্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হয় ও পূর্ণ যৌবন লাভ না করা পর্যন্ত নর্তকীকে কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া জীবনযাপন করিতে হয়।

কথাকলি ঠিক নৃত্য নয়, নৃত্যানাট্যও নয়। বরঞ্চ মুখোশপরা তামাসা-নাচের সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য অধিক ; নৃত্যকলা ইহাতে স্ফূর্ত হয় না। নৃত্যের প্রারম্ভেই যবনিকান্তরালে দুই-একটি আবাহন নৃত্য করা হয় ও তারপর প্রত্যেক শ্লেক বা গান গাওয়া শেষ হইতেই অভিনেতার চক্ৰাকারে ‘কলসম’ নৃত্য করে। তারপর স্ত্রী চরিত্রের ‘সরি’ নৃত্য ও রাজহংস বা ময়ূরের পক্ষীনৃত্য করা হয়।

কথাকলি নৃত্য শক্তি ও তেজঃপ্রধান, কিন্তু অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যোপদসম্পালনের যে কারুকার্য ও গতিছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় ইহাতে তাহার অত্যন্ত অভাব। অভিনেত্রীদেরকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও যে কেন তাহাদের নৃত্য এত রুঢ় ও অপকরূপে প্রকাশ পায়, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা যায় না। কথাকলি গণ্ডিবন্ধ বলিয়া পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট ও মাঝে মাঝে তাহার বস্তুতান্ত্রিকতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। শূদ্ধ আঙ্গিকের দিক দিয়াই আজ কথাকলি আমাদের কৌতূহল ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সুকুমার কলা হিসাবে এই নৃত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ন্যায় আজ মৃত।

মাত্র কুড়ি বাইশ বৎসর হইল এদেশে নৃত্যকে বিস্ময় পরিবেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনে স্থান দিবার চেষ্টা করা হইতেছে ও সংগীত চিত্রাঙ্কনের ন্যায় নৃত্যও সুকুমার কলা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। তাই আজকাল সংগীতের মজলিসে, স্কুল-কলেজের আমোদ-অনুষ্ঠানে, পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব-আনন্দে নৃত্যচর্চা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দৃষ্টির বিষয় যে, কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে মিলাইয়া কেবলমাত্র তালসংযুক্ত পদসম্পালন থাকিলেই তাহা পূর্বের ন্যায় এখনও নৃত্য নামে নন্দিত হয়। সেই নৃত্যকলা এখন 'ফ্যাশান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কোনো রকম শিক্ষা-দীক্ষা না লইয়াই চ্যারিটি-রিলিফ ফাণ্ডের অঙ্গুহাতে যত্নতর নৃত্য করা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখনও কি এই সরল তথ্যটি বুঝিবার সময় হয় নাই যে নৃত্য অর্থহীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্ষেপের মূল্যহীন সমষ্টিমাত্র নহে? এখনও কি দেশবাসী বুঝিবে না যে, নৃত্য অন্যান্য সুকুমার কলার ন্যায় একনিষ্ঠ ও আজীবন সাধনাসাপেক্ষ কলা বিশেষ? অতি অল্পসংখ্যক নর্তকনর্তকীই এযাবৎ অর্থহীন অঙ্গসম্পালন ত্যাগ করিয়া প্রকৃত নৃত্যরসে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। এবং ইহাদের ভিতরেই বা কয়জন সত্যাসত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে নৃত্যের ন্যায় উচ্চাঙ্গের সুকুমার কলায় পারদর্শী হইতে হইলে তাহার প্রতি কী অবিচল নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়? বেশীর ভাগই তো দেখতে পাই দুই-একদিনের ছয়ছাড়া শিক্ষায় দুই একটি নৃত্যেই সন্তুষ্ট। তাহাতে তো শূদ্ধ লোক ভুলানো চলে—সে তো কলা নহে। তাই সামান্য যে কয়জন প্রকৃত নৃত্যকলা হিসাবে গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতেছেন তাহারা সতাই প্রশংসনীয়। সমাজের বাধাবন্ধ উপেক্ষা করিয়া তাহারা সাহসের ভরে লোকচক্ষুর সম্মুখে নৃত্যকলা দেখাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহারাও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যগত নৃত্য দেখাইয়াই সন্তুষ্ট। তাহাদের নৃত্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নাই। পেশাদার নর্তকেরা যে দৈন্য বহু সাধনালব্ধ আঙ্গিকের দ্বারা লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তাহাদের নৃত্যে তাহা বার বার ধরা পড়ে। ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা যে কাহারও নাই এমন নহে, কিন্তু আছে অতি অল্পসংখ্যক গুণীর ভিতরে। তাহারা যে শূদ্ধ গভীর সাধনার দ্বারা নৃত্য আয়ত্ত করিয়াছেন এমন নহে, তাহারা যে শূদ্ধ প্রাচীন ঐতিহ্যগত

নৃত্য সর্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও নহে, তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, বর্তমান যুগের রুচি অনুযায়ী তাহারা নৃত্যের প্রাচীন বিষয়বস্তুকে নতুন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত গুণীর চরম লক্ষ্য তো ইহাও হইতে পারে না; তিনি সৃষ্টিকর্তা, তাহাকে নব নব বিষয়ের কল্পনা করিতে হইবে, নব নব রূপে সেগুলিকে প্রকাশ করিতে হইবে—জরাজীর্ণ বস্ত্রধাকে নবীনবেশে সজ্জিত করিয়া তিনি কেন বিভ্রমিত হইবেন? জীবনীশক্তির যে দ্রুত, অবিশ্রান্ত স্পন্দন আমরা আমাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রতি মৃদুহৃতে অনুভব করি। অতি সনাতন ভাবনা-কামনা একদিন যে রূপ, যে বর্ণ নিয়া প্রকাশিত হইত তাহার সঙ্গে আমাদের অদ্যকার সূক্ষ-দৃষ্টি, জীবন-মরণ সংগ্রাম, আশা-নিরাশার স্বেদের কোথায় যোগসূত্র? সুকুমার কলা কি কখনো মৃতদণ্ড চিত্তা অনুভূতির অশ্বকূপে প্রাণধারণ করিতে পারে? নৃত্য তো শূন্য তাললয়যোগে অঙ্গসঞ্চালন নয়, নৃত্য তো সূচার পদক্ষেপের নামান্তর নয়; আঙ্গিকের উৎকর্ষ নৃত্য, অঙ্গবিন্যাস দ্বারা সুদর্শন আলিঙ্গন সৃষ্টি করাও নৃত্য নয়। প্রকৃত নৃত্যের চরম আদর্শ আমাদের জীবনের স্বন্দানুভূতি প্রকাশ করা, সত্য ও সুন্দরকে উন্মোচন করিয়া আমাদের চক্ষুর গোচর করা। জিজ্ঞাসা করি, রাধা-কৃষ্ণ, শিব-পার্বতী নৃত্য কি যথেষ্ট নাচা হয় নাই, প্রচুর দেখা হয় নাই? এখনও কি ধর্মের আচ্ছদনে আবৃত কুসংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করিবার সময় হয় নাই? এ যুগের মানুষের কি নিজস্ব কোনোও অনুভূতি, কোনো স্বন্দ, কোনো আশা, কোনো আদর্শ নাই? তাহাদের কি কিছুই বক্তব্য নাই—মানবসংসারের চিরন্তন দীপাশ্রিতা প্রজ্জ্বলিত করিবার কোন প্রদীপ নাই? বাহির হইয়া আসুক এ দেশের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, মোহমুগ্ধ হইয়া প্রকাশ করুক তাহাদের আশা-অনুভূতি আপন সবল কণ্ঠে, শূন্য কর্মে নয়,—সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সংগীতে ও নৃত্যে ॥— (শ্রীমতী ঠাকুরের গুজরাতি লিখন হইতে অনূদিত) ।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্বাসিতের আত্মকথা

কোনো কোনো বই পড়ে লেখকেরা আপন আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় নিরাশ হন। যাদের সত্যকার শক্তি আছে, তাদের কথা হচ্ছে না, আমি ভাবছি আমার আর আমার মত আর পাঁচজন কমজোর লেখকের কথা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর পুনরায় ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’ পুস্তিকাখানি আদ্যন্ত পড়লুম। পাঠকমাত্রই জানেন, ছেলেবেলার পড়া বই পরিণত বয়সে পড়ে মানুষ সাধারণত হতাশ হয়। ‘নির্বাসিতের’ বেলা আমার হল বিপরীত অনুভূতি, বরষতে পারলুম, কত সুস্ক্রিয় অনুভূতি, কত মধুর বাক্যভঙ্গি, কত উজ্জ্বল রসবাক্য, কত করুণ ঘটনার ব্যঞ্জনা তখন চোখে পড়ে। সাধুভাষার মাধ্যমে যে এত স্বকৃষ্ণকে বর্ণনা করা যায়, সে ভাষাকে যে এতখানি চটুল গতি দিতে পারা যায়, ‘নির্বাসিত’ দ্বারা পড়েন নি, তাঁরা কল্পনামাত্র করতে পারবেন না।

কিন্তু প্রশ্ন, এই বই পড়ে আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হলুম কেন?

হায়, এ রকম একখানা মণির খনির মত বইয়ের চারিটি সংস্করণ হল ত্রিশ বৎসরে ! তাহলে আর আমাদের ভরসা রইল কোথায় ?

*

*

*

১৯২১ (দু-চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে) ইংরেজিতে একদিন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে দেখি একগাদা বই গুরুদেবের কাছ থেকে লাইব্রেরিতে ভর্তি হতে এসেছে। গুরুদেব প্রতি মেলে বহু ভাষায় বিস্তর পুস্তক পেতেন। তাঁর পড়া হয়ে গেলে তার অধিকাংশ বিশ্বভারতীয় পুস্তকাগারে স্থান পেত। সেই গাদার ভিতর দেখি, ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’।

বয়স অল্প ছিল, তাই উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জানা ছিল না। বইখানা ঘরে নিয়ে এসে এক নিঃশ্বাসে শেষ করলুম। কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছি নে, এ বই সত্যসত্যি আহার-নিদ্রা ভোলাতে পারে। ‘পৃথিবীর সব ভাষাতেই এরকম বই বিরল ; বাঙলাতে তো বটেই।’

পরদিন সকালবেলা গুরুদেবের ক্লাসে গিয়েছি। বই খোলার পূর্বে তিনি শুধালেন ‘উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নির্বাসিতের আত্মকথা” কেউ পড়েছে?’ বইখানা প্রকাশিত হওয়ামাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে ; তিনি সেখানে পড়ে লাইব্রেরিতে পাঠান, সেখান থেকে আমি সেটাকে কস্জা করে এনেছি, অন্যেরা পড়বার সুযোগ পাবেন কি করে ? বয়স তখন অল্প, ভারি গর্ব অনুভব করলুম।

বললুম, ‘পড়েছি।’

শুধালেন, ‘কি রকম লাগল?’

আমি বললুম, ‘খুব ভালো বই।’

রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘আশ্চর্য বই হয়েছে ! এ রকম বই বাঙলাতে কম পড়েছি।’

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে বলে আজ আর হুবহু মনে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি প্রকারে তাঁর প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার খাতাতে টোকা ছিল এবং সে খাতা কাবুল-বিদ্রোহের সময় লোপ পায়। তবে একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে, যে, রবীন্দ্রনাথ বইখানার অতি উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছিলেন।

বিখ্যাত লেখককে দেখার সাধ সকলেরই হয়। আমি যে সে কারণে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম তা নয়। আমার ইচ্ছা ছিল দেখবার যে বারো বৎসর নরক-যন্ত্রণার পর তিনি যে তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করলেন তার কতখানি সত্যি তাঁর চরিত্র-বলের দরুন এই বিশেষ রূপ নিল আর কতখানি নিছক সাহিত্যশৈলী মাত্র। অর্থাৎ তিনি কি সত্যি এখনো সূর্যাসিক ব্যক্তি, না অদৃষ্টের নিপীড়নে তিক্ত-স্বভাব হয়ে গিয়েছেন।

গিয়ে দেখি পিতা-পুত্র বসে আছেন।

বেশ নাদুস-নদুস চেহারা (পরবর্তী যুগে তিনি রোগা হয়ে গিয়েছিলেন), হাসিভরা মুখ আর আমার মত একটা আড়াই ফোটা ছোকরাকে যে আদর করে কাছে বসালেন, তার থেকে তৎক্ষণাৎ বদখে গেলুম যে, তাঁর

ভিতর মানুষকে কাছে টেনে অনেবার কোন আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল, যার জন্যে বাঙলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় তাঁর চতুর্দিকে জড় হয়েছিল।

ছেলোটিকেও বড় ভালো লাগলো। বড় লাজুক আর যে সামান্য দৃষ্ট একটি কথা বলল, তার থেকে বুদ্ধিমত্তা, বাপকে সে শ্রদ্ধা যে ভক্তি-প্রমুখাই করে তা নয়, গভীরভাবে ভালোও বাসে।

অটোগ্রাফ-শিকারের ব্যসন তখন বাঙলা দেশে চালু হয় নি। তবে সামান্য যে দৃষ্ট একজন তখনকার দিনে এ ব্যসনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা শ্রদ্ধা স্বাক্ষরেই সন্তুষ্ট হতেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কুটেশন বা আপন বক্তব্য লিখিয়ে নিতেন। আমার অটোগ্রাফ শ্বজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল রায়, লোভি, অ্যাংলোজ ইত্যাদির লেখা তো ছিলই, তার উপর গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, কারপেলজের ছবিও ছিল।

উপেনবাবুকে বইখানা এগিয়ে দিলুম।

এর পিছনে আবার একটুখানি ইতিহাস আছে।

বাজে-শিবপুত্রে শরৎচন্দ্রকে যখন তাঁর স্বাক্ষর এবং কিছু একটা লেখার জন্যে চেপে ধরেছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বিশেষ করে তাঁর কাছেই এলুম কেন? আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, ‘আপনার লেখা পড়ে আপনার কাছে না আসাটাই তো আশ্চর্য!’

শরৎবাবু একটুখানি ভেবে লিখে দিলেন, ‘দেশের কাজই যেন আমার সকল কাজের বড় হয়।’

আমি জানি শরৎচন্দ্র কেন ঐ কথাটি লিখেছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেস নিয়ে মেতেছিলেন।

তারপর সেই বই যখন রবীন্দ্রনাথকে দিলুম, তখন তিনি শরৎচন্দ্রের বচন পড়ে লিখে দিলেন,—

‘আমার দেশ যেন উপলব্ধি করে যে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ বারাই তার সার্থকতা।’

এর ইতিহাস বাঙালীকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমৈত্রী নিয়ে তখন রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের তর্ক আলোচনা হচ্ছিল।

উপেনবাবুকে অটোগ্রাফ দিতে তিনি দুটি লেখা পড়ে লিখে দিলেন,—

‘সবার উপরে মানুষ সত্য

তাহার উপরে নাই।’

*

*

*

ছেলেবেলায় বইখানা পড়েছিলেন এক নিশ্বাসে কিন্তু আবার যখন সেদিন বইখানা কিনে এনে পড়তে গেলুম তখন বহুবার বইখানা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতে হল। বয়স হয়েছে, এখন অল্পভেই চোখে জল আসে আর এ বইয়েতে বেদনার কাহিনী ‘অপেক্ষা’র উপর দিয়ে শেষ হয় নি। সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব বোধ হয় বইখানির সেখানেই। উপেন্দ্রনাথ যদি দম্ভয়েফ্‌স্কির মতো পুণ্ড্রনাথপুণ্ড্র করে তাঁর কাব্যবাস আর আত্মমান-জীবন (জীবন না বলে ‘মৃত্যু’ বলাই ঠিক)

বর্ণনা করতেন তবে আমাদের মনে কোন জাতীয় অনুভূতির সৃষ্টি হত বলা সুকঠিন কিন্তু এই যে তিনি নির্বাসিতদের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দৈবের বহুভর কাহিনী প্রতিবারেই সংক্ষিপ্ততম বর্ণনায় শেষ করে দিয়েছেন এতে করেই আমাদের কল্পনা তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেলে কত হৃদয়বিদারক ছবি একে আমাদের হৃদয়কে মথিত করেছে কত বেশি। সেটা হল প্রকৃত শক্তিশালী লেখকের লক্ষণ। যেটুকু ব্যক্তির পাখা প্রয়োজন উপেন্দ্রনাথ সেইটুকু মাত্র দিয়েই আমাদের উড়িয়ে দিলেন। উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং যে উদ্ভৃতি আপন পৃষ্ঠকে ব্যবহার করেছেন আমি সেইটে দিয়ে তাঁর এ অলৌকিক ক্ষমতার প্রশংসা গাই ;

“ধন্য ধন্য পিতা দশমেশ গুরু

যিনি চিড়িয়াসে বাজ তোড়ায়ে”

“ধন্য ধন্য পিতা, হে দশম গুরু ! চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলে ;
তুমি ধন্য !”^১

উপেন্দ্রনাথ দস্তয়েফ্‌স্কির মতো শক্তিশালী লেখক নন ; দস্তয়েফ্‌স্কির মতো বহুদুখী প্রতিভা তাঁর ছিল না কিন্তু একথা বার বার বলব দস্তয়েফ্‌স্কির সাইবেরিয়া কারাবাস উপেন্দ্রনাথের আত্মকথার কাছে অতি নিশ্চয় হার মানে।

সবচেয়ে মামুলী জিনিস নিয়েই উপেন্দ্রনাথের শক্তির পরিচয় দিই। ভাষার দখল অনেক লোকেরই আছে কিন্তু একই ভাষার ভিতর এত রকমের ভাষা লিখতে পারে কজন ? এক শ সত্তর পাতার বইয়ে ফলাও করে বর্ণনা দেবার স্থান নেই অথচ তার মাঝখানেই দেখুন, সামান্য কয়টি ছন্দে কী অপরূপ গুরুগম্ভীর বর্ণনা ;—

“গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে, হিমাচলবাসী ভাবোন্মত্ত জনসংঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে ; মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উন্মত্ত তরঙ্গ ছুটিয়াছে ; দুর্লোক ভুলোক সমস্তই উন্মত্ত রণবাদ্যে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ববন্ধনমুক্ত—দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না।”^২

পড়ে মনে হয় যেন বিবেকানন্দের কালীরূপ বর্ণনা শুনছি ;—

“নিঃশেষে নিবেছে তারাদল

মেঘ আসি আবিরিছে মেঘ

স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার

গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবৈগ

লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত পরান

বহির্গত বন্দীশালা হতে

মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি

ফুৎকারে উড়ায় চলে পথে”^৩

উপরের গম্ভীর গদ্য পড়ার পর যখন দেখি অত্যন্ত দিশী ভাষায়ও তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন ঠিক তেমনি জোর দিয়ে তখন আর বিস্ময়ের

১ নির্বাসিতের আত্মকথা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৬০

২ আত্মকথা, পৃঃ ৬৬।

৩ সন্তোম দস্তের অনুবাদ।

অন্ত থাকে না। শূদ্ধ যে সংস্কৃত শব্দের ওজস্ব এবং প্রসার সম্বন্ধে তিনি সচেতন তাই নয়, কলকাতা অঞ্চলের পুরো-পাক্ষাতে তো-কড়া ভাষাতেও তাঁর তেমনি কার্যেমি দখল।

‘বারীন বলিল—“এতদিন স্যান্সাতেরা পটি মেরে আসছিলেন যে তাঁরা সবাই প্রস্তুত ; শূদ্ধ বাঙলাদেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না, সব টুটু। কোথাও কিছুর নেই ; শূদ্ধ কতারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। খুব কষে ব্যাটারদের শূদ্ধিয়ে দিয়ে এসেছি”।^৪

এ-ভাষা হুতোমের ভাষা ; এর ব্যবহার অতি অল্প লেখকেই করেছেন।

এককালে পশ্চিম-বাঙলার লোকও আরবী-ফারসী শব্দে প্রসাদগুণ জানতেন ও কায়দামাফিক সেগুনলো ব্যবহার করে ভাষার জৌলুস বাড়াতে কসুর করতেন না। ক্রমে ক্রমে এ ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গে লোপ পায় অথচ পূর্ব-বাঙলার লেখকদের মেকদারবোধ কম ছিল বলে তাঁরা এ ব্যবদে অনেক জায়গায় লাভের বদলে লোকসানই করেছেন বেশি। উপেন্দ্রনাথ তাগমাফিক আরবী-ফারসীও ‘এক্সেমাল’ করতে জানতেন।

“কোনরূপে হিন্দুকে মুসলমান ভাণ্ডারীর খানা খাওয়াইয়া তাহার গোফ ছাটিয়া দিয়া একবার কলমা পড়াইয়া লইতে পারিলে বেহস্তে যে খোদা-তাল্লা তাহাদের জন্য বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিবেন, এ বিশ্বাস প্রায় সকল মোল্লারই আছে।^৫

কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ছিলেন একদম ন-মিকে বাঙালী। তাই,

“আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলকার হাত হইতে নির্বাচরে রুটি খাই দেখিয়া মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদগতির আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল ; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে, আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই—আমরা বাঙালী।”^৬

বাঙালীরা এরকম নৈতিবাচক রমণীয় সংজ্ঞা আমি আর কোথাও শূদ্ধি নি।

কিন্তু এসব তাবৎ বস্তু বাহ্য।

না সংস্কৃত, না আরবী-ফারসী, না কলকাতাই সব কিছুর ছাড়িয়ে তিনি যে খাঁটি মেটে বাঙলা লিখতে পারতেন তার কাছে দাঁড়াতে পারেন আজকের দিনের ক’জন লেখক ?

“শচীন পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কীরকম খাদ্য খাইতে হয় জিজ্ঞেসা করায় শচীন লপসীর নাম করিল। পাছে লপসীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া পিতার মনে কষ্ট হয় সেই ভয়ে শচীন লপসীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে করিতে বলিল, ‘লপসী খুব পুষ্টিকর জিনিস।’ পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—‘বাড়িতে ছেলে আমার পেলোওএর বাটি টান মেয়ে ফেলে দিত ; আর আজ লপসী তার কাছে পুষ্টিকর জিনিস।’ ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কি হয় তাহা কখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই,

তবে তাহার ক্ষীণ আভাস যে একেবারে পাই নাই তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মবিশ্বজনেরা আমার ছেলেকে আমার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র; কথা কহিতে পারে না। হয়তো এ জন্মে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলা আমার সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মর্দতি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল।^১

*

*

*

স্থাপত্যের বেলা ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায়, কিন্তু সাহিত্যে অতটা সোজা নয়। তাজমহলকে পাঁচগুণ বড় করে দিলে তার লালিত্য সম্পূর্ণ লোপ পেল, যদিও ঐ বিরাট বস্তু তখন আমাদের মনকে বিস্ময়বিমূঢ় করে দিত, আর আমরা স্তম্ভিত হয়ে বলতুম, ‘এ কী এলাহী ব্যাপার!’ ফলে শাহজাহান যে প্রিয়র বিরহে কাতর হয়ে ইমারতখানা তৈরী করেছিলেন, সেকথা বেবাক ভুলে যেতুম।

আর তাজমহলকে ছোট করে দিলে কি হয়, তা তো নিত্য নিত্য স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শ্বেতপাথরের ক্ষুদ্রে তাজমহল মেলা লোক ড্রইং-রুমে সাজিয়ে রাখেন। পাঁচজন তার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করেন তিনি আগ্রায় গিয়েছিলেন কবে? ভুল্লোকের আগ্রা গমন সফল হল—ক্ষুদ্রে তাজ যে কোণে সেই কোণেই পড়ে রইল।

সাহিত্যের বেলাও অনেক সময় প্রশ্ন জাগে, ‘এ উপন্যাসখানা যেন বড় ফেনিয়ে লেখা হয়েছে কিংবা অন্য আরেকখানা এতটা উদ্ভব্বাসে না লিখে আরো ধীরে-মস্থরে লিখলে ঠিক আয়তনে গিয়ে দাঁড়াত।’ যোগাযোগ’ পড়ে মনে হয় না, এই বইখানাকে বড় কিংবা ছোট করা যেত না, ‘গোরা’র বেলা মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, হয়তো এ অনবদ্য পুস্তকখানা আরো ছোট করলে তার মূল্য বাড়ত।

আমার মনে হয় ‘আত্মকথা’ সংক্ষেপে লেখা বলে সেটি আমাদের মনে যে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে, দীর্ঘতর হলে হয়তো সেরকম অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারত না! আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বইখানা লিরিক না করে এপিক করলেই ভালো হত। এ বই যদি ‘ওয়ার আন্ড পীসের’ মত বিরাট ক্যানভাস নিয়ে চিত্রিত করা হত তবে বন্ধু তার উপযোগী মূল্য দেওয়া হত। কিন্তু এ বিষয়ে কারো মনে শ্বিধা উপস্থিত হবে না যে, লিরিক হিসাবে এ বই এর চেয়ে কি বড়, কি ছোট কিছুই করা যেত না।

বই আরম্ভ করতেই চোখে পড়ে প্রথম বিপ্লবী যুগের এই তরুণদের হৃদয় কি অশ্রুত সাহস আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী অবিশ্বাস্য তাক্ষিল্যে ভরা ছিল। পরবর্তী যুগে ইংরেজের জেলখানার স্বরূপ আমরা চিনেছিলুম এবং শেষের দিকে জেল-ভীতি সাধারণের মন থেকে তো এক রকম প্রায় উঠেই গিয়েছিল,

কিন্তু যে যুগে এঁরা হাসিমুখে কারাবরণ করেছিলেন, সে যুগের যুবকদের মেরদুন্দ কতখানি দৃঢ় ছিল, আজ তো আমরা তার কল্পনাই করতে পারি নে। উল্লাস, কানাই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে হেসেছিল—যেন কাঁধ থেকে বেঁচে থাকার একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল। আজ যখন বাঙলাদেশের দিকে তাকাই, তখন বারংবার শিরে করাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করে, ‘হে ভগবান, সে যুগে তুমি অকৃপণ হস্তে বাঙলা দেশকে এত দিয়েছিলে বলেই কি আজ তোমার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছে?’

অথচ রুদ্র মহাকাল এই তরুণদের হৃদয়ে এবং জীবনে যে তাণ্ডব নৃত্য করে গেলেন, যার প্রতি পদক্ষেপে বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ কুটির আন্দোলিত হল, বাঙালী হিন্দুর ইষ্টদেবী কালী করালী যখন বারংবার হুংকার দিয়ে বললেন, ‘মৈ ভূখা-হুং’ তখন যে এই বঙ্গসন্তানগণ প্রতিবারে গম্ভীরতর হুংকার দিয়ে বলল,—

“কালী তুই করালরূপিনী / আয় মাগো আয় মোর কাছে,”

যুগকণ্ঠে শ্বেচ্ছায় স্কন্ধ দিয়ে বলল, ‘হানো, তোমার খঞ্জ হানো,’ তখনকার সেই বিচিত্র ছবি উপেন্দ্রনাথ কী দম্ভহীন অনাড়ম্বর অনাসক্তিতে চিত্রিত করে গেলেন।

দক্ষিণ ভারতের মথুরা, মাদুরায় এক তামিল রাষ্ট্রগের বাড়িতে কয়েক মাস বাস করার সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল। গৃহকর্তী প্রতি প্রত্যুষে প্রহরাধিককাল পূর্বমুখী হয়ে রুদ্র-বীণা বাজাতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, ‘আজ আপনি কি বাজালেন বলুন তো। আমার মনের সব দৃষ্টিচ্যুত যেন লোপ পেল।’ বললেন, ‘এর নাম “শঙ্করবরণম্”—সম্মাসী রাগও একে বলা হয় কারণ এ রাগে আদি, বীর, করুণ কোনো প্রকারের রস নেই বলে একে শান্তরসও বলা হয়। কিন্তু শান্ত অবস্থাকে তো রসাবস্থা বলা চলে না, তাই এর নাম সম্মাস রাগ।’

উপেন্দ্রনাথের মূল রাগ সম্মাস রাগ।

অথচ এই পদ্যস্তিকা হাস্যরসে সমৃদ্ধজল।

তাহলে তো পরস্পরবিরোধী কথা বলা হল। কিন্তু তা নয়। উপেন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের জীবন তথা বাঙলাদেশের পতনঅভ্যুদয়বন্ধুরপন্থা নিরীক্ষণ করছেন অনাখ্যায় বৈরাগ্যে—তাই তার মূল রাগ সম্মাস—এবং তার প্রকাশ দিয়েছেন হাস্যরসের মাধ্যমে, দুঃখ-দুর্দৈবকে নিদারুণ তাচ্ছিল্যরবাণ দিয়ে এ বড় কঠিন কর্ম—কঠোর সাধনা এবং বিধিদত্ত সাহিত্যরস একধারে না থাকলে এ ভান্দুমতী অসম্ভব।

আমার প্রিয় চরিত্র ডন কুইক্সট্। উপেন্দ্রনাথ বিপরীত ডন।

ডন এবং উপেন্দ্রনাথের সাহস অসীম; দুইজনেই পরের বিপদে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে শানিত তরবারি নিয়ে আক্রমণ করেন, অন্যায় অত্যাচারের সামনে দুজনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোহিতরঙে রঞ্জিত দেখেন।

পার্থক্য শুধু এইটুকু, উইংডমিলকে ডন মনে করেন দৈত্য, দাসীকে মনে করেন রাজনন্দিনী, ভেড়ার পালকে মনে করেন জাদুকরের মন্তসম্মোহিত পরীর দল।

আর উপেন্দ্রনাথ দেখেন বিপরীত। কারাগারকে ভাবেন রঙ্গালয়, কারা-রক্ষকে মনে করেন সার্কাসের সং, পদূলিস বাহিনীকে মনে করেন ভেড়ার পাল।

এই নব ডন কুইক্সটকে বার বার নমস্কার ॥

জয়ছে ভারতভাগ্যবিধাতা

ম্যাট্রিক পাশের লিস্টে নাম দেখে যেমন 'ইয়া আল্লা' বলে ছেলে-ছোকরারা লম্ব দিয়ে ওঠে আমাদের অখণ্ড স্বরাজ্যভারের আনন্দোদ্বাস তার সঙ্গে তুলনীয়। এমন কি, ম্যাট্রিকেও যদি পাঠকের মন সন্তুষ্ট না হয় তাহলে বি. এ., এম. এ., পি-এইচ. ডি. ডি. লিট. যা খুশী বলতে পারেন তাতেও কোনো আপত্তি নেই। শুধু তাই নয়—এ স্বাধীনতা পাশের আনন্দ অন্য সব পাশের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। কারণ অন্য যে-কোনো পরীক্ষায় দু-একজনের ইয়ার-বক্সী ফেল মারেনই মারেন—নিতান্ত পরশ্রীকাতর এবং বিঘ্ন-সম্ভোষী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কারোরই কোনো পরীক্ষা পাশ নিরঙ্কুশ আনন্দায়ক হয় না—এ-পরীক্ষায় কিন্তু সবাই পাশ, সবাই রাজা। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী আজ স্বাধীন হলেন, আপনিও হলেন, আমিও হলুম।

কিন্তু প্রশ্ন ততঃ কিম? অবশ্য বলতে পারেন পরীক্ষা পাশ করে জ্ঞানার্জন হল এবং জ্ঞানার্জন স্বয়ংসম্পূর্ণ, আপন মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত। এর পর কিছুর না করলেও কোনো আপত্তি নেই। এটা একটা উত্তর বটে কিন্তু কোনো জিনিস একদম কোনো কাজে লাগল না একথাটা ভেবে কেমন ঘেন সূখ পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে, 'ইট ইজ বেটার টু ব্রেক দি হার্ট ইন লভ দেন ডু ন্যাথিং উইথ ইট'—স্বাধীনতাটা কোনো কাজে লাগাব না একথা, ভেবে মন কেমন ঘেন সূখ পায় না; বাসনা হয়, দেখাই যাক না, রাজনৈতিক স্বরাজ্যের মই চড়ে আরো পাঁচ রকমের স্বরাজ্য হস্তগত হয় কি না। এ-লোভ সকলেরই থাকবে সে-কথা হলপ করে বলা যায় না, কিন্তু অততপক্ষে এ-তব্বতা স্বীকার করে নিতে হবে যে, পাশের পর লেখা-পড়া বন্ধ করে দিলে জ্ঞান যে রকম কপূরের মতো বিনা কারণেই উবে যেতে থাকে, স্বাধীনতা-টাকেও তেমনি চালু না রাখলে ক্রমে ক্রমে সেও তার রূপ বদলাতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পরমুহূর্তেই যদি বেধড়ক ধর-পাকড় আরম্ভ করে দেন, মনে মনে ভাবেন পাঁচটা লোকের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেই পাঁচশ লোকের স্বাধীনতার বাঁচাও তা হয়ে যাব কিংবা যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে না ঝোলান তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বরাজ্য লাভটা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আগেভাগে হলফ করে কিছুর বলা যায় না।

হিটলারের পূর্বেও জার্মানি স্বাধীন ছিল কিন্তু জার্মানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর স্বাধীনতা দিলেন হিটলার। লেনিনের পূর্বে রাশার জনসাধারণ স্বাধীনতার স্বাদ পায় নি, লেনিন এক খাঙ্কায় গোটা দেশটাকে অনেকখানি এগিয়ে দিলেন।

এখন আবার জ্ঞালিন দেশটাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন যে এর পর কি হয় না হয় বলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনিও হিটলারের গতি লাভ করবেন নাকি ?

কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, আমাদের চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো উপায় নেই—কিছু একটা করতেই হবে। স্বাধীনতার ঘোড়া চাঁড় আর নাই চাঁড় সেটাকে অন্তত বাঁচিয়ে রাখার জন্য দানা-পানির খচা হবেই হবে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেকখানি বিলিতি ছিল বলে আমাদের স্বরাজ্যলাভও অনেকখানি বিলিতি কায়দায় হয়েছে। এখনও আমাদের লাট-বেলাটরা বিলিতি কায়দায় লণ্ড-ডিনার খাওয়ান, পরট দেখেন, সেলুট নেন, এডিসি ফেডিসি কত ঝামেলা, কত বখেড়া। তাই স্বাধীনতা নিয়ে কি করব কথাটা উঠলেই গুণীরা বলেন, 'ইয়োরোপ কি বলছে, কান পেতে শোনো তো ; তারপর বিবেচনা করে ভালো-মন্দ যা হয় একটা কিছু করব।'

ইয়োরোপ কি বলছে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো খোঁকা নেই। ইয়োরোপ বলছে, 'হয় মার্কিন ইংরেজের ডিমোক্রেসি গ্রহণ করে তাদের দলে যোগ দাও, নয় লালরক্ত মেখে রুশের সঙ্গে এক হয়ে যাও। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।'

ক্ষীগক্ঠ কেউ কেউ বলেন, 'কেন ? টিটো ?'

উত্তরে শূনি অটুহাস্য। টিটো ইংরেজে বন্দুক-কামান কেনা-বেচার সমঝাওতাও নাকি হয়ে গিয়েছে কিংবা হব-হব করছে। টিটো মিয়ার 'তৃতীয় পন্থা' তিছু-মীরের বাঁশের কেজার মতো তিন দিনও টিকল না। তাঁকেও আশ্চে আশ্চে মার্কিন-ইংরেজের আশ্তিন পাকড়ে এগোতে হচ্ছে।

এর পর আর কোন সাহসে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের কথা তুলি ?

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়োরোপীয় সাহিত্যিক, চিত্রকর, কবি, দার্শনিকদের নিরক্ষুশ নৈরাশ্যবাদ। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালি যে কোনো মাসিক খুললেই দেখতে পাবেন ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিই মাথায় হাত দিয়ে বলেছেন, 'কোনো পন্থাই তো দেখতে পাচ্ছি নে—মার্কিনের দেখালো পথ মনঃপুত হয় না, রুশের পথই বা ধরি কি প্রকারে ? মার্কিন ইংরেজের "ডিমোক্রেসি" এমনিতেই শোষণ-পন্থী তার উপর আমরা যদি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কম্যুনিজমকে নিম্নল করে দি তাহলে এখনো তারা রুশ জুজুর ভয়ে যেটুকু সমঝে চলত, চাষামজুরকে দম্মুঠো অন্ন দিত তাও আর দেবে না। আর রুশের কলমা পড়ে যদি মার্কিন-ইংরেজকে সাবড়ে দিই তাহলে জ্ঞালিনকে ঠেকাবে কে ? যুগযুগসংগিত ইয়োরোপের তাবৎ সভ্যতা তাবৎ সংস্কৃতিকে তো তিনি "বুর্জোয়া" বলে নাকচ করে দিয়েছেন, এমন কি তাঁর আপনজন ভার্গা, ভার্ভিলফ, কল্ংসফ হয় "পেনশনে" নয় নির্বাসনে কিংবা মাটির নীচে। জ্ঞালিন যদি বিশ্বজয় করতে পারেন তবে এ-দুনিয়াতে বাইবেল-কুরান, বেদ-পুরাণ তো থাকবেনই না, শ্লাতো শেকস্পীয়র থাকবেন কিনা তাই নিয়ে অনায়াসে জল্পনা-কল্পনা করা যেতে পারে। আন্ডা-মাখনের ছয়লাপ হয়তো হবে, কিন্তু এই পৃথিবীর লোক

শ্রীমদভগবদ্গীতার পড়তে পাবে না শুনে জ্ঞানিনী কলমা পড়তে কিছুতেই মন মানে না ।’

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে ঋষীঋষীর প্রতি এদের নৈরাশ্যের অনুযোগ । একমাত্র পেশাদারী পাস্পি-পদুরোত ছাড়া ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ আর এ-বিশ্বাস করেন না যে প্রভু যীশুর সাম্যের বাণী বিশ্বসমস্যার সমাধান করতে পারবে । একদিন সে-বাণী দাসকে মুক্তি দিয়েছিল, অত্যাচারীকে শাস্ত করতে পেরেছিল, জড়লোক থেকে অধ্যাত্মলোকের অনিবর্ণ দীপশিখার চিরন্তন দেওয়ালির উৎসবপ্রাক্ষণে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ সে বাণী ভাটিকানের আপন দেশেই লুপ্ত অগ্নিবর্ণ বস্ত্র করতে পারছে না ।

ইয়োরোপে মরা ঘোড়ার মতো পড়ে আছে । ধর্মের চাবুক সে আর খাড়া হবে না ।

অতএব ? অতএব কোনো দিকেই যখন আর কোনো ভরসা নেই তখন যা-খুশি একটা বেছে নাও । আর দয়া করে আমাদের শান্তিতে মরতে দাও, আর তাও যদি না করতে দাও তবে আত্মহত্যা করতে দাও । রুশিয়া এবং পশ্চিম-ইয়োরোপে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভিতরই আজ বেশি ।

*

*

*

আমরা যদি হটেনটট হতুম তাহলে আমাদের কোনো দুর্ভাবনা থাকতো না । আত্মহত্যা ছাড়া—অসভ্যদের ভিতর আত্মহত্যার সংখ্যা অতি নগণ্যও বটে—অন্য যে-কোনো দুর্ঘটনা পন্থার ভিতরে একটা বেছে নিয়ে ‘দুর্গা’ বলে ঝুলে পড়তুম । তারপর যা-হবার হত । (কিছুটা যে হয়েছে সে-কথাও অস্বীকার করা যায় না । কম্যুনিষ্টরা তো আছেনই, আরেক দল যে রুশের বিরুদ্ধে ঝটপট শত্রুতা জানিয়ে মার্কিন কল-কল্লা হাতিয়ে এ-দেশটা শোষণ করতে চান সে তব্বাও আমাদের অজানা নয় ।)

‘ধন্য সেই জাত, যার কোনো ইতিহাস নেই ।’ সে নির্ভয়ে যা-কিছু একটা বেছে নিতে পারে ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলুন, আর সৌভাগ্যই বলুন আমাদের ঐতিহ্য রয়েছে । সে ঐতিহ্যে আমরা শ্রদ্ধা হারাই নি—হয়তো তার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশী শাসনের ফলে আমরা সে ঐতিহ্য অনুযায়ী চলবার সুযোগ এবাবৎ পাই নি ।

কিন্তু যতদিন সে-শ্রদ্ধা আমাদের মনে রয়েছে ততদিন তো আমরা বিগত-মৌন্য অরক্ষণীয় মতো নিরাশ হয়ে গিয়ে মার্কিন কিংবা রুশের গলায় মালা পরিয়ে দিতে পারি নে । স্বরাজের জন্য যারা জেল খাটল, প্রাণ দিল তাদের অনেকেই তো মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিল ভারতবর্ষের লুপ্ত ঐতিহ্য উদ্ধার করে তারই আলোকে ভবিষ্যতের পথ বেছে নেবে, এমন কি গোপনে গোপনে হয়তো এ দম্ভও পোষণ করেছিল যে বিশ্বজনকেও সেই ‘আলোকমাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গনে’ নিমন্ত্রণ করতে পারবে । কৃষ্ণের দেশ, বুদ্ধের

দেশ, চৈতন্যের দেশ আজ কপদকহীন, দেউলে, একথা মন তো সহজে মেনে নিতে চায় না।

কিন্তু সেখানে আরেক বিপদ। ঐতিহ্যের কথা তুললেই আরেক দল উল্লসিত হয়ে বলেন, ‘ঠিক বলছ, চলো, আমরা বেদ-উপনিষদের সত্যযুগে ফিরে যাই।’

কোনো বিশেষ ‘সত্যযুগে’ ফিরে যাওয়ার অর্থই মেনে নেওয়া যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কোনো জিনিস নেই, সেই যুগকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরার অর্থই হল এ-কথা মেনে নেওয়া যে আমরা যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খল অনন্তির পথেই চলে আসছি এবং নতুন জীবন, নবীন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার মতো কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই এঁরা তখন সেই বিশেষ ‘সত্যযুগে’র আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম (এমন কি কুসংস্কার পর্যন্ত, কারণ আমরা বিশেষ কোনো সর্বাঙ্গসুন্দর ‘সত্যযুগে’ বিশ্বাস করিনে বলে সব যুগেই কিছু না কিছু কুসংস্কার মূঢ়তা ছিল বলে ধরে নিই) পদ পদে অনুসরণ অনুকরণ করতে লেগে যান। তখন জিগির ওঠে, ইয়োরোপীয় সব কিছু বর্জন করো, মার্কিন রুশের গা ছুঁয়েছ কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ছড়াও চতুর্দিকে গোবরের জল, ঠেকাও তাই দিয়ে শুদ্ধ “ভারতীয়-সংস্কৃতি”-কে “অস্পৃশ্যের পাপ-স্পর্শ থেকে”।

এঁরা গড়ে তুলতে চান আবার সেই ‘অচলায়তন’ যার অন্য প্রাচীর ভেঙে ফেলবার জন্য কবিগুরু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লাঞ্চিত, অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নব্যযুগের প্রতীক নতুন ‘ডাকঘর’ যার ভিতর দিয়ে রুশন অমলকে বাণী পাঠবেন প্রাচীন রাজা, যিনি জনগণের অধিনায়ক, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।

মার্কিন না রুশ না, এমন কি ভারতীয় কোন বিশেষ ‘সত্যযুগ’ও না—এসব এড়িয়ে বঁচিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের চলিষ্ণু সদাজাগ্রত শাস্বত সত্যধর্মের পথে আমাদের চালাবেন কে? সর্বব্যাপী স্বন্দর, আদর্শে আদর্শে সংঘাত, ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে সংগ্রাম, এর মাঝখানে শান্তসমাহিত হয়ে ধ্রুব সত্যের সম্মান দেবেন কে?

তিনি এলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব তো? আমার মনে হয় পারব। কারণ তিনি কোন ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করবেন তার কিছুটা সম্মান আমরা পেয়ে গিয়েছি—তিনি স্বীকার করে নেবেন প্রথমেই জনগণমন-অধিনায়ক ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে, তাঁর উদার বাণীতেও অহরহ প্রচারিত থাকবে সেই আহ্বান যে আহ্বানে সাড়া দেবে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রীষ্টান, তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাবো সেই চির-সারথির রথচক্রবর্তর, যিনি পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার উপর দিয়ে নিয়ে এসেছেন আমাদের এই নব্যযুগের অরুণোদয়ের সামনে।

শত মূঢ়তার মাঝখানে যে আমরা আজ কোটিকণ্ঠে ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে স্বীকার করে নিলুম—জাতীয়-সঙ্গীত নির্বাচনে পথদ্বান্ত হই নি—এ বড় কম আশার কথা নয় ॥

ইন্দ্রলুপ্ত

(আব্দু সঈদ আইয়ুবকে)

ঘরের দাওয়ায়, তেঁতুলের ছাওয়ায়, মাঠের হাওয়ায়
খাওয়া-দাওয়ায়
শান্তি নেই, গরমেরও ক্রান্তি নেই ।
সবুজ ঘাস হল হলদে, তারপর ফিকে ।
দিসা কাল-বোশেখী বাশের বনে দ্রিবিক্রমে বিক্রমে
তাদের কোমর ভেঙে নামল মাঠে ।
লাথি মেরে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল তার শুকনো শেকড়
বেরিয়ে পড়ল শুল্ল, উষ্ণ, নগ্ন মৃত্তিকা ।
মাঠের টাক—
আমার টাকের মতো ।

কলনের ঘন বনে
নিদাঘের তপ্ত কাফে কোণে
তুমি বসে আনমনে
—আমার চুলের ঘুঙুর তোমার নাচাল নয়ন নীল
কালোকে নীলেতে নাৎসি হারাতে পেল কি গোপন মিল ? —
রাইনের ওরাইনের মৃদু গন্ধ,
অশ্ব ভিখারীর ছবি দেয়ালেতে ডাইনে,
একচোখা রেডিয়োটো করে কটমট
ভয়ে ভয়ে বললাম, 'ফ্লান, Gruess Gott !
বেতারের সুরটা টাংগো না ফক্স-ট্রট ?'
চট করে চটে যাও পাছে ।
তুমি রূপসিনী বিন্দিনী
নরদিশী নন্দিনী ।
তোমার প্রেম এল যে
শ্রাবণের বর্ষাণের ধারা নিয়ে
চারিদিকে টেনে দিয়ে
ঘনকৃষ্ণ সজল যামিনী বননিকা ।
সে বিরাট বিলুপ্তির বিস্মরণে
শুধু আমার চেতনার ছয় ঋতু
আর তোমার চেতনার চার ঋতুর বিজড়িত নিবিড় স্পর্শ—

লাল ঠোঁট দিয়া বঁধুয়া আমার
 পড়িল মস্ত কাল
 দেহলি রুখিয়া হিয়ারে বাঁধিল
 পাতিয়া দেহের জাল ।
 মূখে মূখ দিয়া হিয়ায় হিয়ায়
 পরশে পরশে রাখি
 বাহু বাহুপাশে ঘন ঘন শ্বাসে
 দেহে দেহ দিল ঢাকি ।
 হঠাৎ দামিনী ধমকালো
 বিদ্যুৎ চমকালো
 দেখি, নীল চোখ

কাতরে শুধাই একি
 তোমার নয়নে দেখি,
 আমার দেশের নীলাভ আকাশ
 মায়া রচিছে কি ?
 তোমার বক্ষতলে
 আমার দেশের শ্বেতপদ্ম কি
 ফুটিল লক্ষ দলে ?

রাত পোহাল । বর্ষণ থেমেছে ।

কিস্তি কোথায় শরতের শান্তি, হেমন্তের পূর্ণতা ?

খতুচক্ৰ গেল উলটে—

যমুনার জলও একদিন উজান বয়েছিল ।—

কোন বড় তোমাকে নিয়ে গেল ছিনিয়ে

কোন বড় আমাকে নিয়ে গেল ঝেঁটিয়ে ?

বেরিয়ে এল মাঠের টাক,

আমার টাক ।

আমার জীবনে ইন্দু লুপ্ত

আমার কপালে ইন্দ্রলুপ্ত ॥

নয়রাতি

দেশভ্রমণের সময় যারা ছন্দের মতো ছুটোছুটি করে—অর্থাৎ সকালে মিউজিয়াম, দুপুরে চিত্রশালা, বিকেলে গির্জাদর্শন, সন্ধ্যায় অপেরা, রাত-দুপুরে কাবারে, আমি তাদের দলে নেই । দেশে ফেরার পর কোনো পাক্সা টুরিস্ট যদি আশ্চর্য হয়ে বলেন, ‘সে কি হে ? তুমি প্রাগে তিন দিন কাটালে অথচ বলছ রাজা কালের বর্মাভরণ-অস্ত্রশস্ত্রের মিউজিয়াম দেখ নি—এ তো অবিশ্বাস্য’, আমি তাহলে তা নিয়ে তর্কাতর্কি করি নে কারণ মনে মনে জানি আমি প্রত্যেকটি কড়ির পুরো দাম তোলার জন্য দেশভ্রমণে বেরই নি । ছ

পয়সার টিকিট আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত নিয়ে যায়—আমি নামব হেদোয়—তাই আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত গিয়ে সেখানে নেমে, পায়ে হেঁটে ঘণ্টাতে ঘণ্টাতে হেদোয় এসে বেষ্টিতে বসে ধুঁকতে হবে নাকি? আট নম্বরের জুতো ছটাকায় দিচ্ছে বলে আমার ছ-নম্বরী পাতকে আট নম্বরী পরাতে যাব নাকি?

তাই আমার উপদেশ ও কর্মটি করতে যাবেন না। খাওয়ার যে রকম সীমা আছে, ভালো জিনিস দেখারও একটা সীমা আছে। ক্লান্তি বোধ হলেই দেখা ক্ষান্ত দিয়ে একটা কাফেতে বসে যাবেন কিংবা যদি বাগানে বসবার মতো আবহাওয়া হয় তবে বাগানে বসে কফি, চা, বিয়ার কিছ্ছু একটা অর্ডার দিয়ে সিগারেটটি ধরিয়ে আরামসে গা এলিয়ে দেবেন।

এই হল জাবর-কাটার মোকা। এ কদিনে যা কিছু দেখেছেন তার মধ্যে যে কটি মনে ঢেউ তুলেছিল সেই ঢেউগুলি গুনবেন। কিংবা বলব আপনার মনের ফিল্ম যে ছবিগুলো তুলেছিল তার গুটিকয়েক ডিভালাপ প্রিনটিং করবেন, চোখ বন্ধ করে এক-একটা দেখবেন আর মনের ঘাড় নাড়িয়ে বলবেন, উত্তম হয়েছে, খাসা হয়েছে।

আমার পাশের টেবিলে দুই পাড় দাবা খেলেনওলা বাহাজ্ঞানশূন্য হয়ে দাবা খেলছিলেন। দু'কাপ কফি হিম হয়ে গিয়েছে—উপরে কফির ঘন সর পড়েছে। জামবাটি সাইজ অ্যাশ-ট্রে পোড়া সিগারেটে ভর্তি। আরো জনতিনেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, কিন্তু কারো মুখে কথা নেই, এ দৃশ্য বাঙালীকে রঙ ফিলিয়ে দেখাতে হবে না। কৈলাস খুড়োর যে ছবি শরচ্চন্দ্র একে গিয়েছেন তার দোহার গাইবার প্রয়োজন বাঙলাদেশে বহুকাল ধরে হবে না।

খেলোয়াড়দের একজন দেখলুম ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে আসছেন। আধ ঘণ্টাতেই কাবু হয়ে গেলেন। গজের কিস্তিতে যখন মাত হব্দ-হব্দ, তখন ঘাড়গদানে 'শ্রাগ' করে বললেন, 'স্পাঞ্জ ফেলে দিলুম,' অর্থাৎ আমার খেলা গয়্যগঙ্গাগদাধরহরি।

দর্শকদের একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন? ঐ বড়োটা একঘর ঠেলে দিলে হয় না?'

খাসা চাল তো! ওদিকে কারো নজরই যায় নি। এ চালে আরো খানিকক্ষণ লড়াই দেওয়া যেতে পারে।

খেলোয়াড়টি উঠে দাঁড়িয়ে সেই দর্শককে বললেন, 'আপনি তাহলে বসুন।' দর্শক তখন খেলোয়াড়রূপে বসে প্রথম সামলালেন আপন ঘর, তার পর দিতে আরম্ভ করলেন ধীরে ধীরে চাপ। স্পষ্ট বোঝা গেল ইনি উচ্চাসের লেঠেল। এবার অন্য পক্ষের প্রাণ যায় আর কি। শেষটায় তাই হল। পয়সা বারের কসাই এবারে বকরি হয়ে বললেন—যা বললেন—তার অর্থ 'হরিবোল বল হরি!'

আমরা লক্ষ্য করি নি কে-ই বা এরূপ স্থলে করে—আরো জনতিনেক দর্শক তখন বেড়ে গিয়েছেন। তাদেরই একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন, গজটা পেঁছিয়ে নিলে হয় না?'

এ চালের অর্থটা আমার কাছে ধরা পড়ল না। কিন্তু কসাই দেখলুম

ধরতে পেরেছেন। শূধু বললেন, 'হুঁ।' তখন পল্লা বারের কসাই, দূসরা বারের বর্কারি উঠে বললেন, আপনি তা হলে বসুন।'

অর্থাৎ খোল-নলচে দুইই তখন বদলে গিয়েছে।

এবারে সতি সতি লাগল মোষের লড়াই।

শেষটায় খেলা চাল-মাত হল।

*

*

*

ফিরে এসে আপন চেয়ারে বসলুম।

খেলোয়াড়দের একজন তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক চ'ডু-খানায় যখন এতক্ষণ একসঙ্গে আফিং খেয়েছি তখন খানিকটে পরিচয় হয়ে গিয়েছে বই কি— একটা ছোট নডু করলুম। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বললেন, 'সুপ্রভাত।' আমি বললুম, 'বসুন, বসুন।'

ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, 'বসুন', হুঁঃ, 'বসুন'। ওদিকে আমার প্রাণ যায় আর কি?'

আমি শূধালুম, 'কেন, কি হয়েছে?'

বললেন, 'জবাই করবে, মশাই, জবাই করবে আমাকে—বউ। বলোছিলুম, এই এলুম বলে। কি করে জানব বলুন, দাবার চক্রে পড়ে যাব। বলতে পারেন, মশাই, এই বিদুঘটে খেলা বের করেছিল কে? হাঁ, হাঁ, ভারতবর্ষেই তো এর জন্মভূমি। কিন্তু এদেশে এল কি করে?'

'শুনোছি পারসিকরা আমাদের কাছ থেকে শেখে, আরবরা তাদের কাছ থেকে, ভারপর ক্রুসেডের লড়াইয়ে বন্দী ইয়োরোপীয়রা শেখে আরবদের কাছ থেকে, তারা দেশে ফিরে—'

'আমাদের মজালে। কিন্তু এখন আমার উপায় কি? আপনারা এ অবস্থায় দেশে কি করেন?'

'চাঁদ-পানা মূখ করে গাল সই।'

'বাস্! ব্যামোটা বাধিয়ে বসে আছেন ঠিক; ওষুধটা বের করতে পারেন নি। কিন্তু আমি পেরেছি। চলুন, আমার সঙ্গে, লগ্ন থাকেন।'

'আর গালও খাব? না?'

'না, না, আপনাকে বকবে কেন? আমি বলব, এঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে কি করে যে বেলা বয়ে গেল ঠাহর করতে পারি নি। চলুন, চলুন আর দেরি করা নয়।'

চললুম।

ভদ্রলোকের বয়স—এই ধরুন ৪৫-৪৬। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, পরনে উত্তম রুচির কোট-পাতলুন-টাই। সব কিছুর পরিপাটি। তাই অনুমান করলুম তাঁর অর্ধাঙ্গিনী তাঁকে বকুন-বকুন আর যা-ই করুন না কেন, গৃহিণী হিসেবে তিনি ভালোই।

বললেন, 'যা খুশি তাই বউকে বলে যাবেন, কিছু ভয় করবেন না। তাঁকে যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বোধে ভিক্ষুণী বানিয়ে সিংহলে পাঠিয়ে দিতে পারেন,

তাতেও আমি কোনো আপত্তি করব না, কিন্তু সার, দয়া করে ঐ দাবা খেলার কথাটি চেপে যাবেন।’

আমি বললুম, নিশ্চয়ই।’

দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং স্ত্রী। কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার পূর্বেই ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিলেন, ‘ইনি আমার স্ত্রী, ফ্রান্‌ৎসিস্কা—ফ্রান্‌ৎসিস্কা নয়রাট্।’ আমি বললুম, ‘আমার নাম আলী।’

ফ্রান্‌ৎসিস্কার বয়স ৩৫-৩৬ হবে। সুইটজারল্যান্ডে এই বয়সে মেয়েদের পূর্ণ যুবতী বলে ধরা হয়। এ-যৌবনে কুমারীর রূপের নেশা আর মাতৃহের-মাদুরী মিশে গিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তার রস মানুষ নিভঁয়ে উপভোগ করতে পারে—স্বামী সন্দেহের চোখে দেখে না, রমণী আপনার চোখে চটক লাগাবার জন্য বাস্তব হয়ে ওঠে না। মেয়েদের আচরণ এ সময় সত্যি বড় মধুর হয়; কখনো তারা তরুণীর মতো ভাবে বিহবল আত্মহারা হয়ে অকারণ বেদনার কাহিনী বলে যায়, কখনো আবার মাতৃহের গর্ভ নিয়ে আপনাকে নানা সদুপদেশ দেয়, বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার পাতবার জন্য স্নিগ্ধচোখে অনুন্নয়-বিনয় করে।

স্ত্রীকে কিছু বলতে না দিয়েই হ্যার নয়রাট্ বকে যেতে লাগলেন, ‘বদলে ফ্রান্‌ৎসিস্কা, আমি ঠিক সময়েই ফিরে আসতুম কিন্তু এই হ্যার আলীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ইনি ভারতবর্ষের লোক—শুনছেন তো ভারতবর্ষের লোক কি রকম গুণী-জ্ঞানী হয়। ইনি তাঁদেরই একজন। তার প্রমাণও আমি হাতে-নাতে পেয়ে গিয়েছি। রাস্তায় আসতে আসতে তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেলুম, সাতদিন ধরে এসেছেন জিনীভায়, এখনো লীগ অব নেশনসের “চিড়িয়াখানা” দেখতে যান নি, শামুনিব্‌স্‌ চড়েন নি, অপেরা-থিয়েটারে কিছুই দেখেন নি। আর সব টুরিস্টদের মতো সুইটজারল্যান্ডের প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বস্তুকে পিঁপড়ে নিঙড়ে ঘি বের করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন নি। আমার তো মনে হয়, এ-দেশের উচিত একে এঁর খর্চার পয়সা কিছু ফেরৎ দেওয়া। কী বল?’

পাছে ভদ্রমহিলার অভিমানে ঘা লাগে, আমি তাঁর দেশের কুতূব তাজ ভারতীয় দম্ভের নেশায় তাচ্ছিল্য করছি তাই তাড়াতাড়ি বললুম, ‘আমি বড় দুর্বল, বেশি ঘোরাঘুরি করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আশ্বে আশ্বে সবকিছুই দেখে নেব।’

ফ্রান্‌ৎসিস্কা বললেন, ‘সেই ভালো। শামুনিব্‌স্‌ পাহাড় তো আর বসন্তের বরফ নয় যে দুদিনে গলে যাবে, সুইটজারল্যান্ড ভ্রমণ তো আর দাবা-খেলা নয় যে সুযোগ পেয়েও দুটি কিস্তি না দিলে—’

বাঁকটা আমি আর শুনতে পাই নি। আমি তখন ওয়াল-পেপার হয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যাবার জন্য আশ্বে আশ্বে পিছুপা হতে আরম্ভ করছি।

শুনি, হ্যার নয়রাট্ ব্যাথা-ভরা সুরে বলছেন, ‘গিন্নী, ছিঃ।’

আমার অবস্থা তখন এক মাতাল আরেক স্যাঙাত মাতালকে সাফাই গাইবার জন্য নিয়ে এসে ধরা পড়লে যা হয়।

নাঃ। ভুল করেছি। ফ্রান্সিস্কার কামড়ানোর চেয়ে ঘেউ-ঘেউটাই বেশি। বললে, ‘আঃ, আপনারাও যেমন। মেয়েছেলে এরকম দু-একটা কথা সব সময়েই কয়ে থাকেন—ওসব কি গায়ে মাথতে আছে? তুমি দাবা-খেলার দু-একটা আজিজাজে চাল মাঝে মাঝে দাও না—দুশমন কি করে তাই দেখবার জন্য?’

আবার দাবা। খেয়েছে।

ফ্রান্সিস্কা স্বামীকে বললেন, ‘আজ তো লাগের ব্যবস্থা বড় মামুলী। সুপ্, ফিশ্ আ লা রুস (রাশান কায়দার) আর আপল টাট্ উইথ হুইপ্ট্ ক্রীম। তার চেয়ে বরঞ্চ চল রেস্টোরায়—জিনীভা লেকের মাছ সুইস কায়দায় রান্না—ভালোমন্দ এটা সেটা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে শূধালেন, ‘আপনি কি খেতে ভালোবাসেন?’

আমি নিভয়ে বললাম, ‘সুপ্, ফিশ্ আ লা রুস, আপল টাট্ উইথ হুইপ্ট্ ক্রীম।’

হ্যার নয়রাট্ তো আনন্দে গদগদ। বললেন, ‘দেখলে গিম্বী, কি রকম অশ্রুত আদব-কায়দা। তুমি যদি বলতে আজ রেংখোছ। স্ট্রিকনিং-সুপ, পটাসিয়াম সায়ানাইড-ফ্রাইড, আসেনিক-পুডিং আর কোবরা-রসের কফি তা হলে উনি বলতেন “দি আইডিয়া, আমি দু বেলো ঐ জিনিসই খাই”।’

ফ্রান্সিস্কা বললেন, ‘দেখো, পেটার, বিশ্বসংসারের লোককে তুমি আপন মাপকাঠি দিয়ে মেপো না। তোমার মত ওঁর পেট অজুহাতের মানওয়ারী জাহাজ নয়।’

পেটার বললেন, ‘সব দাবা-খেলোয়াড়কেই অজুহাত-বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয়। বিয়ের পরেই যে রকম হনিমুন, দাবা-খেলার পরেই সেই রকম অজুহাত অবেষণ।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু আমি তো দাবা খেলি নে।’

কথা শুনে দুজনাই খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষটার পেটার বললেন, ‘দেখলে গিম্বী, অজুহাতের রাজা কারে কয়? একদম কবুল জবাব উনি দাবা খেলেন না! বাপ্স! মারি তো হাতি লুট তো ডান্ডার। অজুহাত যদি দিতেই হয় তবে এমন একথানা ঝাড়ব যে মানুষ রা কাড়বার ফাঁকি পাবে না। পাক্সা আড়াই ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখলেন আমাদের খেলা, আর এখন অলান বদনে বলছেন উনি দাবা খেলেন না!’

আমি সবিনয়ে শূধালাম, ‘আপনি কনসার্ট শুনতে যান? আচ্ছা, সেখানে তো পার্ক সাড়ে তিন ঘণ্টা বাজনা শোনেন; তাই বলে কি আপনি পিয়ানো, বালা, চেম্বো কতাল বাজান?’

ওদিকে দেখি, ফ্রান্সিস্কা আমাদের তর্কাতর্কিতে কান দিচ্ছেন না; শূধু বললেন, ‘তাই বোলো, দাবা খেলা হচ্ছিল।’

চাণক্য বাম্ধবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘উৎসবে, ব্যাসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিশ্ববে, রাজ্য্বারে যে সঙ্গ দেয় সে বাম্ধব।’ আমার বিশ্বাস চাণক্য কখনো বিয়ে করেন নি। তা না হলে তিনি ‘রাজ্য্বারে’ না বলে ‘জায়াব্বারে’ বলতেন।

জানি, অতিশয় অভদ্রতা হল—তবু বললাম, ‘আমার ক্ষিদে পেয়েছে।’

বন্ধুর ফাঁসটাকে মূলতঃবী করাতে পারলুম—এই বা কি কম সামান্য ।

*

*

*

আমরা বাড়িতে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে খেরকম হাপসহুপস শব্দ করে আহালাদি সমাপন করি, নেমস্তন্ন খেতে গিয়েও প্রায় সেই রকমই করে থাকি । তফাত মাত্র এইটুকু যে, বাড়িতে চিংকার করে বলি, ‘আরো দুখানা মাছভাজা দাও’, নেমস্তন্ন বাড়িতে বলি, ‘চৌধুরী মশাইকে আরো দুখানা মাছভাজা দাও ।’

সায়ের-সুবোধের কিস্তি বাড়ির খাওয়াতে, রেস্টোরাঁয় আহায়ে এবং নেমস্তন্নের ভোজনে ভিন্ন ভিন্ন কায়দা-কৈতায় খাওয়া-দাওয়া করতে হয় । সায়েররা বাড়িতে খেতে বসে গোগ্রাসে গোস্ত গলে আর পোশাকী ডিনারে কিংবা ব্যানকুয়েটে একরকম না খেয়েই বাড়ি ফেরে । ব্যানকুয়েটে আপনাকে সুপ দেওয়া হবে আড়াই চামচ, তার থেকে আপনি খাবেন দেড় চামচ । ডিনারে সুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে মোলায়েম কায়দায় ঠোঁট রুট করবেন, কিস্তি ডুক অব উইন্ডসরের সঙ্গে ব্যানকুয়েট খেতে বসলে ঠোঁট রুট করাও নিষিদ্ধ, অর্থাৎ তখন ধরে নেওয়া হয়, আপনি এতই কম সুপ খেয়েছেন যে, আপনার ঠোঁট পর্যন্ত ভেজে নি । তারপর পদের পর পদ উত্তম খাদ্য আসবে—আপনি আপন শ্লেটে তুলে নেবেন কখনো আড়াই আউন্স, কখনো দু আউন্স এবং খাবেন তার থেকে এক আউন্স কিংবা তার চেয়েও কম । মৃগীর হাড়ি থেকে যে ছুরি দিয়ে মাংস চাঁচবেন তার উপায় নেই এবং গ্রোভটুকুর মোহ করেছেন কি মরেছেন । সাইড শ্লেটে যে এক স্লাইস টোস্ট দিবেছিল তার এক-দশমাংশের বেশি খেলে পাঁচজনে ভাববে, আপনি রায়লসীমার দুর্ভিক্ষ-প্রসীড়িত ‘পারিয়া’ কিংবা মধ্য-আফ্রিকার মিশনারি-থেকে হটেনটট্ ।

বিশ্বাস করবেন না, এক খানদানী ক্রাবে আমি দুই পক্ষকে পাকি দু ঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি করতে শুনলুম, সসেজ কি করে খেতে হয় । সমস্যাটা এইরূপ :—(ক) সসেজ থেকে ছুরি দিয়ে চাক্তি কেটে নিয়ে তার উপর মাস্টার্ড মাখাবে কিংবা (খ) প্রথম সসেজের ডগায় মাস্টার্ড মাখিয়ে নিয়ে পরে সসেজ থেকে চাক্তি কেটে তুলবে ? আমি প্রথম পক্ষের হয়ে লড়াই করেছিলাম এবং শেষটায় আমরা ভোটে হেরে গেলুম । এর থেকেই বৃদ্ধিতে পারছেন, আমি খানদানী খানা খেতে শিখি নি—ব্যানকুয়েটে আমার নাভিস্বাস ওঠে ।

বিশ্বাস করবেন না, মাসখানেক হল এক সুইস খবরের কাগজে দেখি, এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন, শ্লেটে যে গ্রোভ পড়ে থাকে, তার উপর রুটি টুকরো টুকরো করে ফেলে সেই গ্রোভ চেটেপুটে নেওয়া (জম্বন শব্দ tunken) ব্যাকরণ-সম্মত—অর্থাৎ কায়দাদুরস্ত—কি না ?

উত্তরে এক ‘খানদানী মনিষি’ বলেছেন, কিছুকাল পূর্বেও এ-অভ্যাস কি বাড়িতে, কি রেস্টোরাঁয়, কি ব্যানকুয়েটে সর্বত্রই অভিশয় নিষ্পদীয় বলে গণ্য করা হত, কিস্তি আজকের বিশ্বময় খাদ্যাভাবের দিনে বাড়িতে—আপন ডাইনিং রুমে—কমটি ক্ষমাহ ।

মৃগীর ঠ্যাংটি হাতে তুলে নিয়ে ‘কড়কড়ায়তে, মড়মড়ায়তে’ বাড়িতে বেশির ভাগ ইউরোপীয়ই করে, কিস্তি বাইরে নৈব নৈব চ । তবে কোন কোন

জর্ম'ন এবং সুইস্ রেস্টারায় রোস্ট সাভ' করবার সময় মূর্গীর ঠ্যাংগুলো উপরের দিকে সাজিয়ে রাখে এবং ঠ্যাংগুলোর ডগায় বাটার পেপারের ক্যাপ পরিয়ে দেয়, যাতে করে আপনি হাত নোংরা না করে ঠ্যাংটা চিবুতে পারেন। এ ব্যবস্থা দেখে ইংরেজের জিভে জল আসে, কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে বলে, 'জর্ম'নরা বর্বর !'

অপিচ এসপেরেগাস এবং আর্টিচোক ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাওয়া গো-হত্যার ন্যায় মহাপাপ—খেতে হয় হাত দিয়ে।

ইংরেজ যদিচ কখনো রাইস-কারি কিংবা ইটালিয়ান রিসোত্তো (এক রকমের কিমা-পোলাও) খায়, তবে টেবিল কিংবা ডেসার্ট স্পুন দিয়ে সে খাদ্য মুখে তোলে। তাই দেখে ফরাসী-ইতালী আঁতকে ওঠে—বলে, কী বর্বরতা ! একটা আশ্চর্য চামচ মুখে পুঁরছে—বাপ্‌স্‌। তারা রাইস-কারি খায় ডান হাতে কাঁটা নিয়ে—বিনা ছুরিতে। তাই দেখে চীনা ভদ্রসন্তান আবার ভিরমি যায়। বলে, একটা আশ্চর্য ফর্ক মুখে ঢোকাচ্ছে—কী বর্বরতা ! তার চেয়ে চপশ্চিক কত পরিষ্কার, কত পরিপাটি।

আর বঙ্গসন্তান আমি বলি, এ সবকটা পদ্ধতিই বর্বর না হোক, অন্তত নোংরা। ফর্ক, স্পুন, এমন কি চপশ্চিক পর্যন্ত আমার আপন আঙুলের চেয়ে নোংরা। সব চেয়ে বড়ীয়া হোটেলের স্পুন নিয়ে তাপনি আচ্ছাসে ন্যাপকিন দিয়ে ঘষুন—দেখতে পাবেন ন্যাপকিন কালো হয়ে গেল। অথচ আপনি হাত ধুয়ে যে খেতে বসেন, তখন কাপড়ে আঙুল ঘষলে কাপড় ময়লা হয় না।

কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি টেবিলে বসে খাওয়াতে। টেবিল ক্রুথ বাঁচিয়ে, ছুরি-কাঁটা না বাজিয়ে, জল খাওয়ার সময় গ্লাসে ঠোঁটের দাগ না লাগিয়ে টেবিলের তলায় পাশের কিংবা সামনের লোকের পায়ে গুঁতা না মেরে আপন গেলাস আর পরের গেলাসে খিচুড়ি না পাকিয়ে, আঁত্রের ফর্ক আর জয়েন্টের ফর্কে গোলমাল না বাধিয়ে, শ্লেট শেষ হওয়ার পূর্বে ছুরি-কাঁটা পাশাপাশি না রেখে, ডাইনে-বাঁয়ে সব কিছু রন্দিবরবাদ না করে, এবং আহাশান্তে ঘোত ঘোত করে ঢেকুর না তুলে আহাশ করা আমার পক্ষে কঠিন, সুকঠিন। বিলিতি ডিনার খেতে পারেন মাত্র ম্যাজিশিয়ানরাই যাদের হাত-সামানি আছে, যারা চিড়িতনের টেকাকে বেমালুম হরতনের নয়লা বানিয়ে দিতে পারেন।

এবং সব চেয়ে গভ-যন্ত্রণা, খাওয়ার দিকে আপনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবেন না। এর সঙ্গে ওর সঙ্গে আপনাকে মধুর মধুর বাক্যালাপ করতে হবে। আবহাওয়া থেকে আরম্ভ করে আপনাকে রিলেটিভিটি পর্যন্ত কপচাতে হবে। আবার শূন্য গল্প করলে চলবে না—সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে। এর পরিমাণ ঠিক রাখা সেও এক কঠিন কর্ম। আপনি যদি প্রধান অতিথি হন, তবে আপনাকে বকর বকর করতে হবে বেশি, যদি আমার মতো ব্যাক-বেঞ্চার হন, তবে চুপ করে সব কিছু শুনতে হবে—তা সে যতই নিরস নিরানন্দ

হোক না কেন ?

বলুন তো মশাই, ভোজনের নেমস্তন্ন কি এগজামিনেশন হল ?

*

*

*

নয়রাট লোকটি খুশ গল্প করে ঘরবাড়ি জমজমাট করে রাখতে চান সে কথাটা দু'মিনিটেই বুঝে গেলুম, আর গৃহিণীর ভাবসাব দেখে অনুমান করলুম ইনিও সাদাসিধে লোক, লৌকিকতার বড় ধার ধারেন না। খানা-টেবিলের পাশে পেঁঁছেই বললেন, 'এ বাড়িতে পোলিশ গভ'মেন্ট, (পোলাণ্ডেব ইতিহাসে এত ঘন ঘন অরাজকতা আর বিদ্রোহ হয়েছে যে, জার্মান ভাষায় 'পোলিশ গভ'ন'মেন্ট' বলতে 'এলো-মেলো' 'ছন্নছাড়া' বোঝায়) যে যেখানে খুশি বসতে পারেন।'

নয়রাট বাধা দিয়ে বললেন, 'সে কি করে হয়? আমি বসব আমার পশ্চাদ্দেশের উপর, তুমি বসবে—'

ফ্রান্সিস্কা রাগ করে বললেন, 'ছিঃ, পেটার, ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে এই আজ সকালে; আর এব-ই ভিতর তুমি আরম্ভ করে দিয়েছ যত সব অশ্লীল কথা! তার উপর উনি আমার বিদেশী!'

নয়রাট বললেন, 'দেখো, প্রিয়া, তুমি অনেকগুলো ভুল করেছ। প্রথমত তুমি বিলক্ষণ জানো, আমি দিগ্বিদেশীতে কোন ফারাক দেখতে পাই নে। যার সঙ্গে আমার মনের 'মিল, রুচির মিল হয় সে-ই আমার আত্মজন। কি বলেন আলিসাবেব?'

আমি বললুম, 'অতি খাঁটি কথা। তবে ভারতীয় ঋষি বলেছেন, "আমি" "তুমি"তে পার্থক্য করে লঘুচিন্তের লোক, যার চরিত্র উদার তার কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন।'

নয়রাট গুম্ মেয়ে শুনলেন। অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়ে শেষটায় বললেন, 'এটা হজম করতে আমার একটু সময় লাগবে—ফ্রান্সিস্কার রান্নার মতো।'

ফ্রান্সিস্কা ভয়ঙ্কর চটে যাওয়ার ভান করে (আমার তাই মনে হল) বললেন, 'দেখো, পেটার, তুমি খাওয়া বন্ধ করে এখু-খুনি রেস্তোরাঁ যাও; না হলে এই ডিশ ছুঁড়ে তোমার মাথা ফাটাব।'

পেটার অতি ধীরে ধীরে আরেক চামচ টমাটো সূপ গিলে নিয়ে প্রথম গিল্মিকে শূন্যালেন, আরো সূপ আছে কি না, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবাইকে আত্মজন করা কি কখনো সম্ভব? এই দেখুন না, সেদিন ফ্রান্সিস্কা বললে, একজোড়া ফেঁসি নতুন জুতো কিনবে—দাম চল্লিশ ফ্রাঁ (৩৮)—আমি বললুম আমার অত টাকা নেই, ফ্রান্সিস্কা বললে, সে আমার কাছ থেকে টাকা চায় না, তার মা আসছেন দু'দিন পরে, তিনি টাকাটা দেবেন। কি আর করি বলুন তো? তদুত্তরেই টাকাটা ঝেড়ে দিলুম। ফ্রান্সিস্কার মা! বাপরে বাপ! আপনি কখনো মান-ইটার বাঘের মতোমুখ হয়েছেন?'

আমি কিছু বলবার পূর্বেই ফ্রান্সিস্কা আমাকে বললেন, 'দোহাই মা-মোরর! এই পেটারটা যে কি মিথ্যাবাদী আপনাকে কি করে বোঝাই? (পেটারের আপত্তি শোনা গেল, 'ডালিং, অশ্লীল গল্পের চেয়ে গালি-গালাজ অনেক বেশি খারাপ') আমার মা' যাতে বড়দিন একা-একা না কাটান তার জন্য নিজে—আমাকে না বলে—লুৎসেন গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে এল। তার পর বছরের শেষ রাতে তাঁর সঙ্গে খেই খেই করে নাচলে ভোর চারটে অবধি—ওঁর সঙ্গে নাচলে অস্তত পঁচিশটা নাচ, আমার সঙ্গে দুটো, জোর তিনটে। বড়ীকে শ্যাম্পেন খাইয়ে খাইয়ে টং করিয়ে দিয়ে, যত সব অশ্লুত পুরানো রাশান আর পোলিশ নাচ। কখনো সে মাটিতে বসে উবু খাবড়ায়—মা তখন তার চতুর্দিকে পাই পাই করে চক্কর খাচ্ছেন—কখনো বাদরের মত লম্ফ দিয়ে ছাতে মাথা ঠোকে—মা তখন ১৫ ডিগ্রীতে কাত হয়ে স্কাট তুলেছেন হাঁটু অবধি। তারপর তাঁকে কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে বাই বাই করে ঘুরল ঝাড়া দশ মিনিট। বাদবাকি নাচনে-ওলা-নাচনে-ওলারা ততক্ষণে ফ্লোর তাদের জন্য সাফ করে দিয়ে আপন আপন টেবিলে চলে গিয়েছে। অরকেস্ট্রাও বন্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে, একটা নাচের জন্য ওরা বাজনা বাজায় দশ। জোর পনের মিনিট—ঐ মাৎস্কা না কি পাগলা নাচের জন্যে ওরা বাজনা বাজালে পাকা এক ঘণ্টা। নাচের শেষে মা তো নেতিয়ে পড়ল চেয়ারে, ওঁদিকে কিস্তু চোখ বন্ধ করে বড়ী মিটিমিটিয়ে হাসছে—খুশিতে ডগোমগো!"

পেটার বললেন, 'ডালিং' কিস্তু সে রাত্রের সব চেয়ে সেরা নাচের জন্য কে প্রাইজ পেল সেটা তো বললে না।'

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মা পেলেন ফাস্ট প্রাইজ, আমি সেকেন্ড। তাই তো আমি শাশুড়ীদের বিলকুল পছন্দ করি নে।'

ফ্রান্সিস্কা বললেন, 'আচ্ছা আহাম্মুক তো! নাচের পয়লা প্রাইজ হামেশাই রমণী পায়। দুসরাটা পুরুষ। এটা হচ্ছে শিভালরি। তোমাকে কি করে পয়লা প্রাইজ দিত?'

পেটার আমার দিকে মুখ করে বললেন, 'গিন্নীর রাগ, আমি ওর সঙ্গে নাচলুম না কেন? আচ্ছা মশায়, বলুন তো, আপনি যদি কবিতা পড়ে শোনান, খোশগল্প করেন, বাজনা বাজান কিংবা কালোয়াতি করেন তবে যে সমে সমে মাথা নাড়তে পারে তাকে আদর-কদর করবেন, না, আপন স্ত্রীকে? যেহেতু তিনি আপন স্ত্রী। রসের বাজারে আপন পর করা যায়?'

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, 'তাই তো আমি নিবেদন করলুম, "যাঁর চারিট উদার—অর্থাৎ যিনি রসিক জন—তাঁর কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন"।

পেটার নয়রাট বললেন, 'গিন্নী অবশ্যি একটা কথা ঠিক বলেছেন, আমরা কেউই এটিকেটের ধার ধারি নে। এ বিষয়ে চমৎকার একটা "টুনিস", "শেলে"র গল্প আছে। "টুনিস-শেল"কে চেনেন?'

আমি বললুম, 'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আগাগোড়া একটি "প্রতিষ্ঠান" বলতে পারেন। "টুনিস" কথাটা এসেছে

লাতিন “আস্তিনিয়ুস” থেকে। আস্তিনিয়ুস গালভরা, গেরেমভারী, খানদানী ঐতিহাসিক নাম। আর টুনিয়ুস্ অতিশয় প্লিবলান অপভ্রংশ—নামটাতেই তাই একটুখানি রসের আমেজ লাগে।

আমি বললুম, ‘আমাদের “পণ্ডান” নামটাও গেরেমভারী কিন্তু তার গাহ’ছা সংস্করণ “পাঁচু”টাতেও ঐরকম রসসৃষ্টি হয়।’

‘তাই নাকি? আপনারাও তাহলে এ রসে বঞ্চিত নন? আর “শেল” কথাটার মানে “ঢায়া”। বুঝতেই পারছেন, পিতৃদত্ত নাম নয়, পাড়াদত্ত। এবং নাম থেকেই বুঝতে পারছেন, এরা দুজন ডুক ব্যারন নন—খাঁটি ওয়াকিং কেলাস। খায়দায়, ফুতিফাতি করে, ফোকটে দু পয়সা মারার তালে থাকে, কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ আর বিয়ার-খানায় আড্ডা জমাতে পারলে এরা আর কিছু চায় না।

‘একদিন হয়েছে কি, টুনিয়ুস-শেল রাস্তায় একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে—তা ওরা হামেশাই ওরকমধারা রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়, না হলে গল্পই বা জমবে কি করে?’

‘টুনিয়ুস বললে, “চ, শেল; এই দিয়ে উত্তমরূপে আহারা দি করা যাক।” দুজন দু’কল গিয়ে এক রেস্তোরাঁর আর অর্ডার দিলে দু’খানা কটলেটের।

‘ওয়েটার এসে ছুরিকাটা আর দু’খানা স্লেট মাজিয়ে দিয়ে আনল একখানা বড় ডিশ বরে দু’খানা কটলেট।’

নয়রাট বললেন, ‘কটলেট তো আর অ্যারোলেনের স্ক্রু নয় যে ফিতে দিয়ে মেপেজুপে কিংবা ছাঁচে ঢেলে, ঠিক একই সাইজে বানানো হবে, কাজেই একখানা কটলেটে আরেকখানার চেয়ে সামান্য একটু বড় হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?’

‘টুনিয়ুস তাই ঝগ করে বড় কটলেটখানা আপন স্লেটে তুলে নিল। শেল চুপ করে দেখল। তারপর আশ্চে আশ্চে ছোট কটলেটখানা তুলে নিয়ে টুনিয়ুসকে বললে, “টুনিয়ুস, তুই আদব-কায়দা একদম জানিস নে।”—যেন নিজে সে মহা খানদানী ঘরের ছেলে।

‘টুনিয়ুস শুধালে, “কেন, কি হয়েছে?”

‘শেল বললে, “ভদ্রতা হচ্ছে, যে ডিশ থেকে প্রথম খাবার তুলবে, সে নেবে ছোট টুকরোটা।”

‘টুনিয়ুস বললে, “অ। আচ্ছা, তুই যদি প্রথম নিতিস তবে তুই কি করতিস?”

‘শেল দম্ভ করে বলল, “নিশ্চয়ই ছোট কটলেটটা তুলতুম।”

‘তখন টুনিয়ুস বললে, “সেইটেই তো পেয়েছি, তবে ভ্যাচর ভ্যাচর করছি কেন?”

নয়রাট গল্প শেষ করে খানাতে মন দিলেন।

বলতে পারব না, আমার পাঠকদের গল্পটা কি রকম লাগল—আমার কিন্তু উত্তম মনে হল, তাই প্রাণভরে খানিকক্ষণ হেসে নিলুম।

নয়রাট বললেন, ‘তাই যখন কেউ এটিকেট নিয়ে বড্ড বেশি কপচাতে

শুরু করে তখনই আমার এই গল্পটা মনে পড়ে আর হাসি পায়। আরে বাবা, সংসারে থাকবি মাত্র দু'দিন। তার ভিতর কত হাস্যগামা, কত হৃৎজত। সেই সব সামলাতে গিয়েই প্রাণটা খাবি খায়। তার উপর যদি এটিকেটের নাগপাশ দিয়ে সবাক্স আর নবশ্বার বেঁধে দাও (ফ্লান্‌সিস্‌স্কার আপত্তি শোনা গেল, “পেটার, আবার অশ্লীল কথা!”) তবে দম ফেলবে কি করে? হাঁচবার এটিকেট, কাশবার এটিকেট থুথু ফেলার এটিকেট, গা চুলকাবার এটিকেট—প্রাণটা যায় আর কি।’

আমি সায় দিলুম।

তখন নয়রাট শূন্যালে, ‘বলুন তো, কি সে জিনিস যা চাষা অনাদরে, তাচ্ছিল্যে, এমন কি বলতে পারেন, ঘেম্মাভরে রাস্তায় ফেলে দেয়, আর ভদ্রলোক সেটাকে ধোপদুরন্ত দামমী রুম্মালে ঢেকে, পকেটে পুরে অতি সন্তপণে বাঁড় নিয়ে আসেন?’

আমি খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, ‘তা তো জানি নে।’

বললেন, ‘সিকনি। চাষা ফাঁত করে রাস্তায় নাক ঝেড়ে ওদিকে আর তাকান না, ভদ্রলোক রুম্মাল খুলে ছিঁক করে তারই উপর একটুখানি নাক ঝেড়ে সেটিকে সময়ে ভাঁজ করে, পকেটে পুরে বাঁড় ফেরেন।’

ফ্লান্‌সিস্‌কা হঠাৎ বললেন, ‘পেটার, তুমি তো বকবক করে এটিকেটের নিশ্চাই করে যাচ্ছ, ওদিকে একদম ভুলে গিয়েছ, ভদ্রলোক প্রাচ্যদেশীয়, সেখানে এটিকেটের অস্ত নেই; এদেশে তো প্রবাদই রয়েছে, ওরিয়েন্টাল্ কাট’স’। যে আচার ওঁদের প্রিয় তুমি তাই নিয়ে মশ্কারার পর মশ্কারা করে যাচ্ছ।’

পেটার বললেন, ‘আদপেই না। আমি তো ভদ্রতার (ম্যানাস’) নিষেধ করছি, আমি করছি এটিকেটের। দুটো তো এক জিনিস নয়।’

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনাদের দেশে ব্যবস্থাটা কি রকম?’

আমি বললুম, ‘অনেকটা আপনাদের দেশেরই মতো। অর্থাৎ, ভদ্রতারক্ষার চেষ্টা আমরাও করে থাকি তবে এটিকেটের বাড়াবাড়ি দেখলে তাই নিয়ে আপনার-ই মতো টীকাটিপনই কেটে থাকি। তবে কি না ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—তার নানা প্রদেশে নানা রকমের এটিকেট। এই ধরুন লক্ষ্মী। সেখানে কোনো খানদানী বাঁড়িতে নিমগ্নে খেতে হলে বাঁড়িতে উত্তমরূপে আহারাদি সেয়ে যেতে হয়। কারণ, খানার মজলসে গল্প উঠবে, কোন মৌলানা দিনে আড়াই তোলা খেতেন, কোন সাহেব-জাদা দুই তোলা, কোন পীর-জাদা এক তোলা আর কোন নওয়াব একদম খেতেনই না। অথচ সংস্কৃত আশুবাক্য এ বিষয়ে যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা এ এটিকেট আদপেই মানতেন না।’

কর্তা-গিম্মী উভয়েই শূন্যালে, ‘আশু-বাক্য কি?’

আমি বললুম,—

‘পরাম্ণ প্রাপ্য দুর্বুদ্ধে, মা প্রাণেশু দয়াং কুরু।

পরাম্ণ দুর্লভং লোকে প্রাণাঃ জন্মানি জন্মানি ॥

অর্থাৎ,—

ওরে মূর্খ, নেমতন্ন পেয়েছিস, ভালো করে খেয়ে নে। প্রাণের মাল্লা

করিস নি, কারণ ভেবে দেখ, নেমস্তন্ন কেউ বড় একটা করে না। বেশি খেয়ে যদি মরে যাস তাতেই বা কি—প্রাণ তো ভগবান প্রতি জন্মে ফি দেয়, তার জন্য তো আর খর্চা হয় না।’

*

*

*

আমি বললুম, ‘চমৎকার রান্না হয়েছে’—রান্না সত্যি মামুলী রান্নার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছিল, পোশাকী রান্না বললেও অত্যাঁজি হয় না। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, ‘রুশ কায়দায় মাছ কি করে রাঁধতে হয়?’

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, ‘আপনার বুঝি রান্নার শখ?’

আমি বললুম, ‘না; তবে আমার মা খুব ভালো রাঁধতে পারেন আর নতুন নতুন দিশী-বিদেশী পদ শেখাতে তাঁর ভারি আগ্রহ। আমি প্রতিবার দেশ-বিদেশ ঘুরে যখন বাড়ি ফিরি তখন সবাই আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানা রকম গল্প শোনে, মাও শোনে, কিন্তু বলার প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর তিনি আমাকে একলা-একলি শুধান, নতুন রান্না কি কি খেলুম। আমি ভালো ভালো পদগুলোর নাম করলে পর মা শুধাতেন ওগুলো কি করে রাঁধতে হয়। গোড়ার দিকে রন্ধনপদ্ধতি খেয়াল করে শিখে আসতুম না বলে মাকে কট করে একস্পেরিমেণ্ট করে করে শেষটায় পদটা তৈরী করার পদ্ধতি বের করতে হত। এখন তাই মোটামুটি পদ্ধতিটা লিখে নিই; মাকে বলা মাত্রই দুই ট্রায়ালের পরই ঠিক জিনিস তৈরী করে দেন।’

ফ্রান্ৎসিস্কা আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘বলেন কি?’

বললুম, ‘হ্যাঁ, আশ্চর্য হবারই কথা। আমিও একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি কোনো পদ না দেখে না চেখে তৈরী করেন কি করে? মা বলেছিলেন,—এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে—“আরে বাপু, রান্না মানে তো, হয় সন্ধ করা, নয় তেল-ঘিমে ভাজা, কিংবা শুকনো শুকনো ভাজা অথবা শিকে ঝলসে নেওয়া। এরই একটা, দুটো কিংবা তিনটে কায়দা চালালেই পদ ঠিক উতরে আসবে। আর তুইও তো বলেছিস আমাদের দেশের বাইরে এমন কোনো মশলা জন্মায় না যা এদেশে নেই। তা হলে তুই যা বিদেশে খেয়েছিস আমি তৈরী করতে পারব না কেন?”

তারপর বললুম, ‘অবশ্য মা আমাকে কখনো এস্পেরেগাস্ কিংবা আর্টিচোক খাওয়ান নি কারণ ওগুলো আমাদের দেশে গজায় না। তাই নিজে মায়েরও কোনো খেদ নেই—কারণ যে সব শাক-সব্জী আমাদের দেশে একদম হয় না সেগুলোর কথা আমি মায়ের সামনে একদম চেপে যেতুম।’

ফ্রান্ৎসিস্কা বুদ্ধিমতী মেয়ে বললেন, ‘ওঃ, পাছে তাঁর দুঃখ থেকে যায়, তিনি তাঁর ছেলের সব প্রিয় খাদ্য খাওয়াতে পারলেন না।’

আমি বললুম, ‘হ্যাঁ। কিন্তু তিনি যে তরো-বেতরো রান্না শেখার জন্য উঠপড়ে লেগে যেতেন তার আরো একটা কারণ রয়েছে। রান্না হচ্ছে পুরো-দস্তুর আর্ট। আর আমার মা—’

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, ‘থামলেন কেন?’

আমি লজ্জার সঙ্গে বললুম, ‘নিজের মায়ের কথা সত্যি হলেও বলতে গেলে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে। আপনারা হয়তো ভাববেন ফুলিয়ে বলছি।’

নয়রাট এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, এখন হৃৎকার দিয়ে বললেন, ‘বাস ! হয়েছে। আপনাকে আর এটিকেট দেখাতে হবে না। ফ্রান্সিস্কা আপনাকে বলে নি, এ বাড়িতে এটিকেট বারণ?’

ফ্রান্সিস্কা তাড়াতাড়ি বললেন, ‘ছিঃ, পেটার, তুমি ওরকম কড়া কথা কও কেন?’

আমি সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বললুম, ‘আদপেই না। ওঁর ধমক থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আপনারা সরল প্রকৃতির লোক, আপনাদের সামনে সব কিছু অনায়াসে খুলে বলা যায়। তা হলে শুনুন, যা বলেছিলাম, রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট বিশেষ আর আমার মা খাঁটি আর্টিস্ট। ঠিক আর্ট ফর আর্টস সেক নয়, অর্থাৎ তিনি মনের আনন্দে খুদ-খুদশীর জন্য রেঁধেই যাচ্ছেন, কেউ খাচ্ছে না, কিংবা খেয়েও কেউ ভালোমন্দ কিছু বলছে না— তা নয়। তিনি রান্নার নতুন নতুন টেকনিক্ শিখতে ভালোবাসতেন সত্যকার আর্টিস্ট যে রকম নতুন নতুন টেকনিক্ শিখতে ভালোবাসে। আপনি ভালো প্যাস্টেলপেইন্টিং করতে পারেন, কিন্তু অয়েলপেইন্টিং দেখে কিংবা তার কথা শুনে আপনারও কি ইচ্ছে হবে না সেই টেকনিক্ রপ্ত করার? কিংবা আপনি উড্‌কাট করেন—যদি লাইন এন্‌গ্রেভিং, এঁচিং, মেদজোটিং, আকওয়াটিংয়ের খবর পান, তবে সেগুলোও আয়ত্ত করার বাসনা আপনার হবে না?’

‘অথচ দেখুন খাঁটি আর্টিস্ট অজানা জিনিস আয়ত্ত করার জন্য যত উদ্গ্রীবই হোক না কেন, হাতের কাছের সামান্যতম মালমশলাও সে অবহেলা করে না—নানা রঙের মাটি, শাক-সব্জী থেকেও নতুন রঙ আহরণ করার চেষ্টা করে।

‘ভারতবর্ষের যে প্রান্তে আমার দেশ, সেখানে সব সময় জাফরান পাওয়া যায় না। তাই মা তারই একটা “এরজাৎস” সব সময়ে হাতের কাছে রাখেন। বুদ্ধি দিয়ে বলছি—

‘আমাদের দেশে এক রকম ফুল হয় তার নাম শিউলি। শিউলির বোটা সুন্দর কমলা রঙের আর পাপড়ী শাদা। ফুল বাসি হয়ে গেলে মা সেই বোটাগুলো রোস্‌দুরে শুকিয়ে বোতলে ভরে রাখেন। সেই শুকনো বোটা গরম জলে ছেড়ে দিলে চমৎকার সুগন্ধ আর কমলা রঙ বেরয়। মেয়েরা সাধারণত ঐ রঙ দিয়ে শাড়ি ছোপায়। মা খুব সরু চালের ভাত ঐ রঙে ছুঁপিয়ে নিয়ে চিনি, কিসমিস, বাদাম দিয়ে ভারি সুন্দর ‘মিঠাখানা’ তৈরী করেন।

‘এটা মায়ের আবিষ্কার নয়। কিন্তু তবু যে বললুম, তার কারণ প্রকৃত গুণী কলাসৃষ্টির জন্য দেশী-বিদেশী কোনো উপকরণ অবহেলা করেন না।’

নয়রাটদের বাড়িতে এটিকেট বারণ, তবু আপন মায়ের কথা একসঙ্গে এতখানি বলে ফেলে কেমন যেন লজ্জা পেলুম।

রুশ কবি পুশ্চিকিনের রচিত একটি কবিতার সারমর্ম এই,—

‘হে ভগবান, আমার প্রতিবেশীর যদি ধনজনের অশ্রু না থাকে, তার গোলাঘর যদি বারো মাস ভর্তি থাকে, তার সদাশয় সচ্চরিত্র ছেলেমেয়ে যদি বাড়ি আলো করে রয়, তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি যদি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তবে তাতে আমার কণামাত্র লোভ নেই; কিন্তু তার দাসীটি যদি সুন্দরী হয় তবে—তবে, হে ভগবান, আমাকে মাপ করো, সে অবস্থায় আমার চিত্র-চাঞ্চল্য হয়।’

পুশ্চিকিন সুশিক্ষিত, সুপুরুষ এবং খানদানী ঘরের ছেলে ছিলেন, কাজেই তাঁর ‘চিত্তদৌর্বল্য’ কি প্রকারের হতে পারত সেকথা বদ্ব্যবহারে বিশেষ অসুবিধে হয় না। এইবারে সবাই চোখ বন্ধ করে ভেবে নিন কোন্ জিনিসের প্রতি কার দুর্বলতা আছে।

আমি নিজে বলতে পারি, সাততলা বাড়ি, টাউস মোটরগাড়ি, সাহিত্যিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এ সবের প্রতি আমার কণামাত্র লোভ নেই। আমার লোভ মাত্র একটি জিনিসের প্রতি—অবসর। যখনই দেখি, লোকটার দু’পয়সা আছে অর্থাৎ পেটের দায়ে তাকে দিনের বেশির ভাগ সময় এবং সব প্রকারের শক্তি এবং ক্ষমতা বিক্রী করে দিতে হচ্ছে না, তখন তাকে আমি হিংসে করি। এখানে আমি বিলাসবাসনের কথা ভাবছি নে, পেটের ভাত ‘—’র’ কাপড় হলেই হল।

‘অবসর বলতে আমি কুঁড়েমির কথাও ভাবছি নে। আমার মনে হয়, প্রকৃত ভদ্রজন অবসর পেলে আপন শক্তির সত্য বিকাশ করার সুযোগ পায় এবং তাতে করে সমাজের কল্যাণলাভ হয়। এই ধরুন, আমার বন্ধু শ্রীক’ দাশগুপ্ত। বাদ্যর ছেলে—পেটে অসীম এলেক, তুখোড় ছোকরা, তালেবর ব্যক্তি। সদাগরী আপিসে কর্ম করে, বড় সাহেবকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়—মোটো তন্থা ভী পায়।

বয়স তার এখনো তিরিশ পেরায় নি। পার্টিশনের পর মারোয়াড়ী কারবারীরা যখন তার ‘বস্’কে ঘায়েল করে ব্যবসা কেনবার জন্য উঠেপড়ে লাগল, তখন আমার এই বাদ্যর ব্যাটা সায়েবকে এমন সব ‘কৌশল’ বাতলালে যে উল্টে ওনারা চোখের জলে নাকের জলে।

সায়েবও বড় নেমকহালাল’ লোক। প্রায়ই ‘হ্যালো, ড্যাস্-গুপ্‌টা’, বলে বাড়িতে ঢোকেন, ‘লৌচি’ (লুচি) খেয়ে যান, ড্যাস্-গুপ্‌টার ছেলেদের জন্য পুজার বাজারে দু’চারখানা ‘ডোটি’ (ধুতি) ও রেখে যান। আমি বরাবর

১ শব্দটা গ্রাম্য; কিন্তু পুজুর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে শব্দটিকে অবহেলা করেন নি বলে আমি ড্যাস দিয়ে সারলুম। তিনি গুরুজন—তাঁর শাস্ত্রাধিকার আছে।

২ ‘নেমকহারাম’ অর্থাৎ ‘অকৃতজ্ঞ’, সম্যকটা বাংলায় চলে। ‘নেমকহালাল’ ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ ‘কৃতজ্ঞ’। ‘নেমকহারাম’ ‘নেমকহালাল’ কথাগুলো কিন্তু ‘কৃতজ্ঞ’ ‘অকৃতজ্ঞ’র চেয়ে জোরদার। ‘নেমক’=‘নুন’—তার ‘অপমান’ (হারাম) কিম্বা ‘সম্মান’ (হালাল)।

সকালটা দাশগুপ্তের বাড়িতে কাটাই, তাই সায়েবের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোলাকাত হয়ে যায়। লোকটি এদেশে-আসা সাধারণ ইংরেজের মত গাড়ল নয়, ইংরিজি শোলোক খাসা কপচাতে পারে, অর্থাৎ মন্মথকণ্ঠে উচ্চস্বরে শেলি-কীটস্ আবৃত্তি করতে পারে।

সায়েবের কথা উপস্থিত থাক। দাশগুপ্তের কথায় ফিরে যাই।

আমি জানি দাশগুপ্ত কোনো চেম্বার অব্ কমার্সের বড়কর্তা হবার জন্য লালায়িত নয়। দেড় হাজার টাকার মাইনেকেও সে থোড়াই কেন্সার করে।

আমি জানি, আজ যদি তাকে কেউ পাঁচশ টাকা প্রতি মাসে দেয়, তবে সে কলকাতা শহরের হেথা-হোথা সর্বত্র দশখানা নাইট স্কুল খুলবে। এখন সে আপিসে দিনে সাত ঘণ্টা কাটায়—নাইট স্কুল খোলবার মোকা পেলে সে পরমানন্দে দিনে চোদ্দ ঘণ্টা সেগুলোর তদারকিতে, ক্লাস নেওয়াতে কাটাবে। বিশ্বাস করবেন না, সে তার উড়ে চাকরটাকে স্বাক্ষর করার জন্য উড়ে কায়দাম্ বর্ণমালা পর্যন্ত শিখিয়েছে—চোখ বন্ধ করে মাথা দুলিয়ে দিব্য বলে যায়,—

‘ক’ রে কমললোচন শ্রীহরি।

করেন শঙ্খ-চক্রধারী ॥

‘খ’ রে খগ-আসনে খগপতি।

খটবিত লক্ষ্মী-সরস্বতী ॥

‘গ’ রে গরুড়—ইত্যাদি—

(আমার সহৃদয় উড়িষ্যাবাসী পাঠকবৃন্দ যেন কোনো অপরাধ না নেন— যদি নামতাতে কোনো ভুল থেকে যায়; আমি দাশগুপ্তের মুখে মাত্র দু’তিনবার শুনেছি; কেউ যদি আমাকে পুরো পাঠটা পাঠিয়ে দেন, তবে বড় উপকৃত হই)।

অর্থাৎ আজ যদি দাশগুপ্তকে পেটের ধান্দায় আপিস না যেতে হয়, তবে সে তার জীবন্মৃত্যুর চরম কাম্য কাজে ফলাতে পারবে। কে ক’লক্ষ মণ পাট কিনল, কে ধান্দা এবং ঘৃষ দিয়ে ক’খানা ওয়াগন বাগালে তাতে দাশগুপ্তের কোনো প্রকারের চিন্তদৌর্বল্যও (হেথাকার ভাষায় ‘দিল্ চস্পী’) নেই। দেড় হাজার টাকার মাইনে কমে গিয়ে পাঁচশ’ হলে সে দুম করে মোটরখানা বিক্রী করে দিয়ে ষ্ট্রামে চড়ে ইন্সকুলগুলোর তদারক করবে।

আপনি বিচক্ষণ লোক, আপনি শ্রদ্ধাবেন, এ পাগলামি কেন?

এটা পাগলামি নয়।

আসলে দাশগুপ্ত ইন্সকুল মেস্টার। তার বাবা টোলে আয়ুর্বেদ শেখাতেন, তার ঠাকুরদাও তাই, তাঁর বাপও তাই, তাঁর উপরের খবর জানি নে।

এবং আমার সুহৃদ যে ক’ী অশুভ ইন্সকুল-মেস্টার সে কথা কি করে বোঝাই? চাকরির কামেলার মাধ্যমানেও সে একটা নাইট ইন্সকুল চালায়।

একদিন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দেখি, সে তার ইন্সকুলে ইংরেজী পড়াচ্ছে। চেঁচিয়ে বলছে, ‘আই গো!’

ছোঁড়ারা তীব্রকণ্ঠে ঐক্যস্বরে বলছে, ‘আই গো!’

‘উই গো!’

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (১ম)—১৯

‘উই গো !’
 ‘ইউ গো !’
 ‘ইউ গো !’
 ‘হী গোজ !’
 ‘হী গোজ !’
 ‘রাম গোজ !’
 ‘রাম গোজ !’
 ‘শ্যাম গোজ !’
 ‘শ্যাম গোজ !’

দাশগুপ্ত সম্প্রদায়-পোড়ার মত বলে যাচ্ছে আর ছোঁড়ারা চীৎকার করে দোহার গাইছে।

সর্বশেষে দাশগুপ্ত লাফ দিয়ে উচ্চতম কণ্ঠে চেঁচাল, ‘রাম অ্যান্ড শ্যাম গো গো গো !’

দাশগুপ্তের স্বপ্ন কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। এমন দিন কখনো আসবে না যে, সে পেটের চিন্তার ফৈসালা করে নিয়ে তামাম শহর নাইট স্কুলে নাইট স্কুলে ছয়লাপ করে দিতে পারে।

দাশগুপ্তের কথা যাক। আমি তার উল্লেখ করলুম নয়রাট-জীবনীটা তুলনা দিয়ে খোলসা করার জন্য।

ইয়োরোপে এ জিনিসটা হামেশাই হচ্ছে।

নয়রাট মেট্রিক পাস করেন ১৮ বছর বয়সে, সাংসারে ঢোকে ১৯ বছর বয়সে। তারপর ঝাড়া ছাব্বিশটি বছর বাবসা-বাণিজ্য করে পরিত্যক্ত বছর বয়সে দেখেন এতখানি পর্দাজ জমেছে যে, বাকী জীবন তাঁকে আর সংসার-খরচের জন্য ভাবতে হবে না।

নয়রাটের ভাষাতেই বলি,

‘টাকা জমানোর নেশা আমাকে কখনো পায় নি। আমি জানি এ দুনিয়ার বহু লোকই আমার ধারণা নিয়ে সংসারে ঢোকে কিন্তু বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত ধর্মচ্যুত হয়। জীবনে আমার কতকগুলো শখ ছিল—কিন্তু হিসেব করে দেখলুম, সেগুলো বাগে আনতে হলে পেটের একটা ফৈসালা পয়লাই করে নিতে হবে। তাই খাটলুম ছাব্বিশ বছর ধরে একটানা। আমার অসুখ-বিসুখ করে না, আমি একদিনের তরে কাজে কামাই দিই নি—ঐশ্বর্য বিয়ের সময় যে সাতদিন হিন্দু কাটাই বাধ্য হয়ে তারই জন্য ছুটি নিতে হয়েছিল।’

ফ্রান্সিস্কা বললেন, ‘তা ছুটি নিয়েছিল কেন? আমি বলি নি, তোমার আপিসঘরে, কিম্বা সেখানে জায়গা না হলে তোমার গৃহদোমঘরে পান্ডা ডেকে মশ পড়লেই হবে।’

নয়রাট বললেন, ‘অন্য মতলব ছিল, ডার্লিং, তোমাকে তো আর সব কিছু খুলে বলি নি।’

ফ্রান্সিস্কা বললেন, ‘বটে।’

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনাকে খুলে কই।’

‘বিয়ে করেই বউকে নিয়ে চলে গেলুম এক অজ্ঞ পাড়াগায়ে। সে গাঁটা খুঁজে বের করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল এবং সে গাঁ থেকেও আশ মাইল দূরে একটি ‘শালে’ ভাড়া নিলুম সাতদিনের জন্য। সেখানে ইলেকট্রির আছে—বাস্ আর কিছ্ না। জলের কল না, খবরের কাগজ না, দুখণ্ডালা দুখ পর্যন্ত দিয়ে যায় না।

‘রাতিরের ডিনার খেয়েই আমরা সে বাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

ফ্রান্ৎসিস্কা বাড়িতে ঢুকেই সোহাগ করে বললে—’

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, ‘চোপ্।’

নয়রাট বললেন, ‘আচ্ছা, আচ্ছা, চোপ্।’ তারপর আমাকে বললেন, ‘আচ্ছা, তাহলে কমিয়ে-সমিয়ে বলছি—বাদবাকিটা পরে আপনাকে একলাএকাল বলব।’

‘ভোর তিনটের সময় আমি চুপসে খাট ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে নামলুম নিচের তলায়। পিছনের বাগানে গিয়ে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে গেলুম রান্নাঘরে। সেখানে নাকে-মুখে বিস্তর ধুয়ে গিলে ধরালুম উনুন। তারপর বেকন ফ্রাই করে, গরম কফি, টোস্ট ইত্যাদি বানিয়ে যাবতীয় বস্তু একখানা বিরাট খুণ্ডাতে সাজিয়ে গেলুম উপরের তলায় ফ্রান্ৎসিস্কার বিছানার কাছে। আশ্চে আশ্চে জাগিয়ে বললুম, “ব্রেকফাস্ট তৈরী।”

‘ফ্রান্ৎসিস্কা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে (আবার “চোপ” এবং “আচ্ছা, আচ্ছা, চোপ্” শোনা গেল), ডালিং তুমি আমাকে কত না ভালোবাসো—এই ভোরে এই শীতে আমাকে কিছ্ না বলে তুমি এত সব করেছ।’

‘আমি বললুম, “ডালিং না কচ্ছ, ভালোবাসা না হাতি। আমি এসব তৈরি করে আনলুম শুধু তোমাকে দেখাবার জন্য যে, বাদবাকি জীবন তোমাকে এই রকম ধারা করতে হবে। আর আমি শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খাবো।”

আমি প্রাণ খুলে হাসলুম।

দেখি নয়রাটও মিটমিটিয়ে হাসছেন। ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, ‘আপনি এই তাড়িখানার বেহুদা প্রলাপটা বিশ্বাস করলেন?’

আমি বললুম, ‘কেন করব না? শাদীর পয়লা রাতে শুধু ইরানেই নয়, আরো মেলা দেশে মেলা বর বেড়াল মেরেছে, এ তো আর নতুন কথা কিছ্ নয়। এবারে সুইস সংস্করণটি শেখা হল এই যা।

দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, ‘সে আবার কি?’

আমাকে বাধ্য হয়ে শাদীর পয়লা রাতে রেড়াল-মারার গল্পটা বলতে হল, কিন্তু নয়রাটের মত জমাতে পারলুম না—রাসিয়ে গল্প বলা আমার আসে না, সে আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন।

দুজনেই স্বীকার করলেন, ইরানী গল্পটাই ভালো।

তখন ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, ‘পেটারের বকুনিতে অনেকগুলো ভুল রয়েছে। প্রথমত আমরা হনিমুন যে বাড়িতে কাটাই, সেখানে গ্যাস ছিল, উনুন ধরাবার কথাই ওঠে না, দ্বিতীয়ত পেটার কক্খনো ব্রেকফাস্ট খায় না এবং সর্বশেষ

বক্তব্য, ষে-ব্রেকফাস্টের বর্ণনা সে দিল সেটা ইংলিশ ব্রেকফাস্ট। কোনো কন্টিনেন্টাল শূয়ারের মতো ব্রেকফাস্টের সময় একগাদা বেকন আর আশা গোলে না। পেটার গল্পটা শুনেছে নিশ্চয়ই কোনো ইংরেজের কাছ থেকে, আর সেটা পাচার করে দিলে আপনার উপর দিয়ে।

পেটার বললেন, ‘রেমব্রান্ট একবার এক ভদ্রলোকের মান্নের পট্রেট এঁকেছিলেন। ভদ্রলোক ছবি দেখে বললেন, তাঁর মান্নের সঙ্গে মিলছে না। রেমব্রান্ট বললেন, “একশ বছর পর আপনার মান্নের সঙ্গে কেউ এ ছবি মিলিয়ে দেখবে না—তারা দেখবে ছবিখানি উতবেছে কিনা।”’

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘গল্পটি ভালো কি না, সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। ঘটেছিল কি না, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অব্যবহৃত; আপনি কি বলেন?’

আমি বললুম, ‘সুন্দর-ই সত্য—না ঘটলেও ঘটা উচিত ছিল।’

ফ্রানৎসিস্কা বললেন, ‘বটে!’

নয়রাত বললেন, ‘আমার শখ ছিল দাবা-খেলাতে এবং সে ব্যসনে মেতে আমার কত সময়-সামর্থ্য বরবাদ গিয়েছে তার হিসেব-নিকেশ আমি কখনো করি নি। দাবা-খেলা আমি আরম্ভ করি সাত বছর বয়সে। আমার বাবা কাকা দুজনেই পাঁড় দাবাড়ে ছিলেন আর কাকা রোজ রাত্তিরে বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। এক রাতে আসতে পারলেন না জোর বরফের ঝড় বইছিল ব’লে, আর ওদিকে বাবা তো মৌতাতের সময় হনো হয়ে উঠলেন। আমি থাকতে না পেরে বললুম, “তা আমার সঙ্গেই খেলো না কেন?” বাবা তো প্রথমটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু জানেন তো দাবার নেশা কী নিদারুণ জিনিস—বরষ মদের মাতাল খুনীর সঙ্গে এক টেবিলে মদ খেতে রাজী হবে না, দাবার মাতাল তার সঙ্গে খেলতে কণামাত্রও আপত্তি জানাবে না। বাবা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে খেলতে বসলেন, প্রথম দু’বাজি জিতলেনও কিন্তু তৃতীয় বাজি হল চালমাত এবং তারপর তিনি আর কখনো জেতেন নি। তবে তাঁর হল বড়ো হাড়, এখনো খুব শক্ত শক্ত চালের চমৎকার চমৎকার উত্তর বাতলে দিতে পারেন।’

আমার আশ্চর্য লাগল, কারণ শরৎ চাটুজ্জেও কৈলাস খুড়োর বর্ণনাতেও ঐ কথাই বলেছেন; খুড়োর শেষ বয়সে আটপোরে খেলা ভুলে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য খেলোয়াড়রা তাঁর কাছে যেত। সে কথাটা নয়রাতকে বলতে তিনি বলেন, ‘অতিশয় হক্ কথা। পৃথিবীতে মেলা ধর্ম আছে—তাই ক্রীস্টান, জু এবং দাবাড়ে। দাবাখেলা ধর্মের পর্যায়ে পড়ে, আর যারাই এ ধর্ম মানে তারা সব-ভাই-সব-ভ্রাতার। দাবাড়েদের “পেনফ্রেড” পৃথিবীর সর্বত্র যে রকম ছড়ানো তার সঙ্গে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না।’

তারপর বললেন, ‘সেই যে বাবা দাবা ধরিয়ে দিলেন তারপর ওর হাত থেকে আমি আর রেহাই পাই নি। একবার এক পাঁড় মাতালকে বলতে শুনছিলাম, সে নাকি জীবনে মাত্র একবার মদ খেয়েছে। আমরা সবাই আসমান থেকে পড়লুম, উল্লুকটা বলে কি—উদয়াক্ষ যে লোকটা “ট্যানিসে”র উপর থাকে, সে কি না জীবনে কুল্পে একটবার মদ খেয়েছে! বেহেড মাতাল এরেই কয়।

তখন মাতাল বললে সে মদ খেয়েছে একবারই—তারপর থেকে এ অবশিষ্ট শব্দ তার খোঁসারিই ভাঙছে।’

আমি বললাম, ‘ওমর খৈল্লাম এ বাবদে যা নিবেদন করেছেন সেটা ঠিক হুবহু এর সঙ্গে খাপ খায় না, তবু অনেকটা এরই কান ঘেঁষে। খৈল্লাম বলেছেন, “রোজার পরলা রান্তিরে অ্যায়সা পীনা পীউংগা যে তারই নেশার বেহুশীতে কেটে যাবে রোজার ঝাড়া পুরো মাসটা। হুশ হবে ঈদের দিন। ঈদ মানে পরব (পরব par excellence), পরব মানতে হয়, না হলে জ্ঞাত যাবে, ধর্ম যাবে, তাই তখন ফের বসে যাব সুরাহী পেয়ালা প্রিন্সা নিয়ে।” তারপর খৈল্লাম কি করেছিলেন সে হাদিস তাঁর রুবাইতে মেলে না, তবে বিবেচনা করি, দূসরা রমজান তক্ তিনি তাঁর কান্দা-কানুনে কোনো রদবদল করেন নি।’

ফ্রান্ৎসিস্কা এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এখন বললেন, ‘আমি তো এ রুবাই ফির্টজিরাণ্ডে পাই নি। আপনি কি ফার্সীতে পড়েছেন?’

আমি বললাম, ‘ফির্টজিরাণ্ড তো তর্জমা করেছেন মাত্র বাহাতুর না বিরাসীটি রুবাইয়াৎ। ওমরের নামে প্রচলিত আছে আট শ’ না এক হাজার, আমি ঠিক জানি নে। তবে এ রুবাইটি আপনি নিশ্চয়ই হুইনসফিল্ড কিংবা নিকোলার অনুবাদে পাবেন। এঁরা ওমরের প্রায় কোনো রুবাই-ই বাদ দেন নি।’

ফ্রান্ৎসিস্কা শুধালেন, ‘আপনি যে বললেন, “ওমরের নামে প্রচলিত রুবাইয়াৎ” তার অর্থ কি? আপনি কি বলতে চান, এগুলো ওমরের রচনা নয়?’

আমি বললাম, ‘গুণীদের মুখে শুনেছি, ওমরের বেশির ভাগ রুবাইয়াতের মূল বক্তব্য ছিল, “এই বিরাট বিশ্ব-সংসার কোন নিয়মে চলে, কি করলে ঠিক কর্ম করা হয় এসব বোঝা তোমার আমার সাধ্যের বাইরে। অতএব যে দু’দিন এ সংসারে আছ সে দু’দিন ফুর্তি করে নাও; মরার পর কে কোথায় যাবে, কি হবে, না হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।” তারপর থেকে অন্য যে কোনো কবি এই মতবাদ প্রচার করে নতুন রুবাই লিখতেন তিনি তক্ষুনি সেটা ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। তার কারণও সরল। ওমর রাজানুগ্রহ পেয়েছিলেন, প্রধান মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলুকও ছিলেন তাঁর ক্লাসফ্রেণ্ড। তাই তিনি নিভয়ে ইসলাম-বিরোধী এই চার্বাকী মতবাদ প্রচার করে যেতে পেরেছিলেন; কিন্তু পরের আমলে আর সব কবির সৌভাগ্য তো হয় নি—তাঁরা মোল্লাদের বিলক্ষণ ভরাতেন। তাই তাঁরা তাঁদের বিদ্রোহী মতবাদ ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপন প্রাণ বাঁচাতেন—ওঁদিকে যা বলবার তাও প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে যেতেন।

‘তাই দেখতে পাবেন, হাফিজের (এবং অন্য আরও কয়েক কবির) দিওয়ানে (তোথাকথিত ‘কম্পলিট ওয়ার্কসে’) ওমরের কবিতা, আবার ওমরের দিওয়ানে হাফিজের কবিতা। এ জট ছাড়িয়ে ওমরের কোনগ্দুলো, হাফিজের কোনগ্দুলো সে বের করা আজকের দিনে অসম্ভব।’

নয়রাট বললেন, ‘আপনাদের ওমর কোনো কন্সার নয়। তার স্বর্গপদ্রীর

৪ ‘সুফীরা মদ্য ভগবদ্-প্রেম’ অর্থে ব্যাখ্যা করেন।

৫ ‘রুবাই’ একবচন, ‘রুবাইয়াৎ’ বহুবচন।

বর্ণনাতে তিনি বলেছেন,

“সেই নিরীশা পাতাল-ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছন্ন, পেয়ালা হাতে,
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায় ।
মৌন ভাঙ্গি তার কাছেতে
গন্ধুজে তবে মঞ্জু সুদ
সেই তো সখি, স্বৰ্গ আমার,
সেই বনানী স্বৰ্গ পদ ।”

‘অত সব বয়নাকার কী প্রয়োজন !

‘এক দাবাতেই যখন তাবৎ কিস্তি মাত হয় ?’

ফ্রান্সিস্কা শূন্যালে, ‘ওমর সম্বন্ধে নানারকমের আজগুবী গল্প শোনা যায়—আমার মন সেগুলো মানতে রাজী হয় না, কিন্তু সেগুলো মানা না-মানার চেয়েও বড় প্রশ্ন ; খৃদ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে, ইসলামের মত কট্টর ধর্মাবলম্বীদের দেশে তিনি তাঁর বিদ্রোহ জাহির করলেন কোন সাহসে ? বুদ্ধলব্ধ না হয় রাজ্য আর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে রক্ষা করছিলেন কিন্তু সেইটেই তো শেষ কথা নয় । সে যুগে দেশের পাঁচজন কি ভাবতো না ভাবতো তার হয়ত খুব বেশী মূল্য ছিল না কিন্তু মোল্লা সম্প্রদায় ? সে যুগের রাজারাও তো ওদের সঙ্গে চলতেন ।’

আমি বললুম, ‘হ্যাঁ, কিন্তু ভেবে দেখুন তো, রাজ্যে পোপেতে যদি ঝগড়া লাগে তবে শেষ পর্যন্ত কি হয় ? হুকুম চালাবার জন্য রাজারা সৈন্যের উপর নির্ভর করেন । সৈন্যরা যদি রাজার প্রতি সহানুভূতি রাখে তবে তারা হুকুম পাওয়া মাত্রই মোল্লাদের ঠ্যাঙাতে রাজী ; পক্ষান্তরে তারা যদি মোল্লাদের মতবাদে বিশ্বাস রাখে তবে তারা বিদ্রোহ করে, অর্থাৎ রাজাকে ধরে ঠ্যাঙায় ।

‘এ তো হল কমন-সেন্স । তাই এম্বলে প্রশ্ন ইরানের লোক সে আমলে কতখানি ইসলাম-অনুরাগী ছিল ?’

‘ইতিহাস থেকে আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে—কিন্তু থাক, এসব কচকচানি হয়ত হ্যার নয়রাট পছন্দ করছেন না—’

নয়রাট বললেন, ‘ফের এটিকেট ? আর এটিকেট হলই বা—আমি আপনার বক্তব্যটা শুনছি ইন টাম্‌স্ অব্ চেস্ । আপনি এখন ওপনিং গেম্ আরম্ভ করেছেন, তারপর মিড্ গেম্ আসবে—আমি দেখছি আপনি ঘণ্টিগুলো কি কালদায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—যা বলছিলেন বলে যান ।’

আমি বললুম ‘ইরানের সভ্যতা সংস্কৃতি আরবদের চেয়ে বহু শত বৎসরে খানদানী । ইরান ইসলাম প্রচারের বহু পূর্বেই রাজ্য-বিস্তার করতে গিয়ে গ্রীসের সঙ্গে লড়েছে, ভারতের পশ্চিম-সীমান্ত দখল করেছে, মিশরীদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে, রোমানদের বেকাবুদ করেছে, অর্থাৎ রাষ্ট্র হিসেবে ইরান বহু শত বৎসর ধরে পৃথিবীর পয়লা শক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে । পৃথিবীর সম্পদ ইরানে জড়ো হয়েছিল বলে ইরানীরা যে দ্বাপত্য, যে ভাস্কার্শ্ নির্মাণ করেছিল তার সঙ্গে তুলনা

দেবার মতো কলানিদর্শন আজও পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। আর বিলাসব্যসনের কথা যদি তোলেন তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস ইরানীরা যে রকম পণ্ডিতদের পূর্ণতম আনন্দ গ্রহণ করেছে সেরকম ধারা তাদের পূর্বে বা পরে কেউ কখনো করতে পারে নি।

‘এই ধরুন না, আরব্য-উপন্যাস। অথচ বেশির ভাগ গল্পে যে ছবি পাচ্ছেন সেগুলো আরবের নয়, ইরানের—আমার ব্যক্তিগত ‘ফেঁসিস’ মত নয়, পণ্ডিতেরা এ কথাই বলেন।

‘মনে পড়ছে সেই গল্প?—যেখানে এক সুন্দরী তরুণী এসে এক ঝাঁক-মুঠকে নিয়ে চলল হরেক রকমের সওদা করতে। মাছমাংস, ফলমূল কেনার পর সে তরুণী যে সব সুগন্ধি দ্রব্য কিনল তার সব কটা জিনিসের অনুবাদ কি ইংরিজী, কি ফরাসী, কি বাঙলা কোনো ভাষাতেই সম্ভব হয় নি—কারণ, এসব জিনিসের বেশির ভাগই আমাদের অজানা। এমন কি আজকের দিনের আরবরা পর্যন্ত সে-সব বস্তু কি, বুঝিয়ে বলতে পারে না। তুলনা দিয়ে বলছি, আজকের দিনে প্যারিসে যে পাঁচশ’ রকমের সেন্ট বিক্রী হয় সেগুলোর বয়ান, ফিরিস্তি, অনুবাদ কি এসুকিমো ভাষায় সম্ভবে?

‘ইরানের তুলনায় সে-যুগে আরবরা ছিল প্যারিসের তুলনায় অনুন্নত—অর্থাৎ সভ্যতা-সংস্কৃতি নিম্ন পর্যায়ে। সেই আরবরা যখন ধর্মের বাধনে এক-জোট হয়ে ইরানে হানা দিল তখন বিলাস-ব্যসনে ফর্দা-ফাঁততে বেঞ্জেয়ার ইরানীরা লড়াইয়ে হেরে গেল। আপনাদের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে গ্রীস-রোমের কাহিনী বলতে হয়, সে কাহিনী আমার বলার প্রয়োজন নেই। সেটা হবে “সুইটজারল্যান্ড ঘড়ি আনার মত”।

‘ইরানীরা মুসলমান হয়ে গেল, কেন হল সে-কথা আরেকদিন হবে, যারা হতে চাইল না অথচ জানত দেশে থাকলে অর্থনীতির অলম্ব্য নিয়েম একদিন হতেই হবে তারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল আমার দেশ ভারতবর্ষে—সে ইতিহাসও এস্থলে অবাস্তর।

‘আরবরা মরুভূমির সরল, প্রিমিটিভ মানুষ; তারা ইরানের বিলাস-ব্যভিচার দেখে স্তম্ভিত—“শকট্”, “আউট-রেজ্‌ড্”। আবার ইরানীরাও আরবদের বেদুইন ধরন-ধারণ দেখে ততোধিক স্তম্ভিত এবং “শকট্”।

‘তদুপরি আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আরবরা সেমিটি বংশের (ইহুদী গোত্রের সঙ্গে তাদের “মেলে”), আর ইরানীরা আর্য। জীবনাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন; ধর্ম এক হলে কি হয়? প্যারিসের ক্রীস্টান আর নীগ্রো ক্রীস্টান কি একই ব্যক্তি?

‘এইবার মোশদা কথায় ফিরে যাই; ইরানীরা মুসলমান হল বটে (এবং এদের অনেকেই খাটি মুসলিম) কিন্তু তাদের মজাগত মদ্যাদি পণ্যমকার ছাড়তে পারলো না। তাই ইরানের জনসাধারণ গুমরের মদ্য-দর্শনবাদ খুশীসে বরদাশ্ত করে নিল।

‘দেশের লোক যখন গোপনে গোপনে মদ খায় তখন রাজার আর কি ভাবনা? মোল্লারা যা বলে বলুক, যা করে করুক—এবং একথাও রাজার অজানা ছিল না যে, বহু লোক আপন হারমে বসে ঐতিহ্যগত মদ্যপানে কার্পণ্য করেন না।

‘তাই ওমর বেঁচে গেলেন, রাজাও কোনো মর্শ্বিকলে পড়লেন না।’

*

*

*

নয়রাট বললেন, ‘আপনাদের ওমর খৈয়াম যা আমার ট্যুনিস-শেল্ও তা।’

আমি ঠিক বুদ্ধিতে না পেয়ে শুধালুম, ‘ট্যুনিস-শেল্ নিয়ে তো সব রসিকতার গল্প, আর খৈয়াম তো রচেন চতুষ্পদী।’

নয়রাট বললেন, ‘মিলটা অন্য জায়গায়। আপনাই বললেন না, দুনিয়ার যত ঈশ্বর-বিদ্রোহী, মদ্যোৎসাহী চতুষ্পদী—তা সে ওমরের হোক, হাফিজের হোক, আস্তারের হোক, সব কটা এসে জুটেছে ওমরের চতুর্দিকে, ঠিক তেমনি রসিকতার গল্পে নায়ক যদি মাত্র দুজন হয়, আর তার একজন আরেক জনের উপর টেক্স মারার চেষ্টা করে তবে শেষ পর্যন্ত সেগুলো ট্যুনিস-শেলের নামে চালু হবেই হবে। এগুলোকে তাই সাইক্ল (চক্র) বলা হয়। ওমর সাইক্ল, ট্যুনিস-শেল সাইক্ল কিম্বা পল্‌ডি সাইক্ল। ওমর যে-রকম ইরানের, ট্যুনিস-শেল তেমনি জর্মানীর কলোন শহরের আবার পল্‌ডি সুইটজারল্যান্ডের। আপনাদের ভারতবর্ষে এরকম সাইক্ল আছে?’

আমি বললুম, ‘এস্তার! হর-পার্বতী সাইক্ল, গোপালভাড়া সাইক্ল, শেখ চিল্লী সাইক্ল এবং আরো বিস্তর। কিন্তু পল্‌ডি সাইক্লের বিশেষত্ব কি?’

নয়রাট বললেন, ‘পল্‌ডি হলেন অতিশয় খানদানী ঘরের ছেলে, উত্তম বেশভূষায় ছিমছাম না হয়ে বেরোন না, সকলের সঙ্গে অতিশয় ভদ্র ব্যবহার—এ তো সব হল; কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তিনি একটি পয়লা নম্বরের বক্সেবর, আনাড়ির চুড়ামণি—বে-অকুফের শিরোমণি। দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি—’

ফ্রান্সিস্কা বললেন, ‘কিন্তু শ্লীজ, অশ্লীলগুলো না।’

নয়রাট বেদনাতুরতার ভান করে বললেন, ‘ফ্রান্সিস্কাকে নিয়ে ঐ তো বিপদ। একশ বার বোঝাবার চেষ্টা করছি, শ্লীল-অশ্লীল—একেবারে স্বতঃ-সিদ্ধরূপে, অর্থাৎ perse—পৃথিবীতে নেই, যে-রকম নিজের থেকে “ডাট” বা ময়লা বলে কোন জিনিস হয় না। অস্থানে পড়লেই জিনিস ডাট হয়। ডাস্টবিনের ভিতরকার ময়লা ময়লা নয়—একথা কেউ বলে না, “ডাস্টবিন ময়লা হয়ে গিয়েছে, ওটা সাফ করো”, বলে, “ডাস্টবিন ভাঁত হয়ে গিয়েছে।” ঠিক তেমনি সুন্দরীর ঠোঁটের উপর লিপস্টিক ডাট নয়, কিন্তু যদি সেই লিপস্টিক আমার গালে লেগে যায়—’

ফ্রান্সিস্কা বললেন, ‘পেটোর! আবার।’

আমার মনে হল, ফ্রান্সিস্কা বাড়াবাড়ি করছেন, তাই নয়রাটকে সমর্থন করার জন্য গুনগুন করলুম,

‘অধরের তাম্বুল

বয়ানে লেগেছে

ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি,

দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, ‘মানে?’

আমি সালংকার সবিস্তর নন্দকুমারের গণ্ডে চন্দ্রাবলীর তাম্বুলরাগের বর্ণনা দিলুম।

নয়রাটকে আর পায় কে?—চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে বললেন, ‘শুনলে, গিন্নী শুনলে? গ্রীকৃষ্ণ ভারতীয়দের স্বয়ং ভগবান, আমাদের যেরকম যীশুখ্রীষ্ট! তিনি যদি রাধা ভিন্ন অন্য রমণীকে দয়া দেখাতে পারেন, তবে আমার গালে কিংবা ইভনিং শাটে লিপস্টিক আবিষ্কার করলে তুমি মর্মাহত হও কেন?’

ফ্রান্সিস্কা বাধা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কী টিড্ মিথ্যেবাদী রে, বাবা! আমি আর মা-বোন ভিন্ন অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হলে যে পদ্রুপ—হ্যাঁ পদ্রুপই বটে—শব্দের জন্য পকেট-ডিক্শনারি বের করে তার গালে লিপস্টিক! ডু লিবার হ্যার গট ফন বেনটাইম (বাঙলায়—“হে পিণ্ডাদান খানের মা কালী!”)’

আমি বললাম, ‘কিন্তু হ্যার নয়রাট, একটা ভুল করবেন না। দেবতা যা করবার অধিকার রাখেন, সাধারণ মানুষের তা নেই। কিন্তু সে কথা থাক, শলীল-অশলীল সম্বন্ধে আপনি কি যেন বলছিলেন?’

নয়রাট বললেন, ‘Per se বাই ইটসেলফ যেরকম ডার্ট হয় না, ঠিক তেমনি স্ব-হক্কে কোনো জিনিস অশলীল নয়। উদাহরণ দিয়ে বলি,—যেখানে বাইবেল পাঠ হচ্ছে, সেখানে হঠাৎ পেটের ব্যামো নিয়ে আরম্ভ করা অশলীল এবং তার চেয়েও ভালো দৃষ্টান্ত, ডাক্তাররা যেখানে যৌন সম্পর্কের আলোচনা করছেন, সেখানে বেমক্সা বাইবেল পাঠ আরম্ভ করা তার চেয়েও বেশি অশলীল।

‘অর্থাৎ বস্তু বাস্তু প্রতীয়মান, জাষ্জব্লামান করার জন্য যে কোন দৃষ্টান্ত, যে কোন তথ্য, যে কোন গল্প শলীল—তা সে পঁচিশবার দাক্তের বয়ানই হোক, গণিকা-জীবনকাহিনীই হোক। পক্ষান্তরে ইন্টারলেভেংট আউট অব শ্লেস (বেমক্সা) জিনিস, তা সে ধর্মসংগীতই হোক আর টমাস আকুনিয়াসের জীবনই হোক।’

আমার আশ্চর্য লাগল। কারণ দেশের ডটচাজ মশাই (‘পাদটীকা’ দ্রষ্টব্য) এবং কাবুলের মোলানা মীর আসলম (‘দেশে-বিদেশে’ দ্রষ্টব্য) ঐ একই কথা বলেছিলেন।

আমি বললাম, ‘খাঁটি কথা। কিন্তু এসব থাক না এখন। বরং একটা পল্‌ডি গল্প বলুন।’

নয়রাট বললেন, ‘সেই ভালো।’

‘পিয়ন পল্‌ডিকে মনি অর্ডারের টাকা দিলে। পল্‌ডি দিল জোর টিপস্। পাশে বসেছিলেন বন্ধু, তিনি বললেন, ‘পল্‌ডি, অত বেশি টিপস্ দিলে কেন?’ পল্‌ডি পরম সন্তোষ সহকারে মাথা হেলিয়ে দু’লিখে বললে, ‘ঐ তো! কিসসু জানো না, কিসসু সমঝো না; জোর টিপস্ দিলে ঘন ঘন মনি অর্ডার নিয়ে আসবে না?’

আমার হাসি শেষ হবার পূর্বেই নয়রাট বললেন, “কিংবা ধরুন, পল্‌ডির বন্ধু ব্যাখ্যা। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে বুক-পিঠ বাজিয়ে বললেন, ‘ঠিক ডায়গনোজ করতে পারছি নে। তবে মনে হচ্ছে অত্যধিক মদ্যপানই কারণ।’

পল্‌ডি হেসে বললেন, ‘তাই নিয়ে বিচলিত হবেন না, ডাক্তার, আমি না-হয় আরেকদিন আসব, যেদিন আপনি অত্যধিক মদ্যপান করে মাতাল হয়ে যান নি।’

নয়রাট বললেন, ‘পল্‌ডি রসিকতাতে শূন্য থাকে রস। ও-গল্পের ভিতর দিয়ে পল্‌ডির দেশ, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর পাওয়া যায় না কিন্তু ট্যুনিস-শেলের গল্পের ভিতর দিয়ে জার্মানি, কলোনের শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের জীবনধারণ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায় এবং তাতে করে গল্পগুলো বেশ একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রঙ ধরে। এই ধরুন পাদ্রী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমরা প্রায়ই ব্যঙ্গ করে থাকি। তার-ই একটা ট্যুনিস-শেল্‌ সাইকে বেশ খানিকটে রসের সৃষ্টি করেছে।

‘ট্যুনিস আর শেল্‌ একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে (কটলেটের গল্পে পূর্বেই বলেছি তারা হরদম রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়) এবং ঝগড়া লেগে গিয়েছে টাকাটার ওপর কার হক্ক। ট্যুনিস বলে সে আগে দেখেছে; শেল্‌ বলে সে আগে কুড়িয়ে নিয়েছে এবং পজেশন ইজ থ্রি-ফোর্থ অব ল’। তারপর এ বলে ও মিথ্যেবাদী ও বলে এ মিথ্যেবাদী। করতে করতে হঠাৎ ট্যুনিস বললে, “তাই সই, মিথ্যেবাদী হওয়াটাও কিছ্‌ সোজা কর্ম নয়, আমি হচ্ছি প্যাঁড় মিথ্যেবাদী আর তুই হচ্ছিস পেঁচি (এমেচার) মিথ্যেবাদী।” শেল্‌ বললে, “গাঁজা, ঠিক তার উল্টো।”

‘তখন স্থির হল পাল্লা দিয়ে দুজনে মিথ্যে কথা বলবে, যে সব চেয়ে বেহুদা বেশরম মিথ্যে বলতে পারবে, টাকাটা সে-ই পাবে।

‘তখন ট্যুনিস বিস্মিত হয়ে বলে আরম্ভ করলে,—

“পরশুদিন ঘরে মন টিকছিল না বলে বাইরে এসে এক লক্ষ্যে চলে গেলুম আমেরিকায়। সেখানে পৌঁছলুম এক সমুদ্রপারের ‘লিডো’তে। দীর্ঘ হাজার হাজার মেয়েমন্দ সেখানে চান করছে, সাঁতার কাটছে। আর ছুঁড়ি-গুলো কী বেহায়া! আমার এই একটা নেক্‌টাইয়ের কাপড় দিয়ে তিনটে মেয়ের সুইমিং কস্টুম হয়ে যায়। (ফ্রান্সিস্‌কা বললেন, ‘পেটার, আবার?’ নয়রাট বললেন, ‘আচ্ছা, আচ্ছা, টাপেটোপে বলছি’।) আমার ভায়ফের রাগ হল। করলুম কি, সব কটা হুলো-মেনিকে ধরে একটা ব্যাগে পুরে দিলুম আরেক লাফ। এবারে পৌঁছলুম, ফুঁজি-আমা পাহাড়ের কাছে। ব্যাগের ভিতর তিন হাজার বেড়াল কাঁও ম্যাঁও করছিল বলে আমার দারুণ বিরক্তি বোধ হল। তাই আশত ব্যাগটা গিলে ফেলে গোটা আড়াই টেকুর তুললুম, তারপর—”

“শেল্‌ বাধা দিয়ে বললে, এতে আর মিথ্যে কোন খানটায় হল? আমি তো তোর সঙ্গেই ছিলাম, পষ্ট দেখলাম, তুই এসব করছিলি।”

ফ্রান্সিস্‌কা গল্পটা আগে শোনেন নি বলে হাসলেন। আমিও বললুম, ‘এ গল্পটা ভারি নতুন ধরনের। শেলের উত্তরটা অত্যন্ত আচমকা একটা ধাক্কা দিলে।’

নয়রাট বললেন, ‘গল্পটা এখনো শেষ হয় নি।’

আমরা বললুম, ‘সে কি কথা?’

নয়রাট বললেন, গল্পটি যদিও খাস কলোন শহরের, -তবু তার টেকনিকে একটু চীনা পদ্ধতি এসে গিয়েছে। এ গল্পে দুটো ‘সারপ্রাইজ’, কিংবা বলতে পারেন দুটো কিক আছে। খুলে বলছি;—

‘টুনিস আর শেল্, যখন রাইন নদীর পাড়ের রেলিঙে ভর করে মিথ্যের জাহাজ ভাসাচ্ছিল, তখন এক পাদ্রী সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে সুবাস্তসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন। অনিচ্ছায় কিংবা স্বেচ্ছায়ও হতে পারে, টুনিস শেলের বিকট মিথ্যের বহর তাঁর কানে এসে পৌঁচেছিল। থাকতে না পেরে বললেন, “হি, হি, বাছারা ; এ-রকম ডাহা মিথ্যে তোমরা মুখ দিয়ে বের করছো কি করে ? জানো না, মিথ্যা কথা মহাপাপ ? আমি জীবনে কখনো মিথ্যা বলি নি।”

‘টুনিস পাদ্রীর কথা শুনে প্রথম হকচকিয়ে গেল, তারপর থামে গেল। সম্ভবত ফিরে শেষটায় ক্ষীণকণ্ঠে, বাজি হারার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শেল্কে বললে, “ভাই শেল্, নোটটা ওকেই দে, টাকাটা গুরই পাওনা। তুই এ-রকম পাঁড় মিথ্যে বলতে পারবি নে ; আম্মো পারবো না।”

আমি বললুম ‘খাসা গল্প ; এটা মনে রাখতে হবে।’

ফ্রান্সিস্কা বললেন, ‘কিন্তু আমি জানি, পেটার ওখানে থাকলে প্রাইজটা সেই পেত।’

আমি ময়রাটকে বললুম, ‘গল্পটি সুন্দর, কিন্তু এতে টিপিকাল কলোনের কি আছে ? আমাদের মোল্লা-পুত্রের সন্দেহও তো এরকম বদনাম আছে।’

ময়রাট বললেন, ‘আমি জানতুম না। তবে শুনুন আরেকটা—আর এর জবাব আপনি দিতে পারবেন না।’

‘টুনিস-শেল্ আবার একখানা দশ টাকার নোট পেয়েছে (টুনিস-শেল্ সাইক্লের ভিতরে এ হচ্ছে “নোটের সাব্-সাইকেল”)। এবারে ঝগড়া হয় নি। দুজনে সেই টাকা দিয়ে মদ খেয়ে বেহুশ হয়ে পড়েছে রাস্তায়। পুন্সিস তাদের পৌঁছে দিয়েছে হাসপাতালে। সকালবেলা তাদের ঘুম ভেঙেছে আর নেশাকেটেছে। দেখে চতুর্দিক ফিটফাট, ছিমছাম। টুনিস শুধালে, “ওরে শেল্, এ আবার এলুম কোথায় ?” শেল্ বললে, “আমিও তাই ভাবছি। দাঁড়া, দেখে আসছি।”

‘শেল্ গেল ঘরের বাইরে। পাঁচ সেকেন্ডের ভিতর ছুটে এসে বললে, “ওরে টুনিস—আমরা ভারতবর্ষে পৌঁছে গিয়েছি—রাতারাতি আমাদের ভারতে পাচার করে দিয়েছে।”

‘টুনিস তো তাজব। শুধালে, “কি করে জানলি ?”

‘বললে, “করিডরে মোটা হরপে লেখা আছে, “Die Toiletten befinden sich auf jenseits des Ganges”।’

ময়রাট বললেন, অর্থাৎ, “করিডরের দুপাশে বাথরুমের ব্যবস্থা আছে।” এখন ‘করিডর’ শব্দ জার্মানে Gang আর Gang-এর দুপাশে—অর্থাৎ ষষ্ঠীতংপদ্রুম Ganges, তার মানে বাথরুম গঙ্গার (নদীর) দুপাশে।’

‘তাই টুনিস-শেল্ রাতারাতি ভারতে পৌঁছে গিয়েছে।’

ময়রাট বললেন, ‘দেশশ্রমণের গল্পই যদি উঠল তবে সেই সাবসাইক্লই চলুক।’

আমি বললুম, ‘উত্তম প্রস্তাব।’

ময়রাট বললেন, ‘টুনিস-শেল্ পেটের ধান্দায় হামবুর্গ গিয়ে জহাজের খালাসির চাকরি নিয়ে পৌঁছেছে গিয়ে ইস্তাম্বুল শহরে, সেখানে—’

ফ্রান্সিস্কা বললেন, ‘না, পেটোর, ওটা চলবে না।’

নয়রাট ব্যাথা-ভরা নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘গল্পটা কিন্তু ছিল খাসা ; তার আর কি করা যায় ! তবে তাদের নিয়ে যাই নিউ ইয়র্কে’।

‘হয়েছে কি, টুনিসের এক মামা নিউ ইয়র্কে’ দুপয়সা রেখে মারা গিয়েছে। টুনিস উকিলের চিঠি পেয়েছে তাকে সেখানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নিজের সনাক্ত দিয়ে টাকাটা ছাড়িয়ে আনতে হবে। ওঁদিকে টুনিস আবার ভয়ানক ভীতু ধরনের লোক। একা বিদেশ যেতে ডরায়—শেলকে বললে, “ভাই, তুই চ।” শেল্‌ ভাবলে—আর আমিও তাই ভাবতুম,—মন্দ কি, ফোকটে মার্কিন-মুন্সুকাটা দেখা হয়ে যাবে।

‘তারা নিউ ইয়র্ক পৌঁছল ঠিক বড় দিনের দিন। তামাম মার্কিন দেশ ঝেঁটিয়ে এসে জড়ো হয়েছে নিউ ইয়র্কে’ পরব করার জন্য, সব হোটেল আগাগোড়া ভর্তি, করিডরে পর্যন্ত ক্যাম্প্‌ কট্‌ পেতে শোবার ব্যবস্থা ফালতো গেস্টদের জন্য করা হয়েছে।

‘মহা দুর্ভাবনায় পড়ল দুই ইয়ার। ডিসেম্বরের শীতে আশ্রয় না পেলে শীতেই অন্ধা-লাভ। দুই বন্ধু কলোন গির্জের মা-মেরিকে স্মরণ করে এক ডজন মোমবাতি মানত করলে। আপনি তো মুসলমান, এসব মানেন না, কিন্তু—’

আমি বললুম, ‘আলবত মানি। একশবার মানি। কলকাতায় মৌলা আলীর দগায় মোমবাতি মানত করলে বহু বাসনা পূর্ণ হয়। আর আমাদের দেশে এমন জায়গাও আছে যেখানে মানত করলে মোকদ্দমা পর্যন্ত জেতা যায়।’

ফ্রান্সিস্কা শুধালেন, ‘ডিভোর্স পাবার দরগা আছে?’

আমি বললুম, ‘বিলক্ষণ, তবে সেখানে স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে গিয়ে কামনাটা জানাতে হয়।’

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘খ্যাৎক ইউ।’ তারপর গল্পের খেই তুলে নিয়ে বললেন, ‘কলোনের মা-মেরি বড় জাগ্রত দেবতা। একটা হোটেলে শেষটার একটা ডবল রুম জুটে গেল, কিন্তু ব্যবস্থাটা শুনে দুই ইয়ারই অঁতকে উঠলেন।

‘ঘর পণ্ডাশ তলায়, আর লিফট্‌ বিগড়ে গিয়েছে।’

‘দুইজনাই একসঙ্গে বললে, “হে মা-মেরি এতটা দয়াই যখন করলে, তখন লিফট্‌টা সারাতে পারলে না মা?”’

আমি বললুম, ‘আমাদের গোপালভাঁড়ও তাই বলোছিল,—

“এত দয়াই যদি করলি, মা কালী,

তবে আরেকটু দয়া করে,

বনে আছে দেদার ফাঁড়ি

খা না দুটো ধরে।”

নয়রাট বললেন, ‘গল্পটা কি?’

আমি বললুম, ‘আপনাকে একদিন সময়মত আমাদের “গোপালভাঁড়-সাইক্ল” শোনাও, তবে তার অনেকগুণি ফ্রান্সিস্কার সামনে বলা চলবে না।’

নয়রাট বললেন, ‘তবে নিয়ে চলুন আপনাদের ডিভোর্স-দর্গায়।’

সিগরেট ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফ্যান্‌সিস্কা ভাঁড়াঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, ‘অত তাড়া কিসের? ভারত বাবার জাহাজ আরো সপ্তাহখানেক পর ছাড়ে।’

নয়রাট বললেন, তখন ট্যান্নিস শেল্‌কে বলল, “ভাই, এ ছাড়া আর উপায় যখন নেই তখন চ, সিঁড়ি ভাঙি আর কি?”

‘শেল্‌ বলল, “একটা ব্যবস্থা করলে হয় না, প্রতি তলা উঠতে উঠতে তুই এক-একটা করে গল্প বলবি আর তাতেই মশগূল হয়ে আমরা পঞ্চাশতলা বেয়ে নেব। তুই তো মেলা গল্প জানিস।”

‘ট্যান্নিস বলল, “যা বলেছি, সাথে কি আর তোকে সঙ্গে এনেছিলুম? তবে শোন,” বলে আরম্ভ করলে সিঁড়ি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গল্প-বলা।’

নয়রাট বললেন, সে কত বাহারে গল্প! আমি গল্প কলেক্ট করি নে, কিন্তু আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে আমি আপনাকে আলাপ করিয়ে দেব, তিনি সব কটা জানেন।

তা সে কথা থাক।

‘ট্যান্নিস আর শেল্‌ এক এক তলার সিঁড়ি ভাঙে আর ট্যান্নিস এক-একখানা জান—তর্-র-র্ গল্প ছাড়ে। হেসেখেলে বিন্-মেহমত, বিন্-কসরতে তারা পঁচিশতলা এক ঝটকায় মেরে দিলে।

‘তখন ট্যান্নিস বলল, “ভাই শেল, আমার সব গল্প খতম। আর কোন গল্প মনে পড়ছে না।”

‘তখন শেল্‌ বলল, “ধাবড়াস নি। আমারো কিছু পঁদুজি আছে।”

‘বলে তখন শেল্‌ আরম্ভ করল গল্প বলতে। সেও কিছু কম বাহারে নয়, তবে ট্যান্নিস তালেবর ব্যক্তি, তার সঙ্গে তুলনা হয় না।

‘করে করে তারা আরো চব্বিশখানার সিঁড়ি ভাঙলে—গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে।

‘মাত্র একতলা বাকি। শেল্‌ দুম্ করে মাটিতে বসে পড়ল। এক ঝটকায় হোক আর ঊনপঞ্চাশ ঝটকায়ই হোক পা-গুলো তো আর গল্প শুনতে পায় না। শেল্‌ ক্রান্তিতে নেতিয়ে পড়ে বলল, “ভাই আমার গুদোমও খতম।”

তখন ট্যান্নিস বলল, “কুছ্ পরোয়া নদ্বারদ। আমার একখানা গল্প মনে পড়েছে—একদম সত্যি গল্প।—আমরা ক্লাটের চাবি সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি।”

*

*

*

লগ্ন খেতে এসে তখন প্রায় চায়ের সময় হয়ে গিয়েছে অথচ গাল-গল্পের কন্বলের ভিতর এমনি ওম জমে গিয়েছে যে সে কন্বল ফুটো করে বেরতে ইচ্ছে করে না। শীতের দেশ তো—উভয়ার্থে শীতের দেশ, ইয়োরোপীয়দের মনেও শীত; আড্ডা জমিয়ে সঙ্গ-সুখের আলিঙ্গনে সেটাকে গরম করতে জানে না—তাই এদের কুণ্ডলিতে বহুদিন পরে যেন ‘বসন্ত রেস্টুরেটের’ আনন্দ পেলুম।

শেষটায় একটা হাফ্-মোকা পেয়ে বললাম, ‘আমি তা হলে উঠি।’

নয়রাট একটি কথা বললেন, ‘কেন?’

আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। এরকম অবস্থায় সচরাচর বলা হয়, “সে কি কথা? এখনই যাবেন কেন?” কিংবা ‘বন্ড কাজ পড়ে আছে বৃদ্ধি?’ অথবা অন্য কিছু। আমার কোনো জবাব যোগাল না।

নয়রাট বললেন, ‘দেখুন মশাই, আপনাকে বলি নি, কিন্তু আপনাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। গেল কয়েকদিন ধরে যখনই লেকের পাড় দিয়ে কাজ-কর্মে কোথাও যেতে হয়েছে, তখনই আপনাকে দেখেছি, ঐ একই বেণের উপর—তাও আবার একই পাশে—বসে আছেন। শুনেছি, ইংলন্ডের পার্কে চেয়ারে বসলে তার জন্যে ট্যাক্স দিতে হয়—’

ফ্রান্সিস্কা বললেন, ‘সেখানে দম ফেলতেও ট্যাক্স দিতে হয় এবং তারই ভয়ে কেউ যদি দম বন্ধ করে, তবে মরে গিয়ে তাকে ডেথ্-ট্যাক্স দিতে হয়।’

নয়রাট বললেন, ‘তাহলে বিবেচনা করি সেখানে বিয়ের উপরও ট্যাক্স আছে। আহা, ইংলন্ডে জন্মালে হত।’

ফ্রান্সিস্কা বললেন, ‘আহা আমি যদি তিব্বতে জন্মাতুম। সেখানে প্রত্যেক রমণীর পাঁচটা করে স্বামী থাকে, আর সব কটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।’

আমি বললুম, ‘ষাট, যাট (ইংরিজিতে tut tut), ও রকম অলঙ্কণে কথা কইবেন না।’

সমস্বরে, ‘কেন?’

আমি বললুম, ‘তাহলে আসছে জন্মে, পেটারকে জন্মাতে হবে ইংলন্ড আর মাদাম ফ্রান্সিস্কা (বলে তাঁর দিকে ‘বাও’ করে বললুম), আপনাকে জন্ম নিতে হবে তিব্বতে।’

দুজনাই কিচির-মিচির করে উঠলেন। তার থেকে যে প্রশ্ন ওতরালা তার মোটামুটি জিজ্ঞাসা, ‘আসছে জন্মে’ কথাটার মানে কি? আমরা তো মরে গিয়ে হয় স্বর্গে যাব, কিংবা নরকে, কিংবা কপ্পুর হয়ে যাব, ‘আসছে জন্মে’ তার অর্থ কি?

আমি বললুম, ‘এই যে পেটার শূদ্রালেন, আমি বোধিতে সর্বসময় বসে থাকি কেন? তার অর্থ আমি চলাফেরা, হাঁটাহাঁটি করি না কেন? সুইটজারল্যান্ডে যদি ইংলিশ্ কায়দায় বোধিতে বসতে হত তাহলে ট্যাক্স দিয়ে দিয়ে আমি ফতুর হয়ে যেতুম সেকথা আমি খুব ভালো করেই জানি কিন্তু চলাফেরা করলে আমাকে খেসারতি দিতে হবে অনেক বেশি।’

লাইন কোন্ দিকে চলেছে ফ্রান্সিস্কা যেন তার খানিকটা আভাস পেয়েছেন বলে মনে হল। পেটার কিন্তু রতি-ভর হৃদিস না পেয়ে শূদ্রালেন, ‘এর কোনো মানে হয় না, আপনি রাস্তায় হাঁটছেন, তার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে কেন? ইংলন্ডের মতো বর্বর দেশেও ও-রকম ট্যাক্স নেই।’

আমি বললুম, ‘পরজন্মে মানুষ এ পৃথিবীতে আসে পূর্বজন্মের কামনা নিয়ে। আমি সমস্ত দিন যতদূর সম্ভব চুপচাপ বসে থাকি যাতে করে

ভগবান পরজন্মে আমাকে এমন জায়গায় বসান যেখানে আমাকে কোন কিছু না করতে হয়। আমি যদি হাঁটাহাঁটি করি, তবে ভগবান ভাববেন, আমি ঐ কর্মই পছন্দ করি, আর আমাকে এ জগতে পাঠাবেন পোস্টম্যান করে। তখন মরি আর কি, জলঝড়ে, বিকিঁতুফানে এর বাড়ি ওর বাড়ি চিঠি-পাশেল বয়ে বয়ে।’

ফ্রান্সিস্কা শুধালেন, ‘আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি নে কিন্তু কিছুটা আশ্বাস করতে পেরেছি। আপনি বলতে চান, মানুষ মরে গিয়ে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। সে কি করে হয়?’

জ্ঞানী পাঠক! অপরাধ নেবেন না। আপনি সেন্সলে থাকলে আমার অনেক পূর্বেই বুঝে যেতেন, ‘জন্মান্তরবাদ’ এরা জানে না এবং আপনি সেইটি বুঝতে পেরে তক্খুনি তার শাস্ত্রসম্মত সদুত্তর দিয়ে দিতেন। কিন্তু আমি তো পণ্ডিত নই, দেশ আমাকে আদর করে না, দেশ আমাকে খেতে-পরতে দেয় না, তাই তো আমি লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা হয়ে গিয়েছি বিদেশ, আমি অতশত বুঝতে পারব কি করে?

তদুপরি আরেক কথা আছে। আমি মুসলমানের ছেলে। ইসলাম জন্মান্তরবাদ মানে না; যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মক্কাবাসীরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করতো। সেই যুগের একটি আরবী কবিতা এই সুবাদে মনে পড়ল।

কবিতাটির গীতিরস বাঙলাতে অনুবাদ করার মত বাঙলা-ভাষা-জ্ঞান আমার নেই কিন্তু কল্পনা-চতুর পাঠক হয়তো আমার অনুবাদের চুটি-বিচ্যুতি পেরিয়ে গিয়ে ঠিক তথ্যটি সমঝে যাবেন। মরুভূমির আরব বেদুইন প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলছে,

‘প্রিয়ে,

আরবভূমি মরুভূমি, নীরস কর্কশ

তোমার আমার প্রেমের সুধাশ্যামলিম-রস

কেউ বুঝতে পারল না।

তাই সর্বদেহমনস্ক দিয়ে প্রার্থনা করি,

তুমি যেন এমন দেশে জন্মাও,—

—আসছে জন্মে—

কত শত শতাব্দীর পরে তা জানিনে,

যেখানে মানুষ জলে ডুবে আত্মহত্যা করার

আনন্দ অনায়াসে অনুভব করতে পারে।’

এর টীকা অনাবশ্যক। আরব দেশে হাঁটু-জলের বেশি গভীরতর কোনো প্রকার নদীপুকুর নেই। তাই কবি জন্মান্তরে সেই দেশের কামনা করেছেন যেখানে মানুষ জলে ডুবে চরম শান্তি পায়।

সে দেশ বাঙলা দেশ। চেরাপুঞ্জির দেশ, যেখানে সব চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। নদীনালা, পুকুর-হাওরে জলের থৈ থৈ।

আরব বেদুইন কবি এই দেশই মনে মনে কামনা করেছিল।

*

*

*

আমি বললুম, ‘আসছে জন্মের কথা থাক। আপনি যে এ জন্মের কাহিনী আরম্ভ করেছিলেন সেইটি তো শেষ করলেন না। আপনি বলছিলেন আপনার গাটিকয়েক শখ পূরণ করার জন্য আপনি এক-টানা ছাব্বিশ বছর খেটে পল্লসা জমিনে এখন দিব্য আরাম করতে পারছেন। আপনার শখগুলো কি?’

নয়রাট বললেন, ‘এক নম্বর দাবা-খেলা আর দু নম্বর—বলতে একটু বাধো-বাধো ঠেকছে।’

আমি বললুম, ‘এইবার আপনারা ভদ্রতা “আরম্ভ” করলেন!’

নয়রাট বললেন, ‘ভদ্রতায় ঠেকছে না। ঠেকছে অন্য জায়গায়। তবু না হয় বলেই ফেলি। আমি যখন ইস্কুল যেতুম তখন একটি জারজ ছেলেকে আমার ক্লাসের ছেলেরা বড় ক্ষাপাত-ছেলেরা এ বিষয়ে যে কী রকম ক্রুর আর নিষ্ঠুর হতে পারে তার বর্ণনা আপনি নিশ্চয়ই মোপাসাঁয় পড়েছেন। আমি তখনো গল্পটি পড়ি নি কিন্তু আজ মনে হয় ছেলেটির দুর্দৈব কাহিনী মোপাসাঁ শতাংশের একাংশও বর্ণনা করতে পারেন নি। আমার নিজের বিশ্বাস যৌনবোধ না জন্মানো পর্যন্ত মানুষের মনে স্নেহ করুণা ইত্যাদি কোনো প্রকারের সদগুণ দেখা দেয় না। তাই বালকেরা হয় সচরাচর অত্যন্ত নিষ্ঠুর—আমি ক্লাসের আর সকলের চেয়ে ছিলুম বয়সে একটু বড়, আমার তখন নিজের অজানাতেই যৌনবোধ আরম্ভ হয়েছে এবং তাই ঐ হতভাগ্য ছেলেটির জন্য আমার হৃদয়ে গভীর বেদনার উদ্বেগ হত। কিন্তু বয়সে বড় হলে কি হয়, আমি ছিলুম একে রোগাপটকা, তার উপর মারামারি হাতাহাতির প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা। তাই আমি তাকে কোনো প্রকারে সাহায্য না করতে পেরে মনে মনে বড় লজ্জা বোধ করতুম। তবে সুযোগ পেলেই, আর পাঁচটা ছেলের চোখের আড়ালে ওর হাতে একটা চকলট গর্জে দিতুম, রাজ্জায় দেখা হলে একটা আইসক্রীম খাইয়ে দিতুম।

‘প্রথম যেদিন তাকে চকলেট দি়েছিলাম সেদিন সে আমার দিকে বম্ব ইন্ডিয়টের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল, তারপর দরদর করে তার দু চোখ বেয়ে জল বোরিয়ে এসেছিল। ক্লাসের তিরিশটে কসাইয়ের ভিতরেও যে একটি ছেলে গোপনে গোপনে তার জন্য হৃদয়ে দরদ খরে এর কল্পনাও যে কখনো তার মনের কোণে ঠাই দিতে পারে নি।’

তাকিয়ে দেখি ফ্লান্‌ৎসিস্কার চোখ ছলছল করছে। অথচ তিনি নিশ্চয়ই এ-কাহিনী আগে শুনে থাকবেন। মনে মনে বললুম, নয়রাট সতাই ‘সহধর্মণী’ পেয়েছেন। বাইরে বললুম, ‘ধামলেন কেন?’

বললেন, ‘এখনো বাধো-বাধো ঠেকছে। তবু বলছি, কারণ এ বিষয়ে আমি মিশনারি।’

‘ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বললুম, “এই ফুল! চোখ মুছে ফেল। আর সবাই দেখে ফেললে তাকে জ্বালাবে আরো বেশি, আমাকেও রেহাই দেবে না।”

‘চোখের জলের সঙ্গে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা মিশে গিয়ে তার চেহারা যে কি রকম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তার ছবি আমি আজো দেখতে পাই।

‘আপনাকে কি বলবো, তারপর সেদিন ক্লাসে বসে যখনই আড়নয়নে তাকিয়েছি তখনই দেখেছি, সে চোখ বন্ধ করে আছে, তার ঠোঁটের দূ কোণে গভীর প্রশান্তির মৃদু হাস্য, আর গালের আপেল দুটো খুঁশিতে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো যেন চেপে ধরেছে। আমি তো ভয়ে মরি, মূখুটা আবার কি বলতে গিয়ে কি না বলে ফেলে।

‘তার পর দিন থেকে আরম্ভ হল আরেক আজব কেছা। ছেলেরা রুটিনমাসিক তাকে ‘ব্যা—ড’ বললে, চলে ধরে টান দিলে, অন্যান্য প্রকরণেরও কোনো খাঁকতি হল না কিন্তু সেও রুটিনমাসিক চিংকার চেঁচামেচি গালাগাল দিলে না—সে দেখি, চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে হাসছে—আমি ভাবলুম, হয়েছে, ছোঁড়াটা বোধ করি ক্ষেপে গেছে।

‘বহু পরে সে আমাকে একদিন বলেছিল, সে নাকি তখন খুঁশিতে ডগোমগো, তার নাকি ভারী আনন্দ, তার আর কি ভয়, এই ক্লাসেই তার একটি বন্ধু রয়েছে, সে তাকে চকলেট খাইয়েছে।’

আমি বললুম, ‘অতিশয় হক্ কথা! ফাসীতে প্রবাদ আছে,—

“দুশ্মন্ চি কুনদ্, আগর্ মেহেরবান বাশদ্ দোস্ত।”

“দুশ্মন্ কি করতে পারে, দোস্ত যদি মেহেরবান হয়।”

নয়রাট উল্লসিত হয়ে ফ্যানবিস্কাকে বললেন, ‘বউ, প্রবাদটা টুকে নাও তো, কাউকে দিয়ে ফাসীতে লিখিয়ে নিজের জমানে গণিক হরফে তজ্জমা লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবো।’

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘এতদিন ধরে আমি জুতসই একটা প্রবাদের সম্মানে ছিলাম—অপনাকে অনেক ধন্যবাদ।’

তারপর বললেন, ‘ছোঁড়াটা অশুভ। আমাকে বিপদে না ফেলার জন্য আমার কাছে এসে ন্যাওটামি করতো না। একলা-একলি দেখা হলে শূন্য আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি মূর্চক হেসে চোখ বন্ধ করত।

‘তার কয়েকদিন পরে আমার জন্মদিন। ক্লাসের ছোঁড়াগুলোর প্রতি যদিও আমি ঐ ছোকরাটাকে জ্বালাতন করার জন্য বিরক্ত হতুম তবু অন্য বাবদে ওরাই তো আমার সঙ্গী; তাই তাদের নেমন্ত্রণ করলুম, আর না করলে মা-ই বা কী ভাববে? তারা আমার জন্য উপহার আনলে, বই, পেন্সিল, ছুরি, কলের লাটিম এবং আর পাঁচটা জিনিস। আমরা কেঙ্ লেমন্ডেড খাচ্ছি, জোর হৈ-হুজোড় চলছে, এমন সময় বাড়ির দাসী আমার কানে কানে বললে, “ছোটবাবু, তোমার জন্য একটি ছেলে নিচের তলায় গেটে দাঁড়িয়ে। কিছুতেই উপরে আসতে চায় না; তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।”

‘আমার সব বন্ধুই তো গটগট করে উপরে আসে। এ আবার কে?

‘গিয়ে দেখি সেই পাগলা। হাতে এক টাউস বাস্ক। লজ্জায় লাল হয়ে বললে—

“তোমার জন্মদিনে একটা প্রেজেন্ট এনেছি। ছোট্ট একটা পাল-লাগানো ইয়ট।”

‘বলে কি? ‘ইয়ট’ তখন আমাদের শ্বশুরের বাইরে। পুরো বছরের জল-খাবারের পয়সা জমালেও আমাদের ক্লাসের ধনী ছোকরা আডল্ফ্ পর্যন্ত ‘ইয়ট’ কিনতে পারে না—তখনো জানতুম না, সে পয়সাওলা ছেলে।

সময় মজতবা আলী রচনাবলী (৯ম)—২০

‘লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। বললুম, “তুই উপরে চ, কেক খাবি।”

‘বললে, “না, ভাই, তুই যা, উপরে আরো অনেক সব রয়েছে।”

‘আমি তাকে জোর করে উপরে টেনে নিয়ে এলুম। কোথেকে সাহস পেলুম আজো জানি নে। বোধ হয় ইস্টের কৃতজ্ঞতায়।’

আমি থাকতে না পেয়ে বললুম, ‘ছিঃ, ও জিনিস নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।’

নয়রাট বললেন, ‘খ্যাংক উই। তার পর উপরে কি হল ঠিক বলতে পারব না। প্রথমটায় সবাই থ মেরে গেল। তারপর একে একে সকলেই পাগলার সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করলে। তার চোখ দিয়ে আবার সেই পয়লা দিনের মতো ঝরঝর করে জল নেমে এল।

‘সেই দিনই আমি মর্নাস্থির করলুম, বড় হলে আমি সর্বত্র এরকম ছেলেদের অনায়াস অত্যাচার থেকে বাঁচাবো। ভগবান আমাকে আজ দেখিয়ে দিয়েছেন, এ শক্তি আমার ভিতরে আছে।’

নয়রাট হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, ‘এখুনি আসছি; আমি একটা টেলিফোন করতে ভুলে গিয়েছিলুম।’

বুঝলুম, বিনয়ী লোক, লজ্জা ঢাকবার অবকাশ খুঁজছেন ॥

আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত

কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা	এগিয়ে যা এগিয়ে যা
খুশীকে গীত্ গায়ে জা	খুশীর গীত গাইতে যা।
ইয়েহ্ জিন্দগী হ্যার কোম কী	দেশের তরে জীবন ধন
(তো) কোম পৈ লুটায় জা ॥	দেশের লাগি করাবি নে পণ ?

তু শেরে হিন্দু আগে বঢ়	শেরে হিন্দু এগিয়ে যা।
মরণেসে ফিরিভি তু ন ডর	সামনে মরণ ফিরে না চা ॥
আসমান তক্ উঠায়ৈ সির	আকাশ বিধে তুলবি শির
জোশে ওতন বঢ়ায়ে জা ॥	দেশের জোশ বাড়বে বীর।

তেরে হিন্দু বঢ় তী রহে	বাড়ুক বাড়ুক সাহস তোর
খুদা তেরী সুনতা রহে	খুদা তোরে দেবেন জোর।
জো সামনে তেরে চড়ে	সামনে বাধা পরোয়া না কর
(তো) খাক্মে মিলায়ে জায় ॥	ধুলায় তারা পাবে যে গোর ॥

চলো দিল্লী পুকারকে	হুংকারিয়া দিল্লী চল
কৌমী নিশান সম্ভাল্কে	কৌমী নিশান জাগিয়ে তোল
লাল কিঙ্গে গাঢ়কে	লালকেল্লায় ঝাণ্ডা খোল
লহ রায়ে জা লহ রায়ে জা ॥	এগিয়ে যা ফুর্তিতে চল ॥
কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা ॥	এগিয়ে যা, এগিয়ে যা ॥

শেরে হিন্দু = হিন্দুস্থানের ব্যান্ড, জোশ = শক্তি, কৌমী নিশান = জাতীয় পতাকা

ଦନ୍ଦମଧୁର

উৎসর্গ

বাংলা সাহিত্যকে সর্বপ্রথম সংকীর্ণতার গাঁড় থেকে মুক্ত করে,
তার অধিকার ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন উভয় বাংলার
ষে-সব পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা বাংলাকে
সুন্দর ও কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে
সত্যবন্ধ—তাদের উদ্দেশে

নোনাজল

সেই গোয়ালন্দ চাঁদপুরী জাহাজ। গ্রিশ বৎসর ধরে এর সঙ্গে আমার চেনাশোনা। চোখ বন্ধ করে দিলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক বের করতে পারব, কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান, মৃগীর খাঁচাগুলো রাখা হয় কোন জায়গায়। অথচ আমি জাহাজের খালাসী নই—অবরের-সবরের যাত্রী মাত্র।

গ্রিশ বৎসর পরিচয়ের আমার আর সবই বদলে গিয়েছে বদলায় নি শব্দ ডিসপ্যাচ স্টীমারের দল। এ-জাহাজের ও-জাহাজের ডেকে কোবনে কিছ্নু কিছ্নু ফেরফার সব সময়ই ছিল, এখনও আছে, কিন্তু সব কটা জাহাজের গম্ভাটী হুবহু একই। কীরকম ভেজা-ভেজা, সোঁদা-সোঁদা যে গম্ভাটী আর সব-কিছ্নু ছাপিয়ে ওঠে, সেটা মৃগী-কারি রান্নার। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, সমস্ত জাহাজটাই যেন একটা আশ্রয় মৃগী, তার পেটের ভেতর থেকে যেন তারই কারি রান্না আরম্ভ হয়েছে। এ-গম্ভাটী তাই চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, যে কোন স্টেশনে পৌঁছানো মাত্রই পাওয়া যায়। পূর্বনো দিনের রূপসগম্ভাটী সবই রয়েছে, শব্দ লক্ষ্য করলুম ভিড় আগের চেয়ে কম।

শিবপ্রহরে পরিপাটি আহারাদি করে ডেকচেয়ারে শুয়ে দূর-দিকন্তর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কবিত্ব আমার আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না, যতক্ষণ না রবি ঠাকুর সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাই আমি চাঁদের আলোর চেয়ে পছন্দ করি গ্রামোফোনের বাজ। পোট্টোবলটা আনব আনব করছি, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা মর্দিতা 'দেশ'—মালিক না আসা পর্যন্ত তিনি যদি পরহস্তে কিঞ্চিৎ 'লুপ্টা'ও হয়ে যান, তা তাঁর 'স্বামী' বিশেষ বিরক্ত হবেন না নিশ্চয়ই।

'রূপদর্শী' ছদ্মনাম নিয়ে এক নতুন লেখক খালাসীদের সম্বন্ধে একটি দরদ-ভরা লেখা ছেড়েছে। ছোকরার পেটে এলেন আছে, নইলে অতখানি কথা গুছিয়ে লিখল কী করে, আর এত সব কেছা-কাহিনীই বা যোগাড় করল কোথা থেকে? আমি তো একখানা ছদ্মটির আর্জি লিখতে গেলেই হিমসিম খেয়ে যাই। কিন্তু লোকটা যা সব লিখেছে, এর কি সবই সত্যি? এতবড় অন্যান্য অবিচারের বিরুদ্ধে খালাসীরা লড়াই দেন না কেন? হুঃ! এ আবার একটা কথা হল। সিলেট নোয়াখালির আনাড়ীরা দেবে ঘৃণা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই—আমিও যেমন!

জাহাজের মেজো সারেঙের আজ বোধ হয় ছুটি। সিলেক্ট লুজি, চিকনের কুর্তী আর মৃগার কাজ-করা কিস্তি টুপি পরে ডেকের ওপর টাইল দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছেও। ডিসপ্যাচের পুঁটি ও মানওয়ারির তিমি দুই-ই মাহ—একেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন, 'রূপদর্শী' দর্শন করেছে কতটুকু আর কল্পনায় বুনছে কতখানি!

একটুখানি গলা খাঁকারি দিয়ে শূধালুম, ‘ও সারেঙ সাহেব, জাহাজ লেট যাচ্ছে না তো?’

লোকটা উত্তর দিয়ে সবিনয়ে বলল, ‘আমাকে “আপনি” বলবেন না সাহেব। আমি আপনাকে দৃ-একবারের বেশী দেখি নি, কিন্তু আপনার আশ্বা সাহেব, বড় ভাই সাহেবেরা এ-গরিবকে মেহেরবানি করেন।’

খুশী হলো বললুম, ‘তোমার বাড়ি কোথা? বস—না, তার ফুরসত নেই?’ ধপ করে ডেকের উপর বসে পড়ল।

আমি বললুম, ‘সে কী? একটা টুল নিয়ে এসো। এসব আর আজকাল—’ কথাটি শেষ করলুম না, সারেঙও টুল আনল না। তারপর আলাপ পরিচয় হল। দ্যাশের লোক—সুখ-দুঃখের কথা অবশ্যই বাদ পড়ল না। শেষটায় মোকা পেয়ে ‘রূপদর্শী-দর্শন’ তাকে আগাগোড়া পড়ে শোনালাম। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার জাতভাই চাষারা ঘেরকম পুথিপড়া শোনে, সে রকম আগাগোড়া শুনল, তারপর খুব লম্বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

আল্লাতালার উদ্দেশে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, ‘ইনসাফের (ন্যায়ধর্মের) কথা তুললেন, হুজুর, এ-দুনিয়ায় ইনসাফ কোথায়? আর বে-ইনসাফি তো তারাই করেছে বেশী, যাদের খুদা ধনদৌলত দিয়েছেন বিস্তর। খুদাতালাই কার জন্যে কী ইনসাফ রাখেন, তাই বা বুঝিয়ে বলবে কে? আপনি সমীরুদ্দীকে চিনতেন, বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছিল, অনেক টাকা কামিয়েছিল?’

আমেরিকার কথায় মনে পড়ল। ‘চৌতালি পরগণায় বাড়ি, না, যেন ওই দিকেই কোনখানে।’

সারেঙ বললে, ‘আমারই গা ধলাইছড়ার লোক। বিদেশে সে যা টাকা কামিয়েছে ওরকম কামিয়েছে অল্প লোকই। আমরা খিদিরপুরে সইন (sign) করে জাহাজের কামে ঢুকেছিলাম—একই দিন একই সঙ্গে।’

আমি শূধালুম, ‘কী হল তার? আমার ঠিক মনে পড়ছে না।’

সারেঙ বললে, ‘শুনুন।’

‘যে লেখাটি হজুর পড়ে শোনালেন, তার সব কথাই অতিশয় হক। কিন্তু জাহাজের কাজে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে যে কী জ্ঞান মারা খাটুনি তার খবর কেউ কখনও দিতে পারবে না, যে সে-জাহান্নামের ভিতর দিয়ে কখনও যায় নি। বয়লারের পাশে দাঁড়িয়ে যে লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কয়লা ঢালে, তার সর্বস্ব দিয়ে কী রকম ঘাম ঝরে দেখেছেন—এই জাহাজেই যার দুদিক খোলা, পম্মার জোর বাতাসের বেশ খানিকটা যেখানে স্বচ্ছন্দে বেশ আনাগোনা করতে পারে। এ তো বেহেশৎ। আর দরিয়ার জাহাজের গর্ভের নীচে যেখানে এজিন-ঘর, তার সব দিক বন্ধ, তাতে কখনও হাওয়া-বাতাস ঢোকে না। সেই দশ বারো চোদ্দ হাজার-টনি ডাঙর ডাঙর জাহাজের বয়লারের আকারটা কত বড় হয় এবং সেই কারণে গরমিটার বহর কতখানি, সে কি বাইরের থেকে কখনও অনুমান করা যায়? খালি বিল নদীর খোলা

হাওয়ার বাচ্চা আমরা—হঠাৎ একদিন দেখি, সেই জাহাঙ্গামের মাঝখানে, কালো-কালো বিরাট-বিরাট শয়তানের মত কলকাজা, লোহালকড়ের মুখোমুখি।

‘পয়লা পয়লা কামে নেমে সবাই ভিরমি যায়। তাদের তখন উপরে টেনে জলের কলের নীচে শুইয়ে দেওয়া হয়, হুঁশ ফিরলে পর মুঠো মুঠো নুন গেলান হয়, গায়ের ঘাম দিয়ে সব নুন বেরিয়ে যায় বলে মানুষ তখন আর বাঁচতে পারে না।’

‘কিংবা দেখবেন কয়লা ঢেলে যাচ্ছে বয়লারে ঠিক ঠিক, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, বেলচা ফেলে ছুটে চলেছে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে। খোলা ডেক থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। অসহ্য গরমে মাথা বিগড়ে গিয়েছে, জাহাজী বুলিতে একেই বলে “এমথ” —’

আমি শূখালুম, ‘এবেই কি ইংরাজীতে বলে এমাক্ (amuck) ?’ কিন্তু তখন তো মানুষ খুন করে !’

সারেঙ বললে, ‘জী হাঁ। তখন বাধা দিতে গেলে হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে খুন করতে আসে।’ তারপর একটু থেমে সারেঙ বললে, ‘আমাদের সকলেরই দু-একবার হয়েছে, আর সবাই জাবড়ে ধরে চুবিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা করেছে—শুধু সমীরন্দী কখনো একবারের তরেও কাতর হয় নি। তাকে আপনি দেখেছেন, সারোব ? বাং মাছের মত ছিল তার শরীর, অথচ হাত দিয়ে টিপলে মনে হত কচ্ছপের খোল। জাহাজের চীনা বাবুচির ওজন ছিল তিন মণের কাছাকাছি—তাকে সে এক থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পারত। লাঠি খেলে খেলে তার হাতে জমেছিল বাঘের থাবার তাগদ। কিন্তু সে যে ভিরমি যায় নি, “এমথ” হয় নি, তার কারণ তার শরীরের জোর নয়—দিলের হিম্মৎ—সে মন বেঁধেছিল, যে করেই হোক পয়সা সে কামাবেই, ভিরমি গেলে চলবে না, বিমারি পাকড়ানো সখ্ মানা।’

সারেঙ বললে, ‘কী বেহদ তকলীফে জানপানি হয়ে যে কুলুম শহরে পৌঁছলাম —’

আমি শূখালাম, ‘সে আবার কোথায় ?’

বললে, ‘বাংলায় যারে লুকা কয়।’

আমি বললুম, ‘ও, কলম্বো।’

‘জী। আমাদের উচ্চারণ তো আপনাদের মত ঠিক হয় না। আমরা বলি কুলুম শহর। সেখানে ডাঙায় বেড়াবার জন্য আমাদের নামতে দিল বটে, কিন্তু যারা পয়লা বার জাহাজ বেরিয়েছে, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়, পাছে জাহাজের অসহ্য কণ্ট এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়। সমীরন্দী বন্দরে নামলেই না। বললে, নামলেই তো বাজে খরচা। আর সে-কথা ঠিকও বটে, হুজুর, খালাসীরা কাঁচা পয়সা বন্দরে যা ওড়ায় ! যে জীবনে কখনও পাঁচ টাকার নোট দেখে নি, আধুলির বেশী কামায় নি, তার হাতে পনের টাকা। সে তখন কাগের বাচ্চা কেনে।’

‘আমরা পেট ভরে যা খুশি তাই খেলাম। বিশেষ করে শাক-সবজি।’

জাহাজে খালাসীদের কপালে ও জিনিস কম। নেই বললেও হয়—দেশে যার ছড়াছড়ি।’

‘তারপর কুলুম থেকে আদন বন্দর।’

আমার আর ইংরিজী ‘এইডন’ বলার দরকার হল না।

‘তারপর লাল-দরিয়া পেরিয়ে সুসোর খাড়ি—দু দিকে ধু-ধু মরুভূমি, বালু আর বালু, মাঝখানে ছোট্ট খাল।’

বুঝলুম, ‘সুসোর খাড়ি’ মানে সুয়েজ কানাল।

‘তারপর পুস’ই। সেখানে খালের শেষ। বাড়িয়া বন্দর। আমরা শাক-সবজি খেতে নামলাম সেখানে। ঝানু গেল খারাপ জায়গায়।’

পোর্ট সসৈদের গণিকালর যে বিশ্ববিখ্যাত, দেখলুম, সারেঙের পো সে খপরটি রাখে।

‘পুস’ই থেকে মাস’ই, মাস’ই থেকে হামবুর—হামবুর জম’নির মূলদুকে।’

ততক্ষণে সিলেটী উচ্চারণে বিদেশী শব্দ কী ধ্বনি নেয়, তার খানিকটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে, তাই বুঝলুম, মারসেইলজ, হামবুগের কথা হচ্ছে। আর এটাও লক্ষ্য করলুম যে, সারেঙ বন্দরগুলোর নাম সোজা ফরাসী-জার্মান থেকে শুনে শিখেছে, তারা যেন-কম উচ্চারণ করে, ইংরিজীর বিকৃত উচ্চারণের মারফতে নয়।

সারেঙ বলল, ‘হামবুরে সব মাল নেমে গেল। সেখান থেকে আবার মাল গাদাই করে আমরা দরিয়া পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম নুউক বন্দরে—মিরকিন মূলদুকে।’

‘নয়া বুনো কোন খালাসীকে নুউক বন্দরে নামতে দেয় না। বড় কড়াকড়ি সেখানে। আর হবেই বা না কেন? মিরকিন মূলদুকে সোনার দেশ। আমাদের মত চাষাভূষাও সেখানে মাসে পাঁচ-সাত শো টাকা কামাতে পারে। আমাদের চেয়েও কালা, একদম মিশকالا আদমীও সেখানে তার চেয়েও বেশী কামায়। খালাসীদের নামতে দিলে সব কটা ভেগে গিয়ে তামাম মূলদুকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণ ভরে টাকা কামাবে। তাতে নাকি মিরকিন মজুরদের জবর লোকসান হয়। তাই আমরা হয়ে রইলাম জাহাজে বন্দী।’

‘নুউক পৌঁছবার তিন দিন আগে থেকে সমীরুদ্দীর করল শস্ত পেটের অসুখ। আমরা আর পাঁচজন ব্যামোর ভান করে হামেশাই কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমীরুদ্দী এক ঘণ্টার তরেও কোন প্রকারের গাফিলি করে নি বলে ডাক্তার তাকে শুল্লো থাকবার হুকুম দিলে।’

‘নুউক পৌঁছবার দিন সম্ভ্যাবেলা সমীরুদ্দী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কসম-কিরে খাইয়ে কানে কানে বললে, সে জাহাজ থেকে পালাবে। তারপর কীকৌশলে সে পারে পৌঁছবে, তার ব্যবস্থা সে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে বললে।

‘বিশ্বাস করবেন না সায়েব, কী রকম নিখুঁত ব্যবস্থা সে কত ভেবে তৈরী করেছিল। কলকাতার চোর-বাজার থেকে সে কিনে এনেছিল একটা খাসা নীল রঙের স্ফট, শার্ট, টাইকলার, জুতা, মোজা।’

‘আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেগাচি বোগাড় করে দিয়ে। সম্ভার অশ্বকারে সমীরন্দী সাতারের জাঙিয়া পরে নামল জাহাজের উলটো খার দিয়ে, খোলা সমুদ্রের দিকে। ডেগাচির ভিতরে তার সুট, জুতো, মোজা আর একখানা তোয়ালে। বুক দিয়ে সেই ডেগাচি ঠেলে ঠেলে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে সে প্রায় আধ-মাইল দূরে গিয়ে উঠবে ডাঙায়। পাড়ে উঠে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জাঙিয়া ডেগাচি জলে ডুবিয়ে দিয়ে শিশ দিতে দিতে চলে যাবে শহরের ভিতর। সেখানে আমাদেরই এক সিলেটী ভাইকে সে খবর দিয়ে রেখেছিল হামবুর থেকে। পুর্লিসের খোঁজাখুঁজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে কয়েকদিন, তারপর দাড়িগোঁফ কামিয়ে চলে যাবে নুউক থেকে বহুদূরে, যেখানে সিলেটীরা কাঁচা পয়সা কামায়। পালিয়ে ডাঙায় উঠতে পুর্লিসের হাতে ধরা পড়ার যে কোন ভয় ছিল না তা নয়, কিন্তু একবার সুটটি পরে রাস্তায় নামতে পারলে পুর্লিস দেখলেও ভাববে, সে নুউকবাসিন্দা, সমুদ্রপারে এসেছিল হাওয়া খেতে।’

‘পেলেনটা ঠিক উতরে গেল, সায়েব। সমীরন্দীর জন্য খোঁজ-খোঁজ রব উঠল পরের দিন দুপুরবেলা। ততক্ষণে চাঁড়িয়া যে শুধু উড় গিয়া তা নয় সে বনের ভিতর বিলকুল উধাও। একদম না-পাত্তা। বরঞ্চ বনের ভিতর পাখিকে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নুউক শহরের ভিতর সমীরন্দীকে পুঁজে পাবে কোন পুর্লিসের গোসাই?’

গল্প বলান্ন ক্ষান্ত দিয়ে সারেঙ গেল জোহরের নমাজ পড়তে। ফিরে এসে ভূমিকা না দিয়েই সারেঙ বললে, ‘তারপর হুজুর আমি পুরো সাত বছর জাহাজে কাটাই। দু-পাঁচবার খিদিরপুরে নেমেছি বটে, কিন্তু দেশে যাবার আর ফুরসৎ হয়ে ওঠে নি। আর কী-ই বা হত গিয়ে, বাপ-মা মরে গিয়েছে, বউ-বিবিও তখন ছিল না। যতদিন বেঁচে ছিল, বাপকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতাম—বুড়া শেষের ক বছর সুখেই কাটিয়েছে—খুদাতালার শুকুর—বুড়ী নাকি আমার জন্য কাঁদত। তা হুজুর দরিয়ার অঁথে নোনা পানি যাকে কাতর করতে পারে না, বুড়ির দু ফোঁটা নোনা জল তার আর কী করতে পারে বলুন!’

বলল বটে হক কথা, তবু সারেঙের চোখেও এক ফোঁটা নোনা জল দেখা দিল।

সারেঙ বললে, ‘যাক সে কথা। এ সাত বছর মাঝে মাঝে এর মুখ থেকে ওর মুখ থেকে খবর কিংবা গুজব, যাই বলুন, শুনছি, সমীরন্দী বহুত পয়সা কামিয়েছে, দেশেও নাকি টাকা পাঠায়, তবে সে আশ্চর্য্য গেড়ে বসেছে মিরকিন মুল্লুকে, দেশে ফেরার কোন মতলব নেই। তাই নিয়ে আমি আফসোস করি নি, কারণ খুদাতালা যে কার জন্য কোন মুল্লুকে দানাপানি রাখেন, তার হাদিস বাতলাবে কে?’

‘তারপর কল-ঘরের তেলে-পিছল মেঝেতে আছাড় খেয়ে ভেঙে গেল আমার পায়ের হাঁড়ি। বড় জাহাজের কাম ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসে ঢুকলাম

ডিসপ্যাচারের কামে। এ-জাহাজে আসার দুদিন পরে, একদিন খুব ভোরবেলা ফজরের নামাজের ওজু করতে যাচ্ছি, এমন সময় তাব্বাজব মেনে দেখি, ডেকে বসে রয়েছে সমীরুদ্দী! বৃকে জাবড়ে ধরে তাকে বললাম, ভাই সমীরুদ্দী! এক লহমায় আমার মনে পড়ে গেল, সমীরুদ্দীকে এককালে আমি আপনার ভাইয়ের মতন কতই না প্যার করেছি।’

‘কিন্তু তাকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার চেয়েও বেশী তাব্বাজব লাগল আমার, সে আমার প্যারে কোন সাড়া দিল না বলে। গাঙের দিকে মূখ করে পাথরের পদুতুলের মত বসে রইল সে। শূখালাম, “তোর দেশে ফেরার খবর তো আমি পাই নি। আবার এ জাহাজে করে চলেছিস তুই কোথায়? কলকাতা? কেন? দেশে মন টিকল না?”’

‘কোন কথা কয় না। ফাকির-দরবেশের মত বসে রইল ঠায়, তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, যেন আমাকে দেখতেই পায় নি।’

‘বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে। ভখনকার মত তাকে আর কথা কওবার চেষ্টা না করে, ঠেলেঠেলে কোন গতিকে তাকে নিয়ে গেলাম আমার কেবিনে। নাশতার পেলেট সামনে ধরলাম, আঙা ভাজা ও পরটা দিয়ে সাজিয়ে—ওই থেতে সে বড় ভালবাসত—কিছু মুখে দিতে চায় না। তবু জোর করে গেলাম, বাচ্চাহারা মাকে মানুষ যে-রকম মুখে খাবার ঠেসে দেয়, কিন্তু হুজুর, পরের জন্য অনেক কিছু করা যায়, জ্ঞানতক কুরবানি দিয়ে তাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু পরের জন্য খাবার গিলি কী করে?’

‘সেদিন দুপুরবেলা তাকে কিছুতেই গোয়ালশেদ নামতে দিলাম না আমার, হুজুর, মনে পড়ে গেল বহু বৎসরের পুরনো কথা—নুউক বন্দরেও আমাদের নামতে দেয় নি, তখন সমীরুদ্দী সেখানেই গায়েব হয়েছিল।

‘রাত্রের অন্ধকারে সমীরুদ্দীর মূখ ফুটল।

‘হঠাৎ নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করল, কী ঘটছে।’

সারেও দম নেবার জন্য না অন্য কোন কারণে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বুঝতে পারলুম না। আমিও কোন খোঁচা দিলুম না। বললে, ‘তা সে দুঃখের কাহিনী—ঠিক ঠিক বলি কী করে সাহেব? এখনও মনে আছে, কেবিনের ঘোরঘুটি অন্ধকারে সে আমাকে সব-কিছু বলেছিল। এক-একটা কথা যেন সে-অন্ধকার ফুটো করে আমার কানে এসে বিশ্লেষিত, আর অতি অল্প কথায়ই সে সব কিছু সেরে দিয়েছিল।’

‘সাত বছরে সে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল দেশে তার ছোট ভাইকে। বিশ হাজার টাকা কতখানি হয়, তা আমি জানি নে, একসঙ্গে কখনও চোখে দেখি নি—’

‘আমি বললুম, ‘আমিও জানি নে, আমিও দেখি নি।’

‘তবেই বুঝুন হুজুর, সে-টাকা কামাতে হলে কটা জ্ঞান কুরবানি দিতে হয়।’

‘প্রথম শাচশো টাকা পাঠিয়ে ভাইকে লিখলে, মহাজনের টাকা শোধ দিয়ে বাড়ি ছাড়াতে। তার পরের হাজার দেড়েক বাড়ির পাশের পতিত জমি কেনার

জন্য। তারপর আরও অনেক টাকা দিঘি খোদাবার জন্য, তারপর আরও বহুত টাকা শহুরী ঢঙে পাকা চুনকাম করা দেয়াল-ওলা টাইলের চারখানা বড় ঘরের জন্য, আরও টাকা ধানের জমি, বলদ, গাই, গোয়ালঘর, মরাই, বাড়ির পিছনে মেয়েদের পুকুর, এসব করার জন্য এবং সর্বশেষে হাজার পাঁচেক টাকা টাঙঘরের উম্টোদিকে দিঘির এপারে পাকা মসজিদ বানাবার জন্য।

‘সাত বছর ধরে সমীরুদ্দী মিরকিন মুল্লুকে, অসুন্দের মত খেটে দু’ শিফ্ট আড়াই শিফ্টে গতর খাটিয়ে জান পানি করে পয়সা কামিয়েছে, তার প্রত্যেকটি কড়ি হালালের রোজকার, আর আপন খাই-খরচার জন্য সে যা পয়সা খরচ করেছে, তা দিয়ে মিরকিন মুল্লুকের ভিথারীও দিন গুজরান হয় না।

‘সব পয়সা সে ঢেলে দিয়েছে বাড়ি বানাবার জন্য, জমি কেনার জন্য। মিরকিন মুল্লুকের মানুষ যেরকম চাষবাসের খামার করে, আর ভদ্রলোকের মত ফ্যাশানের বাড়িতে থাকে, সে দেশে ফিরে সেই রকম করবে বলে।’

‘ওদিকে ভাই প্রতি চিঠিতে লিখেছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে—করে করে যেদিন সে খবর পেল মসজিদ তৈরী শেষ হয়েছে, সেদিন রওয়ানা দিল দেশের দিকে। নুউক বন্দরে জাহাজে কাজ পায় আনাড়ী কালা আদমিও বিনা তকলিফে। তার ওপর সমীরুদ্দী হরেক রকম কারখানার কাজ করে করে বলকজা এমনি ভাল শিখে গিয়েছিল যে, তারই সার্টিফিকেটের জোরে, জাহাজে আরামের চাকরি করে ফিরল খিদিরপুর। সম্ভ্যর সময় জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে গেল শেয়ালদা। সেখানে প্লাটফর্মে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে চাটগাঁ মেল ধরে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে পৌঁছল রাত তিনটেয়। সেখান থেকে হেঁটে রওয়ানা দিল ধলাইছড়ার দিকে—আট মাইল রাস্তা, ভোর হতে না-হতেই বাড়ি পৌঁছে যাবে।’

‘রাস্তা থেকে পোয়াটাক মাইল ধানক্ষেত, তারপর ধলাইছড়া গ্রাম। আলের উপর দিয়ে গ্রামে পৌঁছতে হয়।’

‘বিহানের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সমীরুদ্দী পৌঁছল ধানক্ষেতের মাঝখানে।’

‘মসজিদের একটা উঁচু মিনার থাকার কথা ছিল—কারণ মসজিদের নকশাটা সমীরুদ্দীকে করে দিয়েছিলেন এক মিশরী ইঞ্জিনিয়ার, আর হুজুরও মিশর মুল্লুকে বহুকাল কাটিয়েছেন, তাদের মসজিদে মিনারের বাহার হুজুর দেখেছেন, আমাদের চেয়ে ঢের বেশী।’

‘কত দূর-দরাজ থেকে সে-মিনার দেখা যায়, সে আপনি জানেন, আমিও জানি, সমীরুদ্দীও জানে।’

‘মিনার না দেখতে পেয়ে সমীরুদ্দী আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে দেখে—কোথায় দিঘি, কোথায় টাইলের টাঙঘর।’

‘আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, ‘সে কী কথা!’

সারেও যেন আমার প্রশ্ন শুনতে পায় নি। আচ্ছন্দের মত বলে যেতে লাগল, ‘কিছু না, কিছু না, সেই পুরনো ভাঙা খড়ের ঘর, আরও পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেদিন সে বাড়ি ছেড়েছিল, সেদিন ঘরটা ছিল চারটা বাঁশের

ঠেকনার খাড়া, আজ দেখে ছটা ঠেকনা। তবে কি ছোট ভাই বাড়ি-ঘরদোর গায়ের অন্য দিকে বানিয়েছে? কই, তা হলে তো নিশ্চয়ই সে-কথা কোন-না-কোন চিঠিতে লিখত। এমন সময় দেখে গায়ের বাসিত মোল্লা। মোল্লাজী আমাদের সবাইকে বস্তু প্যার করেন। সমীরন্দীকে আদর করে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন।’

‘প্রথমটায় তিনিও কিছ্ বলতে চান নি। পরে সমীরন্দীর চাপে পড়ে সেই ধানক্ষেতের মাধ্যখানে তাকে খবরটা দিলেন। তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে। গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, মৌলবীবাজারে, শেষের দিকে কলকাতায়—ঘোড়া, মেয়েমানুষ আরও কত কী।’

আমি থাকতে না পেরে বললুম, ‘বল কী সারেঙ! এরকম ঘা মানুষ কি সহিতে পারে? কিন্তু বল দিকিন, গায়ের কেউ তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন?’

সারেঙ বললে, ‘তারাই বা জানবে কি করে, সমীরন্দী কেন টাকা পাঠাচ্ছে। সমীরন্দীর ভাই ওদের বলেছে, বড় ভাই বিদেশে লাখ টাকা কামায়, আমাকে ফুঁতি-ফাতির জন্য তারই কিছ্টা পাঠায়। সমীরন্দীর চিঠিও সে কাউকে দিয়ে পড়ায় নি—সমীরন্দী নিজে আমারই মত লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হারামজাদা ভাইটাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তবু মোল্লাজী আর গায়ের পাঁচজন তার টাকা ওড়বার বহর দেখে তাকে বাড়ি-ঘরদোর বাঁধতে, জমি-খামার কিনতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সে নাকি উত্তরে বলেছিল, বড় ভাই বিয়ে শাদি করে মিরকিন মুল্লুকে গেরস্থালী পেতেছে, এ দেশে আর ফিরবে না, আর যদি ফেরেই বা, সঙ্গে নিয়ে আসবে লাখ টাকা। তিন দিনের ভিতর দশখানা বাড়ি হাঁকিয়ে দেবে।’

আমি বললুম, ‘উঃ! কী পাষণ্ড! তারপর?’

সারেঙ বললে, ‘সমীরন্দী আর গায়ের ভিতর ঢোকে নি। সেই ধানক্ষেত থেকে উঠে ফিরে গেল আবার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে। সমীরন্দী আমাকে বলে নি কিন্তু মোল্লাজী নিশ্চয়ই তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু সে ফেরে নি। শুধু বলেছিল, যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।’

‘কলকাতার গাড়ি সেই রাত আটটায়। মোল্লাজী আর গায়ের মদ্রদুর্বারী তার ভাইকে নিয়ে এলেন স্টেশনে—টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে সে গিয়েই ছিল। সমীরন্দীর দু পা জড়িয়ে ধরে সে মাপ চেয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে। আরও পাঁচজন বললেন, বাড়ি চল, ফের মিরকিন যাবি তো যাবি, কিন্তু এতদিন পরে দেশে এসেছিস, দুদিন জিরিয়ে যা।’

আমি বললুম, ‘রাস্কলটা কোন্ মদ্রু নিয়ে ভাইয়ের কাছে এল সারেঙ?’

সারেঙ বললে, ‘আমিও তাই পদুছি। কিন্তু জানেন সারয়েব, সমীরন্দী কী করলে? ভাইকে লাথি মারলে না, কিছ্ না, শুধু বললে সে বাড়ি ফিরে যাবে না।’

‘তার পরদিন ভোরবেলা এই জাহাজে তার সঙ্গে দেখা। আপনাকে তো বলছি, শা-বন্দরের বারদুগীর পুতুলের মত চুপ করে বসে।’

দম নিয়ে সারেঙ বললে, ‘অতি অল্প কথায় সমীরন্দী আমাকে সব-কিছু বলিছিল। কিন্তু হুজুর, শেষটায় সে যা আপন মনে বিড়বিড় করে বলিছিল, তার মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তবে কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলিছিল, “ভিখরী স্বপ্নে দেখে, সে বড়লোক হয়ে গিয়েছে, তারপর ঘুম ভাঙতেই সে দেখে সে আবার দুনিয়ায়। আমি দেশে টাকা পাঠিয়ে বাড়ি ঘরদোর বানিয়ে হয়েছিলাম বড়লোক, সেই দুনিয়া যখন ভেঙে গেল তখন আমি গেলাম কোথায়?”’

বাস্তব ঘটনা না হয়ে যদি শুধু গল্প হত, তবে এইখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু আমি যখন যা শুনছি তাই লিখছি তখন সারেঙের বাদবাকি কাহিনী না বললে অনায়াস হবে।

সারেঙ বললে, ‘চৌদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার সবক্ষণ মনে হয় যেন কাল সাঁঝে সমীরন্দী আমার কেবিনের অন্ধকারে তার ছাতির খুন ঝাঁকিয়েছিল।’

‘কিন্তু ওই যে ইনসাফ বললেন না হুজুর, তার পাত্তা দেবে কে?’

‘সমীরন্দী মিরাকিন মূল্যকে ফিরে গিয়ে দশ বছরে আবার তিরিশ হাজার টাকা কামায়। এবারে আর ভাইকে টাকা পাঠায় নি। সেই ধন নিয়ে যখন দেশে ফিরিছিল তখন জাহাজে মারা যায়। প্রিসংসারে তার আর কেউ ছিল না বলে টাকাটা পেঁছিল সেই ভাইয়েরই কাছে। আবার সে টাকাটা ওড়াল।’

ইনসাফ কোথায়?

নোনামিঠা

ব্যারোমিটার দেখে, কাগজ-পত্র ঘেঁটে জানা যায়, লাল-দরিয়া এমন কিছু গরম জায়গা নয়। জেকাবাদ পেশওয়ার দূরে থাক, যারা, পাটনা-গম্মার গরমটা ভোগ করেছেন তাঁরা আবহাওয়া-দপ্তরে তৈরি লাল-দরিয়ার জন্ম-কুণ্ডলী দেখে বিচলিত তো হবেন-ই না, বরঞ্চ ঈষৎ মৃদু হাস্যও করবেন। আর উন্নাসিক পৰ্যটক হলে হয়তো প্রশ্ন করেই বসবেন, ‘হালকা আল-সুটারটার দরকার হবে না তো!’

অথচ প্রতিবারেই আমার মনে হয়েছে, লাল-দরিয়া আমাকে যেন পাক সার্কাসের হোটেলে খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক-কাবাব ঝলসচ্ছে। ভুল বললুম; মনে হয়েছে, যেন হাঁড়িতে ফেলে, ঢাকনা লেই দিয়ে সেঁটে আমাকে ‘দম-পুখতের’ রান্না বা ‘পুটপক’ করেছে। ফুটবলীদের যে রকম ‘বগি-টীম’ হয়, লাল-দরিয়া আমার ‘বগি-সী’।

সমস্ত দিনটা কাটাই জাহাজের বৈঠকখানায় হাঁপাতে হাঁপাতে আর বরফভর্তি গেলাসটা কপালে ঘাড়ে নাকে ঘষে ঘষে, আর বাতের ভিনটে বামই কাটাই রকে অর্থাৎ ডেকে তারা গুনে গুনে। আমার বিশ্বাস ভগবান লাল-দরিয়া গড়েছেন চতুর্থ ভূতকে বাদ দিয়ে। ওর সমুদ্রে যদি কখনও হাওয়া বয় তবে নিশ্চয়ই কিছু ভূতই বলতে হবে।

তাই সে রাতে ব্যাপারটা আমার কিম্বদন্তু বলেই মনে হল।

ডেক-চেরারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রা। এমন সময় কানে এল, সেই লাল-দরিয়ায়, দেশ থেকে বহুদূরের সেই সাত সমুদ্রের এক সমুদ্রে—সিলেটের বাঙাল ভাষা। স্বপ্নই হবে। জানতুম, সে-জাহাজে আমি ছাড়া আর কোন সিলেটী ছিল না। এ-রকম মরমিয়া সূরে মাঝ রাত্রে, কে কাকে 'ভাই, হি কথা যদি তলচস'—বলতে যায়? খেয়ালী-পোলাও চাখতে, আকাশ-কুসুম শব্দ কতে, স্বপ্নের গান শুনতে কোনও খরচা নেই; তাই ভাবলাম চোখ বন্ধ করে স্বপ্নটা আরও কিছুদ্ধকণ ধরে দেখি।

কিন্তু ওই তো স্বপ্নের একটিমাত্র দোষ। ঠিক যখন মনে হবে, বেশ জমে আসছে, ঠিক তখনই ঘুমটি যাবে ভেঙে। এম্বলেও সে-আইনের ব্যত্যয় হল না। চোখ খুলে দেখি, সামনে—আমার দিকে পিছন ফিরে দুজন খালাসী চাপা গলায় কথা বলছে।

বেচারীরা। রাত বারোটোর পর এদের অনুমতি আছে ডেকে আসবার। তাও দল বেঁধে নয়। বাকী দিনের অসহ্য গরম তাদের কাটাতে হয় জাহাজের পেটের ভিতরে।

সিলেট-নোয়াখালির লোক যে পৃথিবীর সর্বত্রই জাহাজে খালাসীর কাজ করে সে-কথা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, তারা কাজ করে মাল-জাহাজেই; এ ফরাসী বাহরী-জাহাজে রাষ্ট্র শ্বিপ্রহরে, তাও আবার নোয়াখালি চাটগাঁয়ের নয়, একদম খাঁটি আমার আপন দেশ সিলেটের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তার সম্ভাবনা স্বপ্নেই বেশী, বাস্তবে কম।

এরা কথা বলছিল খুবই কম। যেটুকু শুনতে পেলুম, তার থেকে কিন্তু একথাটা স্পষ্ট বোঝা গেল, এদের একজন এই প্রথম জাহাজের 'কামে' ঢুকেছে এবং দেশের ঘরবাড়ির জন্য তার মন বড় উতলা হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গী পূরনো লোক; নতুন বউকে যে-রকম বাপের বাড়ির দাসী সাম্বনা দেয় এর কথার ধরন অনেকটা সেই রকমের।

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলাম। শেষটায় যখন দেখলাম ওরা উঠি-উঠি করছে তখন আমি কোনও প্রকারের ভূমিকা না দিয়েই হঠাৎ অতি খাঁটি সিলেটীতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের বাড়ি সিলেটের কোন গ্রামে?'

সিলেটের খালাসীরা দুনিয়ায় তাবৎ দরিয়ার মাছের মত কিলবিল করে এস-তা সবাই জানে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের সত্য—সিলেটের ভদ্রসন্তান পারতপক্ষে কখনও বিদেশ যায় না। তাই লাল-দরিয়ার মাঝখানে সিলেটী শুনে আমার মনে হয়েছিল, ওটা স্বপ্ন; সেইখানে সিলেটী ভদ্রসন্তান দেখে ওদের মনে হল, আজ মহাপ্রলয় (কিয়ামতের দিন) উপস্থিত। শাস্ত্রে আছে, ওই দিনই আমাদের সকলের দেখা হবে এক-ই জায়গায়; ভূত দেখলেও মানুষ অতথানি লাফ দেয় না। দুজন যেভাবে একই তালে-লয়ে লাফ দিল তা দেখে মনে হল ওরা যেন ওই কর্মীট বহুদিন ধরে মহড়া দিয়ে আসছে।

উভয় পক্ষ কথিঞ্চ শান্ত হওয়ার পর আমি সিগারেট-কেস খুলে ওদের

সামনে ধরলুম। দৃষ্টিতেই সকসঙ্গে কানে হাত দিয়ে জ্বিত কাটল। আমাকে তারা চেনে না বটে—আমি দেশ ছেড়েছি ছেলেবেলায়—তবে আমার কথা তারা শুনছে এবং আমার বাপ-ঠাকুরদার পায়ের ধূলো তারা বিস্তর নিয়েছে, খুদাতালার বেহদু মেহেরবারি, আজ তারা আমার দর্শন পেল। আমার সামনে ওসব—তওবা, তওবা ইত্যাদি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার দেশের চাষারা ইয়োরোপীয় চাষার চেয়ে ঢের বেশী ভদ্র।

খালাসী-জীবনের কষ্ট এবং আর পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথাও হল। দুঃখের কথাই পনের আনা তিন পয়সা। বাকী এক পয়সা সুখ—অর্থাৎ মাইনেটা, সেই এক পয়সাই পঁচাত্তর টাকা। ওই দিয়ে বাড়ির ছাড়াবে, জমি-জমা কিনবে।

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শূদ্রালুম, ‘আহারাদি?’ রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে।

বললে, ‘ওই তো আসল দুঃখ হুজুর। আমি তো তবু পুরোন লোক। পাঁউরুটি আমার গলায় গিঁট বাঁধে না। কিন্তু এই ছেলেটার জ্ঞান পাত্তাভাতে পোতা। পাত্তাভাত! ভাতেরই নেই খোঁজ, ও চাল পাত্তাভাত। মূলে নেই ঘর, পূর্ব দিয়া তিন দোর। হুঃ।’

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘সে কী কথা! আমি তো শুনছি, আর কিছু না হোক তোমাদের ডাল ভাত প্রচুর খেতে দেয়। জাহাজের কাম করে কেউ তো কখনও রোগা হয়ে দেশে ফেরে নি!’

বললে, ঠিকই শুনছেন সারেব। কিন্তু ব্যাপার হয়েছে কী, কোনও কোনও বন্দরে চাল এখন মাগ্গি। সারেঙ আমাদের রুটি খাইয়ে চাল জমাচ্ছে ওই সব বন্দরে লুকিয়ে চাল বিক্রি করবে বলে। সারেঙ দেশের জাতভাই কি না, না হলে অন্য মারার কৌশল জানবে কী করে?’

আমি বললুম, ‘নালিশ ফরিয়াদ কর নি?’

বললে, ‘কে বোঝে কার বুলি? এদের ভাষা কি জানি “ফ্রিঞ্চ” না কী, সারেঙই একটুখানি বলতে পারে। ইংরিজী হলেও না হয় আমাদের মুরদুবীদের কেউ কেউ ওপরওয়ালাদের জানাতে পারতেন। ওই তো সারেঙের কল! ধন্য জাহাজ; ব্যাটারা শুনিয়ে কোলা ব্যাঙ খরে খরে খায়। সেলাম সারেব, আজ উঠি। দেরি হয়ে গিয়েছে। আপনার কথা শুনো জানটা—’

আমি বললুম, ‘বাস বাস।’

মাঝরাতের স্বপ্ন আর শেষরাতের ঘটনা মানদুশ নাকি সহজেই ভুলে যায়। আমার আবার চমৎকার স্মৃতিশক্তি—সব কথাই ভুলে যাই। তাই ভাতের কেছা মনে পড়ল, দুপুরবেলা লাঞ্চার সময় রাইস-কারি দেখে।

জাহাজটা ফরাসিস, ফরাসিসে ভর্তি। আসলে এটা ইণ্ডো-চীন থেকে ফরাসী সেপাই লস্কর লাদাই করে ফ্রান্স যাবার মূখে পিণ্ডিচেরিতে একটা টুং মেরে যায়। প্যাসেঞ্জার মাঠই পণ্টনের লোক, আমরা গুড়টিকয়েক ভারতীয়ই উটকো মাল। খানার্টোবিলে আমার পাশে বসত একটি ছোকরা স্‌লিগোয়না—অর্থাৎ সাব অলটার্ন। আমার নিতান্ত নিজস্ব মৌলিক ফরাসিসে তাকে রাতের ঘটনাদি গল্পছলো নিবেদন করলুম।

শুনে সে তো মহা উত্তেজিত। আমি অবাক! ছুরি কাঁটা টেবিলে রেখে, মিলিটারি গলার ঝাঁজ লাগিয়ে বলতে শুরু করলে, 'এ ভারি অন্যান্য, অত্যন্ত অবিচার, ইনুই—অন-হার্ড-অব—, ফাঁতাস্তিক—ফেনটাসটিক আরও কত কী!'

আমি বললুম, 'রোস রোস। এত গরম হচ্ছে কেন? এ অবিচার তো দুর্নিয়ন্ত্রণ সব'ই হচ্ছে, আকছারই হচ্ছে। এই যে তুমি ইন্দোচীন থেকে ফিরছ, সেখানে কি কোন ড্যানিয়েলগিরি করতে গিয়েছিলে, যো গার্সো (বাছা) ! ওসব কথা থাক, দুটি খাও।'

ছোঁকরাটির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল বলেই কথাটা বলবার সাহস হয়েছিল। বরং ইংরেজকে এ-সব কথা বলবেন, ফরাসিকে বললে হাতাহাতি বোতল-ফাটামাটির সম্ভাবনাই বেশী।

চুপ মেরে একটু ভেবে বললে, 'হঃ। কিন্তু এস্থলে তো দোষী তোমরাই জাতভাই ইন্ডিয়ান সারেও!'

আমি বিসম্মত হয়ে বললুম, 'ওই-য-যা!'

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ এখনও দেখলুম না যেখানে মানুষ সুযোগ পেলে দুপদুরবেলা ঘুমোয় না। তবু কেন বাঙালীর ধারণা যে, সে-ই এ ধনের একমাত্র অধিকারী, এখনও বুঝে উঠতে পারি নি। আপন আপন ডেকচেরারে শুয়ে, চোখে ফেটা মেরে আর পাঁচটি ফরাসিসের সঙ্গে কোরাসে ওই কর্মটি সবেমাত্র সম্মাধান করেছি, এমন সময় উর্দু-পরা এক নৌ-অফিসার আমার সামনে এসে অতিশয় সৌজন্য সহকারে অবনত মস্তকে যেন প্রকাশ্যে আত্মচিন্তা করলেন, 'আমি কি মসিয়ো অমূকের সঙ্গে আলাপ করার আনন্দ করছি?'

আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, আরও অবনত মস্তকে বললুম, 'আদপেই না। এ শ্লাঘা সম্পূর্ণ আমার-ই।'

অফিসার বললেন, 'মসিয়ো ল্য কমাদাঁ—জাহাজের কাপ্তান সাহেব—মসিয়োকে—আমাকে—তার সবশ্রেষ্ঠ আনন্দাভিবাদন জানিয়ে প্রার্থনা করছেন যে, তিনি যদি মসিয়োর উপস্থিতি পান তবে উল্লসিত হবেন।'

পাপাত্মা আমি। ভয়ে আঁতকে উঠলুম। আবার কী অপকর্ম করে ফেলছি যে, মসিয়ো ল্য কমাদাঁ আমার জন্য হুঁলিয়া জারি করেছেন। শূকনো মুখে ঢৌক গিলে বললুম, 'সেই হবে আমার এ-জীবনের সব চেয়ে বড় সম্মান। আমি আপনার পথপ্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল।'

মসিয়ো ল্য কমাদাঁ যদিও যাত্রী-জাহাজের কাপ্তান, তবু দেখলুম তার ঠোঁটের উপর ভাসছে আর-একখানি জাহাজ এবং সেটা সবপ্রকার বিনয় এবং স্তুতি-জ্ঞোক্তবাক্যে টেটবুদ লাদাই। ভদ্রতার মানওয়ারী বললেও অত্যাধিক হয় না। তবে মোশাদ কথা যা বললেন, তার অর্থ আমার মত বহুভাষী পণ্ডিত গ্রিভুবনে আর হয় না, এমন কী প্যারিসেও হয় না।

এত বড় একটা মারাত্মক ভ্রমাত্মক তথ্য তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন

এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করব করব করছি, এমন সময় তাঁর কথার তোড় থেকেই বেরিয়ে গেল, তিনি তিনশো তিরানব্বুই বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এই প্রথম একটি মহাপণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন, যিনি তাঁর খালাসীদের কিচির-মিচিরের একটা অর্থ বের করতে পারেন। যাক, নিশ্চিত হওয়া গেল। তা হলে আমার মত আরও বহু লক্ষ পণ্ডিত সিলেট জেলায় আছেন। তারপর তিনি অনুরোধ করলেন, আমি যদি দয়া করে তাঁর খালাসীদের অসন্তুষ্টির কারণটি খোলসা করে বর্ণনা করি, তবে তিনি বড় উপকৃত হন। আমি তাই করলুম। তখন সেই খালাসীদের আর সারেঙের ডাক পড়ল। তারা কুরবানির পাঠার মত কাঁপতে কাঁপতে উপস্থিত হল।

কাশান আর জজ ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী। সাক্ষীর বয়স কত, সেই আলোচনায় জজেরা হেসে-খেলে সাতটি দিন কাটিয়ে দেন; কাশানরা দেখলুম, তিন মিনিটেই ফাঁসির হুকুম দিতে পারেন। মসিয়ো ল্য কমাদাঁ অতি শান্তকণ্ঠে এবং প্রাজ্ঞল ফরাসীতে সারেঙকে বুঝিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে তিনি যদি আর কখনও এরকম কেলেকারির খবর পান, তবে তিনি একটিমাত্র বাক্যব্যয় না করে সারেঙকে সমুদ্রের জলে ফেলে তার উপর জাহাজের প্রপেলারটি চালিয়ে দেবেন।

যাক। বাঁচা গেল। মরবে তো সারেঙটা!

পানির পীর বদর সায়েব। তাঁর কৃপায় রক্ষা পেয়ে ‘বদর বদর’ বলে কেবিনে ফিরলুম।

খানিকক্ষণ পর চীনা কেবিন-বয় তার নিজস্ব ফরাসীতে বলে গেল, খালাসীরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে আজ যেন আমি মেহেরবানি করে কেবিনে বসে তাদের পাঠানো ‘ডাল-ভাত’ খাই।

গোয়ালন্দী জাহাজের মামুলী রাইস কারি খেয়েই আপনারা আ-হা হা করেন, সেই জাহাজের বাবুচাঁরা যখন কোর্মা কালিয়া পাঠায়, তখন কী অবস্থা হয়? নাঃ, বলব না। দু-একবার ভোজনেব বর্ণনা করার ফলে শহরে আমার বদনাম রটে গিয়েছে, আমি পেটুক এবং বিশ্বনিন্দুক। আমি শুধু অন্যের রন্ধনের নিন্দা করতেই জানি। আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়েছে। তামা-তুলসী স্পর্শ করে এই শপথ করলুম—না, থাক, আপনার আমার বাড়িতে মা-বোনদের আমি একটি লাস্ট চাম্স দিলুম।

কাশান সাহেব আমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছেন। খালাসীরা তাই এখন নির্ভয়ে খাবার নিয়ে আমার কেবিনে আসে।

এমনি করে জাহাজের শেষ রাত্রি উপস্থিত হল। সে-রাত্রের খালাসীদের তৈরী গ্যালা-ব্যানকুয়েট খেয়ে যখন বাওক এ-পাশ ও-পাশ করছি, এমন সময় খালাসীদের মুরুব্বীটি আমার পায়ের কাছটার পাটাতনে বসে হাতজোড় করে বললে, ‘হুজুর, একটি নিবেদন আছে।’

মোগলাই খানা খেয়ে তখন তবিলত বেজায় খুশ। মোগলাই কণ্ঠেই ফরমান জারি করলুম, ‘নির্ভয়ে কও।’

বললে, ‘হুজুর ইটা পরগনার ডেউপাশা গায়ের নাম শুনছেন?’

আমি বললুম, ‘আলবত! মনু গাঙ্গের পারে।’

বললে, ‘আহা, হুজুর সব জানেন।’

মনে মনে বললুম, ‘হায়, শূদ্ধ কাপ্তান আর খালাসীরই বৃদ্ধিতে পারল আমি কত বড় বিদ্যোসাগর। যারা বৃদ্ধিতে পারলে আজ আমার পাওনাদারদের ভয় ঘুচে যেত তারা বৃদ্ধ না।’

বললে, ‘সেই গ্রামের করীম মুহম্মদের কথাই আপনাকে বলতে এসেছি, হুজুর। করীম ব্যাটা মহাপাষাণ্ড, চোদ্দ বছর ধরে মাস’ই (মার্স’লেস) বন্দরে পড়ে আছে। ওঁদিকে বড়ী মা কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো কানা করে ফেলেছে; কত খবর পাঠিয়েছে। হা—কিছুতেই দেশে ফিরবে না। চিঠিপত্রে কিছু হল না দেখে আমরা বন্দরে নেমে তার বাড়ি গিয়েছিলাম, তাকে বোঝাবার জন্য। ব্যাটার বউ এক রেঙথেকী, এমন তাড়া লাগালে যে আমরা পাঁচজন মন্দা মানুষ প্রাণ বাঁচিয়ে পালাবার পথ পাই নে। তবে শুনছি, মেয়ে-মানুষটা প্রথম প্রথম নাকি তার ভাতারের দেশের লোককে আদর-কদর করত। যবে থেকে বুঝেছে, আমরা তাকে ভাঙাচি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার তালে আছি, সেই থেকে মারমুখো খাণ্ডার হয়ে আছে।’

আমি বললুম, ‘তোমরা পাঁচজন লেঠেল যে-কম’টি করতে পারলে না, আমি সেইটে পারব? আমাকে কি গামা পাহলওয়ান ঠাউরেছে?’

বললে, ‘না, হুজুর, আপনাকে কিছু বলবে না। আপনি সুটে টাই পরে গেলে ভাববে আপনি এসেছেন অন্য কাজে। আমাদের লুঙ্গি আর চেহারা দেখেই তো বেরাটী টের পেয়ে যায়, আমরা তার ভাতারের জাত-ভাই। আপনি হুজুর, মেহেরবানি করে “না” বলবেন না, আপনার যে কতখানি দয়ার শরীর সে-কথা বেবাক খালাসী জানে বলেই আমাকে তারা পাঠিয়েছে। আপনার জন্যই আজ আমরা ভাত—’

আমি বললুম, ‘বাস্ বাস, হয়েছে হয়েছে। কাপ্তান পাকড়ে নিয়ে শূধাল বলেই তো সব কথা বলতে হল। না হলে আমার দায় পড়েছিল।’

বললে, ‘তওবা, তওবা। শুনলেও গুনা হয়। তা হুজুর, আপনি দয়া করে আর “না” বলবেন না। আমি বড়ীর হয়ে আপনার পায়ে ধরিছি।’

বলে সত্য-সত্যই আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। আমি ‘হাঁ হাঁ, কর কী, কর কী’ বলে পা দুটো ছাড়ালুম।

ওরা আমাকে যা কোর্মা-পোলাও খাইয়েছে তার বদলে এ-কাজটুকু না করে দিলে অত্যন্ত নেমকহারামি হয়, ওঁদিকে আবার এক ফরাসিনী দৃষ্টি। কিংবা ভাঙা ছাতা নয়, পিস্তল হাতে নিয়ে তাড়া লাগানোই ওদের স্বভাব।

কোন মূর্খ বেরল দেশভ্রমণে! কত না বাহান্ন রকমের যত সব বিদ্বৎসে, খুদার খামকা গেরো।

বন্দরে নেমে দেখি, পরদিন ভোরের আগে বালিন ধাবার সোজা ট্রেন

নেই। ফাঁকি দিয়ে গেরোটো কাটাও তারও উপায় আর রইল না। দুজন খালাসী নেমেছিল সঙ্গে—টেউপাশার নাগরের বাড়ি দেখিয়ে দেবে বলে। তাদের পরনে লুঙ্গি, গায়ে রঙিন শার্ট, মাথায় খেজুর-পাতার টুপি, পায়ে বুট, আর গলায় লাল কম্বোর্টার। ওই কম্বোর্টারিট না থাকলে ওদের পোশাকী সম্ভ্রাটি সম্পূর্ণ হয় না—বাঙালীর যেন-রকম রেশমী উড়ুনি।

দুই হুজুরে আমাকে ‘হুজুর’ ‘হুজুর’ করতে করতে নিয়ে গেল বন্দরের এক সাবাবর্বে। সেখানে দুরের থেকে সস্তপর্ণে ছোট্ট একটি ফুটফুটে বাড়ি দেখিয়ে দিয়েই তাঁরা হাওয়া হয়ে গেলেন। আমি প্রমাদ গুনতে গুনতে এগলুম। পানির পীর বদর সায়েবকে এখন আর স্মরণ করে কোনও লাভ নেই। তাই সৈদ্রবনের ডাঙার বাঘের পীর গাজী সাহেবের নাম মনে মনে জপতে লাগলুম—যাচ্ছ বাঘিনীরই সঙ্গে মোলাকাত করতে।

বেশ জোরেই বোতাম টিপলুম—চোরের মায়ের বড় গলা।

কে বলে খাণ্ডার? দরজা খুলে একটি গ্রিশ-বগ্রিশ বছরের অতিশয় নিরীহ-চেহারার গো-বেচারী যুবতী এসে আমার সামনে দাঁড়াল। ‘গো’-বেচারী বললুম তার কারণ আমাদের দেশটা গরুর। আসলে কিন্তু ওদের দেশের তুলনা দিয়ে বলতে হয়, ‘মেরি হ্যাড এ লিটল ল্যাম’-এর ভেড়াটি যেন মেরির রূপ নিয়ে এসে দাঁড়াল। ওদিকে আমি তৈরি ছিলুম পিঙ্কল, মেশিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেডের জন্য। সামলে নিয়ে জাহাজে যে চোস্ত ফরাসিস আদব-কায়দার তালিম পেয়েছিলুম, তারই অনুকরণে মাথা নিচু করে বললুম, ‘আমি কি মাদাম মা-ও মের (মুহম্মদের ফরাসী উচ্চারণ) সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ লাভ করছি?’ ইচ্ছে করেই কোন দিশী লোক সেটা উল্লেখ করলুম না। ফরাসীরা চীনা ভারতীয় এবং আরবীদের মধ্যে তফাত করতে পারেন না। আমরা যে রকম চীনা, জাপানী এবং বর্মী সবাইকে একই রূপে দেখি।

চেহারা দেখে বুঝলুম মাদাম গুবলেট করে ফেলেছেন। বললেন, ‘আদ্রে (প্রবেশ করুন), মিসরো।’

ভরসা পেয়ে বললুম, ‘মিসরো মাওমের সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?’

‘অবশ্য!’

ড্রইংরুমে ঢুকে দেখি, শেখ করীম মুহম্মদ উস্তম ফরাসী স্ফুট পরে টেবিলের উপর রকমারি নকশার কাপড়ের ছোট ছোট টুকরোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ফরাসীতে বললুম, ‘আমি মাদ্রাজ থেকে এসেছি, কাল বার্লিন চলে বাব। ভাবলুম, আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই।’ সে যে ভারতীয় এবং তার ঠিকানা জানলুম কী করে সে-কথা ইচ্ছে করেই তুললুম না।

ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে অভ্যর্থনা জানাল।

আমি ইচ্ছে করেই মাদামের সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিলুম। মার্সেলস যে কী সুন্দর বন্দর, কত রকম-বেরকমের রেস্টোরাঁ-হোটেল, কত জাত-বেজাতের লোক কত-শত রকমের বেশভূষা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আরও কত কী!

ইতিমধ্যে একটি ছেলে আর মেয়ে চিংকার-চেঁচামেচি করে ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

কী সুন্দর চেহারা ! আমাদের করীম মুহম্মদ কিছু নটবরটি নন, তার বউও ফরাসী দেশের আর পাঁচটা মেয়ের মত, কিন্তু বাচ্চা দুটির চেহারায় কী অপূৰ্ব লাগল ! কে বলবে এরা খাঁটি স্প্যানিশ নয় ? সে দেশের চিত্রকরদের অয়েল পেইন্টিঙে আমি এরকম দেবশিশুর ছবি দেখেছি। ইচ্ছে করে, কোলে নিয়ে চুমো খাই। কিন্তু আশ্চর্য লাগল, পূর্বেই বলেছি, বাপের চেহারা তো বাংলা দেশের আর পাঁচজন হাল-চাষের শেখের যা হয় তা-ই, মায়ের চেহারাও সাধারণ ফরাসিনীর মত। তিন আর তিনে তা হলে সব সময় ছয় হয় না। দশও হতে পারে—ইনিফার্নাট অর্থাৎ পরিপূর্ণতাও হতে পারে। প্রেমের ফল তা হলে অকশ্যপ্তের আইন মানে না।

মাদাম ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি তোদের বাবার দেশের লোক। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি আদর করতেই বলে উঠল, 'ল্যাঁদ, সে তা' প্যাই ঈ ফাঁতাস্তিক নেস্পা ?'—অর্থাৎ ভারতবর্ষ ফেনেটাসটিকে দেশ, সে দেশের অনেক ছবি সে দেখেছে, ভারি ইচ্ছে সেখানে যায়, কিন্তু বাবা রাজী হয় না—অ'ক্ল (কাকা), আমাকে নিয়ে চল,' ওই ধরনের আরও কত কী !

আমি আবার প্রমাদ গুলনলুম। কথাটা ঘেঁদিকে মোড় নিচ্ছে তাতে না মাদাম পিচ্ছিল বের করে।

অনুমান করতে কষ্ট হল না, আলোচনাটা মাদামের পক্ষেও অপ্রিয়। তিনি শুধালেন, 'মিসের রুচি কিসে—চা, কফি, শোকোলো (কোকো), কিংবা—'

আমি বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ।'

তবু শেষটার কফি বানাতে উঠে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে করীম মুহম্মদ উঠে দাঁড়িয়ে সিলেটী কায়দায় পা ছুঁয়ে সেলাম করতে গেল। বুললুম, ওর চোখ ঠিক ধরতে পেরেছে। আমি সিলেটীতেই বললুম, 'থাক্ থাক্।'

যে ভাবে তাকাল তার থেকে বুঝতে পারলুম, সে পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছে না, সে পায়ের ধুলো নিচ্ছে তার দেশের মুরব্বীদের যার ভিতর রয়েছেন আমার পিতৃপিতামহও, সে তার মাথায় ঠেকাচ্ছে দেশের মাটির ধুলো, তার মায়ের পায়ের ধুলো। আমি তখন বারণ করবার কে ? আমার কী দম্ভ ! সে কি আমার পায়ের ধুলো নিচ্ছে ?

শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করলে, 'হুজুর কোন হোটেলে উঠেছেন ?' আমি নাম বললুম। স্টেশনের কাছেই।

আমি বললুম, 'বস।' সে আপত্তি জানাল না। তারপর দুজনই আড়ল্ট হয়ে বসে রইলুম। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

এমন সময়ে মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তার গালে চুমো খেয়ে বললুম, 'মধু।'

বাপ হেসে বললে, 'এবারে জন্মদিনে ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম ও কী সঙগাত চায় তখন চাইলে ইন্ডিয়ান বর। আমাদের দেশের মেয়েরা বিয়ের কথা পাড়লেই ঘেমে ওঠে।'

তার গলায় ঈষৎ অনুরোধের আভাস পেয়ে আমি বললুম, 'মনে মনে নিশ্চয়ই পুর্লুকিত হয়। আর আসলে তো এসব বাড়ির দেশের দেশের আবহাওয়ার কথা। এরা পেটের অসুখের কথা বলতে লজ্জা পায়, আমরা তো পাই নে।'

ইতিমধ্যে কফি এল। মাদাম বললেন, 'মেয়ের নাম সারা (Sara ইংরিজিতে (Sarah), ছেলের নাম রোমী।' বাপ বললে, 'আসলে রহমান।' বুদ্ধলুম লোকটার বুদ্ধি আছে। 'সারা' নাম মুসলমান মেয়েদেরও হয়। আর রহমানের উচ্চারণ ফরাসীতে মোটামুটি রোমীই।

বেচারী মাদাম। কফির সঙ্গে দিলে দুনিয়ার যত রকমের কেক, পেসট্রি, গাতো, রিষোশ, ক্রোয়াসাঁ। বুদ্ধলুম, পাড়ার দোকানের যাবতীয় চায়ের আনুষঙ্গিক ঝোঁটসে কিনে আনিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, প্যাজের ফুলদুরিও। মাদাম বললে, 'ম মারি—ইল লেজ এম।' আমার স্বামী এগুলো ভালবাসেন।

ছেলেটি চেঁচিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মামি'—আমিও মা।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মনোকল'—আমিও চাচা।

আমি আর সইতে পারলুম না। কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সে-সম্বন্ধে আমি সমস্তক্ষণ সচেতন ছিলাম। রোমীর ভারত যাওয়ার ইচ্ছে, সারার ভারতীয় বরের কামনা এসব আমায় যথেষ্ট কাবু করে এনেছিল, কিন্তু ফ্রান্সের সেরা সেরা মিষ্টির কাছে ফুলদুরির প্রশংসা—এ কোন দেশের রক্ত চেঁচিয়ে উঠে আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিলে?

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'আজ তবে আসি। বাঁলনের টিকিট আমার এখনও কাটা হয় নি। সেটা শেষ না করে মনে শান্তি পাচ্ছি নে।'

সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল। ছেলেটা বললে, 'কিন্তু আপনি তো এখনও আমাদের অ্যালবাম দেখেন নি।' বলেই কারও তোয়াক্কা না করে অ্যালবাম এনে পাতার পর পাতা উণ্টে যেতে লাগল। 'এই তো বাজান (বাবা + জান, সিলেটীতে বাজান), কী অদ্ভুত বেশে এদেশে নেমেছিলেন, এটার নাম লুঙ্গি, না বাজান? কিন্তু ভারি সুন্দর, আমরা একটা দেবে, অ'ক'ল্—চাচা? বাবারটা আমার হয় না, (মাদাম বলেন, 'চুপ', ছেলেটা বললে, 'পার্দো' অর্থাৎ বে-আদাবি মাফ কর) এটা মা, বিয়ের আগে, ক্যাল এ জনি, কী সুন্দর—'

ওঃ!

গুণ্টিসুন্দর আমাকে ট্রাম-টার্মিনাসে পৌঁছে দিতে এল। পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বমহল্লা থেকে অন্তত একটা ট্রাম যায়—বিনা চেঞ্জ—স্টেশন অবধি। বিদেশীকে সেই ট্রামে বসিয়ে দিলেই হল। মাদাম কিন্তু তবু পই পই করে ক'ডাক'টরকে বোঝালেন, আমাকে যেন ঠিক স্টেশনে নাবিয়ে দেওয়া হয়। 'মিস্সো এ (ত্) এন্ড্রাজের, স্টেজার, বিদেশী, (তারপর ফিস্ ফিস্ করে) ফরাসী বলতে

পারেন না —’

মনে মনে বড় আরাম বোধ করলুম। যাক, তবু একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পাওয়া গেল, যে আমার ফরাসী বিদ্যার চৌহান্দ ধরতে পেরেছে।

মাদাম, কাক্সাবাক্সা চে’চালে, ‘ও রভোয়ার।’
করীম মুহম্মদ বললে, ‘সেলাম সায়ের।’

আহারাদির পর হোটেলের লাউঞ্জে বসে ওপরে ঘূমতে যাব-যাচ্ছি, যাব-যাচ্ছি করছি, এমন সময় করীম মুহম্মদ এসে উপস্থিত। পরনে লুঙ্গি কম্বোটার।

ইন্সপেক্টরের কোনও হোটেলে ঢুকে আপনি যদি লাউঞ্জে জুতো খুলতে আরম্ভ করেন, তবে ম্যানেজার পুলিশ কিংবা অ্যাম্বুলেন্স ডাকবে। ভাববে আপনি খেপে গেছেন। এ-তথ্যটি নিশ্চয়ই করীমের জানা; তাই তার সাহস দেখে অবাক মানলুম। বরঞ্চ আমিই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তাকে বারণ করলুম। কিন্তু তারপর বিপদ, সে চেয়ারে বসতে চায় না। বুঝতে পারলুম, পরিবারের বাইরে এসে সে ডেউপাশায় ‘কেরীম্যা’ হয়ে গিয়েছে। জুতো পরবে না; চেয়ারে বসবে না, কথায় কথায় কদম্বোস—পদচুম্বন—করতে চায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, ‘এ কী আপদ!’

লজ্জা পেয়ে বললে, ‘হুজুরের বোধ হয় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে সকলের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে! তা হলে, দয়া করে আপনার কামরায়—’

আমি উম্মা প্রকাশ করে বললুম, ‘আদপেই না।’ এবং এ অবস্থায় গ্রীহট্টের প্রত্যেক সুসন্তান যা বলে থাকে, সেটাও জুড়ে দিলুম, ‘আমি কি এ ঘরে ‘মাগনা’ বসেছি, না, এদের জমিদারির প্রজা। কিন্তু তুমি এ-রকম করছ কেন? তুমি কি আমার কেনা গোলাম না কি? চল উপরে।’

সেখানে মেঝেতে বসে একগাল হেসে বললে, ‘কেনা গোলাম না তো কী? আমার চাচাতো ভাই আহমত ছিল আপনাদের বাসার চাকর। এখনও আমি মাকে যখন টাকা পাঠাই সেটা যায় আপনার সাহেবের (পিতার) নামে। আমি আপনাদের বাসায় গিয়েছি, আপনার আশ্রয় আমাকে চীনের বাসনে খেতে দিতেন। আমি আপনাকে চিনি হুজুর।’

আমি শূধালুম, ‘বউকে ফাঁকি দিয়ে এসেছ?’

বলল, ‘না হুজুর। খেতে বসে রোমার মা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললে। আপনাকে সে রাখে খেতে বলতে পারে নি তার জন্য দুঃখ করলে। ও সত্যি বললে যে, আপনাতে আমাতে বাড়িতে নিরিবিলি কথাবার্তা হবে না, তাই আপনাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে নি। আসবার সময় বললে, ‘উনি যা বলেন তাই হবে।’

আমি শূধালুম, ‘বউ না বললে তুমি আসতে না?’

কিছুমাত্র না ভেবে বললে, ‘নিশ্চয়ই আসতাম। তবে ওকে খামকা কণ্ট দিতে চাই নে বলে না-বলে আসতুম।’ বলে লাঙ্গুড় বাচ্চাটির মত ঘাড় ফেরালে। আমার বড় ভাল লাগল।

আমি শূন্যলুম, 'আমি তোমাদের বাড়িতে বলতে গিয়েছিলুম তোমরা জানলে কী করে? আমি শুনছি, তোমার বউ দেশের লোককে তাড়া লাগায়। আমাকে লাগাল না কেন?'

যেন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'তা একটু-আধটু লাগায় বটে, হুজুর, ওরা যে বলে বেড়ায় আমাকে রোমার মা ভাড়া বানিয়ে রেখেছে সে-খবরটা ওর কানে পৌঁছেছে। তাই গেছে সে ভীষণ চটে। আসলে ও বড় শাস্তপ্রকৃতির মেয়ে, ঝগড়া-কাজিয়া করে কয় আদপেই জানে না।'

'আর মানুষকে কি কখনও ভাড়া বানানো যায়? কামরূপে না, কোন-খানেই না।'

- 'আপনি তা হলে সব কিছুর শূনে বিবেচনা করুন, হুজুর।'

'সতেরো বছর বয়সে আমি আর-পাঁচজন খালাসীর সঙ্গে নামি এই বন্দরে। কেন জানি নে, হুজুর, হঠাৎ পুলিশ লাগালে তাড়া। যে যার জ্ঞান নিয়ে যেদিকে পারে দিলে ছুট। আমি ছিটকে পড়লাম শহরের এক অজানা কোণে। জাহাজ আর খুঁজে পাই নে। শীতের রাতে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষটার এক পোলার নীচে শূনে পড়লাম জিরব বলে। যখন হুঁশ হল তখন দেখি, আমি এক হাসপাতালে শূনে। জ্বর সব্বাপ পড়ে যাচ্ছে—দেশে আমার ম্যালেরিয়া হত। তারপর কদিন কাটল হুঁশে আর বেহুঁশে তার হিসেব আমি রাখতে পারি নি। মাঝে মাঝে আবছা আবছা দেখতে পেতাম ডাক্তাররা কী সব বলাবলি করছে। সেরে উঠে পরে শূনে পাই ওদের কেউ কখনও ম্যালেরিয়া রোগীর কড়া জ্বর দেখে নি বলে সবাই ভড়কে গিয়েছিল। আর জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম একটি নার্সকে। সে আমার জল খাইয়ে রুমাল দিয়ে ঠোঁটের দু'দিক মুছে দিত। একদিন শেষরাতে কম্প দিয়ে এল আমার ভীষণ জ্বর। নার্স সব কথানা কম্বল চাপা দিয়ে যখন কম্প থামাতে পারল না তখন নিজেকে জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল। দেশে মা ঘেরকম জড়িয়ে ধরত ঠিক সেই রকম। তারপর আমি ফের বেহুঁশ।

'কিন্তু এর পর যখন জ্বর ছাড়ল তখন আমি ভাল হতে লাগলাম। শূনে শূনে দেশের কথা, মায়ের কথা ভাবি আর ওই নার্সটিকে দেখলেই আমার জানটা খুঁশিতে ভরে উঠত। সে মাঝে মাঝে আমার কপালে হাত বুলায়ে দিত আর ওদের ভাবায় প্রতিবারে একই কথা বলত। আমি না বুঝেও বুঝতাম, বলছে, ভয় নেই, সেরে উঠবে।

'তারপর একদিন ছাড়া পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম বন্দরের দিকে। সেখানে জাত-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। অন্য এক জাহাজের—আমাদের জাহাজ তো কবে ছেড়ে দিয়েছে। সে সব কথা শূনে বললে—'ভাগো ভাগো, এখুনি ভাগো। তোমার নামে হুঁলিয়া জারি হয়েছে, তুমি জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছ। ধরতে পারলেই তোমাকে পুলিশ জেলে দেবে।'

'ক' বছর? কে জানে? এক হতে পারে, চোদ্দও হতে পারে। আইন-কানুন হুজুর আমি তো কিছই জানি নে।'

‘কিন্তু যাই-ই বা কোথায়? যে দিকে তাকাই সে-দিকেই দেখি পুলিস। খানা-পিনার কথা তুলব না হুজুর, সে তখন মাথায় উঠে গিয়েছে। কিন্তু রাতটা কাটাই কোথায়?’

‘শেষটায় শেষ অগতির গতির কথা মনে পড়ল। হাসপাতাল ছাড়ার সময় সেই নাস’টি আমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে দিয়েছিল একথানা চিরকুট। তখনও জানতাম না, তাতে কী লেখা। যাকে দেখাই সে-ই হাত দিয়ে বোঝায়—আরও উত্তর দিকে যাও। শেষটায় একজন লোক আমাকে একটা বড় বাড়ির দেউড়ি দেখিয়ে চলে গেল।

‘সেখানে ঘণ্টাটিনেক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রোঁদের পুলিস আমাকে সওয়াল করতে লাগাল। হাসপাতালে দু’মাস ওদের বুলি শুন শুনে যেটুকু শিখেছিলাম তার থেকে আমেজ করতে পারলাম, ওর মনে সন্দ হয়েছে, আমি কী মতলবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি—আর হবেই না কেন? বুঝলাম রাশিতে জেল আছেই। মনে মনে বললাম, কী আর করি, একটা আশ্রয় তো চাই। জেলই কবুল। চাচা মামু অনেকেই তো লাঠালাঠি করে গেছেন, আমি না হয় না করেই গেলাম।

‘এমন সময় সেই নাস’টি এসে হাজির। পুলিসকে কী একটা সামান্য কথা বলে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল তার ছোট্ট ফ্ল্যাটে—পুলিস যেভাবে তাকে সেলাম করে রা’টি না কেড়ে চলে গেল তার থেকে আদেশা করলাম, পাড়ার লোক ওকে মানে।

‘আমাকে খেতে দিল গরম দুধের সঙ্গে বাঁচা আঁড়া ফেটে নিয়ে। বেহুঁশির ওস্তে কী খেয়েছি জানি নে, হুজুর, কিন্তু হুঁশের পর দাওয়াই হিসেবেও আমি শরাব খাই নি। তাই “বরান্দি”টা বাদ দিল।’

‘রাতে খেতে দিল রু’টি আর মাংসের হালকা ঝোল। চারটি ভাতের জন্য আমার জান তখন কী আকুল-কুলি করেছিল আপনাকে কখনও সমঝাতে পারব না, হুজুর।’

জাহাজের খালাসীদের স্মরণে আমি মনে মনে বললুম, ‘সমঝাতে হবে না।’ বাইরে বললুম, ‘তারপর?’

একটুখানি ভেবে নিয়ে বললে, ‘সব কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে সন্ধ্যা। আর কী-ই বা হবে বলে? ও আমাকে খাওয়ালে পরালে আশ্রয় দিলে—বিদেশে-বিভূঁইয়ে যেখানে আমার জেলে গিয়ে পাথর ভাঙার কথা—এ সব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে না বললে কি তার দাম কম যাবে!’

‘দাম কমবে না বলেই বলছি হুজুর, সুজন নাসের’র কাম করে—’

আমি শুধালুম, ‘কী নাম বললে?’

একটু চোঁজা পেয়ে বললে, ‘আমি ওকে সুজন বলে ডাকি—ওদের ভাষায় সুজন।’

বুঝলুম ওটা ফরাসী Suzanne, এবং আরও বুঝলুম, যে-জাতের লোক আমাদের দেশে মরমিয়া ভাটিয়ালী রচছে তাদেরই একজনের পক্ষে নামের এটুকু পরিবর্তন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিছ্ কঠিন কর্ম নয়। অতখানি স্পর্শ-

কাতরতা এবং কণ্পনাশক্তি ওদের আছে ।

আমি শূদ্রালুম, 'তার পর কী বলছিলে ?'

বললে, 'সুজন নার্সের কাম করে আমাদের যে এক বছর পুষ্টিছিল তখন আমি তার বাড়ির কাজ করেছি । বেচারীকে নিজের রান্না নিজেই করতে হত— হাসপাতাল থেকে গতর খাটিয়ে ফিরে আসার পর । আমি পাক-রসুই করে রাখাতাম । শেষ দিন পর্যন্ত সে আপত্তি করেছে, কিন্তু আমি কান দিই নি ।'

আমি শূদ্রালুম, 'কিন্তু তোমার পাড়ার পুলিশ কিছুর গোলমাল করলে না ?'

একটুখানি মাথা নিচু করে বললে, 'অন্য দেশের কথা জানি না হুজুর, কিন্তু এখানে মহাবতের ব্যাপারে এরা কোন রকম বাগড়া দিতে চায় না । আর এরা জানত যে ওর বাড়িতে ওঠার এক মাস পরে ওকে আমি বিয়ে করি ।'

'কিন্তু হুজুর আমার বড় শরম বোধ হত ; এ যে ঘর-জামাই হয়ে থাকার চেয়েও খারাপ । কিন্তু করিই বা কী ?

'আল্লাই পথ দেখিয়ে দিলেন ।

'সুজন আমাকে ছুটি-ছাটার দিনে সিনেমায়-টিনেমায় নিয়ে যেত । একদিন নিয়ে গেলে এক মস্ত বড় মেলাতে । সেখানে একটা ঘরে দেখি নানা দেশের নানা রকম তাঁত জড় করে লোকজনকে দেখানো হচ্ছে তাঁতগুলো কী করে চালানো হয়, সেগুলো থেকে কী কী নকশার কাপড় বেরয় । তারই ভিতর একটা দেখতে পেলাম, অনেকটা আমাদের দেশেরই তাঁতের মত ।

'আমার বাপ ঠাকুরদা জোয়ার কাজ করেছে, ফসল ফলিয়েছে, দরকার হলে লাঠিও চালিয়েছে ।

'অনেক ইতি উতি কিন্তু-কিন্তু করে সুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "তাঁতের দাম কত ?" বুঝতে পারল, ওতে আমার শখ হয়েছে । ভারি খুশী হল, কারণ আমি কখনও কোন জিনিস তার কাছ থেকে চাই নি । বললে, ওটা বিক্রির নয়, কিন্তু মিস্ট্রী দিয়ে আমাকে একটা গাড়িয়ে দেবে ।

'ও দেশে ধূতি, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা কিনবে কে ? আমি বানালাম স্কার্ফ, কম্বোর্টার । দিশী নকশায় । প্রথম নকশায় আধখানা ফুটতে না ফুটেই সুজনের কী আনন্দ ! স্কার্ফ তাঁত থেকে নামাবার পূর্বেই সে পাড়ার লোক জড় করে বসেছে, আজগুবী এক নতুন জিনিস দেখাবে বলে । সবাই পই-পই করে দেখলে, অনেক তারিফ করলে । সুজনের ডবল আনন্দ, তার স্বামী নিষর্বা ভবঘুরে নয় । একটা হুন্দুরী, গুণী লোক ।

'গোড়ার দিকে পাড়াতে, পরে এখানে-সেখানে বিস্তর স্কার্ফ বিক্রি হল । বেশ দ্রুপয়সা আসতে লাগল । তারপর এখানকার এক তাঁতীর কাছে দেখে এলাম কী করে রেশমের আর পশমের কাজ করতে হয় । শেষটায় সুজন নিয়ে এল আমার জন্য বহুত কেতাভ, সেগুলোতে শূধু কাশ্মীরী নকশা নয়, আরও বহুত দেশের বহুত রকম-বেরকমের নকশাও আছে । তখন যা পয়সা আসতে লাগল তারপর আর সুজনের চাকরি না করলেও চলে । সেই কথা বলতে সে খুশির সঙ্গে রাজী হল । শূধু বললে, যদি কখনও দরকার হয় তবে আবার

হাসপাতালে ফিরে যেতে পারবে। রোমী তখন পেটে। সুজন সংসার সাজাবার জন্য তৈরী।

‘আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কেন বড়ীর কথা পাড়ছি নে। বলছি, হুজুর, রাতও অনেক ঘনিয়ে এসেছে, আপনি আরাম করবেন।

‘আপনি বিশ্বাস করবেন না, দু পসসা হতে সুজন বললে, “তোমার মাকে কিছু পাঠাবে না?” আমি আগের থেকেই বন্দরে ইমানদার লোক খুঁজছিলাম। রোমীর মা-ই বললে, ব্যাৎক দিয়েও নাকি দেশে টাকা পাঠানো যায়।

‘মাসে মাসে বড়ীকে টাকা পাঠাই। কখনও পঞ্চাশ কখনও একশো। ডেউ-পাশাতে পঞ্চাশ টাকা অনেক টাকা। শুন বড়ী টাকা দিয়ে গাঁয়ের জন্য জুন্মা-ঘর বানিয়ে দিয়েছে। খেতে-পরতে তো পারছেই।

‘টাকা দিয়ে অনেক কিছুই হয়, দেশে বলে, টাকার নাম জয়রাম, টাকা হইলে সকল কাম—কিন্তু হুজুর, টাকা দিয়ে চোখের পানি বন্ধ করা যায় না। একথা আমি খুব ভাল করেই জানি। বড়ীও বলে পাঠিয়েছে, টাকার তার দরকার নেই, আমি যেন দেশে ফিরে যাই।

‘আমার মাথার বাজ পড়ল, সায়ের; যেদিন খবর নিয়ে শুনলাম, দেশে ফিরে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু ফিরে আসা অসম্ভব। আমি এখন আমার মহল্লার মুরুব্বীদের একজন। থানার পুর্লিসের সঙ্গেও আমার বহুত ভাব-সাব হয়েছে। আমার বাড়িতে প্রায়ই তারা দাওয়াত-ফাওয়াত খায়। তারা প্যারিস থেকে পাকা খবর আনিয়েছে, ফিরে আসা অসম্ভব। মুসাফির হয়ে কিংবা খালাসী সেজে পালিয়ে এলেও প্যারিসের পুর্লিস এসে ধরে নিয়ে দেশে চালান দেবে। এমন কি, তারা আমাকে বারণ করেছে আমি যেন ওই নিয়ে বেশী নাড়া চাড়া না করি। প্যারিসের পুর্লিস যদি জেনে যায় আমি বিনা পাসপোর্টে এ দেশে আছি তা হলে তারা আমাকে মহল্লার পুর্লিসের কদর দেখাবে না। এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। আপনি কী বলেন, হুজুর?’

ডাহা মিথ্যে বলি কী প্রকারে? আমার বিলক্ষণ জানা ছিল, ফ্রান্স চায় টুরিস্ট্‌সে দেশে এসে আপন গাঁটের পয়সা খরচ করুক, কিন্তু তার বেকারির বাজারে কেউ এসে পয়সা কামাক এ-অবস্থাটা সে যে করেই হোক রুখবে।

আমি চুপ করে রইলুম দেখে করীম মুহম্মদ মাথা নীচু করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে বললে, ‘রোমীর মা আমার মনের সব কথা জানে। দেশের লোক ভাঙচি দেয়, আমি ভেড়া বনে গিয়েছি এ-কথা বলে—এ-সব শুনে সে তাদের পছন্দ করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে ভোরের ঘুম ভেঙে গেলে দেখি সেও জেগে আছে। তখন আমার কপালে হাত দিয়ে বলে, “তোমার দেশে যদি যেতে ইচ্ছে করে, তবে যাও। আমি একাই বাচ্চা দুটোকে সামলাতে পারব।” এ-সব আরম্ভ হল, ও নিজে মা হওয়ার পরের থেকে।

‘আজ আপনার কথা তুলে বললে, “এ ভদ্রলোকের শরীরে দয়ামায়া আছে। আমার ছেলেমেয়েকে কত আদর করলেন।” আমি বললাম, “সুজন, তুই

জানিস নে, আমাদের দেশের ভদ্রলোক আমাদের কত আপনজন। এই যে ভদ্রলোক এলেন, এঁর সারেব (পিতা) আমার বাবাকে “পাতী” (ছেলে) বলে ডাকতেন। এ দেশের ভদ্রলোক তো গরিবের সঙ্গে কথা কয় না।” আপনি-ই বলুন, হুজুর।’

তার ‘আপনজন’। ওইটুকুই বাকী ছিল।

‘সুজনই আজ বললে, “ওঁর কাছে গিয়ে তুমি হুকুম নাও। উনি যা বলেন তাই হবে।” এইবার আপনি হুকুম দিন, হুজুর।’

আমি হাত জোড় করে বললাম, ‘তুমি আমায় মাপ কর।’

সে আমার পায়ে ধরে বললে, ‘আপনার বাপ-দাদা আমার বাপ-দাদাকে বিপদে-আপদে সলা দিয়ে হুকুম করে বাঁচিয়েছেন, আজ আপনি আমার হুকুম দিন।’

আমি নিলশ্বেজর মত পূর্ব-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বললাম, ‘তুমি আমায় মাপ কর।’

অনেক কান্নাকাটি করল। আমি নীরব।

শেষ রাতে আমার পায়ে চুমো খেল, আমি বাধা দিলাম না। বিদায় নিয়ে বেরবার সময় দোরের গোড়ায় তার বুক থেকে বেরল, ‘ইয়া আল্লা !’

মণি

‘কাব্যের উপেক্ষিতা’র ভারতের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবিগুরু বাঙ্গালীকর বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছেন, তিনি তাঁর কাব্যে উর্মিলার প্রতি অবিচার করেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন, রসসংস্কৃতিতে তাবৎ-নায়িকাকে সমান সম্মান, সমান অধিকার দেওয়া সম্ভবপর নয়।

তবু তো উর্মিলার উল্লেখ রামায়ণে আছে। কিন্তু রামচন্দ্র আর সীতাদেবীর কি আরও বহু অনুচর সখা বাস্ধবী পরিচারিকা ছিলেন না, যাদের উল্লেখ আদিকবি আদপেই করেন নি? তাঁদের জীবনে সুখ-দুঃখ উৎসব-ব্যসন বিরহ-বেদনা মিলনানন্দ সব-কিছুই ছিল। এতৎসঙ্গেও আদিকবি তাঁদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। তিনি তো কিছু নিছক কাল্পনিক চরিত্রসংষ্টি করেন নি, নির্ভেজাল রূপকথাতে ঘেরকম হয়। তিনি তো লিখেছিলেন ইতিহাস, অবশ্য রসের গামলায় ঢুঁবয়ে নিয়ে, বাটিক প্রক্রিয়ায়। হলই বা। তাই বলে কি শেষমেশ ওইসব অভাগাদের জ্যান্ত পোতা হল না?

জানি নে, আদিকবিকে এ-ফরিয়াদ জানালে তিনি কী উত্তর দিতেন। যে চন্দ্রবৈদ্য শ্রীরামচন্দ্রের নখ-চুল কেটে দিত, যে শুরুবৈদ্য মা-জননী জনকতনয়ার দুকূল-কাঁচুলি কেটে দিত তারা যদি কবিসমীপে নিবেদন করত, তাদেরই বা তিনি ভুলে গেলেন কেন? উর্মিলার মত নিদেন তাদের নামোল্লেখ করলেই তো তারা অজরামর হয়ে যেত, তবে তিনি কী উত্তর দিতেন?

অত দূরে যাই কেন? কবিগুরু শ্রীরাবীন্দ্রনাথকে যদি জিজ্ঞেস করা হত,

বিনয় এবং ললিতার মত দু'টি অত্যন্ত চরিত্রসৃষ্টি করার পর—হায়, বাংলার সচ্চরিত্র কী দুর্লভ—তিনি সে-দু'জনকে পথমধ্যে গুম্বুস্তান করলেন কেন, তা হলে তিনি কী উত্তর দিতেন ?

আমি বাস্তবিক নই, রবীন্দ্রনাথও নই। এমন কি আমার আপন গ্রামের প্রধান লেখক নই। আমার গ্রামের শূকরুজ্ঞ এবং পাগলা মাধাই যে-সব ভাটিয়ালি রচনা গিয়েছে, আমার রচনা তাদের সামনে লজ্জায় ঘোমটা টানে। মাধাইয়ের একটি ভাটিয়ালির ভুলে-ঝাওয়া অন্তরা আমি তিরিশ বছর ধরে চেঁচা করেও পূরণ করতে পারি নি। মাধাই আমি একই পাঠশালাতে একই শ্রেণীতে পড়েছি। মাধাই ফি বছর ফেল মারত, আমি ফাস্ট হতুম।

তাই, বিশেষ করে তাই, আমি মোক্ষম মনঃস্থির করেছি, আমি আমার সৃজনে যাদের প্রতি অনিচ্ছায় অবজ্ঞা প্রকাশ করেছি, তাদের প্রত্যেককে জ্যান্তগোর থেকে খুঁড়ে তুলে প্রাণবন্ত করব। অর্থাৎ অর্ধমৃত করব। কারণ, আমি শক্তিমান লেখক নই। অদ্যাবধি বর্ণিত আমার তাৎপর্য চরিত্রই জীবন্ত। অতএব এঁরাও অমৃত না হয়ে আমৃত হবেন। কিন্তু আমি তো নিষ্কৃতি পাব আমার জন্মপাপ থেকে।

আমি কাবুলে ছিলাম, তখন সেখানকার ব্রিটিশ লিগেশনের সঙ্গে আমার কণামাত্র হৃদ্যতা হয় নি। 'দেশে-বিদেশে' যারা পড়েছেন তাঁরা সে-কথা হয়তো স্মরণ করতে পারবেন। তবে লিগেশনের একজন প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে আমার অত্যন্ত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইনি পেশাওয়ারের খানদানী বাসিন্দা। অতিশয় খাস পাঠান। এঁর চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনও আপন গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে-শাদি করেন নি। পেশাওয়ারের পুন্স ইন্সপেক্টর আহমদ আলীর অগ্রজ। নাম শেখ মহবুব আলী। ব্রিটিশ লিগেশনে তিনি ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেক্রেটারি।

এঁর মত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ কূটনৈতিক আমি অষ্টকুলাচল সন্তসমুদ্র পরিভ্রম্য করেও দেখতে পাই নি। আমার বিশ্বাস পাঠান-প্রকৃতি ধরে। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু এইসব সরল পাঠানদের যারা সদাঁর হন, যেমন মনে করুন ইম্পাইয়ের ফকীর, ইংরেজীতে বলে ফকির অব ইপি (Ipi), তাঁদের মত ধূরন্ধর ইহসংসারে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শেখ মহবুব আলীই বলতেন, 'পাঠানরা হয় গাড়ল, নয় ঘড়েল। মাঝখানে কিছু নেই। পিগমিজ অ্যান্ড জাইন্টস, নো নর্মেলস্।' অধ্যাপক বগদানফ এবং বেনওয়ার সঙ্গে তাঁর প্রচুর হৃদ্যতা ছিল। বগদানফ গত হয়েছেন। বেনওয়ার আছেন, সৃষ্টিকর্তা তাঁকে শতায়ু দিন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই মহবুব আলীর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে সত্যাসত্য জানতে পারবেন।

মহবুব আলী বিলক্ষণ জানতেন, লিগেশনের ইংরেজ কর্মীদের সঙ্গে আমার অহিন্দুল সম্পর্ক। ওদিকে তিনি যদিও ইংরেজের সেবা করতেন, তবু ভিতরে ভিতরে ওদের তিনি দিল-জান দিয়ে করতেন ঘেমা, 'ঘৃণা' নয়—ঘেমা। এটা অবশ্য আমার নিছক অনুমান। মহবুব আলীর মত ব্যাণ্ড চাগকা বাক্য বা আচরণে সেটা প্রকাশ করবেন, সে-চিন্তাও বরাহভক্ষণসম মহাপাপ! বোধ হয়

প্রধানত এই কারণেই তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তদুপরি আমি আহমদ আলীর বন্ধু। এবং সর্বশেষ সত্য, আমি বহু-দূরদেশাগত রোগাপটকা, নির্বাপ্তব, দুর্নিয়াদার-বাবদে-বেকুব বাঙালী। এমত অবস্থায় আপনি ভগবানের শরণ না নিয়ে পাঠানের শরণ নিয়েই বিবেচকের কর্ম করবেন। তবে একথাও বলব, আমি তাঁর শরণ নিই নি। তিনিই আমাকে অনুজরূপে তাঁর হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

সে-কথা থাক্। আমি আজ তাঁর জীবনী লিখতে বসি নি। আমি লিখতে বসেছি তাঁর স্ত্রীর পরিচারিকা সম্বন্ধে। উল্লিসিত পাঠক বিরক্ত হয়ে আমার বাকী লেখাটুকু পড়বেন না, সে-কথা আমি জানি; কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষম জানি, আমি যে গুণীজনের মজলিসে দৈবেসেবে মুখ খোলার অনুমতি পাই, তাঁদের পৌনে ষোল আনা সহস্র সদাশয় জন। তাঁদের অকৃপণ হৃদয় জন্মদাসী রাজরানী সবাইকে আসন দিতে জানে।

আমার সঙ্গে মহবুব অলীর হৃদয়তা হওয়ার কয়েকদিন পর আমার ভূতা এবং সখা আবদুর রহমান আমাকে যা জানালে তার সারাংশ এই :

মহবুব আলীর পরিবার এবং অন্য এক পরিবারের দুঃশমনী-লড়াই ফ্রান্স দেবার জন্য একদা স্থিরীকৃত হয়, দুই পরিবার যেন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মহবুব আলী এ পরিবারের বড় ছেলে। তাই তাঁকেই বিয়ে করতে হল অন্য পরিবারের বড় মেয়েকে। নবদম্পতি গোড়ার দিকে সুখেই ছিলেন। ইতিমধ্যে বলা নেই—কওয়া নেই, হঠাৎ মহবুব আলীর এক অতি দূর চাচাতো ভাই তাঁর শ্বশুর-পরিবারের ততোধিক দূর এক মামাতো ভাইকে খুন করে। ফলে মহবুব আলীর স্ত্রী পিতৃগণের আদেশানুযায়ী স্বামীগৃহ বর্জন করে পিত্রালয়ে চলে যান।

আবদুর রহমানের কাহিনী অনুযায়ী এ-ঘটনা ঘটেছিল বছর দশেক পূর্বে। বলতে গেলে এই অবধি মহবুব আলী অকৃতদার। অধুনা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি শীঘ্রই হিন্দুস্থান থেকে বিয়ে করে অন্য বিবি নিয়ে আসছেন।

সুহৃদ সম্বন্ধে তার অপরোক্ষ আলোচনা করা অসম্ভব, তা সে ভূত্যের সঙ্গেই হক আর পিতৃব্যের সঙ্গেই হক—এই আমার বিশ্বাস। কিন্তু আবদুর রহমান যখন একবার কথা বলতে আরম্ভ করে তখন তাকে ঠেকানো অসাধ্য ব্যাপার।

শেষটায় আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, 'তোমারই বা এসব বলার কী দরকার? আমারই বা জেনে কী হবে? তিনি তো আমাকে এসব কিছু বলেন নি?'

আবদুর রহমান বললে, 'তিনি কেন বলেন নি সে-কথা আমি কী করে জানব? (পরে মহবুব আলীর কাছে শুনেছিলাম, দুঃখের কথা নাকি বন্ধু বন্ধুকে বলে না) তবে আপনার তো জানা উচিত।' আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হয়।

তবে রাতে আমার গায়ে লেপকম্বল জড়িয়ে দেবার সময় আবদুর রহমান বলেছিল, 'শেখ মহবুব আলী খান বড় ভালো লোক।'

আবদুর রহমান সার্টিফিকেট দেবার সময় রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে

না। একথা বলে রাখা ভাল।

* * * *

শেখ মহবুব আলীর বাসাতে আমি সময় পেলেই যেতুম। তাঁর বাসাটি লিগেশনের প্রত্যন্ত-প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলে ইংরেজের ছায়া না মাড়িয়ে সেখানে পৌঁছানো যেত। তিনি দফতরে থাকলে তাঁর ছেলেবেলাকার বন্ধু এবং চাকর গফুর খান তাঁকে খবর দিতে যেত। আমি ততক্ষণে ড্রইং-রুমে বসে আগুন পোয়াতুম আর বাবুচাঁকে সবিষ্কর বয়ান দিতুম কোন কোন বন্ধু খাওয়া আমার বাসনা।

শেখ গফুর ফিরে এসেই আমার পায়ের কাছে বসে ভাঙা ভাঙা উর্দু ফাসী পাঞ্জাবী পশতুতে মিশিয়ে গল্প জুড়ে দিত। পাঠানদের ভিতর জাতিভেদ নেই। শেখ গফুর আর মহবুব আলী খান প্রভু-ভৃত্য হলেও তাদের সম্পর্ক ছিল সখ্যের। তাই গফুর আমার সঙ্গে গল্প করাটা তার কতব্য বলে মনে করত; আমি 'ভদ্রসন্তান', আর সঙ্গে গল্প করে যে তাকে 'আপায়িত' করছি, সে-কথা তাকে বললে সে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হত। আবদুর রহমান এবং গফুরে যে সৌহার্দ্য ছিল, সে-কথা বলা বাহুল্য।

সচরাচর মহবুব আলীর ড্রইং-রুম খোলাই থাকত।

আবদুর রহমান রচিত মহবুব আলীর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' শোনার কয়েকদিন পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে ড্রইং-রুমের দরজার ধাক্কা দিয়ে দেখি, সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার হ্যান্ডেলের কাছে তখন দেখি বিজলির বোতাম, কলিং বেল। একটুখানি আশ্চর্য হয়ে ভাবনু, মহবুব আলী আবার কবে থেকে পর্দানিশিন হলেন, তাঁর গৃহে মাতা নেই, অপ্রিয়বাদিনী ভার্যা পর্যন্ত নেই, তাঁর গৃহ তো অরণ্যসম। অরণ্যকে ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করার কা কস্য প্রয়োজন? দিলুম বোতাম টিপে, সঙ্গে সঙ্গে ডাকলুম, 'ভাই গফুর!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। ভেবেছিলুম দেখব গাট্টাগোটা গাল-কম্বল দাড়ি সম্বলিত বেঁটে কেলে গফুর মহম্মদ খান। দেখি,—হকচকিয়ে গেলুম,—দেখি, দীর্ঘ এবং তম্বঙ্গী একটি মেয়ে। পরনে-লম্বা শিলওয়ার আর হাটু পর্যন্ত নেবে-আসা কুতরা। ওড়না দিয়ে মাথার অর্ধেক অবাধি ঘোমটা।

শ্যামা। এবং সে অতি মধুর শ্যামবর্ণ। পেশওয়ার কাবুলে মানুষের রঙ হয় ফরসা, কিংবা রোদে-পোড়া বাদামী। এ-মেয়ের রঙ সেই শ্যাম, যেটি পর্দানিশিন বাঙালী মেয়ের হয়। তার কী তুলনা আছে?

বলতে সময় লাগল। কিন্তু প্রথম দিন তাকে দেখেছিলুম এক লহমার তরে। আমি তাকে ভাল করে দেখবার পূর্বেই সে দিরাইছিল ভিতরপানে ছুট। তখন লক্ষ্য করেছিলুম, সেও আধ লহমার তরে, গরুগামিনী রমণীর যে যে স্থলে বিধাতা সৌন্দর্য পুঞ্জীভূত করে দেন, তম্বঙ্গীর ক্ষণ দেহে তার কিছুমাগ্ন কার্পণ্য করেন নি; বরঞ্চ বলব, তিনি অজস্তার চিত্রকরের মত একটু যেন বাড়াবাড়ি করেছেন। অথচ বরষ পনের-ষোল হয় কি না-হয়। তবে কি বিধাতা মানুষের

আঁকা ছবি দেখে তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য বাড়ান ?

তা সে যাক গে । তখন কি আর অত করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলুম, না, ওই বিষয়ে চিন্তাই করেছিলুম ।

আমি আগুনের কাছে গিয়ে বসলুম । খানিকক্ষণ পরে মহব্ব আলী এলেন । পাশে বসে ডাক দিলেন, ‘ম-অ-অ-গি—’

মণি দোরের আড়লে দাঁড়ালে দৃজনাতে পশতু ভাষায় কাথাবার্তা হল । আমি তার এক বর্ণও বুঝতে পারলুম না । মহব্ব আলী আমাকে বললেন, ‘মোট রান্না এখনও বাবুচিঁই করে কিন্তু মণির হাতে তৈরী নাশতা না হলে আমার বিবির চলে না । মণি বললে, আপনি কী খেতে ভালবাসেন সে ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে এবং তৈরী করেছে । ভালই হল । ও বড় তেজী মেয়ে । যাকে অপছন্দ করে তার রুটিতে হয়তো সের্কা বিষ দেবে ।’

দাবা খেলতে বসলুম এবং যথারীতি হারলুম । খেলার মাঝখানে মণি এসে অন্য টেবিলে নাশতা সাজালে ।

সময় নিয়েছে বটে কিন্তু রেঁধেছে ভাল । মমলেটের গুণটি সর্বাঙ্গে সোনালী হলদে । এখানে বাদামী, সেখানে হলদে, ওখানে সাদা নয় । তে-কোণা পরোটাও তৈরী করেছে যেন টিস্কয়ার সেটস্কয়ার দিয়ে । ভিতরে ভাঁজে ভাঁজে কোন জ্বালগায় কাঁচাও নয় ।

খাওয়া শেষ হলে আমি বললুম, ‘আধ ঘণ্টাটাক বসে যাই । সের্কা বিষ দিয়েছে কি না তার ফলাফল দেখে যাই ।’ মণি দাঁড়িয়ে ছিল । সে মহব্ব আলীর মূখের দিকে তাকাল । তিনি পশতুতে অনুবাদ করলেন । মণি ‘যাঃ’ কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা বলে চলে গেল ।

ভবিষ্যৎ দেখতে পেলে তখন ওই কাঁচা রসিকতাটুকুও করতাম না ।

ইতিমধ্যে মহব্ব আলী আমার বাড়িতে একবার এসেছিলেন বলে আমি তাঁর বাড়ি গেলুম দিন পনের পরে । এবারে বাইরের বোতামে চাপ দেওয়া মায়েই হুট করে দরজা খুলে গেল ।

মণি আমাকে দেখে নিঃসঙ্কোচে পশতু ভাষায় কিচির-মিচির করে উঠল । কিছুতেই থামতে চায় না । আমি একবার সামান্য সন্যোগ পেয়ে বললুম, ‘পশতু’, তারপর বাঁ হাত উপরের দিকে তুলে ভরতনাট্যম কায়দায় পশ্চফুল ফোটাবার মূদ্রা দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ‘ডডনং’ । অর্থাৎ আমি পশতু বুঝিনে । কিন্তু কে বা শোনে কার কথা । ভরতনাট্যমে আমি যদি হই খুচরো কারবারী, মণির বেসাতি দেখলুম পাইকিরী লাটের । ডান হাত দিয়ে এক অদৃশ্য ঝাঁটা নিয়ে আকাশের বেশ খানিকটা ঝাঁট দেবার মূদ্রা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে, ‘কুছ পরওয়া নহী ।’ কিন্তু শব্দ মূদ্রা দিয়ে তো আর বেশীক্ষণ কাথাবার্তা চালানো যায় না । তা হলে মানব ভাষার সৃষ্টি না করে শব্দ নেচে কুদে ও মূদ্রা দেখিয়েই শব্দরদর্শনের আলোচনা চালাত, একে অন্যকে এটম বম্ বানাবার কৌশল শেখাত ।

ইতিমধ্যে গফুর এসে আমার পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসে জানালে

মহবুব আলী শহরে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে। তবে পই পই করে বলে গিয়েছেন, আমাকে যেন আটকে রাখা হয়। মণি ততক্ষণে রাস্তাঘরে চলে গিয়েছে।

গফুর তার মনিবের সঙ্গে যে-রকম খোলা-দিলে গল্প জমায়, আমার সামনে সেই ভাবেই উজির-নাজির কতল করতে আরম্ভ করল। আশকথা-পাশকথা বলে সে শূধালে, ‘মণিকে আপনার কী রকম লাগে?’

আম্মা জানেন, মৌলা আলীর দোহাই, আমি স্নব নই। দাসী পরিচারিকা সম্বন্ধে আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করতে আমার কণামাত্র আপত্তি নেই। আমার সেবক আবদুর রহমানের সঙ্গে আমার যে-ভাবে আদান-প্রদান রস-রসিকতা চলত, সে-রকম ধারা আমি বহু ‘শিক্ষিত’ ‘খানদান’ লোকের সঙ্গে করতে রাজী নই। কিন্তু এখানে তো ব্যাপারটা অতখানি সরল নয়। তাই একটু বিরক্তির সুরে বললুম, ‘আমার লাগা না-লাগার কী আছে?’

গফুর আমার উত্তর শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে বললে, ‘এ আপনি কী বলছেন! আপনি শেখ মহবুব আলীর দোস্ত। তাঁর ইষ্টকুটুম, গোষ্ঠীপরিবারের পাঠান-পথতুনের চেয়ে আপনাকে উনি ঢের ঢের বেশী ভালবাসেন। আর আপনি যেভাবে কথা বললেন, তাতে মনে হল ওঁর পরিবারের জন্য আপনার যেন কোন দরদ নেই। আজ যদি মণির বিয়ের সম্বন্ধ আসে তবে কি মহবুব আলী আপনার সঙ্গে ওই বাবদে সলা পরামর্শ না নিয়ে থাকতে পারবেন?’

আমি শূধালুম, ‘এসেছে নাকি?’ সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বললুম, থুড়ি, ভুল করলুম, এতখানি ঔৎসুক্য দেখানো উচিত হয় নি। ‘শাদির পয়লা রাতে বেরাল মারবে’, এ যে দুসরা রাত খতম হবার উপক্রম!

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য না করেই গফুর সোৎসাহে বললে, ‘গন্ডায় গন্ডায়। সুবে পেশওয়ার-কোহট, বহু দেরা-ইসমাইল খান, ইস্তেক জম্ম-জলম্মর অবধি। লিগেশনের সব কটা পাঠান চাপরাসী-দফতরী, কেরানী খাজাণী মণিকে শাদি করতে চায়।’

আমি জানতুম, পাঠানদের আপন গোষ্ঠীর ভিতর জাতবিচার নেই। কিন্তু সেটা ছিল থিয়োরিটিকল জানা, এখন দেখলুম সেটা কীরকম মারাত্মক প্র্যাকটিকল। লিগেশনের খাজাণী মেলের লোকও পরিচারিকা মণিকে বিয়ে করতে চায়!

ইতিমধ্যে মণি দু-তিনবার ঘরে এসে অগ্নিবাণ হেনে গফুরের দিকে তাকিয়েছে। ভাষা না জেনেই বুঝতে পেরেছে, ওর সম্বন্ধেই কথাবার্তা হয়েছে। আমি গতক সন্ধ্যার নয় দেখে বললুম ‘থাক্ থাক্।’

মণি আমার জন্য এক অজানা পেশাওয়ারী কাবাব বানিয়েছে। ভারি মোলায়েম। দেখে মনে হয় কাঁচা, কিন্তু হাত দিয়ে মৃথের কাছে তুলতে না তুলতেই ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে। আমি আগের থেকেই হাঁ করে ছিলাম; মৃথে কিছু পৌঁছল না দেখে মণি খিলখিল করে হেসে উঠল। ওড়না দিয়ে মৃথ ঢেকে

ভিতরের দরজা দিয়ে অতর্কিত করল।

মহব্বত আলী এলেন। দাবার ফাঁকে বললেন, ‘মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।’

আমি বললুম, ‘কিঞ্চিৎ সামলান। ঘোড়া উঠে, নৌকা ঘোড়ার ডবল কিস্তি।’

মহব্বত আলী বললেন, ‘মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।’

আমি বললুম, ‘হ্যাঁ, আমিও বিপদে পড়েছি। আবদুর রহমান বলছিল, এখন থেকে সবাইকে রাস্তায় দেরেশী পরে বেরুতে হবে। দর্জির দোকানে ভিড় লেগেছে। কী করি, বলুন তো?’

ততক্ষণে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি যথারীতি হেরে গিয়েছি।

পূর্বেই বলেছি, মহব্বত আলী চাণক্যাস্য চাণক্য। তাই এটাও জানেন, কখন সাফসফা খোলাখুলি কথা কইতে হয়। বললেন, ‘মণিকে বিয়ে করার জন্য সব কটা পাঠান আমার দোরের ধন্য দিচ্ছে। ওদিকে মণি বলে, সে কাউকে বিয়ে করতে চায় না। কেন? আমার বিবি বললেন, সে নাকি—’

আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললুম, ‘বাস্, বাস্।’

মহব্বত আলী আমার উষ্মার জন্য তৈরী ছিলেন। আমার দুখানা হাত ধরে বললেন, ‘দোস্ত, আমি জানি, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি সৈয়দ-বংশের ছেলে। আপনারা পাঠান-মোগলে বিয়ে শাদি করেন না। যদিও কুরান হাদিসের রায়, যে-কোনও মুসলমান যে-কোনও মুসলমানীকে বিয়ে করতে পারে। হক কথা। কিন্তু লোকাচার দেশাচারও আছে। সেগুলো মানতে হয়। আজ যদি আপনি আমার বোন কিংবা শালীকে বিয়ে করে দেশে ফেরেন তবে আমি কোনও রকম দৃষ্টিচ্যুত করব না। কিন্তু মণিকে বোঝাই কী করে, আপনার সঙ্গে তার বিয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে ছেবেবেলা থেকে দেখেছে যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে যে-কোনও ছেলের বিয়ে হয়। তা যে শূদ্ধ পাঠানদের ভিতরেই, সে কী করে জানবে বলুন? বাইরের সংসারে যে অন্য ব্যবস্থা, কী করে বুঝবে বলুন?’

আমি আরও বিরক্ত হয়ে বললুম, ‘আঃ! কী এক স্টর্ম-ইন-এ টি-পট! তিলকে তাল! আপনার বাড়ির মেয়ে কাকে বিয়ে করতে চায়, না-করতে চায়, তাতে আরার কী?’

মহব্বত শান্ত কণ্ঠে বললেন, ‘হ্যাঁ, আপনার তাতে কী?’

আবদুর রহমানের উপদেশ স্মরণ এল। বললুম, ‘না, না, আপনি আমাকে এতখানি হৃদয়হীন মনে করবেন না। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাকে যেখানে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং যেখানে আমার হাতে কোনও সমাধান নেই, সেখানে আমি উপদেশই বা দিই কী প্রকারে?’

*

*

*

কাবুলে এপিডেমিক সর্দি-কাশি দেখা দিল। ঝাড়া দশ দিন ঘরে বসে থাকতে হল। সেয়ে উঠে শুন, মহব্বত আলী আমার চেয়েও বে-এস্তেয়ার। ভেবেছিলুম সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (১ম)—২২

কিছুদিন ও-পাড়া মাড়াব না। তবু যেতে হল।

এবারে মণি দরজা খুলেই যা পশতুর তুর্বাড়ি বাজি, বিডন-বিশপ ফল্‌স্‌ চালালে, তার সামনে আমি একদম হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কুমারী পার্বতী কাম্য পতিনিন্দা শব্দে ন যথৌ ন তস্থৌ হয়েছিলেন, আমি উলটো অবস্থায়। ফল কিশত্ব একই।

লক্ষ্য করলুম, মণিকে ভয়ংকর রোগা দেখাচ্ছে। ফাসীতে শুধালুম, ‘সিঁদ’ হয়েছে নাকি?’ মণি এক বর্ণ ‘ফাসী’ বোঝে না। খলখল করে হেসে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

মহবুব এলেন লাঠিতে ভর করে। ঠাণ্ডা দেশের সিঁদ, যাবার বেলা মানুষকে অধর্মূত করে দিয়ে যায়। বিশেষ করে যাদের চর্বি নিয়ে কারবার।

আমি জানতুম ওই কথাই উঠবে, যদিও আশা করেছিলুম, নাও উঠতে পারে। মণির বেশ উত্তেজনা থেকে অবশ্য আমেজ করেছিলুম, আরও কিছু একটা হয়েছে।

বললেন, ‘ওই যে আমাদের ছোকরা চাপরাসী মাহমুদ জান, রাসকেল না ইন্ডিয়ট কী পলব! সেই ঘটিয়েছে কাণ্ডখানা। আপনি যখন দিন সাতেক এলেন না, তখন ওই মাহমুদ মণিকে একটা খাসা আরব্য উপন্যাস শোনাতে। রাসকেলটা গল্প বানাতে আস্ত পাঠান। সে মণিকে বললে, “বাদশা আনাউল্লা খান সৈয়দ সায়েবকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এদেশে বিয়ে না করে দামড়ার মত ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত অনর্চিত। লোকনিন্দা হয়, বিশেষ করে আপনি যখন শিক্ষক। তারপর সৈয়দ সায়েবের হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁর মেয়ে-ইস্কুলে। সেখানে দু’শো মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হুকুম দিলেন, বেছে নাও। সৈয়দ সাহেব আর কি করেন! শাহানবাদশার হুকুম। না মানলে গর্দান। আর মেয়েগুলোই বা কি কম খাপসদুরত! সৈয়দ সায়েব বিয়ে করে মশগুল। তাই এদিক আসার ফুরসৎ তাঁর আর কই?’

আমি জীবনে ওই একবারই গীতাবর্ণিত নিকম্প প্রদীপ-শিখাবৎ!

মহবুব আলী বললেন, ‘মণি তো চিৎকার করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তার পর শয্যা নিল, এই ড্রাইং-রুমের দরজার গোড়ায়। একটানা রোজার উপবাস। রাত্রিও খায় না—’

আমিও শুধালুম, ‘মণি বিশ্বাস করলে ওই গাঁজাখুরি?’

‘কেন করবে না? মণি মাঝে মাঝে মোটরে করে আমার বিবির সঙ্গে শহরে যায়। পথে পড়ে মেয়ে-ইস্কুল। দেখেছে, মেয়েগুলোর বরফের মত ফরসা রঙ, বেদানার মত ট্যাব্যট্যাব্য লাল গাল, ধনুকের মত ভুরু—’

আমি বললুম, ‘থাক্ থাক্। আপনাকে আর কবিত্ব করতে হবে না। কিশত্ব আমি তো পছন্দ করি শ্যামবর্ণ—’

এইবারে মহবুব আলীর মুখে ফুটল মধুর হাসি। ন্যাকরা-গলা আবদে-আবদে-সুরে বললেন, ‘তা হলে মণিকে ডেকে সেই সুসমাচার শুনিয়ে দি এবং এটাও বলব কি যে, আপনি মণিকে কাবুলী মেয়েদের চেয়ে বেশী খাপসদুরত

বলে মনে করেন ?’

আমি তো রেগে উঠ। চিৎকার করে বললুম, ‘বলুন, বলুন, বিশ্বসুদ্ধকে বলুন। আমার কী আপত্তি ? মণি যখন বিশ্বাস করে আমার বিষয়ে হয়ে গিয়েছে, তখন তো আপনার সব সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে।’

মহবুব আলী হাসলেন, আরও মধুর হাসি। আমার গা জ্বলে গেল।

অমিয় ছানিয়া বললেন, ‘ওই তো আপনার ভুল। তাই যদি হত তবে আপনাকে দেখা মাত্রই মণি হাসির বন্যা জাগাল কেন ? চিৎকার করে তখন কী বলেছে, শুনছেন ? না, আপনি পশতু বোঝেন না। বলেছে, ওঁর হাতে মেহদীর দাগ নেই, উনি বিষয়ে করেন নি।’

আমি চুপ। শেষটায় কাতর কণ্ঠে শুধালুম, ‘মেহদীর দাগ ছাড়া কি কখনও বিষয়ে হয় না ?’

মহবুব আলী বললেন, ‘বোঝান গিয়ে মণিকে। আপনাকে কতবার বলেছি, ও পাঠান-মেয়ে, ও বোঝে পাঠানদের কায়দাকানুন। ও শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় পাঠান-জগতে। বিশ্বভুবনের খবর ও রাখে না।’

আমি শাধালুম, ‘আপনাকে গতবারে দেখেছিলুম। এ-ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। সেটা হঠাৎ কেটে গেল কী প্রকারে ? আমার তো মনে হচ্ছে জিনিসটে আরও বেশী প্যাঁচালো হয়ে যাচ্ছে।’

তিনি বললেন, ‘পাঠান-মেয়েরা সচরাচর বাপ-চাচার আদেশমত নাক কান বুদ্ধে বিষয়ে করে। কিন্তু হঠাৎ কখনও যদি পাঠান মেয়ে কাউকে ভালবেসে ফেলে তখন সে আগুনে হাত না দেওয়াই ভাল। ব্যাপারটার গুরুত্ব গোড়ার দিকে আমি বুঝতে পারি নি ; তাই তার একটা সমাধান খুঁজিছিলুম। এখন নিরাশ হয়ে অভয় মেনে বসে আছি।’

আমি আর কী বলব ! অত্যন্ত চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরলুম।

*

*

*

সমস্যার ফয়সালা করে দিল বাচ্চায়ে সকাও কাবুল আক্রমণ করে। আমি থাকি শহরের মাঝখানে, ব্রিটিশ লিগেশন শহরের বাইরে মাইল দেড়েক দূরে। বাচ্চা এসেছে সেদিক থেকেই এবং থানা গেড়েছে লিগেশন আর শহরের মাঝখানে। লিগেশন আর শহর একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেখানে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কয়েকদিন পরে বাচ্চা হটে গেল। তখন ব্রিটিশ শ্লেম এসে বিদেশী মেয়েদের পেশাওয়ার নিয়ে যেতে লাগল। খবর পেয়েই ছুটে গেলুম আমার বন্ধু মৌলানা জিয়াউদ্দীনের স্ট্রী জন্ম একটা সীট যোগাড় করতে।

মহবুব আলীর কলিং-বেল টেপা মাত্রই এবারে দরজা খুলল না। তখন হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল।

খানিকক্ষণ পর মহবুব আলী এলেন। মুখ বিষম। কোন ভূমিকা না দিয়েই বললেন, ‘কাবুল নিরাপদ স্থান নয় বলে লিগেশনের সব মেয়েদের পেশাওয়ারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার স্ট্রী চলে গিয়েছেন। মণিও গেছে।’

আমি বলতে চাইলুম, ‘ভালই হল’, কিন্তু বলতে পারলুম না।

তারপর বললেন, ‘আপনাকে বলে কি হবে, তবু বলি। যে কদিন শহর লিগেশন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সে কদিন এখানে অনেক রকম গুজব পৌঁছত, কেউ বলত কাবুলে লুটতরাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, কেউ বলত বিদেশীদের সব খুন করে ফেলা হয়েছে। আর মণি ছুটোছুটি করেছে, এ-চাপরাসী থেকে ও-চাপরাসীর কাছে, এ-আরদালীর কাছ থেকে ও-আরদালীর কাছে। টাকা দিয়ে লোভ পূৰ্ব্বত দেখিয়েছে, আপনার কুশল সংবাদ নিয়ে আসবার জন্যে।’

আমি চুপ।

‘তারপর যখন সে জানতে পারলে তাকেও আমার স্ত্রীর সঙ্গে পেশাওয়ার চলে যেতে হবে তখন এক বিপর্যয় কাণ্ড করে তুললে। কান্নাকাটি জুড়ে দিয়ে বললে, সে কিছতেই দেশে ফিরে যাবে না। এক রকম গায়ের জোরে তাকে খেলেন তুলে দিতে হল।’

আমি কিছু বলি নি।

*

*

*

একদিন কাবুলে অনেক কষ্ট সওয়ার পর খবর পেলুম, আরোশেনে জিয়াউদ্দীন ও আমার জন্য জায়গা হয়েছে। আগের রাতে মহবুব আলী আমাকে গুডজনি বাঁভইয়াজ জানাতে এলেন। বিদায়ের সময় আমাকে একটা মোটা খাম দিয়ে বললেন, ‘আপনি পেশাওয়ারে পৌঁছে আমার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মণিকে খবর দেবেন। মণি এলে তার হাতে খামটা দিয়ে বলবেন—এটা মহবুব আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো।’

আমি বললুম, ‘আমি তো পশতু বলতে পারি নে।’

তিনি কথা কটি উদ্‌ হরফে লিখে বার তিনেক আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিলেন।

আরোশেনে বসে পরের দিন অনেক চিন্তা করেছিলুম। কী চিন্তা করেছিলুম, সে-কথা দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন না।

পেশাওয়ার পৌঁছেই, গেলুম মহবুব আলীর শ্বশুরবাড়ি। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি, দুই বৃদ্ধ মুরুব্বী স্থানীয় লোক বসে আছেন। আমি মহবুব আলীর কুশল সংবাদ জানিয়ে তাঁদের অনুরোধ জানালুম, মণিকে একটু খবর দিতে। ভগ্নলোকেরা একটু চমকে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বললেন, ‘খবর দিচ্ছি।’ এঁরা চমকে উঠলেন কেন? তবে কি এ-বাড়ির মেয়েরা বৈঠকখানায় আসে না? তাহলে মহবুব আলীর সেটা বোঝা উচিত ছিল।

মণি এল। আমাকে দেখে অন্দরের দোরের গোড়ায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। মুখে কথা নেই। মুরুব্বীদের দিকে একবার তাকালে। তাঁরা তখন অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছেন। মণি মৃদু কণ্ঠে একটি শব্দ শোধালে, ‘সলামত?’ কথাটা ফাসী! হয়তো পশতুতেও চলে! অর্থ ‘কুশল?’

আমি ঘাড় নাড়িয়ে বললুম, ‘হ্যাঁ।’

তারপর তার কাছে গিয়ে খামটা দিয়ে সেই শেখা বুলিতে পশতুতে বললুম,

‘এটা মহাব্দ আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ে।’ মণির মূখ খুশিতে ভরে উঠল। যা বলল সে-ভাষা না জেনেও বুঝতে পারলুম, সে বলছে, ‘পশতু তা হলে শিখেছেন?’

আমি দৃংখ দেখিয়ে ঘাড় নেড়ে ‘না’ জানালুম।

মণি ভিতরে চলে গেল।

আমি উঠি-উঠি করছিলাম এমন সময় চাকর এসে বললে কিছু খেয়ে যেতে। পাঠানের বাড়িতে না খেয়ে চলে যাওয়া বড় বেয়াদবি।

মণি টেবিলে খাবার সাজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়াল।

একটি কথা বলল না।

বাড়ি থেকে বেরবার সময় একবার পিছনেব দিকে তাকালুম, মণিকে শেষ সেলাম জানাবার জন্য। কোথাও পেলুম না।

টাঙ্গাতে উঠে উলটো দিকে মূখ করে বসতেই নজরে গেল দোতলার বারান্দার দিকে। দেখি মণি দাঁড়িয়ে। মাথায় ওড়না নেই। আর দু’ চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, লম্বা লম্বা ধারা বয়ে।

টাঙ্গা মোড় নিল।

সে রাতে দেশের ট্রেন ধরলুম।

চাচা-কাহিনী

বালিন শহরের উলাড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থান হোস নামে একটি রেস্টোরাঁ জন্ম নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে, বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্টোরাঁর এক কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার গোসাই ছিলেন চাচা, বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান, আর চেলারা—গোসাই, মুখুন্ডেজ, সরকার, রায়, চ্যাংড়া গোলাম মোলা ইত্যাদি।

রায় চুক চুক করে বিয়ার খাচ্ছিলেন আর গ্রাম-সম্পর্কে তাঁর ভাণে গোলাম মোলা ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে মিট মিট করে তাকাচ্ছিল, পাছে তিনি বানচাল হয়ে যান। এ-মামলা চাচা রোজই দেখেন, কিছু বলেন না, আজ বললেন, ‘অত ডরাচ্ছিস কেন?’

মোলা লাজুক ছলে। মাথা নিচু করে বললে, ‘ওটা খাবার কী প্রয়োজন? আপনি তো কখনও খান নি, এতদিন বালিনে থেকেও। মামুরই বা কী দরকার?’

চাচা বললেন, ‘ওর বাপ খেত, ঠাকুরদা খেত, দাদামশাই খেত, মামারা খায় এ দেশে না এসেও। ও হল পাইকারী মাতাল, আর পাঁচটা হিন্দুস্থানীর মত পেঁচাঁ মাতাল নয়। আর আমি কখনও খাই নি তোকে কে বললে?’

আড্ডা একসঙ্গে বললে, ‘সে কী চাচা?’

এমন ভাবে কোরাস গাইলে, মনে হল, যেন বছরের পর বছর তারা ওই বাক্যগুলোই মোহড়া দিয়ে আসছে।

ডান হাত গলাবন্ধ কোটের মাথাখান দিয়ে ঢুকিয়ে, বাঁ হাতের তেলো চিত করে চাচা বললেন, ‘মদকে ইংরিজিতে বলে স্পিরিট, আর স্পিরিট মানে ভূত। অর্থাৎ মদে রয়েছে ভূত। সে-ভূত কখন কার ঘাড়ে চাপে তার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? তবে ভাগিাস, ও-ভূত আমার ঘাড়ে মাত্র একদিনই চেপেছিল, একবারের তরে।’

গম্পের সম্বন্ধ পেয়ে আড্ডা খুশ! আসন জমিয়ে সবাই বললে, ‘ছাড়ুন চাচা।’

রায় বললেন, ‘ভাগিনা, আরেকটা বিয়ার নিয়ে আস।’

মৌলা অতি অনিচ্ছায় উঠে গেল। উঠবার সময় বললে, ‘এই নিয়ে আঠারটা।’

রায় শুনালেন, ‘বাড়তি না কমতি?’

ফিরে এলে চাচা বললেন, ‘ফ্লাইন ফন্ ব্রাথেলকে চিনিস?’

লোডি-কিলার পুন্ডলিন সরকার বললে, ‘আহা কৈসন্ সুন্দরী,

রুপসিনী বলদিনী

নরদিশি নন্দিনী।’

শ্রীধর মুন্থুজ্জ বললে, ‘চোপ্—।’

চাচা বললেন, ওর সঙ্গে প্রেম করতে যাস নি। চুমো খেতে হলে তোকে উদখল সঙ্গে নিয়ে পেছনে ঘুরতে হবে।’

বিয়ারের ভুড়ভুড়ির মত রায়ের গলা শোনা গেল, ‘কিংবা মই।’

গোসাই বললেন, ‘কিংবা দুই-ই। উদখলের উপর মই চাপিয়ে।’

শ্রীধর বললে, ‘কী জ্বালা! শাস্ত্র শ্রবণে এরা বাধা দিচ্ছে কেন? চাচা, আপনি চালান।’

চাচা বললেন, ‘সেই ফন্ ব্রাথেল আমার বড় স্নেহ করত, তোরা জানিস। ভরগ্রীষ্মকালে একদিন এসে বললে, “ফ্লাইনার ইন্ডিয়ট (হাবা-গঙ্গারাম), এবারে আমার জন্মদিনে তোমাকে আমাদের গায়ের বাড়িতে যেতে হবে। শহরে থেকে থেকে তুমি একদম পিলা মেরে গেছ, গায়ের রোদে রঙটিকে ফের একটু বাদামির আমেজ লাগিয়ে আসবে।’

আমি বললুম, “অর্থাৎ জুতোতে পালিশ লাগাতে বলছ? রোসদুরে না বোরিয়ে বোরিয়ে কোনও গতিকে রঙটা একটু ‘ভদ্রস্থ’ করে এনেছি, সেটাকে আবার নেটিভ-মার্ক করা? কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তুমি না হয় আমাকে সঙ্গে নিতে পার; কিন্তু তোমার বাড়ির লোক? তোমার বাবা, কাকা?”

ব্রাথেল বললে, “না হয় একটু বাদর-নাচই দেখালে।”

চাচা বললেন, ‘যেতেই হল। ব্রাথেল আমার যা-সব উপকার করেছে তার বদলে আমি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও যেতে পারি।’

মৌলা চট করে একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নিলে।

চাচা বললে, ‘অজ পাড়াগাঁ ইন্সট্যান। প্যাসেঞ্জারে যেতে হল। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি, স্বয়ং স্টেশনমাষ্টার সেলাম ঠুকে সামনে হাজির। তার পিছনে

ছোটবাবু, মালবাবু—অবশ্য দ্যাশের মত খালি গায়ে আলপাকার ওপর ট্রেসট-কোট পরা নয়, টিকিট-বাবু, দু-চারজন তামাশা দেখেনেওলা, পুরো পাক্কা প্রসেশন বললেই হয়। ওই অঙ্ক স্টেশনে আমিই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় নামলুম, আর আমিই বোধ হয় শেষ।

স্টেশনমাস্টার বললে, “বাইরে গাড়ি তৈরি, এই দিকে আজ্ঞা হোক।”

বুদ্ধলুম, ফন্ ব্রাথেলেরা শুধু বড়লোক নয়, বোধ হয় এ-অঞ্চলের জমিদার।

বাইরে এসে দেখি, প্রাচীন ফিটিং গাড়ি, কিন্তু বেশ শস্ত্রসম্মত। কোচম্যান তার চেয়েও বড়ো, পরনে মর্নিং সুট, মাথায় চোঙার মত অপ্‌রা হ্যাট, আর ইয়া হিউডেনবুর্গি গোফ, এডওয়াডী’ লাড়ি, আর চোখ দুটো এং নাকের ডগাটি সুস্জ রায়ের চোখের মত লাল, জয়কুম্‌মসকাশং।

কী একটা মন্ত্র পড়ে গেল; দাড়ি-গোঁপের ছাঁকনি দিয়ে যা বেরোল তার থেকে বুদ্ধলুম, আমাকে ফিউডান পদ্ধতিতে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। এ চাপানের কী ওতের মন্ত্র গাইতে হয় ব্রাথেল আমাকে শিখিয়ে দেয় নি। কী আর করি, “বিলক্ষণ, বিলক্ষণ” বলে যেতে লাগলুম, আর মনে মনে ব্রাথেলকে প্রাণ ভরে অভিনন্দিত করলুম, এ-সব বিপাকের জন্য আমাকে কায়দা-কেতা শিখিয়ে দেয় নি বলে।

আমি গাড়িতে বসতেই কোচম্যান আমার হাঁটুর উপর একখানা ভারী কম্বল চাপিয়ে দু দিকে গুঁজে দিয়ে মিলিটারী কায়দায় গটগট করে গিয়ে কোচবাক্সে বসল। তারপর চাবুকটা আকাশে তুলে সার্কাসের হাটারওয়ালী ফ্লয়ারলেস নাদিয়ার মত ফটাফট করে মাঠের মাধ্যাকান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে স্টেশনমাস্টারের ফুটফুটে মেয়েটি আমার অটোগ্রাফ আর স্ন্যাপ্‌ দুইই তুলে নিয়েছে।

মাঠের পর ঈষৎ খাড়াই, তারপর ঘন পাইন বন; বন থেকে বেরতেই সামনে উঁচু পাহাড় আর তার উপর যমদূতের মত দাঁড়িয়ে এক কাসল্‌। মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশযায় শুয়ে শুয়ে ভীষ্মদেব মেলা দুর্গের বয়ান করেছেন, এ দুর্গ যেন সব কটা মিলিয়ে লাভাড়ি-ভর্তা।

আমি ভয় পেয়ে শুধালুম, “ওই আকাশে চড়তে হবে?”

কোচম্যান ঘাড় ফিঁদিয়ে গর্বের হাসি হেসে বললে, “ইয়াঃ মাইন হের!” দেমাকের ঠালায় তার গোঁপের ডগা দুটো আরও আড়াই ইঞ্চি প্রমোশন পেয়ে গেল। তারপর ভরসা দিলে, ‘এক মিনিটে পৌঁছে যাব স্যার।’ আমি মনে মনে মৌলা আলীকে স্মরণ করলুম।

এ কী বিদঘুটে ঘোড়া রে বাবা, এতক্ষণ সমান জমিতে চলাছিল আমাদের দিশী টাটুর মত কদম আর দুলাকি চাল মিশিয়ে, এখন চড়াই পেয়ে চলল লাম্বা চালে। রাস্তাটা অজগরের মত পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠে যেন কাসল্‌টার ফণা মেলেছে; কিন্তু ফণার কথা থাক্‌, উপস্থিত প্রতি বাকি গাড়ি যেন দু চাকার উপর ভর দিয়ে মোড় নিয়েছে।

হঠাৎ সামনে দেখি বিরাট খোলা গেট। কাঁকরের উপর দিয়ে গাড়ি এসে

যেখানে দাঁড়ালো তার ওপর থেকে গলা শূন্যে তাকিয়ে দেখি, ভিলিকিনি থেকে—’

মৌলা শূখাল, ভিলিকিনি মানে ?’

চাচা বললেন, ‘ও ব্যালকনি, আমাদের দেশে বলে ভিলিকিনি—সেই ভিলিকিনি থেকে ফন্ ব্রাখেল চেষ্টা করে বলছে, যোহানেস, ওঁকে ওঁর ঘর দেখিয়ে দাও ; গন্স্টাফ টেবিল সাজাচ্ছে ।’

তারপর আমাকে বললে, “ডিনারের পয়লা ঘণ্টা এখুনি পড়বে, তুমি তৈরী হয়ে নাও ।”

চাচা বললেন, ‘পরি তো কারখানার চোঙার মত পাতলদুর্ন আর গলাবন্ধ কোট, কিন্তু একটা নেভি-ব্লু স্কাট আমি প্রথম যৌবনে হিম্মৎ সিং-এর পাল্লায় পড়ে করিয়েছিলুম, তার রঙ তখন বাদামীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এর পর কোন রঙ নেবে যেন মনঃস্থির করতে না পেরে ন যথৌ ন তস্থৌ হয়ে আছে । হাত-মুখ ধুয়ে সেইটি পরে বেডরুমটার ফেন্সি জিনিসপত্রগুলো তাকিয়ে দেখছি এমন সময় ব্রাখেল আমাকে নক করে ঘরে ঢুকল । আমার দিকে তাকিয়ে বললে, “এ কী ? ডিনার-জ্যাকেট পর নি ?”

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, “ওসব আমার নেই, তুমি বেশ জান ।”

ফন্ ব্রাখেল বললে, “উঁহু, সেটি হচ্ছে না । এ বাড়িতে এ-সব ব্যাপারে বাবা জ্যাঠা দুজনাই জোর রিচুয়াল মানেন, বড় পিটিপটে । তোমাদের পুজোপাজা নেমাজ-টেমাজের মত সসেজ থেকে মাস্টার্ড খসবার উপায় নেই ।” তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে, “তা তুমি এক কাজ কর । দাদার কাবাড’ভিত’ ডিনার-জ্যাকেট, শার্ট, বো—তারই এক প্রস্থ পরে নাও । এটা তারই বেডরুম ; এই কাবাডে’ সব-কিছু পাবে ।”

আমি বললুম, “তুও যা, তোমার দাদার জামা-কাপড় পরলে কোট মাটি পেঁচে তোমার ডিনার গাউনের মত টেল করবে ।”

বললে, “না, না, না । সবাই কি আমার মত দিক-ধেড়েঙ্গে ! তুমি চটপট তৈরী হয়ে নাও, আমি চললুম ।”

চাচা বললেন, ‘কী আর করি, খুললুম কাবাড’ । কাতারে কাতারে কোট পাতলদুর্ন ঝুলছে—সদ্য প্রেস্‌ড, দেরাজ ভিত’ শার্ট, কলার, বো হীরে-বসানো স্লীভ-লিন’ক্‌স, আরও কত কী !

‘মানিকপীরের মেহেরবানি বলতে হবে, জুতোটি পৰ্যন্ত ফিট করে গেল দস্তানার মত ।

‘তারপর চুল ব্রাশ করতে গিয়ে আমার কেমন যেন মনে হল. এ বেশের সঙ্গে সঙ্গে মাথার মাথাখানে সিঁথি জুতসই হবে না, ব্র্যাকব্রাশ করলেই মানাবে ভাল । আর আশ্চর্য, বিশ বছরের দু ফাঁক করা চুল বিলকুল বেয়াড়ামি না করে এক লম্ফে তালুর উপর দিয়ে পিছনে ঘাড়ের উপর চেপে বসল, যেন আমি মায়ের গর্ভ থেকে ওই ঢঙের চুল নিয়েই জন্মেছি । আয়নাতে চেহারা দেখে মনে হল, ঠিক জংলীর মত তো দেখাচ্ছে না, তোরা অবিশ্যি বিশ্বাস করবি নে ।’

চাচার ন্যাওটা ভক্ত গোসাই বললে, 'চাচা, এ আপনার একটা মস্ত দোষ ; শুধু আত্মনিন্দা করেন। ওই যে আপনি মহাভারতের শাস্তিপর্বের কথা বললেন, সেখানেই ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে আত্মনিন্দার প্রচণ্ড নিন্দা করে গেছেন।'

চাচা খুশী হয়ে বললে, 'হেঁ-হেঁ', তুই তো বললি, কিন্তু ওই পদ্বিনটা ভাবে সেই শুধু লোড়-কিলিং লটবর। তা সে কথা যাক গে, ঈভনিং-ড্রেসে কালা কেট্টে সঙ্গে আমি তো শিশ দিতে দিতে নামলুম নীচের তলায়—'

পদ্বিন শুধালে, 'স্যার, আপনাকে তো কখনও শিশ দিতে শুনিনি, আপনি কি আদপেই শিশ দিতে পারেন?'

চাচা বললেন, 'ঠিক শুধিয়েছি। আর সত্যি বলতে কী, আমি নিজের জানি নে, আমি শিশ দিতে পারি কি না। তবে কি জানিস, হাফপ্যান্ট পরলে লাফ দিতে ইচ্ছা করে, জোব্বা পরলে পম্মাসনে বসে থাকবার ইচ্ছা হয়, ঠিক তেমনি ঈভনিং ড্রেস পরলে কেমন যেন সাঁঝের ফষ্টি-নষ্টি করবার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে, না হলে আমি শিশ দিতে যাব কেন? শিশ কি দিয়েছিলুম আমি, শিশ দিয়েছিল বকাটে সুটটা। তা সে কথা যাক।'

ততক্ষণে ডিনারের শেষ ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। আন্দাজে আন্দাজে ড্রইংরুম পেরিয়ে ঢুকলুম গিয়ে ব্যানকুয়েট-হলে।

কাস্লের ব্যানকুয়েট-হল আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ-সাইজ হবে। তার আর বিচিত্র কী এবং সিনেমার কুপায় আজকাল প্রায় সকলেরই তার বিদ্যুটে টপ-টপ দেখা হয়ে গিয়েছে; কিন্তু বাস্তবে দেখলুম ঠিক সিনেমার সঙ্গে মিলল না। আমাদের দিশী সিনেমাতে চণ্ডীদাস পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে টিনের ছাতাওয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন, যদিও বোতাম আর টিন এসেছে ইংরাজী আমলে। আর হলিউড যদি ব্যানকুয়েট-হল দেখায় অষ্টাদশ শতাব্দীর, তবে আসবাবপত্র রাখে সপ্তদশ শতাব্দীর, জাস্ট টু বী অন্ দি সেফ্ সাইড।

ফন ব্রাথেলদের কাসল্ কোন্ শতাব্দীর জানি নে কিন্তু হলে ঢুকেই লক্ষ্য করলুম, মাধ্যাতার আমলের টেবিল-চেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সুখ-সুবিধার সরঞ্জামও মিশে রয়েছে। তবে খাপ খেয়ে গিয়েছে দিবা, এঁদের রুচি আছে কোনও সন্দেহ নেই। এসব অবশ্য পরে, খেতে খেতে লক্ষ্য করেছিলাম।

টেবিলের এক প্রান্তে ক্লারা ফন ব্রাথেল, অন্য প্রান্তে যে ভগ্নলোক বসেছেন তাঁকে ঠিক ক্লারার বাপ বলে মনে হল না, অতখানি বয়স যেন ওঁর নয়।

প্রথম দর্শনেই দুজনেই কেমন যেন হবচাকিয়ে গেলেন। বাপের হাত থেকে তো ন্যাপার্কিনের আংটিটা ঠং করে টেবিলের উপর পড়ে গেল। আমি আশ্চর্য হলুম না, ভগ্নলোক হয়তো জীবনে এই প্রথম ইংডার (ভারতীয়) দেখেছেন, কালো ঈভনিং-ড্রেসের ওপর কালো চেহারা—গোসাইয়ের পদাবলীতে—

'কালোর উপরে কালো।'

হবচাকিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় কিন্তু ক্লারা কেমন যেন অশুভভাবে

তাকালে ঠিক বুঝতেই পারলুম না। তবে কি বোটা ঠিক হেডিং ম্যাফিক বাঁধা হয় নি। কই, আমি তো একদম রেডিমেডের মত করে বেঁধেছি, এমন কি হাল-ফ্যাশান ম্যাফিক তিন ডিগ্রি টারচাও করে দিয়েছি। তবে কি ঈভানিং ড্রেস আর ব্যাকব্রাস করা চুলে আমাকে ম্যাজিসিয়ানের মত দেখাচ্ছিল ?

সামলে নিয়ে ক্লারা ভদ্রলোককে বললে, “পাপা, এই হচ্ছে আমার ইন্ডয়ার আফে !”

অর্থাৎ, ভারতীয় বাঁদর।

বাপও ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। মিষ্টি হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শেক-হ্যান্ড করলেন। ক্লারাকে বললেন, “প্যুই—ছিং, ও-রকম বলতে নেই।”

আমি হঠাৎ কী করে বলে ফেললুম, “আমি যদি বাঁদর হই তবে ও জিরাফ।”

বলেই মনে হল, তওবা, তওবা, প্রথম দিনেই ও-রকমধারা জ্যাঠামো করা উচিত হয় নি।

পিতা কিস্তু দেখলুম, মন্তব্যটা শুনে ভারি খুশ। বললেন “ডাঙেক—ধন্যবাদ—ক্লারাকে ঠিক শুনিয়ে দিয়েছ। আমরা তো সাহস পাই নে।”

পালিশ-আয়নার মত টেবিল, স্বচ্ছন্দে মুখ দেখা যায়। তার উপর ওলন্দাজ লেসের গোল গোল হালকা চাকতির উপর শ্লেট পিরিচ সাজানো। বড় শ্লেটের দু দিকে সারি বাঁধা অস্ত্রত আটখানা ছুরি, আটখানা কাঁটা, আধ ডজন নানা ঢঙের মদের গেলাস। সেরেছে! এর কোন্ ফর্ক দিয়ে মুরগী খেতে হয়, কোন্টা দিয়ে রোস্ট আর কোন্টা দিয়েই বা সাইড্ ডিশ ?

আসল খাবার পূর্বের চাট—‘অর দ্য অভ্রের’ নাম দিয়েছি আমি চাট, তখন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। খুশার ছ পদ থেকে আমি তুলেছি মাত্র দু পদ, কিষ্টিং সসেজ আর দুটি জলপাই, এমন সময় বাটলার দু হাতে গোটা চারেক বোতল নিয়ে এসে শূখাল, শেরি ? পোর্ট ? ভেরমুট ? কিংবা হুইস্কি সোডা ?

আমি এসব দুবা সসম্বন্ধে এড়িয়ে চলি। হঠাৎ কী করে মুখ দিয়ে বোরিয়ে গেল “নো বিয়ার !”

বলেই জিত কাটলুম। আমি কী বলতে কী বললুম! একে তো আমি বিয়ার জীবনে কখনও খাই নি, তার উপরে আমি ভাল করেই জানি, বিয়ার চাষাড়ে ড্রিঙ্ক, ভদ্রলোকে যদি-বা খায় তবে গরমের দিনে, তেঁটা মেটাবার জন্যে। অষ্টপদী ব্যানকুয়েটে বিয়ার! এ যেন বিয়ের ভোজে কালিয়ার বদলে শূটকি তলব করা!

ক্লারা জানত, আমি মদ খাই নে, হয়তো বাপকে তাই আগের থেকে বলে রেখে আমার জন্যে মাফ চেয়ে রেখেছিল, তাই সে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালে।

বাটলার কিস্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে এক টাউস বিয়ারের মগ নিয়ে এল, তার ভিতরে অনায়াসে দু বোতল বিয়ারের জায়গা হয়।

যখন নিতান্তই এসে গিয়েছে তখন খেতে হয়। ভাবলুম, একটুখানি ঠোঁটে

ভেজাব মাত্র, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করবে না, খেতে গিয়ে ঢক ঢক করে প্রায় আধ মগ সাফ করে দিলুম।’

মৌলা এক বিঘত হাঁ করে বললে, ‘এক থাকায় এক বোতল? মামুও তো পারবে না।’

চাচা বললেন, ‘কেন শরম দিচ্ছিস, বাবা? ওরকম ইভনিং-ড্রেস পরে ব্যানকুয়েট-হলে বসলে তোর মামাও এক ঝটকায় দু পিপি বিয়ার গিলে ফেলত। বিয়ার কি আমি খেয়েছিলুম? খেয়েছিল ওই শালার ড্রেস!’

গোসাই মর্মান্বিত হয়ে বললে, ‘চাচা!’

চাচা বললেন, ‘অপরাধ নিস নি গোসাই, ভাষা বাবদে আমি মাঝে মাঝে এটুখানি বে-এক্সপ্লার হয়ে যাই। জানিস তো আমার জীবনের পরলা গুরু ছিলেন এক ভাষা, তিনি শ’কা ব’কার ছাড়া কথা কইতে পারতেন না। তা সে কথা থাক।’

তখনও খেয়েছি মাত্র আড়াই চাঙি সসেজ আর আধখানা জলপাই, পেট পশ্চার বালুচর। সেই শব্দ-পেটে বিয়ার দু মিনিট জিরিয়েই চচ্চড় করে চড়ে উঠল মাথার ব্রক্সরশ্রেণী।

এমন সময় হের ফন ব্রাখেল জিজ্ঞেস করলেন, “বার্লিনে কী রকম পড়াশোনা হচ্ছে?”

বুদ্ধলুম, এ হচ্ছে ভদ্রতার প্রশ্ন, এর উত্তরে বিশেষ কিছু বলতে হয় না, হুঁ করে গেলেই চলে কিন্তু আমি বললুম, “পড়াশোনা? তার আমি কী জানি? সমস্ত দিন, সমস্ত রাত বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না, তো কাটে হৈ-হৈ করে ইয়ার-বকশীদের সঙ্গে।”

বলেই অবাক হয়ে গেলুম। আমার তো দিনের দশ ঘণ্টা কাটে স্টাটস্ বিবলিওটেকে, স্টেট লাইব্রেরিতে, ক্লারারও সে খবর বেশ জানা আছে। ব্যাপার কী? সেই গল্পটা তোদের বলেছি?—পিপের ছাঁদা দিয়ে হুইস্কি বেরুচ্ছিল, ইন্দুর চুক চুক করে খেয়ে তার হয়ে গিয়েছে নেশা, লাফ দিয়ে পিপের উপরে উঠে আশ্চিন গুটিয়ে বলছে, “ওই ড্যাম ক্যাটটা গেল কোথা? ব্যাটাকে ডেকে পাঠাও, তার সঙ্গে আমি লড়ব।”

কিন্তু এত সাত-তাড়াতাড়ি কি নেশা চড়ে?

ইতিমধ্যে আপন অজানাতে বিয়ারে আবার লম্বা চুমুক দিয়ে বসে আছি।

করে করে তিন-চার পদ খাওয়া হয়ে গিয়েছে। যখন রোস্ট টাকীতে পেঁচিছি, তখন দেখি অতি ধোপদুরন্ত ইভনিং-ড্রেস-পরা আর এক ভদ্রলোক টেবিলের ওদিকে আমার মধুমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। ক্লারা তাঁকে বললে, “জ্যাঠামশাই, এই আমাদের ইন্ডার।” বড় নাভিস ধরনের লোক। হাত অল্প অল্প কাঁপছে। আর বার বার বলছেন, “তোমরা ব্যস্ত হয়ে না, সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, আমি শব্দ ইয়ে—” তারপর আমার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে বললেন, “আমি শব্দ রোস্ট আর পুডিং খাই বলে একটু দেরিতে আসি।”

তারপর আমি কী বকর-বকর করেছিলুম আমার স্পষ্ট মনে নেই। সঙ্গে

সঙ্গে চলছে বিয়ারের পর বিয়ার, কখনও বা বেশ উঁচু গলায় বলে উঠি, “গন্সটাফ, আরও বিয়ার নিয়ে এস।”

এ কী অভদ্রতা ! কিন্তু কারও মুখে এতটুকু চিত্তবিকলোর লক্ষণ দেখতে পেলুম না, কিংবা হয়তো লক্ষ্য করি নি। আর ভাবছি, ডিনার শেষ হলে বাঁচি।

শেষ হলও। আমরা ড্রাইংরুমে গিয়ে বসলুম। কফি লিকার সিগার এল। আমি অভদ্রতার চূড়ান্তে পৌঁছে বললুম, “নো লিকার, বিয়ার প্লীজ !”

বাবা হেসে বললেন, “আমাদের বিয়ার তোমার ভাল লাগাতে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু একটু বিলিয়াড খেললে হয় না ? তুমি খেলো ?”

বললুম, “আলবত !” অথচ আমি জীবনে বিলিয়াড খেলোছি মাত্র দু’দিন, কলকাতার ওয়াই. এম. সি. এ-তে। এখানকার বিলিয়াড টেবিলে আবার পকেট থাকে না, এতে খেলা অনেক বেশী শক্ত।

জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে বললেন, “গুড বাই, তোমরা খেলোগে।”

ক্রায়াও আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে “গুড নাইট” বললে।

খুব নিচু ছাতওয়ালা, প্রায় মাটির নীচে বিরাট জলসাম্বর, তারই এক প্রান্তে বিলিয়াড-টেবিল। দেওয়ালের গায়ে গায়ে সারি সারি বিয়ারের পিপে। এত বিয়ার খায় কে ? এরা তো কেউ বিয়ার খায় না দেখলুম।

ইতিমধ্যে লিকারের বদলে ফের শ্যাম্পেন উপস্থিত। আমি বললুম, “নো শ্যাম্পেন।” আবার চলল বিয়ার।

মার্কার কিউ এনে দিলে। আমি সেটা হাতে নিয়ে একটু বিরিস্তির সঙ্গে বললুম, “এ আবার কী কিউ দিলে ?”

মার্কারের মুখে কোন অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল না। বরঞ্চ যেন খুশী হয়েই আলমারি খুলে একটি পুরনো কিউ এনে দিলে। আমি পাকা খেলোয়াড়ীর মত সেটা হাতে ব্যালান্স করে বললুম, “এইটেই তো, বাবা, বেশ ; তবে ওই পচা মাল পাচার করতে গিয়েছিল কেন ?”

আমার বৈয়াদাব তখন চূড়া ছেড়ে আকাশে উঠে ঢলাঢলি আরম্ভ করে দিয়েছে। অবশ্য তখনও ঠিক ঠিক ঠাহর হয় নি, মালুম হয়েছিল অনেক পরে।

গ্রামের একঘেয়ে জীবনের কান্না খেলোয়াড়কে আমি হারাব এ আশা অবিশ্য আমি করি নি ; কিন্তু খেলতে গিয়ে দেখলুম, খুব যে খারাপ খেলছি তা নয়, তবে আমার প্রত্যাশার চেয়ে ঢের ভাল। আর প্রতিবারেই আমি লীড পেয়ে যাচ্ছিলুম অতি খাসা, স্বপ্নের বিলিয়াডেও মানুষ ও রকম লীড পায় না।

রাত ক’টা অবধি খেলা চলেছিল বলতে পারব না। আমি তখন তিনটে বলের বদলে কখনও ছটা কখনও নটা দেখছি, কিন্তু খেলে যাচ্ছি ঠিকই, খুব সম্ভব ভাল লীডের লাকে।

হের ফন্ ব্রাখেল শেষটায় না বলে থাকতে পারলেন না, “তোমার লাক বড় ভাল।”

অত্যন্ত বেকসুর মন্তব্য। আমি কিন্তু চটে গিয়ে বেশ চড়া গলায় বললুম, “লাক, না কচুর ডিম ! নাচতে না জানলে শহর বাঁকা। আই লাইক্ দ্যাট !”

ব্রাথেল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, আমিও অষ্টমে উঠে আরও কড়া কথা শুনিয়ে দিলুম। ওদিকে দেখি মার্ক'র ব্যাটা মিটমিটিয়ে হাসছে। আমি আরও চটে গিয়ে হুঙ্কার দিলুম, 'তোমার মূল্যের দোকান বন্ধ কর, এখন রাত সাড়ে তোরোটায় কেউ মূল্য কিনতে আসবে না।' অথচ 'বেচারী বড়ো থুথুড়ো, সব কটা দাঁত জগন্নাথ দেবতাকে দিয়ে এসেছে।

চিংকার-চেপ্পাচেপ্পির মাধ্যমানে হঠাৎ দেখি সামনে জ্যাঠামশাই, পরনে তখনও পরিপাটি ঈভনিং-ড্রেস।

আবার সেই নাভাস স্বরে বললেন, "সরি সরি, তোমরা কিছু মনে কোর না, আমি শব্দ শুনে এলুম।" তারপর ক্রারার বাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হুই বড় ঝগড়াটে, ভল্ফ্‌গাঙ, নিত্য নিত্য এর সঙ্গে ঝগড়া করিস।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "তার চেয়ে বরং একটু তাস খেললে হয় না? আমার ঘুম হচ্ছে না।"

আমি বললুম, "হুই হুই হুই।"

তাসের টেবিল এল।

আমি স্কাট খেলেছি বিলিয়াডের চেয়েও কম।

জ্যাঠা বললেন, 'কী স্টেক?'

বাপ বললেন, 'নিত্যকার।'

'নিত্যকার' বলতে কী বোঝাল জানি নে। ওদিকে আমার পকেটে হো ছুঁচো ডিগবাজি খেলছে। জ্যাঠা হিসাব করে বললেন, 'হানস্ পনেরো মার্ক' ভল্ফ্‌গাঙ' দুই।'

আপনার থেকে আমার বাঁ হাত কোটের ভিতরকার পকেটের দিকে রঙনা হল। তখনই মনে পড়ল, এ কোট তো ক্রারার দাদার। আমার মনিব্যাগ তো পড়ে আছে আমার কোটে, উপরের তলায়। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে হাত গিয়ে ঠেকল এক তাড়া করকরে নোটে। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তাঁহার কৃপায় টাকা গজায়। এই টাকা দিয়েই আজকের ফাঁড়া কাটাই, পরের কথা পরে হবে। ক্রারাকে বুঝিয়ে বললে সে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না। আর নিজের মনিব্যাগে রেক্স আছেই বা কী? দশ মার্ক হয় কি না-হয়।

ওদিকে রেক্স নেই, ওদিকে খেলার নেশাও চেপেছে। পরের বারিজতে আবার হারলুম, এবার গেল আরও কুড়ি মার্ক, তারপর পঞ্চাশ, তারপর কত তার আর আমার হিসেব নেই। নোটের তাড়া প্রায় শেষ হতে চলল। আমি যুধিষ্ঠির নই, অর্থাৎ কোন রমণীর উপর টুরেস্টি পাসে'ন্টে অধিকারও আমার নেই, না হলে তখন সে রেক্সও ভাঙাতে হত, এমন সময় আছে আছে আমার ভাগ্য ফিরতে লাগল। দশ কুড়ি করে সব মার্ক তোলা হয়ে গেল, তারপর প্রায় আরও শ দুই মার্ক জিতে গেলুম।

ওদিকে মদ চলছে পাইকারী হিসেবে আর জ্যাঠামশাই দেখি হারার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী নাভাস হয়ে যাচ্ছেন। আমি তো শেষটায় না থাকতে পেরে খলখল করে হেসে উঠলুম। কিছুতেই হাসি থামাতে পারি নে। গলা দিয়ে এক ঝলক

বিয়ার বেরিয়ে এল, কোন গতিকে সেটা রুমাল দিয়ে সামলালুম ! কিন্তু হাসি আর থামতে পারি নে । বদ্বলদুম, এরই কল্প নেশা ।

জ্যাঠামশাই নাভাঁস সুরে বললেন, “হেঁ-হেঁ, এটা যেন, কেমন যেন,—হেঁ-হেঁ, তোমার লাক্—হেঁ-হেঁ—নইলে আমি খেলাতে—”

আবার লাক্ ! এক মূহুর্তে আমার হাসি থেমে গিয়ে হল বেজায় রাগ । বিলিয়ার্ডের বেলায়ও আমাকে শুনতে হয়েছিল ওই গুড্ ড্যাম্ লাকের দোহাই ।

ঔং হয়ে এক ঝটকায় টেবিলের তাস ছিটকে ফেলে বললুম, “তার মানে ? আপনারা আমাকে কী পেয়েছেন ? ইউ অ্যান্ড ইয়োর ড্যাম্ লাক্, ড্যাম্, ড্যাম্—”

বাপ-জ্যাঠা কী বলে আমার ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন আমার সেদিকে খেয়াল নেই । কতক্ষণ চলেছিল তাও বলতে পারব না, আমার গলা পর্দার পর পর্দা চড়ে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার যত কটুকাটব্য ।

এমন সময় দেখি, ক্লারা ।

কোথায় না আমি তখন হুঁশে ফিরব—আমি তখন সপ্তমে না, একেবারে সেপ্তুরির নেশায় । শেষটায় বোধ হয়, ‘ছোটলোক’, ‘মীন’, এইসব আশ্রাব্য শব্দও ব্যবহার করেছিলুম ।

ক্লারা আমার কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে । অনুনয় করে বললে, “হত চট্ছ কেন, ওঁদের সঙ্গে না খেললেই হয়, ওঁরা ওই রকমই করে থাকেন ।”

বেরুবার সময় পর্যন্ত শূনি ওঁরা বলছেন, “সরি, সরি, প্লীজ প্লীজ । আমাদের দোষ হয়েছে ।”

তবু আমার রাগ পড়ে না ।

চাচা কণ্ঠে চুমুক দিলেন । রায় বললেন, ‘ঢের ঢের মদ খেয়েছি, ঢের ঢের মাতলামো দেখেছি, কিন্তু এরকম বিদঘুটে নেশার কথা কখনও শূনি নি ।’

চাচা বললেন, ‘যা বলেছ ! তাই আমি রাগ ঝাড়তে ঝাড়তে গেলুম শোবার ঘরে ! ঈভনিং-কোট, পাতলুন খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কিন্তু ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে, বিয়ারের মগও হাতের কাছে নেই ।

বালিশে মাথা দিতে না দিতেই স্পষ্ট বদ্বতে পারলুম, সমস্ত সন্ধ্যা আর রাতভোর কী ছুঁচোমিটাই না করেছি ! ছিঁ-ছিঁ, ক্লারার বাপ-জ্যাঠামশায়ের সামনে কী ইতরোমোই না করে গেলুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে !

আর এদেশে সবাই ভাবে ইন্ডিয়ার লোক কতই না বিনয়ী, কতই না নম্র !

যতই ভাবতে লাগলুম, মাথা ততই গরম হতে লাগল । শেষটায় মনে হল, কাল সকালে, আজ সকালেই বলা ভাল, কারণ ভোরের আলো তখন জানলা দিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করেছে, এঁদের আমি মদ্য দেখাব কী করে ? জানি, মাতালকে মানুষ অনেকখানি মাফ করে দেয়, কিন্তু এ যে একেবারে চামারের মাতলামো !

তা হলে পালাই ।

অতি ধীরে ধীরে কোন প্রকারের শব্দটি না করে স্টুটকেসটি ওইখানেই ফেলে গাছের আড়ালে আড়ালে কাস্‌ল্‌ থেকে বেরিয়ে স্টেশন পানে দে ছুট । মাইল-খানেক এসে ফিরে তাকালুম ; নাঃ, কেউ পিছু নেয় নি ।

চোরের মত গাড়িতে ঢুকে সোজা বার্লিন ।

মৌলা বললে, ‘শুনলেন, মামা ?’

চাচা বললেন, ‘আরে শোনই না শেষ অবধি ।’

সেদিন সম্ভাব্যেলায় তখন ঘরে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি, এমন সময় ঘরের দরজায় টোকা, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রারা । হায়, হায়, আমি ল্যান্ডলোডিকে একদম বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সবাইকে যেন বলে, আমি মরে গিয়েছি কিংবা পাগলা গারদে বন্ধ হয়ে আছি কিংবা ওই ধরনের কিছ্‌ একটা ।

শেষটায় মর-মর হয়ে ক্রারার কাছে মাতলামোর জন্য মাফ চাইলুম ।

ক্রারা বললে, ‘অত লজ্জা পাচ্ছ কেন ? ও তো মাতলামো না, পাগলামো । কিংবা অন্য কিছ্‌, তুমি সব কিছ্‌ বুঝতে পার নি, আমরাও যে পেরেছি তা নয় ।

‘তুমি যখন দাদার স্টুট পরে ডিনারে এলে তখনই তোমার সঙ্গে কোথায় যেন দাদার সাদৃশ্য দেখে বাবা আর আমি দুজনাই আশ্চর্য হয়ে গেলুম, বিশেষ করে ব্যাকরণ করা চুল আর একটুখানি ট্যারচা করে বাঁধা বো দেখে । তার পর তুমি জোর গলায় চাইলে বিয়ার, দাদাও বিয়ার ভিন্ন অন্য কোন মদ খেত না ; তুমি আরম্ভ করলে দাদারই মত বকতে, “লেখাপড়ার সময় কোথায় ? আমি তো কারি হৈ-হৈ”—আমি জানতুম একদম বাজে কথা ; কিন্তু দাদা হৈ-হৈ করত আর বলতেও কসুর করত না ।’

‘শুধু তাই নয় । দাদাও ডিনারের পর বাবার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলত এবং শেষটায় দুজনাতে ঝগড়া হত । জ্যাঠামশাই তখন নেমে এসে ওদের সঙ্গে তাস খেলা আরম্ভ করতেন এবং আবার হত ঝগড়া । অথচ তিনজনাতে ভালবাসা ছিল অগাধ ।’

‘তোমাকে আর সব বলার দরকার নেই ; তুমি যে ঘরে উঠেছিলে ওই ঘরেই একদিন দাদা আত্মহত্যা করে ।’

‘কিন্তু আসলে যে কারণে তোমার কাছে এলুম, তুমি মনে কষ্ট পেয়ে না ; বাবা-জ্যাঠামশাই আমাকে বলতে পাঠিয়েছেন, তাঁরা তোমার ব্যবহারে কিছ্‌ মাত্র আশ্চর্য কিংবা দঃখিত হন নি ।’

চাচা থামলেন ।

রায় বললেন, ‘চাচা, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, শিস দিয়েছিল স্টুটটাই, বিয়ারও ওই খেয়েছিল ।’

চাচা বললেন, ‘হক কথা । মদ মানে স্পিরিট, স্পিরিট মানে ভূত, তাই স্পিরিট স্পিরিট খেয়েছিল ।’

বাঁশী

আজ আর সে শান্তিনিকেতন নেই।

তার মানে এ নয়, গুরুদেব নেই, দিনুবাবু নেই, ক্ষিতিমোহনবাবু ক্লাস নেন না। সে তো জানা কথা। কোম্পানির রাজস্ব, মহারানীর সরকারই যখন চলে গেল তখন এঁরাও যে শালবাঁশী থেকে একদিন বিদায় নেবেন, সে তো আমাদের জানাই ছিল; কিন্তু এটা জানা ছিল না যে, আশ্রমের চেহারাটিও গুরুদেব সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

খুলে কই।

তখন আশ্রমের গাছপালা ঘর-বাড়ি ছিল অতি কম। গাছের মধ্যে শালবাঁশী, বকুলতলা, আম্রকুঞ্জ আর আমলকি-সারি। বাস্। হেথা-হোথা খানসাতেক ডরমিটরি, অতিথিশালা আর মন্দির। ফিরিষ্টি কম্প্লিট। তাই তখনকার দিনে আশ্রমের যেখানেই বসো না কেন, দেখতে পেতে দূরদূরান্তবাপী, চোখের সীমানা-চৌহদ্দি ছাড়িয়ে—খোয়াইয়ের পর খোয়াই, ডাঙার পর ডাঙা—চতুর্দিকে তেপান্তরী মাঠ। ভোরবেলা সৃষ্টিজঠাকুরের টিকিটি বেরুনোমাত্র সিটিও আমাদের চোখ এড়াতে পারত না। রাত তেরটার সময় চাঁদের ডিঙির গলুইখানা ওঠামাত্রই আমরা গেয়ে উঠতুম—‘চাঁদ উঠেছিল গগনে।’ যাবে কোথায়, চতুর্দিকে বেবাক ফাঁক। আর আজ? গাছে গাছে ছয়লাপ। আম জাম কাঁঠাল খানদানী ঘরানারা তো আছেনই। তার সঙ্গে জুটেছেন যত সব দেশ-বিদেশের নাম-না-জানা কালো নীল হলদে ইয়া-ইয়া ফুলের গাছ। এখন আশ্রমের অবস্থা কলকাতারই মত। সেখানে পাঁচতলা এমারত সৃষ্টিজ-চন্দর ঢেকে রাখে, হেথায় গাছপালায়।

ওই দূরদূরান্তে, চোখের সীমানার ওপারে তাকিয়ে থাকা ছিল আমাদের বাই। অবশ্য যারা লেখাপড়ার ভাল ছেলে তারা তাকাত বইয়ের দিকে, আর আমার মত গবেষ্টরা এক হাত দূরের বইয়ের পাতাতে চোখের চৌহদ্দি বন্ধ না রেখে তাকিয়ে থাকত সেই সন্দূর বাটের পানে—তাকিয়ে আছে কে তা জানে। গুরুদেব, অর্থাৎ শাস্ত্রীমশাই মিশ্রজী কিছু বলতেন না। তাঁরা জানতেন, বরঞ্চ একদিন শালতলার শালগাছগুলো নর-নরৌ-নরাঃ, গজ-গজৌ-গজাঃ উচ্চারণ করে উঠতে পারে কিন্তু আমাদের শ্বারা আর যা হোক, লেখাপড়া হবে না। অন্য ইন্সকুল হলে অবশ্য আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত, কিন্তু তাঁরা দরদ দিয়ে বুদ্ধতেন, আমি বাপ-মা-খ্যাদানো ছেলে, এসেছি এখানে, এখান থেকে খেঁদিয়ে দিলে, হয় যাব ফাঁসি, নয় যাব জেলে।

এই দূরের দিকে তাকিয়ে থাকার নেশা আপনাদের বোঝাই কী প্রকারে? আমি নিজেই যখন সেটা বুঝে উঠতে পারি নি, তখন সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, এ-নেশাটা সাঁওতাল ছোঁড়াদের বিলক্ষণ আছে। আকাশের সন্দূর সীমানা খুঁজতে গিয়ে তারা বেরিয়েছিল সাজে, তারপর অন্ধকার রাতে, পথ হারিয়ে একই জায়গায় সাত শো বার চক্র খেয়ে

পেয়েছে অন্ধা। বড়ো মাঝিরা বলে, পেয়েছিল ভূতে। সে-কথা পরে হবে।

আমি শান্তিনিকেতনে আসি ১৯২১ সনে। গাইয়া লোক। এখানে এসে কেউ বা নাচে ভরতনৃত্য, কেউ বা গায় জয়জয়ন্তী, কেউ বা লেখে মধুমালতী ছন্দে কবিতা, কেউ বা গড়ে নব নটরাজ, কেউ বা করে বাতিক, লেদার-গ্লার্ক, ফ্লেস্কা, স্ট্রুকো, উড-গ্লার্ক, এচিং, ড্রাই-পয়েন্ট, মেদজো-টিন্ট্- আরও কত কী। এক কথায় সবাই শিল্পী, সবাই কলাবৎ।

আমারও বাসনা গেল—শিল্পী হব। আর্টিস্ট হব। ওদিকে তো লেখা-পড়ায় ডডনং, কাজেই যদি শিল্পীদের গোয়ালে কোন গতিকে ভিড়ে যেতে পারি তবে সমাজে আমাকে বেকার-বাউন্ডুলে না বলে বলবে শিল্পী, কলাবৎ, স্মার্তিসং।

অথচ আমার বাপ-পিতামোর চোন্দপনুদুশ, কেউ কখনও গাওনা-বাজনার ছায়া মাড়ানো দূরে থাক, দূর থেকে ঝঙ্কার শুনলেই রামদা নিয়ে গাওয়াইয়ার দিকে হানা দিয়েছেন। আমরা কটর মুসলমান। কুরানে না হোক আমাদের স্মৃতি-শাস্ত্রে গাওনা-বাজনা বারণ, বাদর-ওলার ডুগডুগ শুনলে আমাদের প্রাচিস্তির করতে হয়। আমার ঠাকুন্দাদার বাবা নাকি সেতারের তার দিয়ে সেতারীকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন।

কাজেই প্রথম দিন ব্যালাতে ছড় টানা মাঠই আশ্রমের উঠল পরিচয়ই অটুরব। কেউ শূদ্রালে, গরু জবাই করছে কে; কেউ ছুটলে গুরুদেবের কাছে হিন্দু ব্রহ্মচর্যপ্রমে মামদো ভুতের উপদ্রব থামাবার জন্য অনুরোধ করতে। গুরুদেব পড়লেন বিপদে। তাঁর মনে পড়ল আপন ছেলেবেলাকার কাহিনী—তাঁর পিতৃদেব তাঁর প্রথম কবিতা শূনে কী রকম বাঁকা হাসি চেপে ধরেছিলেন। তাই তিনি সে রাতে কবিতা লিখলেন,

‘আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে

বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে?’

কার হাতে আর দেবেন? দিলেন আমারই হাতে। সবাই বুদ্ধিয়ে বললে, ‘ভাই ব্যালাটা ক্ষান্ত দাও। বাঁশী বাজাও; কিন্তু দোহাই আশ্রম-দেবতার আশ্রমের বাইরেই রেওয়াজটা কোর।’

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বাঁশী হাতে নিয়ে গেলুম সাঁওতাল-গায়ের দিকে। পশ্চিমাস্য হয়ে, অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধরলুম তৌড়।

সাঁওতাল-গায়ের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে মেলা ‘এন্কোর’, ‘সাধু সাধু’ রব কাড়লে।

সুদূর দিক-প্রান্তের দিকে, অস্তমান সূর্যের পানে তাকিয়ে আমার মাথায় তখন চাপল সেই বাই, যেটা পূর্বেই আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি—হোথায় যেথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আমাকে সেখানে যেতে হবে।

নেমে পড়লুম খোয়াইয়ে।

গোধূলির আলো ম্লান হয়ে আসছে। তারই লালিমা খোয়াইয়ের গেরুয়াকে কী রকম যেন মেরুন রঙ মাখিয়ে দিচ্ছে। চতুর্দিকে কী রকম যেন একটা দুজ্জ্বল আলী রচনাবলী (১ম)—২৩

ক্রান্তি আর অবসাদ। আমি সুন্দরের নেশায় এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ দৃশ্য করে অশ্বকার হয়ে গেল।

প্রথমটায় বিপদ বুঝতে পারলাম না। বুঝলাম মিনিট পাঁচেক পরে। অশ্বকারে হোঁচট খেয়ে, উঁচু ঢিপি থেকে গড়গড়িয়ে সবাক্ষ ছড়ে গিয়ে নীচে পড়ে, হঠাৎ উঁচু ঢিপির সঙ্গে আচমকা নাকের খাক্সা লেগে, কখনও বা কারও অদৃশ্য পায়ে বেমজ্জা ল্যাং খেয়ে মৃত্যু খুবড়ে পড়ে গিয়ে।

উঠি আর পড়ি, পড়ি আর উঠি।

দশ মিনিটে সাঁওতাল-গায়ে ফেরার কথা। পনের, পঁচিশ মিনিট, আধ-ঘণ্টাটুক হয়ে গেল, গায়ের কোনও পাতাই নেই।

ততক্ষণে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছি। জাহান্নামে যাক গে আকাশের সীমানা-ফিমানা, এখন আশ্রমের ছেলে আশ্রমে ফিরতে পারলে বাঁচি। কিন্তু কোথায় আশ্রম, কোথায় সাঁওতাল-গ্রাম! একই জায়গায় চক্কর খাচ্ছি, না, কোন একদিকে এগিয়ে যাচ্ছি তাই আল্লার মালুম।

এমন সময় কানের কাছে শুনি—

অভূত তীক্ষ্ণ কেমন যেন এক আতঁরব! একটানা নয়, থেমে থেমে। কেমন যেন—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফী-নী-নী-নী!—

ভয়ে ছুট লাগাবার চেষ্টা করলাম। সেই ফিঁৎ ফিঁৎ যেন কলরব করে উঠে আরও জোরে চেঁচাতে লাগল—ফীঁৎ ফীঁৎ!

ইয়া আল্লা, ইয়া পয়গম্বর, ইয়া মোলা আলীর মুরশীদ। বাঁচাও বাবারা, এ কী ভূত, না প্রেত, না ডাইনী!

হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম গড়গড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূতুড়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপার কী!

আস্তে আস্তে ফের রওয়ানা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই শব্দ—প্রথমে ক্ষণিক, আমি যত জোরে চলতে থাকি শব্দটাও সঙ্গে সঙ্গে জোরালো হতে থাকে। প্রথমটায় আস্তে আস্তে—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ। আমি যত জোর চলতে আরম্ভ করি শব্দটাও দ্রুততর হতে থাকে—ফিঁৎ ফিঁৎ ফিঁৎ।

আর সে কী প্রাণঘাতী, জিগরের খুন-জমানেওলা শব্দ!

যেন কোন কংকালের নাকের ভিতর দিয়ে আসছে দীঘনিশ্বাস—কখনও ধীরে ধীরে আর কখনও বা দ্রুতগতিতে। একদম, আমার সঙ্গে কদম কদম বাড়হায়ে যাচ্ছে, আমার কানের কাছে যেন সঁটে গিয়ে, লম্বা লম্বা হাতের আঙুল দিয়ে কানের পর্দাটা ছিঁড়ে দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল গুরুদেবের “কংকাল” গল্পটা। কিন্তু গুরুদেব মহাবীর সন্তান; তিনি ভয় পান নি। বেশ জমজমাট করে খোশগল্প করেছিলেন কংকাল আর ভূতের সঙ্গে। আমি পাপী—নেমাজ-রোজা নিত্য নিত্য কামাই দিই।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্বকার যেন আমার গলার টাঁটি চেপে ধরল।

আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। দেখি; যেন আমার চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ তারা

ফুটে উঠছে। কিন্তু হৃদয়ে রঙের। 'প্যার কোলম্বাস মাস্টার্ড'।

কতক্ষণ অন্তরান হয়ে পড়েছিলুম, বলতে পারব না।

যখন হৃদয় হল তখন গায়ে লাগল পূর্বের বাতাস। তাই উলটো দিকে চলতে আরম্ভ করলুম। ওই রকম যদি চলতে থাকি, তবে একদিন না একদিন আশ্রম, ভুবনডাঙা, কিংবা রেল লাইনে পৌঁছবই পৌঁছব।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ জোরে সেই—ফিৎ ফিৎ ফিৎ।

কিন্তু এবারে সঙ্গে সঙ্গে একটা টিপতে উঠতেই দেখি—উত্তরাংশ। তারই বারান্দায় গুরুদেবের সৌম্য মূর্তি। টেবিল-ল্যাম্পের পাশে বসে মিশ্রজীর সঙ্গে গল্প করছেন।

আমি চিৎকার করে উঠলুম—

ওয়া গুরুজীকী ফতে।

গুরুর জয়, গুরুদেবের জয়।

তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। তাঁরই কৃপায় রক্ষা পেয়েছি।

কিন্তু 'ওয়া গুরুজীকী ফতে' বেরিয়েছিল—'ওবা গরজীকী ফত' হয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে, চাপা সুরে।

ততক্ষণে ধড়ে জান ফিরে এসেছে।

শব্দটা তবে কিসের ছিল?

বাঁশীর। আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে হাওয়া ঢুকে ফিৎ ফিৎ করছিল। জোরে চললে হাত ঘন ঘন দোলা খেয়েছে, ফিৎ ফিৎ জোরে বেজেছে। আঙুলে আঙুলে আঙুলে।

বাঁশীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। শেষবারের মত ফিৎ করে কাতর আত'নাদ ছেড়ে সে নীরব হল।

আমি কলাবৎ হবার চেষ্টা করি নি।

গুরুদেব যখন গেলেন—

'বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে?'

তখন আমার কথা ভাবেন নি।